মুঘল আমলে বাংলায়

মুসলিম শাসনের ইতিহাস

ষোল'শ চৌদ্দ থেকে সতেরো'শ সাতান্ন

ডক্টর মুহাম্মদ মোহর আলী

মুঘল আমলে বাংলায়

মুসলিম শাসনের ইতিহাস

(১৬১৪ থেকে ১৭৫৭ সাল)

মূলঃ
ডক্টর মুহাম্মদ মোহর আলী

প্রকাশনায়

মেধা বিকাশ প্রকাশন

৩৮/৩ বুক্‌স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট
বাংলা বাজার, ঢাকা।

মুঘল আমলে বাংলায়
মুসলিম শাসনের ইতিহাস
(১৬১৪ সাল থেকে ১৭৫৭ সাল)

মূল:
ডক্টর মুহাম্মদ মোহর আলী
অনুবাদ:
মুহাম্মদ সিরাজ মান্নান

পরিবেশনায়
প্রফেসর'স পাবলিকেসন্স
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল:০১৭১১১২৮৫৮৬
E- mail: aislam12172@gmail.com

মুঘল আমলে বাংলায়

মুসলিম শাসনের ইতিহাস

ডক্টর মুহাম্মদ মোহর আলী

প্রকাশনায়

মেধা বিকাশ প্রকাশন

৩৮/৩, বাংলা বাজার, ঢাকা।

পরিবেশনায়

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স

বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মোবাইল: ০১৭১১-১২৮৫৮৬।

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : মে' ২০১৭ ইং

কম্পিউটার এন্ড গ্রাফিক্স

প্রফেসর'স ট্রেড কর্ণার

মগবাজার, ঢাকা।

গ্রন্থস্বত্ব : © অনুবাদক

মুদ্রণে

ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং প্রেস

মগবাজার, ঢাকা।

ISBN : 984-31-1426-0

শুভেচ্ছা মূল্য : ৪০০.০০ টাকা মাত্র।

HISTORY OF THE MUSLIMS OF BENGAL VOL.I BY DR. MOHAMMAD MOHOR ALI TRANSLATED BY MUHAMMED SIRAJ MANNAN, PUBLISHED BY A M AMINUL ISLAM, MEDHABIKASH PROKASHON 38/3 BANGLA BAZAR, DHAKA. PRICE TK. 400.00 ONLY.

মুখবন্ধ

ডঃ মুহাম্মদ মোহর আলী স্বমহিমায় পরিচিত ব্যক্তি, যাকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এই দেশের তিনিই একমাত্র বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব, যিনি মুসলিমবিশ্বের নোবেল পুরস্কার হিসেবে পরিচিত King Faisal International Prize পেয়েছেন। ইতিহাসের একজন শিক্ষক ও সত্যাশ্রয়ী গবেষক হিসেবে তিনি ইংরেজ ও হিন্দু ঐতিহাসিকগণ নবী মুহাম্মদ (সা.), সাহাবাসহ আরব-অনারব মুসলমান শাসকদের উপর যে কালিমা লেপন করতে চেয়েছিলেন, তার বিরুদ্ধে কলম ধরেন। তিনি তথ্য উপাত্তসহ যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে তাদের অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করে সত্যকে সকলের সামনে তুলে ধরতে সচেষ্ট হন। এরই অংশ হিসেবে তিনি HISTORY OF THE MUSLIMS OF BENGAL VOL. I & II রচনা করেন।

ডঃ মুহাম্মদ মোহর আলী রচিত HISTORY OF THE MUSLIMS OF BENGAL VOL. I (MUSLIM RULE IN BENGAL) বইটির **"মুঘল শাসনে বাংলা"** অংশটুকু বাংলায় অনুবাদ করার জন্য প্রায় ১৫ বছর আগে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আমাকে দায়িত্ব দেয়। বাকী অংশের দায়িত্ব পেয়েছিলেন জনাব ইব্রাহীম ভূঁইয়া। আমি যথারীতি অনুবাদ করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পান্ডুলিপিটি ফাউন্ডেশনের অনুবাদ বিভাগে জমা দেই। কিন্তু ফাউন্ডেশনের প্রশাসনিক কারণে তা প্রকাশ করা হয়নি। দীর্ঘদিন সেটি সেখানেই সংরক্ষিত থাকে।

অনেক পরিশ্রমের ফসল এই অনুবাদকর্মটি আর প্রকাশিত হবে না এমনটিই ধরে নিয়েছিলাম। বয়সের ভারে প্রকাশকের কাছে যাওয়া বা আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে নিজেই তা প্রকাশ করা-কোনটাই সম্ভব হচ্ছিল না। মহান আল্লাহর রহমতে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কিছু ব্যক্তির সার্বিক সহায়তায় সেই সমস্যার সমাধান হয়।

আগেই বলেছি যে, সম্পূর্ণ বইটি অনুবাদের দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়নি। HISTORY OF THE MUSLIMS OF BENGAL VOL. I (MUSLIM RULE IN BENGAL) বইটির তৃতীয় খন্ড THE MUGHAL RULE IN BENGAL এবং চতুর্থ খন্ড THE MURSHIDABAD NIYÂBAT অনুবাদ করার দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়।

বাংলা বা বঙ্গ নামের উৎপত্তি নিয়ে নানা মত রয়েছে। পরিবর্তনের হাওয়া এই বাংলার মানচিত্রে বারবার লেগেছে। বর্তমান বাংলাদেশ, ব্রিটিশ আমলের বাংলা অথবা এরও পূর্বে মুঘল আমলের বাংলার আয়তন এক নয় বর্ননা দিয়ে মূল বইয়ের লেখক ডঃ মুহাম্মদ মোহর আলী লিখেন It thus comprises not only the former British Indian province of Bengal but also parts of Bihar in the west and Assam in the east, together, at times with strips of Orissa-the south east আর এটাই ছিল সুবে বাংলা।

ইতিহাস গবেষণার এক পর্যায়ে এসে জানা যায় যে, হযরত মুহম্মদ মুস্তফার (সা.) জীবদ্দশায় (৫৭০-৬৩৩ খ্রীঃ) তাঁর কতিপয় শিষ্য সরন্দীপ বা শ্রীলঙ্কায় অবস্থিত হযরত আদমের (আ.) পদচিহ্ন দেখার জন্যে ভারতের দিকে আসেন। আরব তীর্থযাত্রীগণ মালাবার উপকূলের "পেরুমান পেরমল" নামক জনৈক হিন্দু রাজার সহিত "ক্রেঙ্গানো" নামক স্থানে সাক্ষাৎ করে হযরত মুহম্মদ মুস্তফা (সা.) কর্তৃক চন্দ্র-বিভাজন কাহিনী বর্ণনা করেন। রাজা এই অতিপ্রাকৃত (miraculous) ঘটনা বিশ্বাস করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং হযরত মুহম্মদকে (সা.) দর্শন করবার জন্য মক্কায় গমন করেন।

কিন্তু ভারতে প্রথম মুসলিম শাসক হিসেবে আবির্ভূত হন মুহাম্মদ ঘোরি। জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের ২১ এপ্রিলে সংঘটিত পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইবরাহিম লোদিকে পরাজিত করে ভারত উপমহাদেশে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর বাংলা অভিযানে শেখ আলাউদ্দিন চিশতীকে পাঠান। তিনি ইসলাম খান চিশতী (ইসলাম খান নামেই অধিক পরিচিত) নাম ধারণ করেন। ইসলাম খান সম্রাট জাহাঙ্গীরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তিনি বাংলার রাজধানী ঢাকায় স্থাপন করেন।

আর বাংলা মুসলিম শাসনের অধীনে আসে ১২০৩ সালের পর যখন আফগান বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী বল্লাল সেনকে পরাজিত করে বাংলা দখল করেন।

১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে হোসেনশাহী বংশের শেষ সুলতান গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহের পতনের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীন সালতানাতের সমাপ্তি ঘটে। মুগল সম্রাট হুমায়ুন রাজধানী গৌড় অধিকার করেন। অবশ্য তিনি তা বেশি দিন নিজের দখলে রাখতে পারেননি।

১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে চৌসার যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে শূর বংশীয় আফগান শেরশাহ বাংলার অধিপতি হন। বাংলায় এই আফগান আধিপত্য প্রায় পঁচিশ বছর (১৫৩৮-১৫৬৩ খ্রিঃ) পর্যন্ত স্থায়ী হয়। সম্রাট আকবরের শাসনকালে আফগানদের নিকট

থেকে বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে আসলেও পরিপূর্ণভাবে অধীনে আসে সুবাদার ইসলাম খানের মৃত্যুর আগ মুহূর্তে। ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দে সুবাদার ইসলাম খানের ভাই কাশিম খান, যিনি মঙ্গীরের গভর্ণর ছিলেন, তাকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করা হয়। এই সময় কাছারের গোত্র প্রধান সাতরুদামান মোগলদের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য যে, অনূদিত বই এখান থেকেই শুরু।

ভারতবর্ষে ১৫২৬ সনে মুঘল শাসন শুরু হলেও পুরো বাংলায় তাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে সময় লাগে প্রায় ৯০ বছর। ১৬০৮ সনে পুরো বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলাম খানের মাধ্যমে। ১৬১৭ সালে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভাই ইব্রাহীম খানকে বাংলার সুবাদার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটলে নূরজাহান প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সম্রাটের পঞ্চম পুত্র শাহরিয়ারকে সিংহাসনে বসানোর পথ পরিষ্কার করতে থাকেন। এই সময় সম্রাটের তৃতীয় পুত্র শাহজাহান বাংলা দখল করেন এবং ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জানুয়ারী দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন।

বইটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে বাংলার অবস্থা কেমন ছিল, তার বর্ণনা রয়েছে। শাহজাহান সিংহাসনে আরোহন করেই বাংলার সুবাদার ফিদাই খানের পরিবর্তে কাশিম খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। তিনি বাংলায় সুবাদার ইসলাম খান চিশতীর সময় খাজাঞ্চী বা প্রাদেশিক অর্থমন্ত্রী ছিলেন।

বাংলায় আগেই পুর্তগীজদের আগমন ঘটেছিল। ১৬২৪ সালে পুর্তগীজরা হুগলীতে যে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করে, ১৬৩২ সালে মুঘলরা সেই হুগলী দখলের মাধ্যমে মানুষকে তাদের বর্বরতা থেকে উদ্ধার করে।

তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে ১৬৬০-১৬৬৩ সাল পর্যন্ত, যখন বাংলায় মীর জুমলা সুবাদার ছিলেন। মীর জুমলা ছিলেন বুদ্ধিমান, উদ্যোগী ও সাহসী। তাঁকে খান-ই-খানান উপাধি দেওয়া হয়। তাঁর সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাথে সম্পর্কের সংস্কার করা হয়। ইংরেজ বণিকরা যে অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করে, তা তিনি কঠোর হস্তে দমন করেন। ১৬৬১ সালে মীর জুমলা কুচবিহার ও আসাম অভিযানের জন্যে যাত্রা শুরু করেন। ১৬৬২ সালে তিনি কামরূপ পুনরুদ্ধার করেন।

চতুর্থ অধ্যায় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত সুবাদার শায়েস্তা খানের বিজয় ও শাসনব্যবস্থার বর্ণনা রয়েছে। বাংলার সুবাদার মীর জুমলার মৃত্যু সারা ভারতে একটি বড় রকমের আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৬৬৪ সালের ৪ মার্চ সুবাদার হিসেবে শায়েস্তা খান সুবেহ বাংলার এক সময়ের রাজধানী রাজমহলে (বর্তমানে এর নাম আকবরনগর) প্রবেশ করেন। তিনি তাঁর পুত্রকে রাজপ্রতিনিধি (ভাইসরয়) হিসেবে রাজধানী ঢাকায় প্রেরণ করেন। ১৬৬৪ সালের ডিসেম্বরে তিনি রাজধানী ঢাকায় আসেন।

সুবাদার শায়েস্তা খান আওরঙ্গজেবের মামা ছিলেন। তাঁকে "আমীরুল ওমারাহ্" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি বাংলায় প্রশাসনিক সংস্কারের দিকে নজর দেন। তিনি জায়গীরদার, আইমাদার এবং নিস্কর মাদাদ-ই-মায়াশ ভোগকারীদের সুবিধার জন্যে কয়েকটি কল্যাণকর প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করেন। এতে বহু সংখ্যক মুসলমান নিশ্চিন্ত ও স্থায়ীভাবে এ দেশে বসবাসের সুযোগ পান।

সুবাদার শায়েস্তা খানের সময়ে বাংলায় ইঙ্গো-ওলন্দাজ যুদ্ধ হয়। ইংরেজ বণিকদের লাগামহীন বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও তাদের কাছ থেকে যথাযথ রাজস্ব আদায় করার কারণে বহু ইংরেজ ঐতিহাসিক তাঁকে অত্যাচারী শাসক হিসেবে চিহ্নিত করেন। মূলত শায়েস্তা খানের সুবাদারী ছিল বাংলায় মুঘল শাসনের সেরা যুগ।

সুবাদার শায়েস্তা খানের পর বাংলায় সুবাদার ছিলেন যথাক্রমে খান-ই-জাহান বাহাদুর (১৬৮৮-১৬৮৯), ইব্রাহীম খান (১৬৯০-১৬৯৭) এবং শাহজাদা আজীমুদ্দীন (১৬৯৭-১৭১২)। এই তিন সুবাদারের শাসনকালে এমন সব ঘটনা ঘটে এবং প্রক্রিয়া শুরু হয়, যা শেষ পর্যন্ত বাংলায় মোগল শাসনের অবসান ঘটায়। সপ্তম অধ্যায়ে এর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়ে বাংলায় মুর্শিদাবাদের নওয়াবী শাসন দিয়ে শুরু হয়। নবাব মুর্শিদ কুলী খান বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন। তাঁকে আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হতো: কারণ তাঁর শাসনামলে বাংলায় তুলনামূলকভাবে শান্তি বিরাজমান ছিল। তবে ১৭০৭ সালে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুতে বাংলার শাসনব্যবস্থায় কিছুটা অস্থিরতা দেখা দেয়।

নবাব মুর্শিদ কুলী খান তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর দৌহিত্র (নাতি) সরফরাজ খানকে তাঁর উত্তরসূরী রূপে সুবেহ বাংলার নবাব মনোনীত করেন। তাঁর আসল নাম ছিল মির্জা আসাদুল্লাহ। সরফরাজ খানের তুলনায় তাঁর পিতা শুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খান সামরিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অধিকতর দক্ষ ছিলেন। নবাব মুর্শিদ কুলী খানের আস্থাভাজন ব্যক্তিগণও সরফরাজ খানের পরিবর্তে শুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খানকে সমর্থন করেন। সরফরাজ খান অবস্থা বুঝে তাঁর পিতার বশ্যতা স্বীকার করেন।

যা হোক, শুজাউদ্দিন খানের মৃত্যুর পর তার পুত্র বাংলার মসনদে বসেন, কিন্তু তাকে পরাজিত করে আলীবর্দী খান বাংলার মসনদে বসেন। বিজয় লাভ করলেও তিনি সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ না করে কিছু প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসে তাঁর আত্মীয়দের প্রাধান্য দেওয়া হয়। সরফরাজ খানের অনুগতদের সাথে আলীবর্দী খানের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ বিগ্রহ চলে। ঐতিহাসিকদের মতে এই সময় বাংলার পূর্বাঞ্চলে মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক দীনতা সৃষ্টি হয়।

নবাব আলীবর্দী খানের মৃত্যুর পর সিরাজুদ্দৌলাহ বিনা বাধায় বাংলার মসনদে বসেন। ঘষেটি বেগম তাঁর অনুগত বাহিনী দ্বারা সিরাজুদ্দৌলাহকে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করলে নবাবের বাহিনী তা প্রতিহত করে এবং তাঁকে মুর্শিদাবাদের প্রাসাদে বন্দী করা হয় এবং তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। সিরাজুদ্দৌলাহ নবাব হবার পর প্রথা অনুসারে ইংরেজদের প্রতিনিধি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেনি বা উপঢৌকন পাঠায়নি। মূলত ইংরেজরা এতদিনে এই অঞ্চলে নিজদেরকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

ফোর্ট উইলিয়ামকে কেন্দ্র করে ইংরেজরা বিদেশে ব্যবসায়ে নিয়োজিত বণিকের মত আচরণ না করে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সরকারের মত আচরণ করে। তারা সেখানে একের পর এক ষড়যন্ত্র শুরু করে। সিরাজুদ্দৌলাহ ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) সৈন্য নিয়ে ফোর্ট উইলিয়াম আক্রমণ করেন। দুই দিন যুদ্ধ করার পরে দুর্গের অধিকাংশ ইংরেজ সৈন্য নদীর কয়েক মাইল ভাটিতে ফল্টায় পালিয়ে যায়।

বিশ্বাসঘাতক জগৎশেঠ, উমিচাঁদ ও রাজবল্লভ মিলে জগৎশেঠের বাড়িতে এক গোপন মিটিংয়ে এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, সিরাজুদ্দৌলাহকে বাংলার মসনদ থেকে সরাতে হবে। সেই মিটিং এ মহিলার ছদ্মবেশে পালকীতে করে যোগ দিয়েছিলো ইংরেজ দূত ওয়াটস। মিটিং এ সিদ্ধান্ত হয় যে, সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করা হবে, আবার মুসলমানদের উত্তেজিত করা যাবে না। এজন্য সিরাজের আত্মীয় মীর জাফরকে মসনদে বসানো হবে। এরপর জগৎশেঠের বাড়িতে দফায় দফায় মিটিং হয়। সেখানে উপস্থিত থাকেন জগৎশেঠ, রাজা মহেন্দ্ররায় (রায় দুর্লভ), রাজা রামনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও মীরজাফর।

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে সিরাজ বাহিনীর সাথে ইংরেজ বাহিনীর যুদ্ধ হয়। মীরজাফরসহ হিন্দু সেনাপতিদের নিষ্ক্রিয়তায় সিরাজ বাহিনীর সংখ্যা বেশি হলেও ইংরেজ বাহিনীর কাছে তারা পরাজিত হয়। বাংলার আকাশে পরাজয়ের পতাকা উড়ে আর জমিনে চেপে আসে জগদ্দল পাথর। ১৯০ বছর পর লাখ লাখ মানুষের জীবনের বিনিময়ে সেই পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গা সম্ভব হয়।

মুহাম্মদ সিরাজ মান্নান

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় (১৬১৪-১৬২৭ খ্রিঃ)	**১৫-৩৮**
মুগলদের শান্তি প্রক্রিয়া এবং সীমান্ত যুদ্ধের শুরু	১৫
১. সুবাদার কাশিম খানের শাসনকাল	১৬
২. ইব্রাহীম খানের শাসন কাল	২৩
৩. বাংলায় যুবরাজ শাহজাহান	২৮
দ্বিতীয় অধ্যায় (১৬২৮-১৬৫৯ খ্রিঃ)	**৩৯-৭০**
শাহজাহানের রাজত্বকালে বাংলা	৩৯
১. সুবাদার কাশিম খানের শাসন এবং পর্তুগীজদের নিকট থেকে হুগলী দখল	৪০
(ক) বাংলায় পর্তুগীজদের আগমন	৪১
(খ) কাশিম খানের হুগলী বিজয়	৪৯
২. আযম খান এবং ইসলাম খান মাশহাদীর সুবাদারী এবং আসাম ও আরাকানের সাথে সংঘর্ষ	৫৫
(ক) আসামের সাথে সংঘর্ষ	৫৬
(খ) আরাকানের সাথে গোলোযোগ	৫৯
৩. বাংলার সুবাদার হিসেবে শাহজাদা শুজা	৬০
৪. উত্তরাধিকার যুদ্ধ এবং শুজার জীবনের সমাপ্তি	৬৬
তৃতীয় অধ্যায় (১৬৬০-১৬৬৩ খ্রিঃ)	**৭১-১১৬**
মীর জুমলার সুবাদারী	৭১
১. প্রশাসনিক পুনর্গঠন	৭৩
২. ইউরোপীয় কোম্পানী সমূহের সঙ্গে সম্পর্ক	৭৬
(ক) যখন তিনি দাক্ষিণাত্যে ছিলেন	৭৬
(খ) বাংলার বিদেশী বণিকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক	৮১
৩. কুচবিহার এবং আসাম অভিযান	৯৩
(ক) পটভূমি এবং কারণ	৯৩

(খ) কুচবিহার অধিকার ৯৭

(গ) কামরূপ পুনরুদ্ধার ৯৯

(ঘ) মূল আসামে অভিযান ১০১

(ঙ) রাজধানী গাড়গাঁও অধিকার ঃ আপোষমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ১০৩

(চ) আগাম বর্ষার প্রকোপ ঃ মীর জুমলার সমস্যা ১০৬

(ছ) পুনরায় আক্রমণ শুরু এবং শান্তিচুক্তি সম্পাদন ১১০

৪. মীর জুমলার প্রত্যাবর্তন এবং মৃত্যু ১১৩

চতুর্থ অধ্যায় (১৬৬৪-১৬৭৮ খ্রিঃ) ১১৭-১৪৭

শায়েস্তা খানঃ বিজয় এবং শাসন ব্যবস্থা ১১৭

১. মীর জুমলার মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা ১১৭

২. শায়েস্তা খানের আগমন এবং কুচবিহার পুন:অধিকার ১২০

৩. প্রশাসনিক এবং রাজস্ব ব্যবস্থা ১২৩

৪. চট্টগ্রাম জয় ১৩০

৫. চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মূল্যায়ন ১৪২

পঞ্চম অধ্যায় (১৬৭৭-১৬৭৯ খ্রিঃ) ১৪৮-১৯৪

১. শায়েস্তা খান এবং বাংলায় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য ১৪৮

(ক) প্রাথমিক মন্তব্য ১৪৮

(খ) প্রথম পর্যায়, ১৬৬৪ থেকে ১৬৬৯ সাল ১৫৭

(গ) ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দের পরওয়ানার প্রয়োগ ১৭২

ষষ্ঠ অধ্যায় (১৬৭৯-১৬৮৮ খ্রিঃ) ১৯৫-২১৭

বাংলায় ইংরেজদের প্রথম যুদ্ধ ১৯৫

১. বাংলায় শায়েস্তা খানের অনুপস্থিতি এবং অন্তবর্তী সময় ১৯৫

২. শায়েস্তা খানের দ্বিতীয় মেয়াদের সুবাদারী ২০১

বাংলায় ইংরেজদের প্রথম যুদ্ধ ২০১

সপ্তম অধ্যায় (১৬৮৮-১৭১২খ্রিঃ) ২১৮-২৩৪

সমাপ্তির সূচনা ২১৮

১. খান-ই-জাহান বাহাদুরের সুবাদারী ২১৯

বাংলায় ইংরেজদের দ্বিতীয় অভিযান ২১৯

২. সুবাদার ইব্রাহীম খান ২২১

বাংলায় ইংরেজদের পুনরায় বসতি স্থাপন ২২১
৩. রহিম খান আফগান এবং শোভা সিংয়ের বিদ্রোহ ২২৩
৪. শাহজাদা আজীমুশ্বানের সুবাদারী ২২৬
রহিম খান আফগানীর বিদ্রোহ দমন ২২৬
৫. শাহজাদার অর্থোপার্জন ২২৮
ইংরেজরা সুতানটী, কলিকাতা এবং গোবিন্দপুর ক্রয় করে ২২৮
৬. শাহজাদা এবং করতলব খানের মধ্যে সংঘাত ২৩০

অষ্টম অধ্যায় (১৭০৪ খ্রি:-১৭২৭ খ্রি:) ২৩৫-২৮২

মুর্শিদাবাদের নওয়াব মুর্শিদ কুলী খান ২৩৫

১. মুর্শিদ কুলী খান "আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তি" ২৩৫
২. শাহজাদা ফাররুখ সিয়ারের সঙ্গে জিয়াউদ্দীন খানের সংঘাত ২৩৯
৩. সীতারামের বিদ্রোহ ২৪৪
৪. বাংলার সুবাদার হিসেবে মুর্শিদ কুলী খানঃ
তাঁর প্রশাসনিক এবং রাজস্ব বিষয়ক পদক্ষেপসমূহ ২৪৭
৫. মুর্শিদ কুলী খান এবং ইউরোপীয় বণিক ২৬১
(ক) ইংরেজদের প্রাথমিক অসুবিধাসমূহ ২৬৩
৬. বাংলা থেকে মুর্শিদ কুলী খানের অন্তর্বর্তীকালীন অনুপস্থিতি (১৭০৮-১৭১০খ্রিঃ) ২৬৭
৭. মুর্শিদ কুলী খানের প্রত্যাবর্তন ২৭১
ইংরেজদের জন্য ফাররুখ সিয়ারের ফরমান ১৭১৭খ্রিঃ ২৭১
৮. চরিত্র ও মূল্যায়ন ২৭৫

নবম অধ্যায় (১৭২৭-১৭৪০ খ্রি:) ২৮৩-৩১৪

১. শুজাউদ্দীন মুহাম্মদ খান এবং সরফরাজ খান একটি বিলম্বিত যুদ্ধ ২৮৩
২. শুজাউদ্দীন খানের প্রাথমিক পদক্ষেপসমূহ ২৮৮
৩. জাহাঙ্গীর নগরের ঘটনাবলী ২৯১
ত্রিপুরা বিজয় ২৯১
৪. উড়িষ্যা এবং অন্যান্য বিষয় ২৯৪

৫. বিহার সংযোজন ২৯৫

আলীবর্দী খানের উত্থান ২৯৫

৬. ইউরোপীয় বণিক ২৯৯

৭. শেষের বৎসরসমূহ এবং মূল্যায়ন ৩০৩

৮. সরফরাজ খান, বিলম্বিত উত্তরাধিকার যুদ্ধ ৩০৬

দশম অধ্যায় (১৭৪০-১৭৫৬ খ্রিঃ) ৩১৫-৩৬৬

আলীবর্দী খান ৩১৫

আভ্যন্তরীণ মতভেদ এবং বিদেশী অনুপ্রবেশ ৩১৫

১. আলীবর্দী খানের বাংলার মসনদে আরোহণ ৩১৫

২. উড়িষ্যা অধিকারের চেষ্টা ৩১৮

৩. প্রতিরোধ যুদ্ধ ঃ মীর হাবীব এবং মারাঠাদের আক্রমণ ৩২৬

৪. আফগান বিদ্রোহ এবং চতুর্থ মারাঠা আক্রমণ ৩৩৪

৫. মীর হাবীব উড়িষ্যা অধিকারে রাখে,
আফগানদের দ্বিতীয় বিদ্রোহ (১৭৪৬ সাল) ৩৩৯

৬. মীর হাবীব এবং মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি (১৭৫১খ্রিঃ) ৩৪৪

৭. আলীবর্দী খানের শেষের কয়েক বৎসর
বাংলায় ইংরেজদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ ৩৫০

একাদশ অধ্যায় (এপিল ১৭৫৬ খ্রিঃ-২৩ জুন ১৭৫৭ খ্রিঃ) ৩৬৭-৪০০

সিরাজুদ্দৌলাহ এবং বাংলায় মুসলিম শাসনের অবসান ৩৬৭

১. ইংরেজদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ৩৬৭

২. ফলটায় ইংরেজদেন অবস্থান ৩৭৪

৩. ইংরেজদের আক্রমণ এবং সিরাজুদ্দৌলাহর পতন ৩৮২

৪. সিরাজুদ্দৌলাহর পরাজয় এবং নিহত হওয়া ৩৯০

মুঘল আমলে বাংলার কয়েকজন মুসলিম শাসক ৩৯৮

প্রথম অধ্যায়[১]

মোগলদের শান্তি প্রক্রিয়া এবং সীমান্ত যুদ্ধের শুরু

ইসলাম খান তাঁর মৃত্যুর অল্প পূর্বে আফগান সর্দার ও অন্যান্য গোত্রীয় প্রধানদের দমনে সফল হয়েছিলেন। তাদেরকে শান্ত করে বাংলার বুকে মোগলদের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা তখনো বাকি। তদুপরি, শেষোক্ত শক্তি বাংলার শাসকদের পরাজিত করার কারণে স্বভাবতই বাংলার উত্তরপূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব সীমান্তের সমস্যার প্রতি নতুন শাসকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। পূর্ববর্তী গোলযোগকালীন সময়ে উত্তরপূর্ব সীমান্তে আসামরাজ এবং দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে আরাকানীরা এবং পর্তুগীজরা বারবার হামলা করছিল। এখন তাদের মোকাবেলা করা প্রায় অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। অতএব, এটা অস্বাভাবিক নয় যে, ইসলাম খানের পরবর্তী উত্তরসূরীদ্বয়কে বাংলার এই সমস্যাগুলোর মোকাবেলা করতে হয়। এই উত্তরসূরীদ্বয় হচ্ছেন কাশিম খান (১০২৩-১০২৬ হিঃ/১৬১৪-১৬১৭ খ্রিঃ) এবং ইব্রাহিম খান (১০২৬-১০৩৩ হিঃ/১৬১৭-১৬২৪ খ্রিঃ), শেষোক্ত ব্যক্তি রাজমহলের নিকট আকবরনগর নামক স্থানে সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী যুবরাজ শাহজাহানের সঙ্গে এক যুদ্ধে নিহত হন। শাহজাহান প্রায় এক বৎসর এ প্রদেশে তাঁর আধিপত্য বজায় রাখেন। তারপর সম্রাট জাহাঙ্গীরের জন্য প্রদেশটি পুনরুদ্ধার করা হয়। তাঁর শাসনকাল দ্রুত শেষ হয়ে আসছিল এবং তাঁর জীবনের অবশিষ্ট তিন বৎসরে পর পর তিন জন সুবাদার যথা:- মহবত খান (তার পুত্র খানাহজাদ খানের সাহায্যে), মুকাররম খান এবং ফিদাই খান প্রদেশটির শাসনকার্য পরিচালনা করেন। সুবাদার হিসেবে তাদের শাসনকাল ছিল অনেকটা অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থার মত এবং এই সময়ে তেমন কোন অগ্রগতি বা কোন তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেনি।

---

১. মূল বইয়ের ষষ্টদশ অধ্যায়.

মুসলিম শাসনের ইতিহাস-১৬

১. সুবাদার কাশিম খানের শাসনকাল

(১০২৩-১০২৬ হিঃ/১৬১৪-১৬১৭ খ্রিঃ)

কাশিম খান ছিলেন সাবেক সুবাদার ইসলাম খানের ভাই এবং বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে তিনি ছিলেন বিহারের মঙ্গীরের শাসক। নতুন সুবাদারের অবশ্য তাঁর ভাই সাবেক সুবাদারের মত যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা এবং কর্মতৎপরতার কিছুই ছিল না এবং তিনি তাঁর নতুন দায়িত্বভার গ্রহণে বেশ বিলম্ব করে শুরুতেই ভুল করে বসেন। কারণ যদিও তিনি তাঁর ভাইয়ের পদে ১০২২ হিজরীর শাবান মাস/১৬১৩ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে নিয়োগ পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি প্রায় আট মাস পরে রবিউল আউয়াল ১০২৩ হিজরী, মে ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীরনগরে পৌঁছেন। এ অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে দিওয়ান মীর্যা হুসেন বেগ তার নিজপদ দিওয়ানের[২] দায়িত্বের অতিরিক্ত সুবাদার এবং কোতোয়ালের দায়িত্ব গ্রহণ করে একাই শাসন পরিচালনা করেন। এ কাজে তাকে সাহায্য করেন বখশী খাজা[৩] তাহির মুহাম্মদ, সংবাদ লেখক (Waqia Nawis)[৪] আগা ইয়াগমা (Aga Yaghma) এবং সাবেক সুবাদারের পুত্র শেখ হুশাং। অবশেষে যখন কাশিম খান ঢাকায় পৌঁছেন এবং তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তখন তিনি দেখতে পান যে, এই চক্রটি তাকে পছন্দ করছে না। একজন নতুন কোতোয়াল[৫] নিয়োগ নিয়ে তাদের দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কারণ দিওয়ান হুসেন বেগ তাঁর এ কাজের বিরোধিতা করেন। তার পুত্র সুবাদারের সমর্থকদের আক্রমণ করে কয়েকজনকে হতাহত করে। প্রতিশোধ নিতে সুবাদার কাশিম খান দিওয়ানকে বন্দী করেন এবং তার বিষয়-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন।

অবশেষে সম্রাট জাহাঙ্গীরের হস্তক্ষেপে তাদের এ দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। এ বিষয়ে তদন্ত এবং আর্থিক বিষয়াদি নিষ্পত্তি করার জন্য সম্রাট পরপর দুইজন কর্মকর্তাকে পাঠান। অবশেষে দিওয়ানকে মুক্তি দেয়া হয় এবং তার সম্পদও তাকে প্রত্যার্পণ করা হয়। তদুপরি, কাশিম খান তাকে এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতেও বাধ্য হন। ফলে তাঁর শুরুটা ভাল হয়নি এবং তাঁর ও দিওয়ানের পক্ষদ্বয়ের মধ্যে তিক্ত সম্পর্ক অব্যাহত থাকে। কিছু দিন পরে সম্রাট দিওয়ানকে প্রত্যাহার করে তার স্থলে মুখলিস খানকে প্রেরণ করেন এবং তাকে নতুন করে বখশী এবং সংবাদ লেখক নিয়োগেরও ক্ষমতা প্রদান করেন।[৬]

---

২. দিওয়ান হচ্ছেন সরকারের রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা।

৩. বখশী হচ্ছেন সামরিক হিসাব বিভাগের প্রধান।

৪. তথ্য কর্মকর্তা।

৫. কোতোয়াল হচ্ছেন পুলিশ প্রধান।

৬. তুযুক. ১.পৃঃ ৩০৬.

অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং ব্যক্তিগত এ দ্বন্দ্ব থামতে না থামতেই উত্তরপূর্ব সীমান্তে কাছারের কিছু ঘটনাবলীর প্রতি সুবাদারের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। এ অঞ্চলটি সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুবাদার ইসলাম খান কাছারের বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করে[৭] এর রাজা সাতরুদামানকে পরাজিত করেন এবং মোগল সম্রাটের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে তাকে বাধ্য করেন। বুঝা যাচ্ছে যে, ইসলাম খানের মৃত্যুর পর সাতরুদামান মোগলদের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এতে পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়, যখন সিলেটের নিকটবর্তী দক্ষিণ-পশ্চিম কাছারের একটি বিশেষ শ্রেণির লোক নতুন উৎপাত শুরু করে। তারা দাবী তোলে যে, তারাই হচ্ছে "আদি মোগল" এবং প্রচার করে যে, তারা হচ্ছে তৈমুরের একটি বিশেষ সেনাদলভুক্ত সৈন্যদের উত্তর পুরুষ, যাদেরকে ভারতে রেখেই তারা তাদের দেশে প্রত্যাবর্তন করেছে। যদিও এ সকল লোক কাছারী ভাষায় কথা বলত, কিন্তু তাদের দৈহিক গঠন, চাল-চলন এবং প্রথা-পদ্ধতি ছিল সাধারণ কাছারীদের থেকে আলাদা। তাদের দাবীর মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার আগেই তাদের দমন করার জন্য কাশিম খান দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সে অনুযায়ী তিনি তাদের বিরুদ্ধে পূর্ব সিলেটের বিন্দাসিল থানার প্রধান মুবারিজ খানের নেতৃত্বে ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে (শাওয়াল, ১০২৩ হিঃ) এক অভিযান প্রেরণ করেন। তাদেরকে পরাজিত ও দমন করতে মুবারিজ খানের বেশি সময় লাগেনি। এ অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর কাশিম খান তাকে সাতরুদামানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং তাকে সহযোগিতা করার জন্য মিরক বাহাদুর জালাইর নেতৃত্বে আরেকটি সু-সজ্জিত বাহিনী প্রেরণ করেন। মুবারিজ খান কাছারের বিরুদ্ধে মোগলদের পূর্ববর্তী আক্রমণ অভিযানগুলোতেও অংশগ্রহণ করেন এবং এজন্য একই পথ অনুসরণ করে প্রাথমিকভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম কাছারের অন্তর্গত প্রতাপগড় দুর্গ আক্রমণ করেন এবং পরে এর কয়েক মাইল উত্তরের আসুরেতাকার দুর্গ আক্রমণ করেন। উভয় জায়গায়ই সাতরুদামান প্রচন্ড প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। কিন্তু তিনি পরাজিত হন এবং মোগলরা দুর্গ দুটি দখল করে নেয়। সাতরুদামান পুনরায় শান্তির জন্য আবেদন করেন। কর হিসেবে প্রচুর নগদ অর্থ ও হাতি প্রদান করে মোগল সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের নিশ্চয়তা প্রদান করেন, তবে তিনি তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং দরবারে হাজিরা দেয়ার ব্যাপারে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন। কাশিম খান শর্তাবলী মেনে নেন। তবে চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার পূর্বেই হঠাৎ করে মুবারিজ খান ইন্তেকাল করেন। তখন তার সহকারী মিরক বাহাদুর জালাইর খান কালবিলম্ব না করে আসুরেতাকার দুর্গ ত্যাগ করে

৭. তুযুক- ১. পৃঃ ৩১৭-৩১৮

সিলেটে প্রত্যাবর্তন করেন। এভাবে এ অভিযানে সাময়িক বিজয় অর্জিত হলেও বাস্তবে এর রাজনৈতিক ফলাফল শূণ্যে পর্যবসিত হয়। কাশিম খান অবশ্য মিরক বাহাদুর জালাইরকে অপসারণ করে কামরূপ বিজেতা মুকাররম খানকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন। কিন্তু সাতরুদামানের বিরুদ্ধে আর কোন অভিযান প্রেরণ করা যায়নি। কারণ দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে আরাকানীদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল আরো প্রবল।

মোগল-আফগান ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং এ অবস্থায় যে অশান্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, এ সুযোগে আরাকানের রাজা মেং খামাউং চট্টগ্রাম পর্যন্ত তার কর্তৃত্ব সম্প্রসারণ করেন এবং এখানে একটি মজবুত দুর্গ গড়ে তোলে একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী মোতায়েন করেন। এখান থেকে তিনি পূর্ব দিকে সোনারগাঁও এবং পশ্চিমে হুগলী পর্যন্ত বাংলার দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে প্রায়ই আক্রমণ করে লুট-তরাজ করতেন।[৮] তার সব আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের সময় তিনি মাঝে মধ্যে পর্তুগিজ জলদস্যুদের সঙ্গেও সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তেন। বিশেষ করে তাদের একজন বিশেষ নেতা সেবাস্টিয়ান গঞ্জালেসের সঙ্গে, যিনি এ সময় নিজকে সন্দীপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন[৯] তার সংগেও দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠাকে আরাকানের রাজা এবং গঞ্জালেস উভয়েই ভয়ের কারণ হিসেবে গণ্য করতেন এবং স্বভাবতই তারা বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে মোগলদের প্রতিরোধ করা এবং মোগলদের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করার লক্ষ্যে পারস্পারিক সহযোগিতার বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করেন। ইসলাম খান কর্তৃক ভুলুয়া (নোয়াখালী) জয় করায় বাস্তবক্ষেত্রে মোগলশক্তি সরাসরি আরাকানীদের সংস্পর্শে এসে যায়। স্মরণ করা যেতে পারে যে, মোগল সেনাবাহিনী যখন ভুলুয়ায় উপস্থিত হয়, তখন এর রাজা অনন্ত মাণিক্য আরাকানে পালিয়ে যান এবং আরাকান রাজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। অবশ্য অনন্ত মাণিক্যের পরবর্তী তৎপরতা সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না। কিন্তু আরাকান রাজ শীঘ্রই গঞ্জালেসের সঙ্গে তার বিবাদ মিটিয়ে ফেলেন এবং ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে (জিলক্বদ, ১০২৩) উভয়ে সম্মিলিতভাবে স্থল ও নৌপথে ভুলুয়া আক্রমণ করেন। কাশিম খান তখনো কাছার অভিযান থেকে পুরোপুরি মুক্ত হননি। আরাকান রাজ এক বিরাট বাহিনী নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে স্থল পথে অগ্রসর হন এবং তার সঙ্গে ছিল ৭০০ যুদ্ধ হস্তী এবং পতুগীজদের প্রচুর সংখ্যক স্থল সৈন্য, আর তার নৌ-বাহিনী গঞ্জালেসের নৌ-বাহিনীর সঙ্গে যোগ

---

৮ দ্রষ্টব্য, জে.এন. সরকার, "দ্যা ফিরিঙ্গি পাইরেটস অব চাটগাঁও," জে.এ.এসবি, ১৯০৭, ৪১৯-৪২৫. এর ভিত্তি হচ্ছে শিহাবুদ্দীন তালিশের বিবরণ. এ বিবরণের প্রাসঙ্গিক অংশ সরকার সংযোজন করে দিয়েছেন।

৯ সন্দীপ পূর্বে নোয়াখালী জেলার অন্তর্ভূক্ত ছিল। বর্তমানে এটি চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্ভূক্ত।

দিয়ে জল পথে অগ্রসর হয়।[১০] ভুলুয়ার মোগল থানাদার আবদুল ওয়াহিদ আক্রমণকারী বাহিনীর মোকাবেলা করা অসম্ভব মনে করেন এবং পর্তুগীজ ও আরাকানীদের নৌ-জাহাজের নাগালের বাহিরে থাকার জন্য উত্তর দিকে ডাকাতিয়া নদী এবং মাছোয়া খালের দিকে পশ্চাদপসারণ করেন। এতে আক্রমণকারীরা যথেচ্ছা সুযোগ পায় এবং ভুলুয়া নদীর উভয় পার্শ্বের লোকালয়ে ব্যাপক লুটতরাজ করে ডাকাতিয়া নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়। যাহোক, এ পর্যায়ে এসে তারা নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়েন। আরাকান রাজ তার বাহিনীতে থাকা পর্তুগীজ সেনা কর্মকর্তাদের বন্দী করেন, বন্দীদের মধ্যে ফিরিঙ্গী এডমিরাল এন্টানিও কারভালহোর ভ্রাতুস্পুত্রও ছিল। এর প্রতিশোধ নিতে কারভালহো আরকানীদের নৌ-কমান্ডার এবং নৌ-বাহিনীর অন্যান্য কর্মকর্তাদের গ্রেফতার করেন এবং আরাকানীদের ভান্ডার এবং গোলান্দাজ বাহিনীর কামান এবং গোলাবারুদ লুট করে সন্দীপে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মোগল বহিনীকে মোকাবেলা করার জন্য আরাকান রাজকে একা স্থলভাগে রেখে আসেন। আবদুল ওয়াহিদ এ অবস্থার সুযোগ নিতে পিছপা হননি। ইত্যবসরে কাশিম খান কর্তৃক তাকে সাহায্যের জন্য শেখ ফরিদ, শেখ কামাল এবং মির্যা মক্কীর নেতৃত্বে নতুন করে আরো সৈন্য প্রেরণ করায় তার শক্তিও বৃদ্ধি পায়। আবদুল ওয়াহিদ পুনরায় ডাকাতিয়া নদী পার হয়ে আরাকানী বাহিনীকে প্রচন্ডভাবে প্রতি আক্রমণ করেন। নৌ-বাহিনীর সমর্থন বঞ্চিত এবং তার সঙ্গে আসা পর্তুগীজ সৈন্যরা তাকে পরিত্যাগ করায় তিনি বাধ্য হয়ে তড়িৎ গতিতে ফেনী নদী পার হয়ে আরাকানের দিকে পশ্চাদপসারণ করেন এবং পশ্চাধাবনকারী মোগল বাহিনীর জন্য পেছনে ফেলে আসেন তার বিপুল সংখ্যক সৈন্য এবং যুদ্ধহস্তী।

আরাকান রাজ শীঘ্র মোগলদের সঙ্গে আর কোন শত্রুতামূলক আচরণ করতে পারেননি। কারণ পরবর্তী বৎসর(১০২৪/১৬১৫) তিনি একদিকে পর্তুগীজ এবং অন্যদিকে বার্মার রাজা মহা ধর্ম রাজার (১৬০৫-১৬২৮) সঙ্গে শত্রুতায় জড়িয়ে পড়েন।[১১] এ বৎসর কাশিম খানও শান্তি ভোগ করতে পারেননি। কারণ এ সময় উত্তর-পূর্ব দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। সুবাদার ইসলাম খানের সময় কুচবিহার ও কামরূপ বিজিত হওয়ায় মোগল শক্তি কামরূপের পূর্বদিকের আহোম রাজ্যের সংস্পর্শে আসে এবং তখন এ রাজ্যটি মোটামুটি আধুনিক আসামের দারাং, নোয়াগাঁও এবং সিবসাগর জেলা কয়টি নিয়ে গঠিত হয়েছিল।

---

১০ বি.জি. আই. ১৪৬।

১১ এ.পি. ফিয়েরে (Phyere). হিস্ট্রি অব বার্মা. লন্ডন. ১৮৮০. ১৭৬-১৭৭; এবং জি.ই. হার্ভে. হিস্ট্রি অব বার্মা. লন্ডন. ১৯২৫. ১৮৯।

কামরূপের উপর মোগল অধিপত্যের কারণে তারা আহোম রাজ্যের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। কুচবিহার এবং আসামের রাজা যথাক্রমে লক্ষী নারায়ণ এবং পরীক্ষিত নারায়ণের আচরণে এ সংঘর্ষ আরো ত্বরান্বিত হয়। কারণ তারা মোগল সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিলেও এখন আহোম রাজের সঙ্গে চক্রান্তমূলক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। কাশিম খান সুবাদারের দায়িত্ব নেয়ার অল্প দিনের মধ্যেই উপলব্ধি করলেন যে, এ দুজনকে জাহাঙ্গীর নগরে এনে অত্যন্ত কড়া সতর্কতায় রাখা এবং পরে সম্রাটের দরবারেও প্রেরণ করে দেয়া প্রয়োজন। এতে তাদেরও স্ব স্ব এলাকায় অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। পরীক্ষিত নারায়ণের ভাই বালী নারায়ণ অহোম রাজার আশ্রয়ে চলে যান। এটাই তাদের মধ্যে সৃষ্ট সংঘর্ষের আশু কারণ কি না, তা স্পষ্ট নয়; তবে কাশিম খান অনতিবিলম্বে আবু বকরের অধিনায়কত্বে এক বিরাট বাহিনী তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এ অভিযানে ১২০০০ পদাতিক ও অশ্বারোহী এবং ৪০০ রনতরী ছিল। আবু বকর কামরূপের প্রাচীন রাজধানী বারানগরের পথ ধরে অগ্রসর হন এবং সেখান থেকে মোগলদের নতুন সদর দপ্তর হাজোর দিকে এবং সেখান থেকে বারনদীর তীরস্থ সীমান্ত চৌকি কোহাট্টা পৌঁছেন। তিনি সেখানে ১৬১৫ সালের (জুন-সেপ্টেম্বর) পুরো বর্ষাকালই কাটিয়ে দেন। এ স্থানের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া মোগল সৈন্যদেরকে অসুস্থ্য করে তোলে এবং তাদের মধ্যে অনেকেই মারা যায়। বর্ষা মৌসুম শেষ হলে আবু বকর আসামে প্রবেশ করেন এবং একই বৎসরের নভেম্বর মাসে আসামের সীমান্ত ফাঁড়ি কাজলী অধিকার করেন। সেখান থেকে তিনি ভারেলী ও ব্রহ্মপুত্র নদীদ্বয়ের মোহনায় অবস্থিত আসামের অপর দুর্গ সামধারার দিকে অগ্রসর হন। এখানে আসাম রাজ প্রচন্ড প্রতিরোধ সৃষ্টি করেন। ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দের (১০২৪ হিজরী) জানুয়ারীর মধ্যভাগে প্রায় ৩০০০০০ পদাতিক সৈন্য এবং ৭০০ যুদ্ধহস্তী নিয়ে অহোমীয় বাহিনী রাতের অন্ধকারে ভারেলী নদী অতিক্রম করে হঠাৎ মোগল শিবির আক্রমণ করে। একটি প্রচন্ড স্থল ও নৌযুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং এ যুদ্ধে অধিনায়ক আবু বকর বেশ কয়েকজন অফিসারসহ নিহত হন এবং আসামীছত্রেরা বিপুল সংখ্যক মোগল রণ-তরী দখল করে নেয়। মোগল বাহিনীর অন্যান্য অধিনায়ক যথা- মিরন, সায়্যিদ মাসুদ, সোনাগাজী এবং রাজা শতরুজিত মোগলদের স্থল ও নৌবাহিনীর অবশিষ্ট সৈন্য-সামন্তসহ পালিয়ে আসতে সক্ষম হন।[১২] ইতিমধ্যে মগরাজা (আরাকান রাজ) পর্তুগীজ ও বর্মীদের সঙ্গে তার

---

১২ বি.জি. ১. ৩৯৬।

বিবাদ মিটিয়ে ফেলেন। অতএব, ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে তিনি পুনরায় ভুলুয়া আক্রমণ করেন। মোগল থানাদার আবদুল ওয়াহিদ এবারও আগের মতই ডাকাতিয়া নদীর ধারে আরো নিরাপদ স্থানে পশ্চাদপসারণ করা প্রয়োজন বোধ করেন। তার পুত্র মিয়া নুরুদ্দীন অবশ্য আরাকান বাহিনীকে ফাঁদে আটকানোর পরিকল্পনা করেন। তিনি নদীর নিকটেই এক জলাভূমির বিপরীত পার্শ্বে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে আত্মগোপন করে থাকেন। মগরাজা ঐ স্থানটি অতিক্রম করে আরো সামনে অগ্রসর হওয়া মাত্রই তিনি তার অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে তাকে পিছন থেকে আক্রমণ করেন। আবদুল ওয়াহিদও একই সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে তাকে আক্রমণ করেন। এভাবে চতুর্দিক থেকে শত্রুবাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মগবাহিনী (আরাকানী) চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে পতিত হয়। তারা পশ্চাদপসারণের চেষ্টা করলে তাদেরকে কাদা ও জলাভূমির দিকে ঠেলে দেয় হয়। এভাবে তাদের বিপুল সৈন্য নিহত হয় এবং অল্প সংখ্যকই পালাতে সক্ষম হয়। আরাকান রাজা তার ভ্রাতুস্পুত্রসহ নিজে প্রচুর যুদ্ধ হাতি নিয়ে জল-কাদায় আটকা পড়েন। চরম বিপর্যস্ত অবস্থায় তিনি তার ভ্রাতুস্পুত্রসহ সকল অফিসার ও সৈন্য, যুদ্ধ হস্তী এবং অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জাম সমর্পণ করে শান্তি প্রার্থনা করেন এবং বিনিময়ে তার ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং জীবন ভিক্ষা চান। আবদুল ওয়াহিদ তার শর্ত মেনে নেন এবং মগরাজাকে শুধুমাত্র একাকী চট্টগ্রামের দিকে পালিয়ে যেতে অনুমতি দেন। ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে আবদুল ওয়াহিদ বিজয়ীরবেশে যুদ্ধবন্দী ও হস্তীকূল নিয়ে ভুলুয়ায় ফিরে আসেন।

দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে শান্তি ভঙ্গকারী এবং বার বার হামলাকারী মগরাজার সহিত আবদুল ওয়াহিদের আচরণে বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায় না। খুব সম্ভব সুবাদার কাশিম খান এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। কারণ, এর কিছু দিন পরেই ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি নিজেই ভুলুয়ায় আসেন এবং মগরাজাকে চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়ন এবং চট্টগ্রাম দখল করার জন্য সেখান থেকে আবদুন নবীর নেতৃত্বে এক অভিযান প্রেরণ করেন। মগরাজা সীতাকুন্ডের নিকট কাঠগড়ে মোগল বাহিনীর অগ্রাভিযান প্রতিরোধ করেন এবং সেখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করে বিপুল সংখ্যক সৈন্য এবং তাদের সমর্থনে প্রায় ১০০০ নৌ-তরীর সমাবেশ করেন। আবদুন নবী প্রথম দুর্গ আক্রমণ করে তা দখলে নেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে দুর্গ অবরোধ করেন। এ অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী হয়, ফলে রসদ সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেয়ায় মোগল সেনাপতি ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে দুর্গের অবরোধ উঠিয়ে ভুলুয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন।

উপরোল্লিখিত বহির্দেশীয় ঘটনাবলী ছাড়াও সুবাদার কাশিম খানের শাসনামলে সদ্য বিজিত কয়েকজন আফগান সর্দার ও দেশীয় জমিদারের অবাধ্যতায় তিনি নানা বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হন। তাঁর শাসন ক্ষমতা গ্রহণের অল্প পরেই দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় বসতি স্থাপনকারী দু'জন আফগান সর্দার আনুগত্য প্রত্যাহার করে নেন এবং স্বাধীন মনোভাব গ্রহণ করেন। তারা হচ্ছেন হিজলীর (দক্ষিণ-পূর্ব মেদিনীপুর) সেলিম খানের উত্তরাধিকারী এবং ভ্রাতুস্পুত্র বাহাদুর খান এবং প্যাসেটের শামস্ খান। তাদের সঙ্গে যোগ দেন বর্ধমানের একজন হিন্দু জমিদার বীর হামীর এবং চন্দ্রকোলার (উত্তর মেদিনীপুর) বীরভান। কাশিম খান তাদের বিরুদ্ধে দু'টি অভিযান প্রেরণ করেন, একটির সেনাপতি ছিলেন শেখ কামাল এবং অন্যটির মির্যা মক্কী। যখন মোগল বাহিনী সেখানে পৌঁছে, তখন আফগান সর্দার ও হিন্দু জমিদারগণ সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণ করেন এবং তাদেরকে তাদের জায়গীরে বহাল রাখা হয়।[১৩]

১৬১৭ সালের প্রথম দিকেই সম্রাট জাহাঙ্গীর বাংলা থেকে কাশিম খানকে প্রত্যাহার করে নেন। ইসলাম খানের মত একজন কীর্তিমান সুবাদারের স্থলাভিষিক্ত হওয়ায় স্বভাবতই কাশিম খানের যোগ্যতা ও গুণাবলী কম দীপ্তিমান মনে হয়, তবে একটি বিষয়কে অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে যে, তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের শুরু থেকেই ইসলাম খানের সভাসদদের মধ্য থেকেই একটি দল অবন্ধুসুলভ আচরণ করছিল; তদুপরি তাঁর স্বল্প মেয়াদী সুবাদারীর সময়টি ছিল কয়েকটি আভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় সমস্যায় জর্জরিত। তাঁর দায়িত্বকালীন তিন বৎসরের মধ্যে তাকে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে পাঁচটি বড় ধরনের অভিযান প্রেরণ করতে হয়েছিল - দু'টি অভিযান ছিল কাছার এবং আসামের বিরুদ্ধে এবং তিনটি মগরাজার বিরুদ্ধে। আবার এগুলোর মধ্যে দু'টি ছিল আত্মরক্ষামূলক এবং একটি ছিল শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে। এ অভিযানগুলো ছিল অবাধ্য জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রেরিত অভিযানের অতিরিক্ত। এসব অভিযানের সবগুলোতে তিনি সফল হননি, এ কথা সত্য; তবে এ কথাও সত্য যে, তিনি বাংলায় মোগল শক্তিকে যে অবস্থায় পেয়েছিলেন, তার থেকে দূর্বল করে রেখে যাননি। আসলে তাঁর সমস্যা ছিল ইসলাম খান কর্তৃক দ্রুত সম্পাদিত কাজের অবশ্যম্ভাবী ফল এবং একজন লেখক বলেছেন যে, " ইসলাম খানের বিরাট কাজ তাঁর ভাইয়ের হাতে বিনষ্ট হয়ে যায়"[১৪] - এরূপ বলা হবে অসত্য, অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি। ইসলাম খানের কাজ বিনষ্ট করা দূরে থাক, তিনি বরং তার আরাধ্য কাজই অব্যাহত রেখেছিলেন এবং সম্পূর্ণ করেছিলেন।

১৩ তুযুক, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৯২।
১৪ এস, এন, ভট্টাচার্য, হিষ্ট্রি অব বেঙ্গল, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৯৮।

২. ইব্রাহীম খানের শাসন কাল

(১০২৭-১০৩৩ হিঃ/১৬১৭-১৬২৪ খ্রিঃ)

১৬১৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ইব্রাহীম খান কাশিম খানের স্থলাভিষিক্ত হন। নতুন সুবাদার ছিলেন সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভ্রাতা এবং বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে তিনি ছিলেন বিহারের গভর্ণর। বিহারের গভর্ণর থাকাকালীন সময়ে তিনি ডায়মন্ড খনির জন্য বিখ্যাত "খোখারা" অঞ্চল (ছোট নাগপুর) জয় করেন[১৫] এবং এ কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য তাঁকে তাঁর মসনব (Rank) বাড়িয়ে পুরস্কৃত করা হয় এবং তাঁকে ফতেহ্ জং (Fath Jang) উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[১৬] তিনি দক্ষ, বুদ্ধিমান এবং কর্মঠ ছিলেন এবং তাঁর অতিরিক্ত সুবিধা ছিল এই যে, তিনি ছিলেন সম্রাটের বিশ্বস্ত এবং আস্থাভাজন। তাঁর ছয় বৎসর-ব্যাপী শাসনকালে অবশ্য একই সমস্যা পরিলক্ষিত হয় এবং তাঁর পূর্বসূরীর আমলে যেসব ঘটনাবলী ঘটে, তাঁর আমলেও সে সবের পূনরাবৃত্তি ঘটে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কামরূপের উপর আধিপত্য নিয়ে একই ধরণের সমস্যা দেখা দেয়। তদুপরি আসামের সহিত শত্রুতা, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে মগ ও পর্তুগীজ দস্যুদের আক্রমণ এবং কিছু সংখ্যক জমিদারের অবাধ্যতা -এসব পরিস্থিতিতে সুবাদার কর্তৃক একই ধরণের পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণই ছিল রীতি। এ সকল সমস্যার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর পূর্বসূরীর চেয়ে দৃশ্যমান অধিক কোন সাফল্যই দেখাতে পারেননি। অতএব, একথা বলা মোটেই সত্য হবে না যে, ইব্রাহীম খানের শাসনকালে মোগলদের বিজয়ের পর প্রথমবারের মত শান্তি এবং স্থিতিশীলতা পরিলক্ষিত হয় এবং বাংলায় মোগল শাসনের সুফল ভোগের জন্য শান্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়।"[১৭]

ইব্রাহীম খানের বাংলায় আগমনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কামরূপে এক ভয়ানক ঘটনা ঘটে। সেখানে মোগলদের কর আদায়কারী শেখ ইব্রাহীম সে অঞ্চলের রাজস্ব আত্মসাৎ করে এবং অহোম রাজা এবং তাঁর প্রতিনিধি বালি নারায়ণ (পরীক্ষিত নারায়নের ভ্রাতা) এর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।[১৮] মির্যা নাথান একজন ইতিহাসবিদ এবং বিশ্বস্ত কর্মকর্তা, সে ইব্রাহিমকে দমন করতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। একমাত্র ইব্রাহীম খানের বাংলায় আগমন এবং নতুন করে আরো সৈন্য প্রেরণের পরেই বিদ্রোহী কর্মকর্তাকে দমন এবং হত্যা করা সম্ভব হয়। কিন্তু তার দ্বারা (শেখ ইব্রাহীম) যে অনিষ্ট শুরু হয়েছিল, তা তখনও শেষ

---

১৫ তুযুক, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩১৪।
১৬ তুযুক, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩১৬।
১৭ এস, এন, ভট্টাচার্য, হিষ্ট্রি অব বেঙ্গল ২য় খন্ড, ২৯৯।
১৮ বি, জি, ৪৪৩-৪৪৫।

হয়নি। বালি নারায়ণ কামরূপ আক্রমণ করার সাহস পান। অহোম রাজার সাহায্য পেয়ে তিনি পাণ্ডু নামক মোগলদের একটি সীমান্ত ফাঁড়ি দখল করে নেন এবং কামরূপে মোগলদের সদর দপ্তর হাজো পর্যন্ত অগ্রসর হন। তিনি একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন এবং সাময়িকভাবে মোগলদেরকে পরাভূত করতে সক্ষম হন। অনতিবিলম্বে নতুন করে আরো মোগল সৈন্যের আগমন ঘটে এবং অবশেষে ফেব্রুয়ারী, ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিসহ তাকে বিতাড়িত করা হয়।

শেখ ইব্রাহীমের বিদ্রোহ এবং বালি নারায়ণের কামরূপ আক্রমণ এ এলাকায় রাজনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার বিষয়ে চিন্তা করতে ইব্রাহীম খানকে উদ্বুদ্ধ করে। এ চিন্তা ভাবনা থেকে তিনি কাশিম খান কর্তৃক দিল্লীতে নির্বাসিত কুচবিহারের রাজা লক্ষী নারায়ণ, কামরূপের রাজা পরীক্ষিত নারায়ণ এবং ইসলাম খান কর্তৃক সম্রাটের দরবারে প্রেরিত যশোরের প্রতাপাদিত্যের পুত্রদ্বয়সহ সকলকে মুক্তি দিতে সম্রাটকে পত্র লিখেন। সম্রাট তাঁর সুপারিশ রক্ষা করেন এবং তাদেরকে ছেড়ে দেন। একই সময়ে (১৬১৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চে) ইব্রাহীম খান সুবাদার ইসলাম খানের সময় থেকে ঢাকায় আটক আফগান নেতা মুসা খান এবং তাঁর সহকর্মীদেরকে মুক্তি দেন। তাঁর এ রাজনৈতিক উদারতা ছিল নিঃসন্দেহে একটি বুদ্ধিমত্তার কাজ এবং এতে সুবাদারের হাতও শক্তিশালী হয়। মুসা খান তাঁর বাকি জীবন বিশ্বস্ততার সঙ্গে মোগলদের জন্য কাজ করে গিয়েছেন এবং রাজা লক্ষী নারায়ণও অনুগত ছিলেন। কিন্তু তাতে কামরূপের অবস্থার তেমন কোন উন্নতি হয়নি। বাস্তব অবস্থা ছিল এই যে, কামরূপের রাজা পরীক্ষিত নারায়ণকে মুক্তি দেয়ার অব্যবহিত পরেই তাঁর এক ছোট ভাই মধুসূধন হঠাৎ বিদ্রোহ করে বসে এবং এর দক্ষিণ-পশ্চিম পরগনা কারিবারি দখল করে ফেলে। এ সময় মুসা খানকে মুক্তি দেয়ার পরে তাঁকে প্রধান করে কামরূপের বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করা হয় এবং শুধুমাত্র মুসা খানের বীরত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা দ্বারাই এ বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হয়। তারপরও এ পুরো সময়ব্যাপী কামরূপ একটি গোলযোগপূর্ণ এলাকা হিসেবেই থেকে যায়।

সম্রাটের পক্ষ থেকে ইব্রাহীম খানের প্রতি প্রধান নির্দেশ ছিল আরাকানী মগদের আক্রমণের অবসান ঘটানো। সে অনুযায়ী কামরূপের মধুসূধনের বিদ্রোহ দমনের পরপরই ইব্রাহীম খান দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। কাশিম খানের মত তিনিও এ উপসংহারে পৌঁছেন যে, বাংলায় মগদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণকে কার্যকরীভাবে প্রতিহত করার একমাত্র উপায় হল মগরাজার হাত থেকে চট্টগ্রাম দখল করে নেয়া। এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ

হিসেবে তিনি প্রথম ত্রিপুরা জয়ের সিদ্ধান্ত করেন, যেন মগরাজার সঙ্গে জোট বেধে এটি পেছন থেকে কোন সমস্য সৃষ্টি করতে না পারে। তাই ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে ইব্রাহীম খান ত্রিপুরার উপর ত্রিমুখী আক্রমণ পরিচালনা করেন। তাঁর বাহিনীর একাংশকে মির্যা ইস্কান্দারের অধিনায়কত্বে আধুনিক ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার মধ্য দিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ত্রিপুরা অভিমুখে প্রেরণ করা হয়; দ্বিতীয় ডিভিশনকে মির্যা নুরুদ্দীন এবং মুসা খানের নেতৃত্বে কুমিল্লা শহরের নিকটবর্তী মিহিরকুল দিয়ে ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুরের দিকে প্রেরণ করা হয়; আর নৌ-বহরকে এডমিরাল বাহাদুর খানের অধীনে রেখে কুমিল্লা হয়ে গোমতী নদীর উজানের দিকে প্রেরণ করা হয়। ত্রিপুরার রাজা যশোমাণিক্য রাজধানী থেকে বেরিয়ে আসেন এবং মির্যা ইস্কান্দিয়ারের নেতৃত্বে মোগলদের যে বাহিনী রাজধানীর কাছে পৌঁছে গিয়েছিল, প্রথমে তাদেরকে বাধা দেন। বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও বিরাট ক্ষয়ক্ষতিসহ ত্রিপুরার বাহিনী পরাজিত হয় এবং যশোমাণিক্য রাজধানীর দিকে পশ্চাদপসারণ করতে বাধ্য হন। তাঁর এ পশ্চাদপসারণের সময় তিনি মির্যা নুরুদ্দীন এবং মূসা খানের নেতৃত্বে পশ্চিম দিক থেকে আগত মোগল বাহিনীর সম্মুখীন হন এবং পুনরায় পরাজিত হন। মোগল নৌ-বহরের আগমন প্রতিহত করার জন্য তাঁর প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয় এবং মোগলদের দু'টি ডিভিশন ১৬১৮ সালের প্রথম দিকে রাজধানী উদয়পুর দখল করে। যশোমাণিক্য আরাকানে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁর পশ্চাদাবন করে তাঁকে সপরিবারে গ্রেফতার করা হয়। সুবা বাংলার সাথে ত্রিপুরাকে যুক্ত করা হয় এবং মোগল সেনাপতিগণ নভেম্বরের শেষ দিকে গ্রেফতারকৃত ত্রিপুরার রাজা এবং কিছু সংখ্যক হাতি নিয়ে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন।[১৯]

ইব্রাহীম খান অবশ্য অবিলম্বে মগদের চট্টগ্রামস্থ দুর্গ আক্রমণ করে তাঁর এ সাফল্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেননি। কারণ ইতিমধ্যেই উত্তর-পূর্ব দিকের ঘটনাবলী তাঁকে পুনরায় ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। ভুসনার (ফরিদপুর ও যশোরের অংশ বিশেষ) রাজা ছত্রজীত, যিনি ইসলাম খানের নিকট আত্মসমর্পণ করেছিলেন, তিনিও মোগল বাহিনীভুক্ত ছিলেন এবং কামরূপের একজন থানাদার হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। এখন তিনি নিজকে অবিশ্বস্ত প্রমাণ করলেন এবং বালি নারায়ণ ও তার নিরাপত্তাদাতা অহোম রাজের সঙ্গে মিলিত হয়ে চক্রান্ত শুরু করেন।[২০] ছত্রজিত দাড়াং জেলায় বালি নারায়ণের যুদ্ধ প্রস্তুতিতে গোপনে সাহায্য

১৯ বি.জি. ২য় খন্ড. পৃঃ ৬২৮।
২০ এস এস ভট্টাচার্য. এ হিস্ট্রি অব মোগল নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার পলিসি. কলিকাতা ১৯২৯. পৃঃ ২৪৫

প্রদান করেন এবং শুমারু নামে একজন অহোম সর্দারকে হঠাৎ হাঙ্গারাবাড়ীর মোগল ফাঁড়ি আক্রমণ করার জন্য প্ররোচিত করেন। তার এ উদ্যোগের সুবিধার্থে ছত্রজীত ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ইব্রাহীম খানের বকসীকে (Paymaster General of force) হাত করেন এবং যখন তিনি সৈন্যদল পরিদর্শনে যান এবং সৈন্যদেরকে দুর্গের বাহিরে নিয়ে আসেন, তখন ছত্রজীতের ইঙ্গিত পেয়ে অহোমী সেনাবাহিনী হঠাৎ হাঙ্গারাবাড়ী দুর্গ আক্রমণ করে এবং সহজেই দুর্গটি দখল করে নেয়। তারা দূর্গে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং প্রায় সাত শত মোগল সৈন্য নিহত হয়। যেহেতু তারা অপ্রস্তুত অবস্থায় ও অহোমী বাহিনীকে হটাতে চেষ্টা করছিল। তাদেরকে অবশ্য শেষ পর্যন্ত ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল।[২১] ছত্রজীতের বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণ তখনও জানা যায়নি, তাই তিনি তাৎক্ষণিক শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যান। তার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে বালি নারায়ণ মোগলদেরকে কামরূপ থেকে হঠিয়ে দেয়ার জন্য কয়েকবার দুঃসাহসিক আক্রমণ পরিচালনা করেন। তিনি অবশ্য এ কাজে সফল হতে পারেননি। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে ইব্রাহীম খান কর্তৃক প্রেরিত অতিরিক্ত সৈন্যদের সময় মত এসে উপস্থিত হওয়া।

এ সময়টায় মগরাজা অলস বসে থাকেননি, তিনি গঞ্জালেসের হাত থেকে সন্দ্বীপ দখল করে নিজের অবস্থান আরো শক্তিশালী করে তোলেন এবং ১৬২০ সালের প্রথম দিকে পুনরায় দক্ষিণ-বাংলায় হামলা শুরু করেন। যুদ্ধ জাহাজের এক বিরাট বহর নিয়ে তিনি অতর্কিতে মেঘনা নদীর পাড়ে উপস্থিত হন এবং তীরবর্তী গ্রামগুলোতে লুটতরাজ চালান এবং ঢাকা থেকে মাত্র কয়েক মাইল দক্ষিণের বাগচর পর্যন্ত অগ্রসর হন। ইব্রাহীম খান অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং তখন তাঁর সঙ্গে প্রাথমিকভাবে ছিল মাত্র ৩২টি রণতরী। কিন্তু শীঘ্রই মূসা খান ও অন্যান্য সেনাধ্যক্ষের নেতৃত্বে রণ-তরীর প্রধান বহর এবং প্রায় ৮০০০ অশ্বারোহী সৈন্য তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়। মগরাজ মোগল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে সাহস করেননি, বরং দ্রুত পশ্চাদপসারণ করেন। এ সময় ইব্রাহীম খান দীর্ঘ দিন যাবৎ স্থগিত চট্টগ্রাম অভিযান শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৬২১ খ্রিস্টাব্দের মার্চের প্রথম দিকে তিনি নতুন ঘাটি ত্রিপুরা থেকে সুসজ্জিত এক বিরাট বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন এবং নৌ-বহরকে বিশাল ফেনী নদীতে মোতায়েন করে রেখে যান। মনে হচ্ছে যে, তিনি পথিমধ্যে কোন নৌ-যুদ্ধ এড়িয়ে অতর্কিত চট্টগ্রাম এসে উপস্থিত হতে চেয়েছিলেন। যেহেতু সন্দ্বীপে আরাকানীদের একটি শক্তিশালী ঘাটি ছিল, কিন্তু তাঁর এ পরিকল্পনা ব্যর্থ

---

২১ . বি.জি. ১ম খন্ড. পৃঃ ৬২৩-২৪. ৬৬৫।

হওয়ার পিছনে প্রধান কারণ ছিল ত্রিপুরার মধ্যে দিয়ে যাত্রা পথে ঘন জঙ্গল এবং বন্ধুর পাহাড়ী পথ। দূর্গম জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অশ্বারোহী ও হস্তী বাহিনী অগ্রসর হতে পারেনি। খাদ্য সরবরাহের স্বল্পতা এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে মহামারী ছড়িয়ে পড়ায় তিনি সৈন্য প্রত্যাহারে বাধ্য হন।[২২] পরিস্কার বুঝা যায় যে, পরিকল্পনাটি ছিল ত্রুটিপূর্ণ এবং তাঁর পূর্ববর্তী সুবাদার কাশিম খান কর্তৃক প্রেরিত মোগল এবং আরাকানী বাহিনীর মধ্যে সর্বশেষ যুদ্ধ যেখানে হয়েছিল, সে সীতাকুন্ড পর্যন্তও তাঁর বাহিনী পৌঁছতে পারেনি।

চট্টগ্রাম অভিযান ব্যর্থ হওয়ার আশু প্রতিক্রিয়া হিসেবে আরাকান রাজা নতুন করে হামলা শুরু করেন। একই বৎসর (১৬২১) মধ্য-আগস্টে তিনি মেঘনা নদীর মোহনায় দক্ষিণ শাহবাযপুর দ্বীপে (বর্তমানে এটি বরিশাল জেলার একটি অঞ্চল) এক অতর্কিত হামলা চালান এবং লুটতরাজ করেন। ইব্রাহীম খান একটি নৌ-বহর নিয়ে ঐ অঞ্চলের নিকট পৌঁছা মাত্র মগরাজ দ্রুত পশ্চাদপসারণ করেন। এ ঘটনার পরে বর্মী রাজের সঙ্গে শত্রুতার কারণে তিনি কিছুদিন ব্যস্ত থাকেন। অবশ্য, পর্তুগীজ দস্যুরা উপকূলীয় অঞ্চলে তাদের লুটতরাজ অব্যাহত রাখে। একবার তারা যশোরের দক্ষিণাঞ্চল পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে গ্রামগুলোতে লুটতরাজ চালায় এবং প্রায় ১৫০০ নারী পুরুষকে বন্দী করে নিয়ে যায়।[২৩] পুনরায় এ বিপদ মোকাবেলার জন্য ইব্রাহীম খান এক বিরাট নৌ-বহর নিয়ে অগ্রসর হন, কিন্তু তিনি বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের আকা-বাঁকা নদী-নালা দিয়ে যশোর পৌঁছার আগেই তারা আরো দক্ষিণের নিরাপদ এলাকায় পালিয়ে যায়।

একই সময়ে হিজলীর (দক্ষিণ-পূর্ব মেদিনীপুরের) বাহাদুর খান, যিনি সুবাদার কাশিম খানের সময়ে প্রথমে বিদ্রোহ এবং পরে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, তিনি পুনরায় বিদ্রোহ করেন। তিনি উড়িষ্যার মোগল গভর্ণর মুকাররম খানের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং তার নিকট থেকে সমর্থন লাভ করেন। যশোর থেকে ইব্রাহীম খান এক শক্তিশালী বাহিনীসহ তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র মির্যা আহমদ বেগকে বাহাদুর খানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং তাঁর সঙ্গে এ আক্রমণে যোগদানের জন্য তিনি বর্ধমানের ফৌজদার মুহাম্মদ বেগ অবকাশকে নির্দেশ দেন। ইত্যবসরে উড়িষ্যার গভর্ণর মুকাররম খান বাহাদুর খানের প্রতি তার সমর্থন প্রত্যাহার করেন। এ অবস্থায় বাহাদুর খান এ 'যৌথ আক্রমণ প্রতিরোধ করা অসম্ভব মনে করে সন্ধির প্রস্তাব দেন এবং ইব্রাহীম খানের নিকট

---

২২ বি.জি. ২য় খন্ড. পৃঃ ৬২৩-৬৩৩
২৩ বি.জি. ২য় খন্ড. পৃঃ ৬৩৫

আত্মসমর্পণ করার জন্য নিজেই যশোরে আসেন। ইব্রাহীম খান তাকে মার্জনা করেন এবং তাকে তার জায়গীরে পূণর্বহাল করেন। তবে তার অবাধ্যতার জন্য তাকে ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) টাকা জরিমানা ধার্য করেন।[২৪] এ ঘটনার পর প্রায় দুই বৎসর পর্যন্ত ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে বিদ্রোহী রাজপুত্র শাহজাহানের আগমণ পর্যন্ত বাংলায় তুলনামূলকভাবে শান্তি বিরাজমান ছিল। তবে কামরূপে দু'একটি বিচ্ছিন্ন অবাধ্যতার ঘটনা ঘটলেও সেখানে নিয়োজিত শেখ কামাল তা যথারীতি দমন করেন। অবশ্য ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে তিনি কামরূপে মারা যান। সুবাদার ইসলাম খানের সময় থেকে যে সকল কর্মকর্তা বাংলায় কাজ করেছেন, তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম অভিজ্ঞ মোগল কর্মকর্তা। ইব্রাহীম খান শেখ কামালের জায়গীর এবং তার পদ জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ শাহ মুহাম্মদকে প্রদান করেন এবং তাঁর পদ মর্যাদা বাড়িয়ে তাকে কামরূপ প্রেরণ করেন। শেখ কামালের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই আরেকজন মহান ব্যক্তি তথা মুসা খানের জীবনাবসান ঘটে। তিনি একই বৎসর এপ্রিলে রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান। ইব্রাহীম খান মৃত নেতার কনিষ্ঠ পুত্র ১৯ বৎসর বয়স্ক মাসুম খানকে তাঁর পিতার পদ ও জমিদারীর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।[২৫]

সুবাদার ইব্রাহীম খান মুসা খানের অন্যান্য কর্মকর্তা যথা- মন্ত্রী খাজা চাঁদ, এডমিরাল আদিল খান এবং অন্যান্যদেরকে তাদের চাকুরীতে বহাল রাখেন। অবশ্য ১৬২৩ সালটি ছিল ইব্রাহীম খানের জন্য সবচেয়ে খারাপ। এ বৎসর তাঁকে বিদ্রোহী যুবরাজ শাহজাহানের মুখোমুখী হতে হয়।

৩. বাংলায় যুবরাজ শাহজাহান

১৬২২ইং (১০৩১ হিঃ) সালের শেষের দিকে যুবরাজ শাহজাহান দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি ছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীরের তৃতীয় এবং সবচেয়ে যোগ্যপুত্র। তিনি তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারীও মনোনীত হয়েছিলেন। ১৬১৭ খ্রিস্টাব্দেই সম্রাট জাহাঙ্গীর যুবরাজ শাহজাহানকে নজীর বিহীন "৩০,০০০ ধাত এবং ২০,০০০ সওয়ার" পদ মর্যাদা এবং "শাহজাহান" উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর আসল নাম যুবরাজ খুররম। অবশ্য, শান্তিপূর্ণভাবে তাঁর সিংহাসনে আরোহণের সম্ভাবনা সম্রাজ্ঞী নূর জাহানের উচ্চাভিলাষী কুট কৌশলের কারণে

২৪ বি.জি. ২য় খন্ড. পৃঃ ৬৩১-৬৩২. ৬৩৬-৬৩৭
২৫ বি.জি. ২য় খন্ড. পৃঃ ৬৮০

নস্যাৎ হয়ে যায়।[২৬] ১৬২১ সাল থেকে এ প্রক্রিয়া শুরু হয়, যখন নূর জাহানের পিতা এবং "নূর জাহান চক্রের" পিছনে আসল মন্ত্রনাদাতা, ইতিমাদ দৌলাহ ইন্তিকাল করেন। ১৬২২ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে জাহাঙ্গীরের স্বাস্থ্যের মারাত্মক অবনতির হলে সম্রাজ্ঞী নুর জাহান ঐ চক্রটি পুনর্গঠিত করে এ পরিস্থিতির আরো অবনতি হলে তার নিজ প্রাধান্য অব্যাহত রাখতে পারেন কিনা- সে ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি তার এবং তার প্রথম স্বামী শের আফগানের কন্যা, লাদলী বেগমকে জাহাঙ্গীরের পঞ্চম পুত্র শাহরিয়ারের সহিত বিবাহ দেন এবং শেষোক্ত রাজপুত্রের জন্য সিংহাসন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে পারস্যের শাহ আব্বাস কান্দাহার আক্রমণ করে তা দখল করে নেন। শাহজাহানকে সে দিকে অগ্রসর হতে নির্দেশ দেয়া হয়। শাহজাহান সন্দেহ করেন যে, জাহাঙ্গীরের এ তীব্র অসুস্থতার সময় তাঁকে রাজধানী থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য এটি সম্রাজ্ঞীর এক প্রচেষ্টা বই অন্য কিছু নয়। এ চিন্তার বশবর্তী হয়ে তিনি মালওয়া পর্যন্ত আগমণ করেন এবং সেখান থেকে বর্ষা মৌসুমের অজুহাত দেখিয়ে আর সামনে অগ্রসর হওয়া থেকে নিজকে বিরত রাখেন। তদুপরি তিনি চাম্বল নদীর বাম তীরে এবং আগ্রা থেকে ৮০ মাইল দূরের ধোলিপুর পরগণাকে সামরিক কৌশলের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিধায় তার জায়গীরের সহিত যুক্ত করে দেয়ার জন্য দাবী করেন।

শাহজাহানের এ দাবী প্রতিহত করার জন্য সম্রাজ্ঞী পরগনাটিকে শাহরিয়ারকে দেয়ার জন্য জাহাঙ্গীরকে রাজী করান। শাহজাহান অবশ্য পরগণাটিকে নিজ দখলে নিয়ে নেন, ফলে শাহজাহান এবং শাহরিয়ারের বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য শাহজাহান আবুল ফজলের পুত্র আফজাল খানকে এক পত্রসহ জাহাঙ্গীরের নিকট প্রেরণ করেন। নুর জাহানের প্রভাবে জাহাঙ্গীর পত্র বাহককে সাক্ষাতকার দিতে অস্বীকার করেন। এ অবস্থায় শাহজাহানকে দিল্লীর নিকটবর্তী দোয়াব অঞ্চল এবং হিসার ফিরোজাস্থ সরকারে অবস্থিত তার নিজ জায়গীর থেকে বঞ্চিত করে তা শাহরিয়ারকে প্রদান করা হয় এবং তাকে আরো জানানো হয় যে, "দক্ষিণ গুজরাট এবং মালওয়া সুবাসমূহও তাকে (শাহরিয়ারকে) প্রদান করা হয়েছে, এসব সুবার সীমার মধ্যে যেখানে তার ইচ্ছা, সেখানে সদর দপ্তর স্থাপন করে সে ঐ সুবাগুলোর শাসন কাজ পরিচালনা করতে পারবে।" শাহজাহানকে আরো নির্দেশ দেয়া হয় যে, কান্দাহার অভিযানের প্রয়োজনে সে যেন তাঁর প্রধান প্রধান সেনাপতি ও

---

২৬ শাহ জাহানের বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য বি.পি. সাকসেনার হিস্ট্রী অব শাহ জাহান অব দিল্লী, এলাহাবাদ ১৯৩২ দ্রষ্টব্য. আরো দেখুন. রিয়াদ. পৃঃ ১৮০-১৮৩

সৈন্যদলগুলোকে রাজধানীতে পাঠিয়ে দেয়। এ নির্দেশ মানতে শাহজাহান মোটেই রাজী ছিলেন না, বিশেষ করে যখন তিনি জানতে পারলেন যে, উত্তরাধিকারের প্রশ্নে শক্তি প্রদর্শনের জন্য মহবত খানসহ কাবুলে নিয়োজিত অন্যান্য দক্ষ সেনাপতিদেরকেও রাজাধানীতে ডেকে পাঠানো হয়েছে। একটি সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য সর্বশেষ প্রচেষ্টা হিসেবে শাহজাহান কাজী আব্দুল আজিজকে সম্রাটের দরবারে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাকে সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হতেই দেয়া হয়নি এবং মহবত খানকে নির্দেশ দেয়া হয় তাকে বন্দী করার জন্য। এটা ছিল শাহজাহানের জন্য ধৈর্য সীমার বাইরে, তাই তিনি এবার বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে দেন।

শাহজাহান তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেন। কিন্তু রাজপুত্র পারভেজ এবং মহবত খানের পরিচালনায় আগ্রার নিকটে এক যুদ্ধে শাহজাহান সম্রাটের বাহিনীর নিকট পরাজিত হন। শাহজাহান তখন মালওয়ার মান্ডুর দিকে পশ্চাদাপসারণ করেন। মহবত খান এবং রাজপুত্র পারভেজ সেখানেও তাকে অনুসরণ করেন এবং নর্বাদা নদী পার হয়ে আরেক যুদ্ধে তাকে আবার পরাজিত করেন। বিদ্রোহী যুবরাজ তাপ্তী নদী অতিক্রম করে আহমাদ নগর এবং বিজাপুরের দিকে চলে যান। এসব স্থানে কোন সমর্থন সংগ্রহ করতে না পেরে তিনি এবার উড়িষ্যা এবং বাংলার দিকে অগ্রসর হন। যখন তিনি উড়িষ্যায় পৌঁছেন, তখন উড়িষ্যার গভর্ণর আহমদ বেগ (ইব্রাহীম খানের ভ্রাতুস্পুত্র) প্রথমে দ্রুত কটক এবং পরে বাংলায় পশ্চাদপসারণ করেন। এর স্পষ্ট কারণ হচ্ছে এই যে, তিনি তার ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে শাহজাহানকে মোকাবেলা করা অসম্ভব বলে গণ্য করেছিলেন । শাহজাহান কোন প্রতিরোধ ছাড়াই উড়িষ্যা দখল করেন এবং এর প্রশাসনের জন্য নিজের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কটকে অবস্থানকালে হুগলীর পর্তুগীজ গভর্ণরের একজন প্রতিনিধি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং তাঁকে কিছু দুষ্প্রাপ্য উপঢৌকন এবং কিছু সংখ্যক হাতি প্রদান করেন।[২৭] পর্তুগীজদের পক্ষ থেকে এটা ছিল একটি কুটনৈতিক পদক্ষেপ এবং তাদের পক্ষ থেকে শাহজাহানের প্রতি কোন সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়নি। উড়িষ্যা থেকে শাহজাহান দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় প্রবেশ করেন এবং বর্ধমানের ফৌজদার মির্যা শাহ কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু সহজেই তাকে পরাভূত এবং গ্রেফতার করা হয়। তারপর যুবরাজ আকবর নগরের (রাজমহল) দিকে অগ্রসর হতে থাকেন।

---

২৭ বি.জি. ২য় খন্ড. পৃঃ ৬৮৮. আরো দেখুন. কে.এম. করিম দ্যা প্রভিন্সেস অব বেঙ্গল এন্ড বিহার আন্ডার শাহ জাহান ঢাকা. ১৯৭৪. পৃঃ ১৩

শাহজাহান বাংলার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন জানতে পেরেই ইব্রাহীম খান রাজমহলের দিকে যাওয়ার জন্য অবিলম্বে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তিনি ঢাকার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য তার ব্যক্তিগত সহকারী খাজা উদরাককে ৫০০ অশ্বারোহী এবং ১০০০ পদাতিক সৈন্যসহ রেখে যান আর বখশী মির্যা বাকীকে ১০০০ অশ্বারোহী সৈন্যসহ মগ ও পর্তুগীজ দস্যুদের হামলার বিরুদ্ধে সতর্ক পদক্ষেপ হিসেবে ফরিদপুর ও যশোরের নিরাপত্তা ফাঁড়ির শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রেরণ করেন।[২৮] তার অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে ইব্রাহীম খান রাজমহলের দিকে অগ্রসর হন। তখন তার সঙ্গে ছিল ছয় হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, ১০০ হাতি, একটি বিরাট গোলন্দাজ বাহিনী, মাসুম খানের অধীনস্থ রনতরী ব্যতীত ও মীর শামসের নেতৃত্বে ৩০০ রণতরীর আরো একটি বহর। তাছাড়া প্রচুর সংখ্যক জেলেনৌকাসহ ম্যানোয়েল ট্যাভারেস নামক একজন ভাড়াটিয়া পর্তুগীজ নৌ-সেনাপতিও তার সঙ্গে ছিলেন।[২৯] ইব্রাহীম খান এত দ্রুত অগ্রসর হয়েছিলেন যে, মাত্র ১১ দিনে তিনি রাজমহলের সন্নিকটে এসে পৌঁছে ছিলেন। আকবর নগরে এসে তাঁর পৌঁছার অল্পকাল পরেই উড়িষ্যার গভর্ণর আহমদ বেগ তার সঙ্গে যোগ দেন।[৩০] যেহেতু মানসিংহ কর্তৃক নির্মিত আকবর নগরের পূরাতন দূর্গটি ছিল নদী থেকে একটু অভ্যন্তরভাগে, যেখানে রণতরী নিয়ে পৌঁছা সম্ভব ছিল না। তাই ইব্রাহীম খান নদীর আরো দুই মাইল ভাটিতে আকবরপুর, যেখানে তার পুত্র সমাহিত ছিলেন, সেখানে অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি জায়গাটিকে সুরক্ষিত করেন এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতুস্পুত্র মির্যা ইউসুফের নেতৃত্বে ৪০০০ সৈন্য মোতায়েন করেন। তার সাহায্যে ছিলেন জালায়ের খান, মির্যা ইস্কান্দিয়ার এবং মির্যা নূরুল্লাহ। অবশিষ্ট সৈন্য এবং আহমদ বেগকে সঙ্গে নিয়ে ইব্রাহীম খান গঙ্গার তীর ধরে আরো অগ্রসর হয়ে সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। আর তার নৌবহর নদীতে অপেক্ষা করতে থাকে। ইতিমধ্যে শাহজাহান আকবরনগরের পরিত্যক্ত দুর্গ দখল করেন। যুদ্ধ শুরুর পূর্বে তিনি সুবাদারকে তাঁর পক্ষে আনার জন্য চেষ্টা করেন এবং একজন দূতের মাধ্যমে বাংলায় তাঁকে তাঁর চাকুরীতে বহাল রাখা বা নিরাপদে দিল্লীতে চলে যাওয়ার সুযোগ দেয়ার প্রস্তাব দেন। কিন্তু ইব্রাহীম খান তাঁকে একটি তেজোদীপ্ত এবং তার পদের মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ জওয়াব দিয়ে জানিয়ে দেন যে, তিনি প্রয়োজন হলে সম্রাটের জন্য যুদ্ধ

২৮. বি.জি. পৃঃ ৬৯০।
২৯. বি.জি. ২য় খন্ড পৃঃ ৬৯০, আরো দেখুন ক্যাম্পোজ, হিস্ট্রি অব দ্যা পর্তুগীজ ইন বেঙ্গল, কলিকাতা, ১৯১৯।
৩০. বি.জি. ২য় খন্ড, ৬৮৯।

করতে করতে প্রাণ দেবেন, তবু কোন বিশ্বাস ঘাতকতা করতে পারবেন না।[৩১] এর পরপরই যুদ্ধ শুরু হয়। শাহজাহান দারিয়া খানের নেতৃত্বে একটি সেনা দলকে নদীর অপর পাড়ে প্রেরণ করতে সক্ষম হন এবং একটি তীব্র যুদ্ধে তিনি আহমদ বেগকে পরাজিত করেন।[৩২] কিন্তু আকবরপুর দুর্গের উপর আক্রমণ প্রতিহত এবং বিদ্রোহী সৈন্যদের ভীষণ ক্ষতিসাধন করা হয়। সুবাদারের নৌবহরের কারণে শাহজাহান তাঁর প্রধান বাহিনীকে নদীর অপর পাড়ে পাঠাতে পারেননি। এ পর্যায়ে মনে হয়, শাহজাহান সুবাদারের নৌ-কমান্ডার যথা: মীর শামস্, মাসূম খান এবং টেভারেসের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেন, আর তাই এরপর থেকে তাঁরা অত্যন্ত উদাসীনভাবে কাজ করে[৩৩]। আব্দুল্লাহ খানের পরিচালনা এবং স্থানীয় জমিদারদের সহায়তায় শাহজাহানের বাহিনী বিনা বাধায় নদী পার হয়ে যায়। আগের সুবাদারের সৈন্যদের মধ্য থেকে অনেকে পক্ষ ত্যাগ করেন। এ অবস্থায় ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দের ২০ এপ্রিল একটি ভয়ানক এবং তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে সুবাদার ইব্রাহীম খান তাঁর কয়েকজন কর্মকর্তাসহ নিহত হন। তারপরও তাঁর সৈন্যরা কয়েকদিন পর্যন্ত দুর্গ রক্ষা করেন। কিন্তু সুবাদারের মৃত্যু এবং নৌবহরের নিষ্ক্রিয়তায় তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায়। দিনের শেষে দুর্গ দখল হয়ে যায়। বিরাট সংখ্যক সৈন্য নিহত ও আহত হয় এবং অবশিষ্টরা আহত আহমদ বেগের সঙ্গে জাহাঙ্গীরনগরের দিকে পালিয়ে যায়। নৌবহরও জাহাঙ্গীরনগরে চলে আসে।

ইব্রাহীম খানের পরাজয় অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। তিনি ছিলেন একজন প্রাদেশিক শাসক মাত্র এবং সেনাবাহিনীও ছিল একই পর্যায়ের। আর শাহজাহানের অধীনে ছিল অনেক উঁচু মানের বাহিনী। এ বাহিনীর কমান্ডারগণ যথা- আব্দুল্লাহ খান, দারিয়া খান এবং অন্যান্যরাও ছিলেন অনেক বেশি দক্ষ। তারপরও সুবাদারের পরাজয়ের প্রধান কারণ ছিল তাদের সৈন্যদের মধ্য হতে পক্ষত্যাগ এবং নৌ-কমান্ডার মীর শামস্, মাসুম খান এবং ম্যানুয়েল ট্যাভারসের বিশ্বাস ঘাতকতামূলক নিষ্ক্রিয়তা। অনেক সময় বলা হয় যে, ইব্রাহীম খান প্রথম দিকে ছিলেন অমনোযোগী এবং প্রথম সুযোগে বিদ্রোহী যুবরাজের অগ্রগতি প্রতিহত করার জন্য সুসংগঠিত এবং কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং তাঁকে বিনা বাধায় মেদিনীপুর এবং বর্ধমান জেলায় প্রবেশের সুযোগ দেন এবং তাতে স্থানীয় কর্মকর্তারা নিজেদের সুবিধামত আনুগত্য পরিবর্তন করার

৩১ রিয়াদ, ১৮৯।

৩২ বি.জি. ২য় খন্ড, পৃঃ ৬৯২।

৩৩ বি.জি. ২য় খন্ড, পৃঃ ৬৯৪।

সুযোগ পেয়ে যান।[৩৪] সুবাদারের পক্ষ থেকে আনুমানিক অমনোযোগীতার কারণ ব্যাখ্যা স্বরূপ আরো বলা হয় যে, তিনি একটি "বিব্রতকর অবস্থায়" পতিত হয়েছিলেন। যেহেতু দ্বন্দ্বটি ছিল সম্রাট এবং তাঁর এক পুত্রের মধ্যে এবং "এরূপ বিবাদের সময় একজন কর্মচারীর পক্ষে সঠিক কার্যক্রম অনুসরণ করা কঠিন ব্যাপার"।[৩৫] এ সমালোচনা অন্যায্য এবং সাফাই গেয়ে এর গুরুত্ব হ্রাস করাও নিস্প্রয়োজন। অবস্থাটি বিব্রতকর হতে পারে। কিন্তু ইব্রাহীম খানের মনে এ নিয়ে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা ভুল বোঝাবুঝি ছিল না। তিনি স্থানীয় অফিসারদেরকে তাদের নিজেদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেননি। আহমদ বেগ তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র হলেও তাঁর নিয়ন্ত্রাধীন ছিলেন না, বরং অন্য একটি প্রদেশের গভর্ণর ছিলেন। পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে পরিস্কার হয়ে যায় যে, তিনি তাঁর সৈন্য সামন্ত নিয়ে বাংলায় এসেছিলেন ইব্রাহীম খানের বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্য এবং এভাবে একটি যৌথ প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য আহমদ বেগ বর্ধমানের ফৌজদার মির্যা সালিহকে তার সঙ্গেই রাজমহলে আসতে বলেছিলেন এবং মনে হয় মির্যা সালিহ বিচ্ছিন্ন বরং একটি দুর্বল প্রতিরোধ সৃষ্টি করে শাহজাহানের হাতে বন্দী হওয়ার চেয়ে তাঁর সঙ্গে গেলেই ভাল করতেন। এরূপ ধরে নেয়া ভুল যে, বাংলায় আহমদ বেগের পশ্চাদপসারণ এবং মির্যা সালিহ্কে দেয়া তার পরামর্শ ছিল শাহজাহানকে বাংলা দখল করে নেয়ার সুযোগ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে। যদি শাহজাহানের প্রতি আহমদ বেগের কোন সহানুভূতি থাকত, তাহলে অন্যান্য অনেক দক্ষ সেনাপতি এবং অফিসারগণ যেমন করেছিলেন, তিনিও সহজেই তাঁর দলে ভিড়ে যেতে পারতেন। আবার শাহজাহানের অগ্রগতি বাধা দেয়ার জন্য ইব্রাহীম খানের পক্ষে ও তার নিজ প্রদেশের সীমা অতিক্রম করাও যুক্তিযুক্ত ছিল না। বিশেষ করে বাংলায় প্রবেশ করার পূর্বে শাহজাহানের গতিবিধি সম্পর্কে সুবাদারের পক্ষে স্পষ্ট ধারণা লাভ করাও সম্ভব ছিল না। তাছাড়া তিনি বিদ্রোহী যুবরাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে মোটেই বিলম্ব করেননি। সত্যিকারভাবে যখনই তিনি জানতে পারলেন যে, শাহজাহান বাংলার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, তখনই

---

৩৪ এস.এন. ভট্টাচার্য, ইন এইচ বি ২য় খন্ড. পৃঃ ৩০৬-৩০৭

৩৫ ঐ. কে. এম. করিম (পূর্বোক্ত. ১৪. ১৯) ও মনে হয় ঐ ঘটনার ব্যাখ্যায় ভট্টাচার্যের মত অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেছেন। এভাবে বিব্রতকর অবস্থা সম্পর্কে তার যুক্তি মেনে নিয়ে করিম বলেন যে. 'আসন্ন অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে তার উদাসীনতা. বেখেয়ালি এবং অবহেলা করার জন্য ইব্রাহীম খানকে অভিযুক্ত করা অযৌক্তিক নয়' পৃঃ ১৪ এবং একটু পরেই অন্য আলোচনায় করিম আরো বলেন যে. "ইব্রাহীম খান একজন সেনাপতি এবং একজন অফিসার হিসেবে তার দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করেননি. তার কর্তব্য ছিল সকল বিদ্রোহ. আক্রমণ এবং গোলযোগের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।" বলার অপেক্ষা রাখে না যে. শাহজাহানের বিদ্রোহ শুধু মাত্র একটি অভ্যন্তরীণ অভ্যুত্থান বা গোলযোগ ছিল না অথবা ইব্রাহীম খানের জন্য এটা কোন বহি:শত্রুর আক্রমণও ছিল না।

তিনি তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রদেশের পশ্চিম প্রান্ত রাজমহলের দিকে তাঁর সৈন্যদলকে পরিচালনা করলেন, ফলে আহমদ বেগ যুব রাজের আগেই বাংলায় এসে দেখতে পেলেন যে, সুবাদার ইতিপূর্বে রাজমহলে এসে পৌঁছেছেন এবং শাহজাহানকে এর মধ্যে সীমান্ত ফাঁড়ীতেই বাধা দেয়া হয়েছে। শাহজাহানকে মোকাবেলা করার পূর্বেই ইব্রাহীম খান তাঁর সৈন্যদেরকে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে মোতায়েন করেছিলেন বলে যে অপবাদ দেয় হয়, তাও ভিত্তিহীন। আকবরনগরেও সৈন্যদের বিক্ষিপ্ত করে রাখা হয়নি বা অধিনায়কত্বেও কোনরূপ বিভক্তি সৃষ্টি করা হয়নি; তবে এ ইঙ্গিত দ্বারা যদি ঢাকা, যশোর ও ফরিদপুরে যৎসামান্য সৈন্য রাখাকে বুঝানো হয়ে থাকে, তাহলে বলতেই হবে যে, ঢাকা এবং অন্যান্য স্থানের নিরাপত্তা বিধানের জন্য কিছু সংখ্যক সৈন্যও যদি মোতায়েন না করে তিনি মগ এবং পর্তুগীজ দস্যুদের দয়ার উপর ছেড়ে যেতেন, তাহলে তা হত রাজধানীর জন্য ধ্বংসাত্মক এবং তাঁর পক্ষে স্পষ্ট রাজনৈতিক বিচক্ষণতার অভাব। কেননা মাত্র কয়েক মাস আগেই তারা হামলা করে ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকাও বিধ্বস্ত করে গেছে।

আকবরপুর বিজয়ের পরেই শাহজাহান দ্রুত জাহাঙ্গীর নগরের দিকে অগ্রসর হন এবং রাজা ভীম নামে তাঁর একজন সেনাপতির উপর আকবর নগরের (রাজমহলের) দায়িত্ব ন্যাস্ত করে আসেন। তাঁর পরবর্তী কর্মকান্ড পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, ঢাকা আসার পিছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তিনটি। সেখানকার বিপুল ধন সম্পদ এং যুদ্ধ-সরঞ্জাম হস্তগত করা; আহমদ বেগ এবং সে অঞ্চলের অন্যান্য কর্মকর্তাদের আনুগত্য আদায় এবং প্রদেশটির শাসন ব্যবস্থা তাঁর নিজের পক্ষে নিশ্চিত করা। বাস্তবিক পক্ষে, পান্ডুয়া (মালদহ) ঘোড়াঘাট (রংপুর) এবং শাহজাদপুর হয়ে আসার পথে তিনি বিভিন্ন এলাকার সর্দার, থানাদার এবং জমিদারদেরকে তার আনুগত্য স্বীকার করার জন্য ফরমান জারী করেন এবং কোন রকম অবাধ্যতা প্রদর্শন করলে মারাত্মক পরিণতির হুমকি প্রদান করেন। ১৬২৪ সালের মে মাসের প্রথম দিকে তিনি ঢাকা এসে পৌঁছেন। তখন সেখানে আহমদ বেগ, সাবেক সুবাদারের পরিবার পরিজন এবং অন্যান্যরা তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। তারা সকলেই যেহেতু ছিলেন তাঁর আত্মীয়, তাই তাদের প্রতি দয়া এবং করুনা প্রদর্শন করা হয়। যাহোক, তিনি একটি বিরাট অংকের অর্থ সাবেক সুবাদার এবং তাঁর পরিবারের ব্যক্তিগত অর্থ-সম্পদসহ তৎকালীন প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা লাভ করেন। তাছাড়া, যুদ্ধ সরঞ্জাম, ৫০০ হাতি, ৪০০ ঘোড়া, সমগ্র গোলাবারুদ, কামান এবং রণতরীসমূহও লাভ করেন।[৩৬] তিনি

৩৬ বি.জি. ২য় খন্ড. পৃঃ ৭০৬-৭১০। আরো দেখুন. কে. এম. করিম পূর্বোক্ত পৃঃ ৩৯-৪০

অবশ্য মুক্তভাবে তাঁর বিশিষ্ট অনুসারী এবং সেনাপতিদেরকে নগদ-অর্থ এবং পদ মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে তিনি প্রদেশকে চারটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে ভাগ করেন।[৩৭] এ প্রক্রিয়ায় বাংলা বা ভাটিকে একটি সুবায় পরিণত করা হয় এবং আবদুর রহিম খান-ই-খানানের পুত্র দারাব খানকে সুবাদার নিযুক্ত করা হয় এবং জাহাঙ্গীর নগরকে করা হয় এর সদর দপ্তর। কামরূপসহ কুচবিহারকে আরেকটি সুবা বানানো হয় এবং যাহিদ খানকে সুবাদার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। দক্ষিণাঞ্চলের অন্যান্য জেলা নিয়ে যশোরকেও একটি সুবায় পরিণত করা হয়। কিন্তু আলী খান নিয়াজী, যাকে এ সুবার দায়িত্ব প্রদান করা হয়, তাকে সুবাদার না বলে সর্দার বা প্রধান কর্মকর্তা পদবী দেয়া হয়। অনুরূপভাবে, আকবর নগর অঞ্চলকে (রাজমহল-গৌড়কে) আরেকটি সুবা নির্ধারণ করে একজন সর্দারের দায়িত্বে ন্যাস্ত করা হয়। রাজা ভীম প্রথমে সেখানে থাকলেও পরে তাকে পাটনায় বদলী করা হয় এবং সিলেট থেকে মির্যা নাথানকে আকবর নগরে বদলী করা হয়। তাছাড়া সামরিক কৌশলের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে থাকায় সিলেটকে মির্যা সালিহর (বর্ধমানের সাবেক থানাদার) অধীন ন্যাস্ত করা হয় এবং তাকে সর্দার পদবী দেয়া হয়, আর সাবেক সুবাদারের বখশী মির্যা বাকীকে ভুলুয়ার থানাদার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। তবে সমগ্র বাংলার জন্য মির্যা মুলকীকে প্রধান দিওয়ান এবং মালীক হুসেনকে প্রধান কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয়। শাহজাহান রণতরীর এডমিরাল আদিল খান এবং পাহাড় খানকে তাদের স্বপদে বহাল রাখেন, তবে প্রথম জন ঢাকায় থাকবেন এবং শেষোক্ত জন তার সঙ্গেই থাকবেন। শাহজাহান মাত্র ৭ দিন ঢাকায় ছিলেন। এ স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি আরাকান রাজ থিরী থুধাম্মা, যিনি ১৬২২ সালে তাঁর পিতা মেং খামাউং এর উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন, তার একজন দূতকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। আরাকান রাজের পক্ষ থেকে এটা ছিল শুধুমাত্র একটা কূটনৈতিক পদক্ষেপ, কারণ শাহজাহানের বাংলা ত্যাগ করার পর পরই তিনি তার পিতার মত বাংলায় হামলা এবং আগ্রাসন চালাবার নীতি পুনরায় গ্রহণ করেন।

বাংলা অধিকার কোনভাবেই শাহজাহানকে দিল্লীর সিংহাসনের নিকটবর্তী করেনি এবং তিনি নিজেও এ প্রদেশে থাকার উদ্দেশ্যে আসেননি। যদি উদ্দেশ্য করতেন ও বিদ্রোহের পূর্বে দাক্ষিণাত্যে তাকে যে রাজ্য দেয়া হয়েছিল, পূর্বাঞ্চলে তার এ রাজ্য শুধু ওটার সমানই হত। তাই উত্তর-ভারত জয় করার জন্য তিনি দ্রুত পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন। মহবত খান এবং রাজপুত্র পারভেজ তাকে ধরার

৩৭ বি.জি. ২য় খন্ড, পৃঃ ৭০৬-৭১০। আরো দেখুন, কে. এম. করিম পূর্বোক্ত পৃঃ ৩৯-৪০

জন্য দাক্ষিণাত্যে গিয়েছিলেন, তারা সেখান থেকে ফিরে আসার পূর্বেই তিনি রাজধানী দিল্লীকে পদানত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা সফল হয়নি; কারণ তাঁর পিতা তাঁর গতিবিধি সম্পর্কে এরূপই আশংকা করেছিলেন এবং তিনি মহবত খান এবং পারভেজকে এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তারা যেন দাক্ষিণাত্য থেকে এলাহাবাদ এবং বিহারের দিকে অগ্রসর হয়। শাহজাহান শেষোক্ত স্থানটি জয় করে বেনারস পৌঁছতে না পৌঁছতেই পারভেজ এবং মহবত খান তাকে আর সামনে অগ্রসর হওয়া থেকে বাধা দেন। শাহজাহান তাঁর বাংলার কর্মকর্তাদের নিকট সৈন্য চেয়ে পত্র লিখেন। জাহাঙ্গীর নগরের সুবাদার দারাব খানের এবার তাকে সাহায্য করার ব্যাপারে আগ্রহের অভাব দেখা যায়; যদিও তিনি তার কনিষ্ঠ পুত্রকে ১০০ অশ্বারোহী এবং মীর শামস্, মাসুম খান এবং পর্তুগীজ ট্যাভারেসের অধীনে রণ-তরীসমূহ প্রেরণ করেন, কিন্তু তিনি নিজে ওজর প্রদর্শন করেন এবং জাহাঙ্গীর নগর ত্যাগ করেননি।[৩৮] বাংলার সকল অফিসারদের মধ্যে শুধু আকবর নগরের প্রশাসক (সর্দার) মির্যা নাথান বিদ্রোহী যুবরাজের প্রতি আনুগত্যে অনড় ছিলেন এবং তাকে অর্থ, রসদ এবং গোলা বারুদ সরবরাহ করেছিলেন।[৩৯] ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরের শেষের দিকে উত্তর প্রদেশের মির্যাপুর জেলায় কান্তির নিকট এবং টম্‌স নদীতে উভয় পক্ষের মধ্যে চূড়ান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আবারও মীর শামস্, মাসুম খান এবং ট্যাভারেসের নেতৃত্বাধীন বাংলার নৌ-বহর সন্দেহজনক ভূমিকা পালন করে এবং যুবরাজকে বেকায়দায় ফেলে বাংলায় প্রত্যাবর্তন করার জন্য মহবত খান তাদেরকে প্রলুব্ধ করেন।[৪০] শাহজাহান চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন এবং পূর্ব দিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

তিনি ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারীর প্রথম দিকে আকবর নগরে আসেন এবং সেখানে ২৪ দিন ছিলেন এবং তাঁর সকল তল্পি-তল্পা এবং যুদ্ধ সামগ্রী সংগ্রহ এবং সেখানে রেখে যাওয়া মহিলাদেরকে নিয়ে দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করেন। সম্রাটের নির্দেশে মহবত খানকে বাংলার দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং সহকারী হিসেবে দেয়া হয় তাঁর পুত্র খানাহযাদ খানকে, শাহজাদা পারভেজ শাহজাহানের সন্ধানে দাক্ষিণাত্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। যাহোক, উপায়ন্তর না দেখে শাহজাহান তাঁর পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। শাহজাহানের নিয়ন্ত্রণাধীন দুর্গসমূহ সমর্পণ এবং তাঁর দু'পুত্র যথা- দারা এবং আওরঙ্গজেবকে দরবারে জিম্মী হিসেবে রাখার শর্তে সম্রাট তাঁকে আনন্দের সঙ্গেই ক্ষমা মঞ্জুর করেন।

---

৩৮ বি.জি. ২য় খন্ড. পৃঃ ৭৩৭

৩৯ বি.জি. ২য় খন্ড. পৃঃ ৭৩৯-৪০

৪০ বি.জি. ২য় খন্ড. পৃঃ ৭৪৯-৫০।

শাহজাহানের বিদ্রোহ ব্যর্থ প্রমাণিত হয় এবং ১৬২৫ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকেই বাংলায় জাহাঙ্গীরের শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। জাহাঙ্গীর অবশ্য, বাকী জীবনে শান্তি পাননি, বাংলায় সুবাদার নিয়োগ ছিল তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রেরই একটি অংশ। মহবত খানের হাতে ক্রমান্বয়ে সামরিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া এবং পারভেজের সঙ্গে তার সম্পৃক্ততাকে সম্রাজ্ঞী নূর জাহান সন্দেহের চোখে দেখতেন। তিনি ভয় করতেন যে, তাদের এ মিলন তাঁর জামাতা শাহরিয়ারের স্বার্থকে ক্ষুন্ন করবে। অন্যদিকে তাঁর ভ্রাতা আসফ খান ছিলেন দরবারের সর্বাধিক প্রভাবশালী আমির এবং শাহজাহানের শ্বশুর এবং তিনিও একই কারণে মহবত খান ও পারভেজের সম্পর্ককে অপছন্দ করতেন। আসফ খানও স্বাভাবিক ভাবেই চাইতেন যে, তার জামাতা শাহজাহানই সিংহাসনে আরোহণ করুক এবং এ জন্য আরো চাইতেন মহবত খানকে নূর জাহান এবং শাহরিয়ার উভয়ের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে রাখতে এবং সম্ভব হলে এ সেনাপতিকে শাহজাহানের দিকে আকৃষ্ট করতে। সে অনুযায়ী ভাই এবং বোন উভয়েই প্রথম এক হয়ে মহবত খানকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ দেয়ার জন্য জাহাঙ্গীরকে রাজী করান এবং পরে তার বিরুদ্ধে বাংলা থেকে রাজস্ব এবং কোন যুদ্ধ হস্তী না পাঠানোসহ বিভিন্ন প্রকার অভিযোগ উত্থাপন করেন। অন্যদিকে, শেখ আহমদ সিরহিন্দের অনুসারীদের প্রতি জাহাঙ্গীরের কঠোর ব্যবহারে মহবত খান তাঁর প্রতি রুষ্ঠ হচ্ছিলেন, কারণ তিনি নিজেই শেখ আহমদ সিরহিন্দের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তাদের মধ্যে চূড়ান্ত ভাঙ্গন সৃষ্টি হয় তখন, যখন নূর জাহান এমন এক ব্যক্তিকে অমানবিক শাস্তি প্রদান করে, যার সঙ্গে মহবত খানের কন্যা ছিলেন বাগদত্তা। এতে মহবত খানের ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে যায়। তিনি তাঁর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বাংলা থেকে রওয়ানা দেন এবং এক সাহসী অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সম্রাটকে আটক করতে সক্ষম হন। কিন্তু নূর জাহান পালিয়ে যান, পরে অবশ্য আত্মসমর্পণ করে সম্রাটের সঙ্গে মিলিত হন। এভাবে সাম্রাজ্যের সবচাইতে দক্ষ সেনাপতির নিকট উদ্ধত সম্রাজ্ঞী নতজানু হন। তবে অল্প সময় পরেই সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞী মহবত খানের বন্দী দশা থেকে পালাতে সক্ষম হন এবং এ অবস্থায় মহবত খানের পক্ষে তার অনুসারীদেরসহ দাক্ষিণাত্যে পালিয়ে গিয়ে শাহজাহানের সঙ্গে যোগ দেয়া ছাড়া অন্য কোন বিকল্প তার সামনে ছিল না। সমগ্র ঘটনাই বিস্ময়করভাবে শাহজাহানের অনুকূলে চলে যায় এবং তা ঘটে আসফ খানের কুটকৌশল এবং ইচ্ছানুসারে। ফলে, যোগ্যতম যুবরাজের সঙ্গে সাম্রাজ্যের যোগ্যতম সেনাপতির মিলন ঘটে।

শাহজাহানের বিদ্রোহ এবং মহবত খানের অভ্যুত্থান বাংলাকে বিশৃঙ্খলার মধ্যে ফেলে দেয়। বাংলা ছেড়ে শাহজাহানের উত্তর ভারতে চলে যাওয়ার স্বল্প পরেই আরাকান রাজ ভুলুয়ায় হামলা এবং লুটপাট করে প্রচুরলুণ্ঠিত মালামাল

নিয়ে দেশে চলে যান।[৪১] আবার যখন মহবত খানও চলে যান, তখন আরাকানের রাজা পুনরায় আক্রমণ করেন এবং ঢাকা পর্যন্ত অগ্রসর হন; এক বর্ণনানুযায়ী তিনি শহরে প্রবেশ করেন, শহর জ্বালিয়ে দেন, লুটতরাজ করেন এবং বিপুল সংখ্যক লোককে বন্দী করে দেশে নিয়ে যান।[৪২] আরাকানীরা এমন সময় ঢাকা আক্রমণ করে যখন খানাহযাদ খান বাংলায় তার পিতা মহবত খানের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন, শেষোক্ত জনের বিদ্রোহের কারণে তাকেও দরবারে ডেকে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু তিনিও শেষ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে পালিয়ে যান। এর পর জাহাঙ্গীর মুকাররম খানকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন শেখ বায়াযীদ মুয়াযযম খানের পুত্র, শেখ সেলিম চিশতীর নাতি এবং বাংলায় জাহাঙ্গীরের সাবেক সুবাদার ইসলাম খানের জামাতা। ইসলাম খানের সময় মুকাররম খান বাংলায় ছিলেন এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। বিশেষ করে কুচ বিহার জয়ের ব্যাপারে। পরে তিনি উড়িষ্যার গভর্ণর নিযুক্ত হয়েছিলেন। সুবাদার হিসেবে তার অবস্থান ছিল খুবই ক্ষণস্থায়ী। কারণ ১৬২৭ সালের ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিকে যখন তিনি তৎকালীন রীতি অনুযায়ী একটি রাজকীয় 'ফরমান' গ্রহণের জন্য নদী পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন আকস্মিকভাবে নৌকা ডুবে যাওয়ায় তিনি নদীতে নিমজ্জিত হয়ে মারা যান। তখন সাধারণ রেওয়াজ ছিল এই যে, সম্রাটের কোন আদেশ বা ফরমান আসলে তাঁর প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ কয়েক মাইল এগিয়ে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তা গ্রহণ করা হত।

মুকাররম খানের মৃত্যু হলে ফিদাই খানকে (মির্যা হেদায়েতুল্লাহ) সুবাদার নিয়োগ দিয়ে পাঠানো হয়। তিনি ছিলেন একজন অভিজ্ঞ কর্মকর্তা এবং পূর্বে এক সময় অত্যন্ড় গুরুত্বপূর্ণ পদ, মীর-ই-বহর-ই-নাওয়ারা অর্থাৎ নৌ-বহরের প্রধান ছিলেন। তিনি ছিলেন মহবত খানের উপদলভুক্ত এবং তার অভ্যুত্থানের সময় তাকে সমর্থনও করেছিলেন; তবুও ফিদাই খান সম্রাটের আস্থা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। বলা হয় যে, যখন তাকে সুবদার নিয়োগ করে পাঠানো হয়, তখন "সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, প্রতি বৎসর সম্রাটের জন্য পাঁচ লাখ এবং সম্রাজ্ঞী নূর জাহানের জন্য পাঁচ লাখ, মোট দশ লাখ টাকা প্রতি বৎসর রাজকীয় কোষাগারে পাঠানো হবে।" এ পরিমাণ ছিল প্রদেশের মোট রাজস্ব থেকেও অনেক বেশী। ফিদাই খানের বাংলায় এসে পৌঁছানের অল্প দিন পরেই ২৭ শে সফর ১০১৩/ ২৯ শে অক্টোবর, ১৬২৭ জাহাঙ্গীর মৃত্যু বরণ করেন। নতুন সম্রাট শাহজাহান দ্বিতীয় কাশিম খানকে ফিদাই খানের স্থলাভিষিক্ত করেন।

---

৪১ বি.জি. ২য় খান্ড

৪২ তালিশের বিবরণ ১৫৪৬. এইচ বি তে উদ্বৃত ২য় পৃঃ ৩১৪

দ্বিতীয় অধ্যায়[৪৩]

শাহজাহানের রাজত্বকালে বাংলা

(১৬২৮সাল থেকে ১৬৫৮সাল)

জাহাঙ্গীরের পাঁচ পুত্রের মধ্যে তিনজন তাঁর জীবদ্দশায়ই মারা যান এবং তাঁর মৃত্যুর সময় তার তৃতীয় পুত্র শাহজাহান এবং পঞ্চম পুত্র শাহরিয়ার জীবিত ছিলেন। অতএব, স্বাভাবিক নিয়মেই শাহজাহানের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হওয়ার কথা; কিন্তু,তিনি পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং তার মৃত্যু পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করে পরিস্থিত জটিল করে ফেলেছিলেন। অপরদিকে, নুর জাহান তাঁর জামাতা শাহরিয়ারকে সিংহাসনে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন এবং তাঁর ভাই ও শাহজাহানের শ্বশুর আসফ খান এবং মীর-ই-বখশী আযম খানকে বন্দী করার জন্যও পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। "তারা দু'জনেই ছিলেন তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে বাধা এবং সাম্রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ।[৪৪]

আসফ খান তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন এবং দাক্ষিণাত্যে অবস্থানরত শাহজাহানের নিকট সর্বাগ্রে উত্তরে (রাজধানীতে) আসার জন্য দ্রুত সংবাদ প্রেরণ করেন। একই সময়ে আসফ খান পরলোকগত শাহজাদা খসরুর এক পুত্র দাওয়ার বখশকে হাত করেন এবং সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে তাকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। নূর জাহান সহজেই খেলাটি বুঝতে পারেন এবং লাহোরে অবস্থানরত তাঁর জামাতাকে সম্রাট হিসেবে নিজকে ঘোষণা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। এভাবে একই সময়ে দু'জন সম্রাট হয়ে যান। কিন্তু শাহরিয়ার ছিলেন অযোগ্য, অপদার্থ এবং আসফ খান কর্তৃক দাওয়ার বখশের নামে প্রেরিত বাহিনীর হাতে পরাজিত এবং বন্দী হন। আসফ খান অন্যান্য প্রভাবশালী আমিরদেরকেও স্বপক্ষে নিয়ে আসেন। শাহরিয়ারকে কারারুদ্ধ এবং অন্ধ করে দেয়া হয়। শাহজাহান উত্তরে এসে পৌঁছেন এবং ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী বিজয়দৃপ্তভাবে রাজধানীতে প্রবেশ করেন। "বলির পাঠা" দাওয়ার বখ্‌শকে

---

৪৩ মূল বইয়ে সপ্তদশ অধ্যায়

৪৪ এম.ইউ. ১ম খন্ড. পৃঃ ২৮৯

কারারুদ্ধ করা হয় এবং পরে পারস্যে চলে যেতে অনুমতি দেয়া হয়। নূর জাহানও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড থেকে বিরত হন। তিনি শাহজাহানের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলেও শাহজাহান তাঁর প্রতি সদয় ব্যবহার করেন এবং তাঁর জন্য একটি উপযুক্ত ভাতা মঞ্জুর করেন। শাহজাহানের জন্য এরূপ বিরাট কাজ করায় আসফ খানকে প্রচুর উপঢৌকন এবং সম্মান দেয়া হয়।

শাহজাহানের ত্রিশ বৎসর শাসনকালে (১৬২৮-১৬৫৮ইং) মুগল সাম্রাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করে এবং বাংলায়ও এর প্রতিফলন ঘটে। এটা আরো উল্লেখযোগ্য এ কারণে যে, যদি বলা হয় যে, জাহাঙ্গীরের শাসনকাল ছিল বাংলায় আফগান সর্দারদের এবং অন্যান্য জমিদারদের দমন এবং পরিণতিতে মোগলদের কর্তৃত্ব সংহত করার সময়, তবে বলতে হয় শাহজাহানের রাজত্বকালে বাংলায় জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। বিশেষ করে পর্তুগীজদের নিকট থেকে হুগলী দখল, তাদের দাস ব্যবসা বন্ধ এবং অন্যান্য দস্যুবৃত্তি দমন করে দক্ষিণ বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১. সুবাদার কাশিম খানের শাসন (১৬২৮-১৬৩২খ্রিঃ) এবং পর্তুগীজদের নিকট থেকে হুগলী দখল

সিংহাসনে আরোহনের অল্পকাল পরেই শাহজাহান ফিদাই খানের পরিবর্তে তাঁর নিজের মনোনীত কাশিম খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। তিনি ছিলেন মীর মুরাদের পুত্র, যিনি সম্রাট অকবরের রাজত্বকালে তার আদি নিবাস বাইহাক থেকে ভারতে আগমন করেন। আকবর তাকে শাহজাদা খুররমকে (শাহজাহান) তীরন্দাজী শিক্ষা দানের জন্য নিয়োগ করেন এবং পরে তাকে লাহোরের বখশী নিয়োগ করেন। মীর মুরাদের পুত্র এ কাশিম খান সুবাদার ইসলাম খান চিশতীর সময় বাংলার খাজাঞ্চী (Treasurer General) ছিলেন। কাশিম খান পরে সম্রাজ্ঞী নূর জাহানের ভগ্নী মনিজাহ বেগমকে বিয়ে করে সম্রাট জাহাঙ্গীরের ঘনিষ্ঠ হয়ে যান এবং আগ্রার শাসন কর্তা হিসেবে নিয়োজিত হন। কৌতুকপ্রিয় সভাসদগণ তাকে কাশিম খান মনিজাহ বলে ডাকতেন।[৪৫] আবদুস সালাম বলেছেন যে, এই "কাশিম খান" ছিল তার উপাধি, কোন উৎসেই তার আসল নামের উল্লেখ নেই। তার সুবাদারীর সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে পর্তুগীজদের নিকট থেকে হুগলী দখল, যা দক্ষিণ বাংলায় তাদের দস্যুতা দমনে অত্যন্ত কার্যকরি প্রমাণিত হয়।

৪৫ রিয়াদ. পৃঃ ২০৯. টীকা-১।

(ক) বাংলায় পর্তুগীজদের আগমন (১৫১৮ খ্রিস্টাব্দ)

১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতের পশ্চিম উপকূলের কালিকট বন্দরে ভাস্কোডা-গামার পৌঁছার সাথে সাথে প্রাচ্যের সমুদ্রে পর্তুগীজদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তার পূর্বসূরীরা ইতিপূর্বেই পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলীয় উত্তমাশা অন্তরীপ পর্যন্ত সমুদ্র পথ আবিস্কার করে ফেলেছিলেন। তিনি উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে আহমদ ইবন্ মাজেদ নামে একজন আরব মুসলমান নাবিকের সহায়তায় মাদাগাস্কার থেকে কালিকটে এসে পৌঁছেন। তবে, প্রথম পর্তুগীজ প্রতিনিধি জায়ো বেনয়েলহো ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে বাংলার উপকূল চট্টগ্রামে এসে পৌঁছতে পারেননি। একই বৎসর পশ্চিম ভারতীয় উপকূলীয় বন্দর গোয়ার পর্তুগীজ প্রধান ডম জায়ো ডি সিলভেরিয়াকে ৪টি জাহাজসহ আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব দিয়ে চট্টগ্রাম প্রেরণ করেন। সিলভেরিয়া আসার পথে চট্টগ্রামের গভর্ণরের আত্মীয় গোলাম আলী নামক একজন মুসলমান বণিকের কয়েকটি জাহাজ দস্যুর মত দখল করে তার অবস্থান কঠিন করে ফেলেন।[৪৬] অতএব, পর্তুগীজ অভ্যাগতকে স্বাভাবিকভাবেই একজন জলদস্যু হিসেবেই গণ্য করা হয় এবং একটি কঠিন সময় ব্যয় করে কোন সুফল ছাড়াই তিনি পশ্চিম ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। চট্টগ্রামে আগমণকারী পরবর্তী পর্তুগীজ প্রতিনিধি হচ্ছেন রুয়ে ভায় পেরেইরা, যিনি ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে আগমন করেন। তিনিও আসার পথে খাজা শিহাবুদ্দীন নামে চট্টগ্রাম ভিত্তিক একজন পার্শী সওদাগরের জাহাজ এ অজুহাত দিয়ে দখল করে নেয় যে, ঐ জাহাজটি পর্তুগীজদের জাহাজের মত করে সজ্জিত করা হয় এই জন্য যে, তারা দস্যুতা করে পর্তুগীজদের উপর তার দোষ চাপিয়ে দিবে।[৪৭]

এ অজুহাতটি প্রাচ্যের সমুদ্র পথে পর্তুগীজদের দ্বারা জলদস্যুতা সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে পরোক্ষ স্বীকৃতি ছাড়াও এ ইঙ্গিত দেয় যে, খাজা শিহাবুদ্দীন সম্ভবতঃ পর্তুগীজদের দ্বারা জলদস্যুতার শিকার হওয়া থেকে নিরাপদ থাকার জন্যই ঐরূপ করেছিলেন। ব্যাপারটি যাই হোক, তিনি উদ্ধার পান পর্তুগীজদের তৃতীয় এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে আরেকবার আগমনের পরে। মার্টিম এ্যাফোনসো ডি মেলো জুসার্টেকে কয়েকজন সহযোগীসহ ভারত মহাসাগর থেকে ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং পেগুও (বার্মা) সমুদ্র উপকূলে তাদের জাহাজ ডুবে যায়। সেখান থেকে কয়েকজন জেলে তাদেরকে দক্ষিণ চট্টগ্রামের চকোরিয়ায় নিয়ে যায়। সেখানে খুদা বখ্শ নামক একজন স্থানীয় সর্দার তার

---

৪৬ রিয়াদ, পৃঃ ২২৫

৪৭ ক্যাম্পোজ, হিস্ট্রি অব দ্যা পর্তুগীজ ইন বেঙ্গল, কলিকাতা, ১৯১৯, পৃঃ ৩০-৩১

প্রতিবেশীদের সঙ্গে বিবাদে তাদেরকে কাজে লাগান এবং তিনি অবশ্য তাদেরকে সংযত করে রেখেছিলেন। খাজা শিহাবুদ্দীন তখন তাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য এগিয়ে আসেন, তাদেরকে মুক্ত করান এবং বিনিময়ে তার দখলকৃত জাহাজটি ফেরত পান। খাজা শিহাবুদ্দীনের পরামর্শেই গোয়াস্থ পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে ৫টি জাহাজ এবং ২০০ লোকসহ মার্টিম অ্যাফোনসো ডি ম্যালো জুসার্টের নেতৃত্বে একটি বাণিজ্য প্রতিনিধি দল বাংলায় প্রেরণ করেন। এই বাণিজ্য প্রতিনিধি দলটির শুরুও খুব খারাপ ভাবে হয়। কারণ জুসার্টে তার জাহাজের মালামাল স্বভাবিক আবগারী শুল্ক না দিয়ে চট্টগ্রামে কালোবাজারী করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং অবস্থা আরো খারাপ হয়ে দাঁড়ায় যখন দেখা যায় যে, তিনি একজন দূতের মাধ্যমে গৌড়ের হুসেন শাহী সুলতান মাহমুদ শাহের জন্য যে উপঢৌকনগুলো প্রেরণ করেছিলেন, সে উপঢৌকনগুলো হচ্ছে কুখ্যাত পর্তুগীজ জলদস্যু দামিয়া বার্মান্ডস কর্তৃক সম্প্রতি লুণ্ঠিত একজন মুসলমান সওদাগরের। জুসার্টে প্যাকেটগুলো থেকে আসল মালিকের মোড়কগুলো অপসারণ করার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করেনি।[৪৮] ফল হয় এই যে, সুলতান নিশ্চিতভাবেই উপসংহারে পৌঁছেন এবং দূতকে কারারুদ্ধ করেন এবং চট্টগ্রামে তার সুবাদারকে সেখানকার অন্যান্য পর্তুগীজদেরকেও ধরার নির্দেশ দেন। ৫টি জাহাজ ভর্তি ২০০ লোকের সঙ্গে সম্ভবত একটি বড় ধরণের সশস্ত্র সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য সুবাদার জুসার্টে এবং তার ৪০ জন সহযোগীকে একটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়ে এনে তাদেরকে বন্দী করেন। তবুও তারা প্রতিরোধ করেন এবং তাতে তাদের ১০জন নিহত হয়। এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য গোয়ার পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ ১৫৩৪ সালে এন্টানিও ডি সিলভা মেঞ্জেসের অধীনে একটি বড় আকারের নৌ-বহর প্রেরণ করেন। তিনি প্রথমে কিছুটা আলাপ আলোচনা করার চেষ্টা করেন, পরে চট্টগ্রামে হামলা করে শহর জ্বালিয়ে দেন এবং শহরের বহু সংখ্যক বেসামরিক লোককে হত্যা করেন।

তবে পর্তুগীজদের এই নৌশক্তি প্রদর্শনের জন্য নয় বরং বাংলার রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের জন্য পর্তুগীজদের প্রতি সুলতান মাহমুদ শাহ্'র মনোভাবে শীঘ্রই পরিবর্তন আসে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ সময় আফগান বীর শের শাহ বাংলার প্রতি প্রচণ্ড হুমকি সৃষ্টি করেছিলেন এবং এ বিপদের সম্মুখীন হয়ে তিনি মরিয়া হয়ে নতুন মিত্র সন্ধান করছিলেন।[৪৯] অতএব, ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে যখন

৪৮. আর. এস. হোয়াইটওয়ে. দ্যা রাইজ অব দ্যা পর্তুগীজ পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া. ওয়েস্টমিনিস্টার. ১৮৯৯. পৃঃ ২৩৩
৪৯. আর.এস. হোয়াইটওয়ে. পূর্বোক্ত. পৃঃ ২৩৬।

আরেকটি পর্তুগীজ বাণিজ্য প্রতিনিধিদল চট্টগ্রাম আসে, তখন বাংলার সুলতান তাদের প্রতি লক্ষণীয় অনুগ্রহ দেখান এবং কারাবন্দী পর্তুগীজদেরকে মুক্তি দেন। এভাবে মার্টিন এ্যাফোনসো ডি মেলো জুসার্টে "হঠাৎ নিজেকে সুলতানের সামরিক উপদেষ্টার মত সম্মানজনক অবস্থানে দেখতে পান।"[৫০] তবে সুলতানের জন্য পর্তুগীজদের সামরিক সাহায্য যথেষ্ট বা সময়োপযোগী কোনটাই ছিলনা, তাই সুলতান মাহমুদ রক্ষা পাননি, তিনি আফগানদের দ্বারা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন এবং আহত হয়ে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। তিনি অবশ্য এর পূর্বে পর্তুগীজদেরকে চট্টগ্রাম এবং সপ্তগ্রামে বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি দিয়েছিলেন।[৫১]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শের শাহের বাংলা দখল থেকে চূড়ান্তভাবে মোগলদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত দেশে চলেছে এক ধরণের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং এ সময়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল স্বাধীন আফগান সর্দার এবং অন্যান্য জমিদারদের উত্থান।[৫২] ঠিক এই গোলযোগপূর্ণ সময়েই দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের মত বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলে পর্তুগীজদের কার্যকলাপ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। স্থানীয় পরিস্থিতিও পর্তুগীজদের জন্য সহায়ক হয়। শের শাহের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই চট্টগ্রাম আরাকান রাজের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। তার সঙ্গে পর্তুগীজদের সম্পর্ক সব সময় ভাল যাচ্ছিল না। তাই তারা বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলির প্রতি অধিক মনোযোগ দেয় এবং সেখানে তারা আফগান সাম্রাজ্যের ধ্বংস স্তুপের উপর গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্দারদেরকে নতুন মিত্র হিসেবে পেয়ে যায়। ১৫৫৯ খ্রিস্টাব্দে বাকলার (বরিশালের) রাজা পরমানন্দ তাদের সঙ্গে এক অধীনতামূলক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেন। "পরমানন্দ তার প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে তাকে সামরিক সহযোগিতার বিনিময়ে পর্তুগীজদেরকে বাৎসরিক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ চাল, মাখন, তৈল, আলকাতরা, চিনি এবং হাতে বোনা তাতের কাপড় কর হিসেবে দিতে অঙ্গীকার করেন।"[৫৩] তিনি একই সঙ্গে তার নিয়ন্ত্রিত এলাকায় তাদেরকে বাণিজ্য করতেও অনুমতি দেন। তার উত্তরাধিকারী রামচন্দ্র একজন পর্তুগীজ ক্যাপ্টেন, পর্তুগীজ বংশোদ্ভূত এবং খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদেরকে তার অধীনে চাকুরীতে নিযুক্ত করেন[৫৪] এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজ খ্রিস্টান মিশনারী সংস্থা

---

৫০. এস.এন. সেন. ই. এইচ.বি., ২য় খন্ড. পৃঃ ৩৫৮

৫১. ক্যাম্পোজ. পূর্বোক্ত. পৃঃ ৩৯।

৫২. ক্যাম্পোজ. পূর্বোক্ত. অধ্যায় ১৪শ এবং ১৫শ।

৫৩. এস.এন. এইচ.বি., ২য় খন্ড. পৃঃ ৩৫৮

৫৪ এস.এন. এইচ.বি., ২য় খন্ড. পৃঃ ৩৬০।

সোসাইটি অব যীশু এর মেলকয়ার ডি ফনসেকাকে গীর্জা নির্মাণ এবং খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার করার জন্য অনুমতি দেন।[৫৫] রামচন্দ্রের শ্বশুর যশোরের প্রতাপাদিত্যও কিছু সংখ্যক পর্তুগীজ ভাড়াটে সৈন্য নিয়োগ করেছিলেন, বিশেষ করে তার রণতরীগুলো সুসজ্জিত করার জন্য। তিনি তাদেরকে তার এলাকায় খ্রিস্টান গীর্জা প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্থান এবং অর্থও দিয়েছিলেন। বার ভূঁইয়াদের অন্যতম শ্রীপুরের (ঢাকার) কেদার রায় ও তাঁর অধীনে পর্তুগীজদেরকে চাকুরীতে স্বাগত জানাতেন। তাঁর অধীনস্থ এমনই একজন ভাড়াটে সৈন্য ডমিঙ্গো কার্ভালহো ১৫৯২ খ্রিস্টাব্দে সন্দ্বীপের মুসলমান অধিবাসীদেরকে পরাজিত করে দ্বীপটি দখল করেন।[৫৬] তারপর কার্ভালহো কেদার রায়ের কর্তৃত্ব ছুড়ে ফেলে দেন এবং মেট্রোস নামক আরেকজন পর্তুগীজ অভিযাত্রিকের সাহায্য নিয়ে দ্বীপটির উপর পর্তুগীজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের এই কৃতিত্বের জন্য কার্ভালহো এবং মেট্রোস উভয়কে পর্তুগীজ রাজা "নাইটহুড অব দ্যা অর্ডার অব ক্রাইস্ট" এবং "জেন্টলম্যান অব দ্যা রয়্যাল হাউজহোল্ড উপাধি" দ্বারা ভূষিত করেন।[৫৭] পর্তুগীজদের এই দ্বীপ দখল ছিল খুবই ক্ষণস্থায়ী; কারণ একই বৎসর মগরাজ দ্বীপটি আক্রমণ করেন এবং চট্টগ্রামের বিপরীত দিকে দিয়াঙ্গায় পর্তুগীজদেরকে পরাজিত করেন এবং তারপরে দ্বীপটি থেকে পর্তুগীজদের বহিস্কার করার জন্য এক বিরাট নৌবহর প্রেরণ করেন। এইভাবে মগ এবং স্থানীয় মুসলমানদের চাপে কার্ভালহো অল্পকাল পরেই দ্বীপটি পরিত্যাগ করেন এবং তার কিছু সংখ্যক অনুসারী নিয়ে শ্রীপুরে আশ্রয় নেন। আর অবশিষ্ট পর্তুগীজ এবং স্থানীয় খ্রিস্টানগণ বন্ধুভাবাপন্ন বাকলা এবং চন্ডিকানের(যশোর) দরবারে আশ্রয় নেন।[৫৮]

কার্ভালহোর পশ্চাদপসারণের পরে সন্দ্বীপ জনৈক ফতেহ খানের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। তিনি কিভাবে দ্বীপটির নিয়ন্ত্রণ পেলেন, তা স্পষ্ট নয়। বলা হয় যে, তিনি প্রথম দিকে পর্তুগীজদের অধীনে একজন ক্যাপ্টেন ছিলেন। খুব সম্ভব দ্বীপের মুসলিম জনসাধারণের প্রতি পর্তুগীজদের নিষ্ঠুর আচরণের কারণে তিনি তাদের থেকে আলাদা হয়ে যান। আরো একটু বেশি সম্ভাবনা হচ্ছে এই যে, মগরাজা ঐ স্থান থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়নের জন্য তাকে নিয়োগ করেছিলেন। সন্দ্বীপে ফতেহ খানের আবির্ভাবের সময়েই দৃশ্যপটে সেবাস্টিও গঞ্জালেস টিবউ নামক একজন নিষ্ঠুর ও দুর্ধর্ষ পর্তুগীজ জলদস্যুর আবির্ভাব ঘটে। সে সন্দ্বীপের

---

৫৫ বেভারিজ ডিস্ট্রিক্ট অব বাকেরগঞ্জ, পৃঃ ৩১, ১৭৫-১৭৭।

৫৬. ১৫৬৯ খ্রীস্টাব্দে যখন সিজার ফ্রেডারিক দ্বীপটি পরিদর্শন করেন, তখন তিনি এ দ্বীপে একজন "আরব রাজার" অধীনে মুসলমানদের বসবাস করতে দেখেন। পার্চাজ, হিজ পিলগ্রিমস, ৯ম খন্ড পৃঃ ১৩৭।

৫৭. এইচ.বি. ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৬১

৫৮. এইচ.বি.২য় খন্ড, পৃঃ ৩৬১।

নিকটবর্তী ভূভাগ এবং নির্দোষ ব্যবসায়ীদের উপর তার হামলা ও লুটতরাজ চালাতে থাকে। ফতেহ খান তাদের এসব কর্মকাণ্ড দমন করার সিদ্ধান্ত নেন এবং যখন তারা বাকলা রাজার নিয়ন্ত্রণাধীন শাহবাযপুর (বরিশাল) দ্বীপে তাদের লুণ্ঠিত মালামাল বন্টনে ব্যস্ত ছিল, তখন ১৬০৯ সালে তিনি তাদের উপর অতর্কিতে এক নৌ-অভিযান প্রেরণ করেন। এতে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাতে অবশ্য ফতেহ খান পরাজিত এবং নিহত হন। তখন গঞ্জালেস সন্দ্বীপ আক্রমণ এবং দখল করে নেন। "তার আগের দস্যুতাবৃত্তির মতই এ অভিযানেও সে তার বন্ধু ভাবাপন্ন বাকলার রাজার সমর্থনের উপর একটুও নির্ভরশীল ছিলেন না। দস্যুতা করে লব্ধ মালামাল অবশ্য রাজার নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার মধ্যেই ভাগ-বাটোয়ারা করা হত। বাকলার রাজা সন্দ্বীপ বিজয়ের সময় এই শর্তে গঞ্জালেসের সাহায্যের জন্য দুই শত অশ্বারোহী এবং কিছু সংখ্যক সশস্ত্র রণতরী পাঠিয়েছিলেন যে, দ্বীপের রাজস্ব উভয় মিত্রের মধ্যে সমভাবে বন্টিত হবে।"[৫৯] এই চুক্তি পালন করা দূরে থাক, গঞ্জালেস পরে বিশ্বাসঘাতকতা করে বাকলার (বরিশালের) রাজার নিকট থেকে শাহবাযপুর এবং পটলভাঙ্গা দ্বীপ দু'টি কেড়ে নেয়। এরপর গঞ্জালেস মগ রাজার অধীনস্থ এলাকায় অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে কিন্তু বিতাড়িত হয়। ইতিমধ্যে মোগলরা ইসলাম খান চিশতীর নেতৃত্বে আফগান প্রতিরোধ গুড়িয়ে দিতে সক্ষম হয় এবং যশোর (চণ্ডিকান), বাকলা এবং ভুলুয়ার রাজাদের এলাকাসহ সমগ্র বাংলায় মোগলদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে।[৬০] স্বাভাবিকভাবেই মোগল বাহিনীর এ অগ্রগতিকে পর্তুগীজ দলদস্যু এবং মগ রাজা উভয়কেই শংকিত করে তোলে এবং পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা তাদের বিবাদ মিটিয়ে ফেলে এবং ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দে সম্মিলিতভাবে ভুলুয়ার মোগল ফাঁড়িতে হামলা করে।[৬১] অভিযানের মধ্যভাগে সুবিধাবাদের এ মৈত্রী ভেঙ্গে পড়ে এবং উভয়েই নিজ নিজ অবস্থানে পশ্চাদপসারণ করে। উভয়ের মধ্যে নতুন করে সৃষ্ট এ ভুল বোঝাবুঝির ফলশ্রুতিতে মগরাজা ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দে গঞ্জালেসের নিকট থেকে সন্দ্বীপ দখল করে নেন। এরপর ঐ "নিষ্ঠুর রোমান্টিক" ব্যক্তি ইতিহাসের অধ্যায় থেকে অপসৃত হয়। বাংলার দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলাগুলি যথা- যশোর, খুলনা (চণ্ডিকান), বরিশাল (বাকলা) এবং ভুলুয়ার (নোয়াখালীর) উপর মোগলদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পর্তুগীজরা বাস্তবিকই তাদের দস্যুবৃত্তি পরিচালনা করার জন্য তাদের সুবিধাজনক

---

৫৯ এইচ.বি.২য় খন্ড, পৃঃ-৩৬২।
৬০ এইচ.বি., ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৬১
৬১. এইচ.বি., ২য় খন্ড, পৃঃ ৩০৮, ৩১০-৩১২।

ঘাটিগুলো থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু তবুও তারা তা সম্পূর্ণ বন্ধ করেনি। মগরাজার হাতে গঞ্জালেসের চূড়ান্ত পরাজয়ের পর পর্তুগীজরা বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলের উপর মগদের শ্রেষ্ঠত্ব নিরবে মেনে নেয় এবং তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য চট্টগ্রামকে প্রধান ঘাঁটি হিসেবে বেছে নেয়। যদিও আরাকান রাজ তার নিজ দেশে পর্তুগীজদের ঔদ্ধত্য সহ্য করতেন না। কিন্তু বুঝা যায় যে, বাংলার ক্ষেত্রে তিনি পর্তুগীজদের দস্যুবৃত্তিতে সম্মতি দিতেন। যদিও তাতে তার উদ্দেশ্য ছিল শুধু মোগলদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করা। অধিকন্তু, পর্তুগীজরা ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে ঢাকা, বরিশাল, যশোর, হুগলী এবং অন্যান্য স্থানে বহু কুঠি ও বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করেছিল, যেগুলি বন্ধ করা হয়নি। এগুলো প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল নিয়মিত ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সম্মতি নিয়ে। প্রকৃতপক্ষে পর্তুগীজরা সাতগায়ের কুঠির বিকল্প হিসেবে ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবরের একটি "ফরমান" নিয়ে তাদের হুগলীর কুঠি স্থাপন করেছিল, কারণ নদীর প্রধান স্রোতধারার গতি পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ায় সাতগাঁওতে জাহাজ নিয়ে প্রবেশ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। এসব এলাকা দিয়ে বিরাট পরিমাণ ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হত। ১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভ্রমণ করে সিজার ফ্রেডারিক লিখেছেন যে, সাতগাঁওয়ে "চাল, জাকজমকপূর্ণ কাপড়, বিভিন্ন প্রকার লাক্ষা রং, প্রচুর পরিমাণ চিনি, শুকনা মরিচ এবং আরও বিভিন্ন প্রকার পণ্য দিয়ে" বৎসরে প্রায় ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশটি ছোট ও বড় জাহাজ বোঝাই করা হত।[৬২] কিন্তু পর্তুগীজ বণিকরা প্রায় সব সময়ই নিয়মিত বাণিজ্যের সঙ্গে তাদের অনিয়মিত কর্ম-কাণ্ডকে একাকার করে ফেলত এবং তাদের মধ্যে যাদেরকে বাংলার বিভিন্ন স্থানে নিয়মিত বাণিজ্যের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়েছিল, তারাই ফিরিঙ্গীদেরকে তাদের দস্যুবৃত্তির জন্য গোপন তথ্য সরবরাহ করত। মোগলদের দ্বারা নোয়াখালী, বরিশাল এবং যশোর বিজিত হওয়ার পরে পর্তুগীজ জলদস্যুদের দ্বারা বলপূর্বক কেড়ে নেয়া এবং লুট-তরাজ করে সংগৃহীত ও লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি এবং তাদের হাতে বন্দীদেরকে দাস হিসেবে বিক্রির জন্য হুগলী প্রধান ঘাটিতে পরিণত হয়।

ফিরিঙ্গী জলদস্যুরা বাংলার ভাটি অঞ্চলে অমানবিক ও নৃশংস আচরণ করত। এ এলাকার ধন-সম্পদ এবং উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী লুট করা ছাড়াও তারা হাজার হাজার নারী-পুরুষ এবং শিশুদেরকে ধরে নিয়ে যেত এবং তাদেরকে হয় দাস হিসেবে বিক্রি করে দিত, নয়ত বলপূর্বক খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করত। নিরীহ জেলে, মাঝি, বণিক এবং পর্যটকরা এ "ফিরিঙ্গী" জলদস্যুদের ভয়ে সর্বদা

৬২. পারচাজ, হিজ পিলগ্রিমস। দশম, পৃঃ ১১৩-১১৪।

সন্ত্রস্ত থাকত। যেমন, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইব্রাহীম খানের সুবাদারীর সময় তারা যশোরে এক অভিযান চালিয়ে ১৫০০ নারী পুরুষকে ধরে নিয়ে যায়।[৬৩] আবার ১৬২১ সাল থেকে ১৬২৪ সাল পর্যন্ত ৪২,০০০ লোককে ধরে নিয়ে যায়, তাদের মধ্যে ২৮,০০০ জনকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করে এবং অবশিষ্টদেরকে দাসে পরিণত করে।[৬৪] ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে যখন মোগলরা হুগলী জয় করে, তখন সেখান থেকে পর্তুগীজদের দ্বারা আটককৃত ১০,০০০ লোককে উদ্ধার করা হয়। পর্তুগীজ জলদস্যুরা তাদের বন্দীদের উপর অমানবিক এবং বর্বরসুলভ নির্যাতন করত। শিহাবুদ্দীন তালিশ নামক একজন সমসাময়িক লেখক বিবরণ দিয়েছেন: তারা হিন্দু এবং মুসলমান নারী এবং পুরুষ, উচ্চ এবং নীচ, অল্প বা বেশি, যাকে নাগালে পেত তাকেই ধরে নিয়ে যেত; তাদের হাতের তালু ছিদ্র করে সরু বেত ঢুকিয়ে দিত এবং তাদের জাহাজের ডেকের নিচে একজনের উপর আরেকজনকে ছুড়ে মারত। যেভাবে মোরগ-মুরগীকে শস্য দানা ছুড়ে দেয়া হয়, ঠিক সেভাবে প্রতি সকাল এবং সন্ধ্যায় রান্না বিহীন চাল, খাদ্য হিসেবে উপর থেকে তাদের দিকে ছুড়ে দেয়া হত। তাদের দেশে ফেরার পরে এ নিষ্ঠুর ব্যবহারের পরেও যে সব বন্দী বেচেঁ থাকত, তাদের শক্তি অনুযায়ী তাদেরকে তারা অত্যন্ত অপমান ও অসম্মানজনকভাবে কৃষি কাজসহ অন্যান্য কঠোর কাজে নিয়োগ করত। অন্যদেরকে দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন বন্দরে ডাচ, ইংরেজ এবং ফরাশী ব্যবসায়ীদের নিকট দাস হিসেবে বিক্রি করে দিত। শুধুমাত্র জলদস্যুরাই তাদের বন্দীদেরকে বিক্রি করত। কিন্তু মগরা তাদের সকল বন্দীদেরকে কৃষি কাজসহ অন্যান্য সেবামূলক কাজে নিয়োগ করত। অনেক উচ্চ বংশীয় মানুষ এবং সৈয়দ পরিবারভুক্ত অনেক সতী নারীকে দিয়ে দাসীবৃত্তির কাজ করাত অথবা ঐসব অসৎ ও দুষ্ট লোকদের শয্যা সঙ্গিনী হতে বাধ্য করা হত। এসব যুদ্ধ-পীড়িত অঞ্চলে মুসলমানদেরকে যেসব অত্যাচার সহ্য করতে হত, তা ইউরোপেও তাদেরকে সহ্য করতে হত না।[৬৫]

বাংলায় পর্তুগীজদের উদ্ধত আচরণ কোন অস্বাভাবিক বা ব্যতিক্রমী ঘটনা ছিল না। এ দেশের কার্যকরী নৌ-শক্তির অভাব, মগরাজ কর্তৃক উস্কানী দান এবং স্থানীয় অন্যান্য পরিস্থিতি বাস্তবিকই এ অবস্থা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু বাংলায় পর্তুগীজদের যে নৃশংসতা ছিল, তা তারা অন্যান্য যে সকল দেশে গিয়েছে, সে সকল দেশে তাদের দ্বারা পরিচালিত কর্মকাণ্ডেরই প্রতিবিম্ব। যেখানেই তারা গিয়েছে, সেখানেই তারা বাণিজ্য সন্ধান এবং খৃস্ট ধর্ম

---

৬৩ পারচাজ, হিজ পিলগ্রিমস। দশম খন্ড, পৃঃ ৩৩৭।

৬৪ ক্যাম্পজ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৫।

৬৫ বড, এম এস এস ৫৮৯, সরকার কর্তৃক জে, এ, এস, বি.তে অনূদিত, ১৯০৭, পৃঃ ৪২২

প্রচারের জন্য তরবারী ও অগ্নি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছে; সাধারণতঃ তারা দস্যুতা এবং বাণিজ্যের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট বিবেচনা প্রসূত পার্থক্য করত না। তারা অবশ্য মানুষ এবং অন্যান্য উৎপাদিত পণ্যকে একই রকম আকর্ষণীয় বাণিজ্যিক পণ্য বলে গণ্য করত এবং জোর-জবরদস্তী করে তা লাভ করার চেষ্টা করত। তারা মুসলমানদের প্রতি দুটি প্রধান কারণে বিদ্বেষ পোষণ করত। পর্তুগীজরা উত্তর আফ্রিকার মুসলমানদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত তীব্র ও দীর্ঘ মেয়াদী ক্রুসেড যুদ্ধ চালিয়েছে এবং তারা প্রাচ্যেও একই রকম চেতনা এবং সকল মুসলমানের প্রতি শত্রুতার মনোভাব সঙ্গে করে নিয়ে আসে এবং সকল মুসলমানকে "মুর" (Moors) বলে অভিহিত করত। দ্বিতীয়ত, খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বাণিজ্য প্রধানত: মুসলমানদের হাতেই ছিল। অতএব, পর্তুগীজরা যখন এ অঞ্চলে প্রবেশ করে, তখনও তারা দেখতে পায় যে, বাণিজ্যিক ক্ষেত্রেও মুসলামানরাই তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই পর্তুগীজ নাবিকরা ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে মুসলমান বণিকদেরকে আঘাত করা এবং তাড়িয়ে দেয়া্য নিজেদের লক্ষ্য নির্ধারণ করে। এ সবের সঙ্গে আরো দুটি সাধারণ কারণও যোগ করা যেতে পারে। প্রাচ্যে আধিপত্য বিস্তারের জন্য পর্তুগীজদের এ প্রচেষ্টার সঙ্গে যুগপতভাবে ঘটে যায় পর্তুগাল উপদ্বীপে প্রতি-সংস্কার আন্দোলন (Counter-Reformation) থেকে সৃষ্ট ধর্মীয় উন্মাদনা এবং ধর্মীয় আদালত (Inquisition) প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। এ সময়ে প্রতিটি পর্তুগীজই নিজেকে নতুন চেতনার ধারক ও সমর্থক মনে করত এবং খ্রিষ্টীয় রাজ্য সম্প্রসারণ এবং অন্যদেরকে খ্রিস্টান বানানোর লক্ষ্যে গৃহীত কোন পদক্ষেপই তাদের নিকট অন্যায় বলে গণ্য হত না। দ্বিতীয়ত, প্রাথমিক পর্তুগীজ আবিস্কারকগণ আফ্রিকার উপকূলীয় আটলান্টিক মহাসাগরভুক্ত প্রাচ্যের জল সীমায় তাদের পরবর্তীদের জন্য একটি বিশেষ ঐতিহ্য এবং ধারা সৃষ্টি করে গিয়েছেন। প্রাথমিক আবিস্কারকগণ সকল বয়সের নারী-পুরুষদের ধরে ও বন্দী করে আনার জন্য আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে হানাদার বাহিনী প্রেরণ করতেন। তাদের মধ্যে যারা একটু বুদ্ধিমান ছিল তাদেরকে পথ প্রদর্শক এবং দোভাষী হিসেবে কাজে লাগাতেন এবং বাকিদেরকে দাস হিসেবে বিক্রি করে দিতেন।[৬৬] বাংলায় পর্তুগীজদের অধিকাংশ অপকর্ম সম্পর্কে একজন লেখক যথার্থই বলেছেন যে, "তাদের অরাজক ও বেআইনী কাজ কারবারের অভ্যাসের সঙ্গে 'কৃষ্ণ' মহাদেশের দেশগুলোতে বিচার থেকে মুক্ত থাকার অনুকূল পরিবেশই ছিল দায়ী।"[৬৭]

---

৬৬ প্রেমটেজ. দ্যা পর্তুগীজ পাইওনীয়ারস পৃঃ ১০১ এইচ.বি.তে উদ্ধৃত ২য় খন্ড পৃঃ ৩৫৪।

৬৭ এস. এন. সেন. উপরোক্ত গ্রন্থ. পৃঃ ৩৫৪

খ) কাশিম খানের হুগলী বিজয় (১৬৩২ খ্রিঃ)

বাংলায় পর্তুগীজদের উপরোক্ত কার্যকলাপের বিবরণ থেকে স্পষ্ট যে, কোন প্রতিষ্ঠিত সরকারের পক্ষে ঐ সব কাজ বন্ধ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী। এখন যেহেতু মোগলরা সমগ্র বাংলা (চট্টগ্রাম ব্যতীত) তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে, তাই এখন এটা শুধু সময়ের প্রশ্ন যে, তারা পর্তুগীজ ও মগদের লুটতরাজের প্রতি তাদের পূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে। আসলে এ বিষয়টি ইতিপূর্বেই সুবাদার ইব্রাহীম খানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বলে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে,[৬৮] এবং তিনি তৎকালীন বিদ্রোহী শাহজাদা শাহজাহানকে মোকাবেলা করার জন্য ঢাকা থেকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে এ শত্রুদের দমন করার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। অতএব, শাহজাহানের সিংহাসন আরোহন করার পর পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যবস্থা গ্রহণ কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, তিনি যখন দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করছিলেন, তখনই তিনি ঐ অঞ্চলে পর্তুগীজদের ঔদ্ধত্যমূলক আচরণের বিষয়ে অবগত হয়েছিলেন। অতএব, সিংহাসনে আরোহণ করার পরে তিনি গোয়ার পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের নিকট তাদের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে পত্র লিখেছিলেন। বিশেষ করে তার প্রজাদের জাহাজ দখল করার বিরুদ্ধে এবং ঐসব দখলকৃত জাহাজ ফিরত দেয়ার জন্য আহবান জানিয়েছিলেন, অন্যথায় দক্ষিণ ভারতের ঘাঁটি থেকে তাদের বহিস্কারের[৬৯] সম্মুখীন হওয়ার জন্য তাদেরকে সতর্ক করেছিলেন। ১৬২৯ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে তিনি ভারতে ইংলিস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং পর্তুগীজদের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে তার পরিকল্পিত ব্যবস্থার পক্ষে তাদের সাহায্য চান।[৭০] শেষোক্তদের সঙ্গে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে ইংরেজ প্রতিনিধিগণ শাহজাহানের অনুরোধের প্রতি অনুকূলে সাড়া দিবেন বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু তাদের বাস্তবে সে সামর্থ না থাকায় তারা কোন সক্রিয় সহযোগিতা করতে পারেনি। তথাপি শাহজাহান গোয়া, দমন ও দিউর বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু মোগল বাহিনীর মধ্যে মহামারী দেখা দেওয়ায় এ অভিযানের লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। তবে শাহজাহান তাঁর উদ্যোগ ত্যাগ করেননি এবং পরবর্তীতে তিনি বাংলার পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।

---

৬৮ এস.এন. সেন কর্তৃক উপরোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত. পৃঃ ৩৪০।

৬৯ হেগ. অনূদিত সিরিজ ১. ৯ম খন্ড. সংখ্যা ২৯৬. ই.এফ. আইতে উদ্ধৃত. ১৬২৪-২৯. পৃঃ ৩২৯।

৭০ ই.এফ. আইতে উদ্ধৃত. ১৬২৪-২৯. পৃঃ ৩২৭-২৮।

হুগলীর পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ছিল সমগ্র মোগল সাম্রাজ্যব্যাপী পর্তুগীজদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার বৃহত্তর নীতির অংশ বিশেষ। তবু কাশিম খানের হুগলী দখলের পিছনে কতিপয় কারণ পেশ করা হয়। একজন জেসুইট খ্রিস্টান মিশনারী, যিনি হুগলী অবরোধের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি এর পিছনে সম্রাটের একটি ব্যক্তিগত কারণ উল্লেখ করেছেন। বলা হয়েছে যে, শাহজাহান যখন পিতার বিরুদ্ধে একজন বিদ্রোহী হিসেবে বাংলায় আসেন, তখন তাঁর প্রতি পর্তুগীজদের প্রকাশ্যে সমর্থন ঘোষণা করতে অস্বীকার করা এবং পরে আবার পর্তুগীজ অভিযাত্রিক ম্যানোয়েল ট্যাভারেস কর্তৃক টনসের যুদ্ধের প্রাক্কালে তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে আসা[৭১] এবং রণতরীর বহর প্রত্যাহার করে নিয়ে আসা, ফিরার পথে শাহজাহানের মালিকানাধীন ধন-সম্পদ বোঝাই কয়েকটি নৌকা লুট করা, তদুপরী মমতাজ মহলের দুইটি বালিকা দাসীকে ধরে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি কারণে শাহজাহান তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।[৭২] বাংলার পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ শাহজাহানের সিংহাসনে আরোহণের পর তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে কোন উপঢৌকনও পাঠায়নি। আরো বলা হয়েছে যে, মমতাজ মহল তাঁর দাসী বালিকা দু'টিকে উদ্ধার করা এবং হুগলী দখল করার জন্য শাহজাহানকে চাপ প্রয়োগ করেছেন।[৭৩] ম্যানোয়েল ট্যাভারেস কর্তৃক শাহজাহানকে পরিত্যাগ করে চলে আসা এবং লুট-পাট করার ঘটনাও সত্য এবং এজন্য তাদের প্রতি সম্রাটের অসন্তুষ্ট হওয়া যুক্তি সঙ্গত। কিন্তু বিষয়টি হচ্ছে এই যে, সিংহাসনে আরোহণের পরে শাহজাহান প্রথমে দক্ষিণ ভারতে পর্তুগীজদের প্রতি প্রথম তাঁর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। তাঁর শাসন কালের পঞ্চম বৎসরের পূর্বে হুগলীতে অভিযান প্রেরণ করা হয়নি এবং তাও আবার মমতাজ মহলের মৃত্যুর পরের বৎসর। এ থেকে এই আভাসই পাওয়া যায় যে, উক্ত ঘটনাবলী সম্রাটের নিকট একটি বিবেচ্য বিষয় হলেও তার উপর ঐগুলোর প্রভাব ছিল খুবই ক্ষীণ। সন্দেহ নেই, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণ ছিল আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ক্যাব্রাল অবশ্য এগুলোর প্রতি ইঙ্গিতও দিয়েছেন। হুগলী রাজনৈতিকভাবে পর্তুগীজদের কার্যকলাপের জন্য দ্রুত একটি শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছিল। শাহজাহানের সিংহাসনে আরোহনের প্রাক্কালে হুগলীতে পর্তুগীজ উপনিবেশ স্থাপনকারী, তাদের কর্মচারী এবং তাদের বংশোদ্ভুত এদেশীয় মিত্রদের নিয়ে তাদের মোট সংখ্যা ছিল দশ হাজারেরও বেশি। তাদের ছিল উন্নততর যুদ্ধাস্ত্র এবং তাদের পিছনে ছিল

---

৭১ ই.এফ. আইতে উদ্ধৃত. ১৬২৪-২৯. পৃঃ ৩৪৫।

৭২ ম্যানরিক. ২য় খন্ড. পৃঃ ৩৯৪।

৭৩ ম্যানুকী. ষ্টোরিয়া ডি মগর . ১ম খন্ড. পৃঃ ১৮২

তৎকালীন সময়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নৌশক্তি। তারা হুগলীতে আরাকান ভিত্তিক পর্তুগীজ জলদস্যুদের লুণ্ঠিত দ্রব্য এবং দাস বিক্রির সঙ্গেও সম্পৃক্ত ছিল। তদুপরি, হুগলীর পর্তুগীজরা মোগলদের চির শত্রু মগরাজকে বার বার বাংলায় অনুপ্রবেশ ও হামলা করার জন্য ভাড়াটে সৈন্য এবং অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করত। এসব কিছু মিলে শাহজাহানের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি করে। যেমনঃ ক্যাব্রাল লিখেছেন, "তাঁর মনে এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে, তাঁর বাংলা রাজ্যটি শেষ পর্যন্ত নাকি স্পেনের রাজার অধীনে চলে যায়।"[৭৪]

ধর্মীয় দিক থেকে পর্তুগীজদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ও সম্রাটের নিকট সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় ছিল। তবে সম্রাট শাহজাহান খ্রিস্ট ধর্মের পরিবর্তে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বলে ক্যাব্রাল যে তার স্বভাব সুলভ ইঙ্গিত দিয়েছেন, তা আদৌ সত্য নয়।[৭৫] অন্যত্র ক্যাব্রাল নিজেই স্বীকার করেছেন যে, সাম্রাজ্যের কোথায়ও মোগলরা শান্তিপূর্ণভাবে খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচারের পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি[৭৬] এবং হুগলী দখলের পরে শাহজাহান কর্তৃক যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি হয় ইসলাম গ্রহণ, নয় কারাগার -এরূপ বিকল্প দেয়ার কারণ ছিল ইতিপূর্বে পর্তুগীজদের দ্বারা বহু মুসলমানকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে যাওয়া এবং তাদেরকে খ্রিস্টান বানানোর বিরুদ্ধে স্পষ্টতই একটি প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা। কারণ অন্যান্য খ্রিস্টান জাতি যথা- ইংরেজ এবং ওলান্দাজদেরকে তাদের পছন্দ মত চলতে অনুমতি দেয়া হয়েছিল অথবা তাদেরকে দরবারে আনুকূল্যও দেখানো হয়েছিল এবং অল্পকাল পরেই পর্তুগীজদেরকে হুগলীতে ফিরে আসার অনুমতি দেয়া হয়েছিল।[৭৭] প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, শাহজাহান পর্তুগীজদের দ্বারা তার প্রজাদের বলপূর্বক ধরে নিয়ে খ্রিস্টান বানানো বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। সমসাময়িক মোগল ইতিহাসবেত্তাদের অভিন্ন বিবরণ এবং বর্তমানে সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত বিষয় পর্তুগীজদের দ্বারা বলপূর্বক খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের বিষয়টিকে একটু সতর্কভাবে বিশ্লেষণ করলে এ ব্যাপারে শাহজাহানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। বাস্তবিকপক্ষে যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে পর্তুগীজদের সঙ্গে যে শান্তি আলোচনা হয়েছিল, তা থেকে এ বিষয়টি আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে যায় এবং এ আলোচনায় ক্যাব্রাল নিজেই পর্তুগীজদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তাই তিনি লিখেছেন যে, বিষয়টি শান্তিপূর্ণভাবে

---

৭৪ ম্যানরিক, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৯৫
৭৫ ম্যানরিক, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৯৫।
৭৬ ম্যানরিক, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৯৫
৭৭ ক্যামপোজ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪১

সমাধানের জন্য পর্তুগীজদের আবেদনের প্রেক্ষিতে মোগল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পর্তুগীজদের দ্বারা আরাকানের রাজাকে সাহায্য করার অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। তাছাড়া তারা পর্তুগীজদের দ্বারা বলপূর্বক হুগলীতে আটক এবং খ্রিস্টান বানানো সকলকে মুক্ত করে দেয়ার দাবী উত্থাপন করে। এ প্রেক্ষিতে বলপূর্বক আটককৃত এবং খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিতদের মধ্য হতে প্রথম ব্যাচে ৯০ জনকে মুক্তি দেয়া হয়।[৭৮] কিন্তু তাতেও শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব হয়নি। অতএব, হুগলীর পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে মোগলদের প্রত্যাঘাতের পিছনে ধর্মীয় কারণ কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ফলে, একজন আধুনিক লেখকের মত একথা বলা ভুল হবে যে, এখানে ধর্মীয় কারণটি ছিল গৌণ, কম গুরুত্বপূর্ণ এবং এ বিষয়টি "শুধু নীতিগত কারণেই শাহজাহান কর্তৃক এ বিবাদের মধ্যে আমদানী করা হয়েছিল"।[৭৯] তৎকালীন পর্তুগীজ বা মোগল কর্তৃপক্ষের কেহই তখন এত ধর্মহীন বা ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) ছিলেন না, যেমন কিছু আধুনিক লেখক আমাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন।

১০৪২ হিঃ/১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে হুগলীর বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করা হয়। মনে হচ্ছে, কাশিম খানের পরিকল্পনা ছিল এ রকম যে, তিনি পর্তুগীজদের কোন সন্দেহের উদ্রেক না করে হুগলীর নিকটে সৈন্য সমাবেশ করতে চেয়েছিলেন এবং এ সমাবেশ করা হয়েছিল তাদের উপনিবেশের ভাটিতে যেন তারা নদী পথে সমুদ্রে পালিয়ে যেতে না পারে অথবা গোয়া এবং আরাকান থেকেও কোন সাহায্য এসে পৌঁছতে না পারে। তাই তিনি তাঁর প্রধান সেনাধ্যক্ষ বাহাদুর কাম্বুর নেতৃত্বে একটি সেনাদল পাঠান মাকসুদাবাদ (মুর্শিদাবাদ) এর দিকে, লক্ষ্য ছিল তাদের সেখানকার উপনিবেশ দখলে নেয়া এবং আরেকটি সেনাদল তাঁর নিজ পুত্র ইনায়েতুল্লাহ খানের নেতৃত্বে হিজলীর জমিদারকে বিতাড়নের জন্য বর্ধমানের দিকে প্রেরণ করেন। একই সময়ে ছয়শ'রও বেশি রণতরীর একটি বহর খাজা শের এবং মাসুম খান (মুসা খানের পুত্র এবং ঈশা খানের নাতি) এর নেতৃত্বে ঢাকা থেকে হুগলীর দিকে রওয়ানা করার নির্দেশ দেন। ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের মাঝামাঝি রণতরীর বহরটি বর্তমান কলিকাতার দশ মাইল ভাটিতে সাঙ্করাইল নামক স্থানে হুগলী নদীতে অবস্থান নেয়। এতএব, দুটি সেনাদলই বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদ থেকে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয় এবং হুগলীর একটু আগেই একসাথে মিলিত হয়। তারপর সাঙ্করাইলের নিকট নৌবহরের সঙ্গে

---

৭৮ ম্যানরিক, ২য় খন্ড, ৪০৩-৪০৪, ৪০৭, পরে আরো উলে-খ করা হবে

৭৯ ই ম্যাক ল্যাগান, দ্যা জেসুইটস এন্ড দ্যা গ্রেট মোগল, লন্ডন, ১৯৩২, পৃঃ ১০০-১০১

যোগদান করে। নদীর সবচেয়ে সংকীর্ণ স্থানে নৌকা দিয়ে আড়াআড়িভাবে পুল তৈরী করা হয় এবং নদীর উভয় তীরে কয়েক মাইল পর্যন্ত ট্রেঞ্চ খনন এবং কামান তাক করে গোলান্দাজ বাহিনী বসানো হয়। এভাবে প্রস্তুতি সম্পন্ন করে মোগল বাহিনী ২০শে জুন, ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে হুগলী এসে উপস্থিত হয় এবং ২৪শে জুন শহরতলী দখল করে যুদ্ধের সূত্রপাত করা হয়। এভাবে হঠাৎ করে মোগল বাহিনী এসে উপস্থিত হওয়া এবং মোগল বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করে পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যার সমাধানের জন্য আলাপ-আলোচনা শুরু করে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ক্যাব্রাল নিজেই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন এবং তিনি শান্তি আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। সংক্ষেপে, মোগলদের অভিযোগ ছিল এই যে, পর্তুগীজরা অস্ত্র শস্ত্র এবং সৈন্য দিয়ে আরাকানীদের বাংলায় হামলা করার জন্য সহায়তা করছে, দাস অথবা খ্রিস্টান বানানোর জন্য নিরীহ লোকদের বলপূর্বক ধরে নিয়ে হুগলীতে আটক করে রাখা হচ্ছে এবং অন্য কথায় পর্তুগীজরা জঘন্য দাস ব্যবসা করছে। এ আলাপ আলোচনা প্রসঙ্গেই মোগলদের হুগলী অবরোধের কারণ এবং লক্ষ্য প্রকাশ পেয়ে যায়। পর্তুগীজরা "৯০জন খ্রিস্টান দাস"কে (যাদেরকে বলপূর্বক ধরে নিয়ে ধর্মান্তরিতকরণ এবং দাসে পরিণত করা হয়েছিল) হস্তান্তর, এক লক্ষ টাকা পরিশোধ এবং আলাপ-আলোচনার এক পর্যায়ে ৪টি জাহাজ হস্তান্তর করে মোগলদেরকে শান্ত করতে চেয়েছিল। তবে হুগলীর পর্তুগীজদের ঘর-বাড়ীগুলোতে আরো ঐ ধরণের দাসকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে কিনা- তা তল্লাশী করে দেখার জন্য পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করার মোগলদের দাবি (মানতে) অস্বীকার করার কারণেই পর্তুগীজদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ভেঙ্গে যায়। ক্যাব্রাল লিখেছেন যে, মোগলরা প্রধানতঃ ঢাকা থেকে বন্দুক কামান এবং সৈন্য আনার জন্য সময় নিতেই আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যায়।[৮০] কিন্তু মনে হচ্ছে পর্তুগীজরাও আরাকান এবং গোয়ায় অবস্থানরত তাদের স্বদেশীয় লোকদের পক্ষ থেকে সাহায্য পাওয়ার জন্য সমভাবেই আগ্রহী ছিলেন।[৮১] কিন্তু এ ধরণের কোন সাহায্য আসেনি, কারণ গোয়ার পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের নিকট তখন বাংলায় অভিযান প্রেরণ করার মত যথেষ্ট জাহাজ এবং অর্থও ছিল না; আর আরাকানের পর্তুগীজরা নিজেরাই তখন আরাকানের শাসকের সঙ্গে এক সশস্ত্র সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিল। মনে হচ্ছে যে, কাশিম খান হুগলী দখল করার জন্য তখন এক চমৎকার সময় বাছাই করেছিলেন।

---

৮০ · ম্যানরিক. ২য় খন্ড. পৃঃ ৪০৭
৮১ দেখুন এ.এস. ১ম খন্ড. পৃঃ ৫০০

হুগলী অবরোধ প্রায় তিন মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, যদিও মাঝে মাঝে শান্তি আলোচনা ও গোলাগুলি চলত। মোগল সূত্র অনুযায়ী তখন হুগলীর দূর্গে পর্তুগীজদের প্রায় ৭০০০ পদাতিক ও গোলন্দাজ সৈন্য ছিল।[৮২] তাছাড়া ছিল শহরের প্রান্ত সীমায় বসবাসকারী তাদের মিত্র, সাহায্যকারী খ্রিস্টান এবং দাসেরা। এসব লোকই পর্তুগীজদের রণতরীতে কাজ করত। তাদের জন্য রসদ সরবরাহ এবং ট্রেঞ্চ খনন ইত্যাদি কাজ করত। মোগল সেনাপতি পর্তুগীজদের এসব স্থান, বিশেষ করে হুগলীর উত্তর দিকে বালী দখল করে তাদের জন্য সাহায্য-সহযোগীতা ও রসদ সরবরাহের পথ বন্ধ করে দেন। তাছাড়া তাদের প্রায় ৪০০০ নাবিক ও মাঝি মাল্লার পরিবারকে বন্দী করেন। ফলে, এসব লোক বাধ্য হয়ে পর্তুগীজদের পক্ষ ত্যাগ করে এবং মোগলদের পক্ষ অবলম্বন করে। ১৬৩২ সালের আগস্টের শুরুতেই ঢাকা এবং অন্যান্য স্থান হতে মোগলদের কামান বন্দুক এসে পৌঁছে। এ সময় মার্টিন এ্যাফোনসো-ডি-মেলো নামক একজন পর্তুগীজ যার ব্যক্তিগত বিবাদ ছিল হুগলীর পর্তুগীজদের সঙ্গে, মোগলদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং হুগলীর অবরোধ কাজে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে। পর্তুগীজদের অবস্থান ক্রমান্বয়ে অসহনীয় হয়ে ওঠে। অবশেষে ২৪ শে সেপ্টেম্বর তারা শহর ত্যাগ করে ও নৌকায় আরোহন করে নদীর আরো ভাটিতে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে। তাদের এ পলায়নের প্রচেষ্টা বিপর্যয় সৃষ্টি করে। কারণ তীরে বসানো মোগলদের কামানের গোলার আঘাতে অধিকাংশ নৌকা ডুবে যায় এবং তাদের বিপুল সংখ্যক লোক নিহত হয়। আর রেহাই প্রাপ্ত খ্রিস্টান ও দাসদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০০০ এবং তারা নদীর মোহনায় সাওগর দ্বীপে পৌঁছতে সক্ষম হয়। মোগল সূত্র অনুযায়ী, অবরোধ কালে তাদের এক হাজার সৈন্য ক্ষয় হয়, আর "শত্রুদের দশ হাজার-নারী পুরুষ, বৃদ্ধ এবং যুবক নিহত হয়, ডুবে মরে অথবা অগ্নিদগ্ধ হয়" এবং ৪,৪০০ জনকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়।[৮৩] পরবর্তী বৎসর শেষোক্তদের মধ্যে ৪০০ জনকে সম্রাটের সামনে হাজির করা হয় এবং তাদের জন্য হয় ইসলাম গ্রহণ নতুবা কারারুদ্ধ হয়ে থাকার বিকল্প প্রস্তাব দেয়া হয়। বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ধর্মান্তরে রাজী হয় এবং অবশিষ্টরা কারাবাসকেই অগ্রাধিকার দেয়।[৮৪]

এভাবে পর্তুগীজদের দাস ব্যবসা এবং বলপূর্বক ধর্মান্তর করার ঘাঁটি হুগলীর পতন হয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, দেশ থেকে তাদের পুরোপুরি বহিস্কার বা তাদের নিয়মিত ব্যবসা বন্ধ করে দেয়া হয়। বাস্তবে অল্প দিন পরেই তাদেরকে হুগলীতে ফিরে আসা এবং শান্তিপূর্ণভাবে বাণিজ্য এবং ধর্ম প্রচার করার অনুমতি

---

৮২ ঐ. পৃঃ ৪৯৯-৫০০. বি.এন. খন্ড ১ম. পৃঃ ৪৩৭
৮৩ বি.এন. ১ম খন্ড. পৃঃ ৪৩৯. এ.এস. ১ম খন্ড. পৃঃ ৫০১
৮৪ বি.এন. ১ম খন্ড. পৃঃ ৪৩৯

দেয়া হয়; তবে তারা আর কখনো এটাকে তাদের অনিয়মিত কাজ কারবারের ঘাটি হিসেবে ব্যবহার করতে পারেনি। মোগলদের হুগলী দখল আরাকানের শাসক এবং আরাকান ভিত্তিক পর্তুগীজ জলদস্যুদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহায্যের উৎস থেকে বঞ্চিত করে। এরপর হুগলী থেকে পিছনের দিক দিয়ে এসে পর্তুগীজদের দ্বারা হয়রানি হওয়ার ভয় থেকে মুক্ত হয়ে মোগলরা আরাকান-ভিত্তিক পর্তুগীজ জলদস্যুদেরকে মোকাবেলা করার সুযোগ পায়। বাস্তবিকপক্ষে, হুগলী দখল চট্টগ্রামের মগ এবং ফিরিঙ্গী জলদস্যুদের দমন করার জন্য একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বলে প্রমাণিত হয় এবং পরবর্তী সময়ে আওরঙ্গজেবের শাসনামলে আরাকানীদের হাত থেকে এ স্থানটি পুনঃদখল করাও সম্ভব হয়। একটু পরেই যার বিবরণ প্রদান করা হবে।

২. আযম খান (১০৪২-১০৪৫ হিঃ /১৬৩২-১৬৩৫ খ্রিঃ) এবং ইসলাম খান মাশহাদীর (১০৪৫-১০৪৯ হিঃ /১৬৩৫-১৬৩৯ খ্রিঃ)

সুবাদারী এবং আসাম ও আরাকানের সাথে সংঘর্ষ

হুগলী অধিকারের অল্পকাল পরেই দ্বিতীয় কাশিম খান ইন্তিকাল করেন। তারপর আযম খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন ইরাকের একজন অধিবাসী এবং তাঁর প্রকৃত নাম ছিল মীর মুহাম্মদ বাকির। তিনি জাহাঙ্গীরের শাসনামলে ভারতে আসেন এবং সম্রাট তাঁর গুণের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রথমে রাজকীয় খান-ই-সামান, পরে কাশ্মীরের সুবাদার এবং সর্বশেষে মীর বখশী হিসেবে নিয়োগ দেন। শাহজাহান তাঁর পদমর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং তাকে উযির বা প্রধান দিওয়ান নিযুক্ত এবং আযম খান উপাধিতে ভূষিত করেন। প্রথম তাঁকে ইরাদাত খান উপাধি দেয়া হয়েছিল।[৮৫] আযম খানের সুবাদারীর তিন বৎসর (১০৪২-১০৪৫ হিঃ/১৬৩২-১৬৩৫ খ্রিঃ) ছিল শান্ত, কোন ঘটনাবিহীন। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি বাংলায় "একদল উত্তম মানুষ" সংগ্রহ করেছিলেন এবং এদের অধিকাংশই ছিলেন পারস্যের লোক।[৮৬]

১০৪৫ হিঃ/১৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর স্থলে ইসলাম খান মাশহাদীকে বাংলার সুবাদার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়, কারণ রিয়াদে উল্লেখ রয়েছে যে, তাঁর সময় বাংলার প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল এবং আসামীরা সীমান্তবর্তী পরগনাগুলোতে হানা দেয়া শুরু করেছিল।[৮৭]

---

৮৫ এম.ইউ. ১ম খন্ড, অনূদিত, পৃঃ ৩১৫-৩১৯
৮৬ ঐ, পৃঃ ৩১৮
৮৭ রিয়াদ, পৃঃ ২১১

ইসলাম খান মাশহাদীর আসল নাম ছিল মীর আবদুস সালাম। সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক তাঁকে ইসলাম খান উপাধি দেয়া হয়। বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে ইসলাম খান মাশহাদী গুজরাটের গবর্ণরসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[৮৮] বাংলায় তাঁর সুবাদারী আসাম এবং আরাকানের সঙ্গে সংঘর্ষের জন্য সুবিদিত।

(ক) আসামের সাথে সংঘর্ষ

"শাহজাহানের শাসনকালে আসামের সঙ্গে যে যুদ্ধ, তা কোন সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণ নীতির ফলশ্রুতি ছিলনা। আসামের রাজার উচ্চাভিলাসী নীতির বিরুদ্ধে কামরূপ জেলার নিরাপত্তা বিধানের জন্য মোগলরা এ যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল।"[৮৯] সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বের প্রথম দিকে আসাম রাজ সুসেংফা ওরফে প্রতাপ সিং (১৬০৩-১৬৪১ খ্রিঃ) মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত কামরূপ জেলার দিকে সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করেছিলেন। সুবাদার দ্বিতীয় ইসলাম খানের সময় হুগলীর পর্তুগীজদের সঙ্গে মোগলদের জড়িয়ে পড়া এবং আযম খানের সুবাদারীর সময় উত্তর-পূর্ব সীমান্তের দিকে নজরদারীর শিথিলতায় সুসেংফা নিঃসন্দেহে উৎসাহিত হয়েছিলেন। মোগলদের নিকট আত্মসমর্পণকারী কামরূপের পরীক্ষিত নারায়ণের ভাই বালি নারায়ণকে আসামের রাজা একজন অধীনস্থ শাসক হিসেবে দাড়াং এ নিয়োগ দেন এবং মোগল কর্তৃপক্ষকে হয়রানী করার জন্য কামরূপে হামলা করতে তাকে উস্কানী দেন। কামরূপের রাজস্ব খেলাপী সন্তোষ লস্কর এবং জয় রাম আসামে পালিয়ে গেলে সুসেংফা তাদেরকে আশ্রয় দেন। তবে আশু কারণ ছিল কামরূপের থানাদার হিসেবে নিয়োজিত রাজা ছত্রজিতের বিশ্বাসঘাতকতা। তিনি বালি নারায়ণকে আকস্মিকভাবে মোগলদের সদর দপ্তর হাজো আক্রমণ করার জন্য গোপনে উৎসাহ যোগান। তদানুযায়ী ১০৪৭ হিঃ /১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে বালি নারায়ণ অহোমী এবং কোচীদের নিয়ে এক বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করে হাজো আক্রমণ করেন।[৯০] তথাকার মোগল ফৌজদার আবদুস সালাম এই আকস্মিক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না এবং তিনি আরো সৈন্যের জন্য সুবাদারের নিকট আবেদন জানান। ইসলাম খান বাছাই করা একদল মনসবদার (অফিসার) যথা- শেখ মুহিউদ্দীন, (আবদুস সালামের ভ্রাতা), মুহাম্মদ সালিহ কামবূহ, মির্যা মুহাম্মদ বুখারী এবং জয়নাল আবেদীনকে আসামীদের হামলা

---

৮৮ এম.ইউ. ১ম খন্ড. অনুদিত. পৃঃ ৬৯৪-৬৯৬
৮৯ জে.এন. সরকার. এইচ.বি. ২য় খন্ড: পৃঃ ৩২৮
৯০ ঐ

মোকাবেলা করার জন্য প্রচুরসংখ্যক সৈন্য ও রণ-তরীসহ প্রেরণ করেন। কিন্তু এই সৈন্যদল যখন হাজো পৌঁছে তখন আসামীরা ছত্রজিত যে স্থানের দায়িত্বে ছিলেন, সে পান্ডুর উপরই মূল চাপ প্রয়োগ করে। ছত্রজিত কোনরূপ প্রতিরোধ না করে পশ্চাদপসারণ করেন এবং এভাবে চক্রান্তমূলকভাবে আসামীদের হাতে ঐ স্থানের পতন ঘটান। এই অবস্থায় আবদুস সালাম প্রধান সেনাদল নিয়ে হাজোতেই অবস্থান করেন এবং পান্ডু এলাকায় আসামীদের আক্রমণ করার জন্য জয়নাল আবেদীন এবং মুহাম্মদ সালিহ কামবূহের নেতৃত্বে আরেকদল সৈন্য প্রেরণ করেন। জয়নাল আবেদীন এবং মুহাম্মদ সালিহ কামবূহ আসামীদের পরাজিত করেন এবং তাদেরকে সীমান্ত দুর্গ শ্রীঘাটে বিতাড়িত করেন।

এই পর্যায়ে মনে হয়, আবদুস সালাম কৌশলগত একটি ভুল করে বসেন। তিনি নৌ ও স্থলবাহিনীকে সালিহ কামবূহ, রাজা ছত্রজিত এবং মজলিস বায়েজিদের অধীনে শ্রীঘাটে রেখে জয়নাল আবেদীনকে হাজোতে চলে আসতে নির্দেশ দেন। জয়নাল আবেদীন শ্রীঘাট ত্যাগ করে চলে আসার পর আসামীরা পুনরায় হামলা শুরু করে এবং সেখানে এক যুদ্ধে মোগল বাহিনীকে পরাজিত করে। মুহাম্মদ সালিহকে হত্যা করে এবং যুদ্ধবন্দী হিসেবে মজলিশ বায়োজিদকে নিয়ে যায়।[৯১] এ বিপর্যয়ের প্রধান কারণ হচ্ছে ছত্রজিতের বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণ এবং এখন তিনি প্রকাশ্য আসামীদের পক্ষে যোগদান করেন এবং সঙ্গে করে কয়েক জাহাজ ভর্তি অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে যান।[৯২] এ সাফল্যের পর বালি নারায়ণ তার আসামী এবং কোচ সৈন্যদের নিয়ে অগ্রসর হয় এবং হাজো অবরোধ করেন। মোগলরা আসামীদের প্রতিরোধ করা অসম্ভব বলে দেখতে পায়। জয়নাল আবেদীন যুদ্ধে নিহত হন এবং আবদুস সালাম এবং তার ভাই আত্মসমর্পণের শর্ত নিয়ে আলোচনা করার জন্য আসামীদের শিবিরে যান। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদেরকে বন্দী করা হয় এবং বন্দী হিসেবে আসাম রাজ দরবারেও প্রেরণ করা হয়।[৯৩] হাজো এবার বালি নারায়ণের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়, তবে শীঘ্রই সুবাদারের ভাই মীর জয়েনুদ্দীন আলীর নেতৃত্বে আরো সৈন্য প্রেরণ করা হয়; তাঁকে সহায়তা করার জন্য আল্লাহ ইয়ার খান, মুহাম্মদ জামাল তেহরাণী এবং অন্যান্য মনসবদারদেরকে (অফিসারদেরকে) প্রেরণ করা হয়। সেনাবাহিনীর সমর্থনে মাসুম খানের নেতৃত্বে নৌ-তরীর একটি শক্তিশালী বহরও প্রেরণ করা হয়। এই সেনাবাহিনী ব্রহ্মপুত্র নদী দিয়ে অগ্রসর হয় এবং পরীক্ষিত

---

৯১ বি.এন. ২য় খন্ড. পৃঃ ৭৬
৯২ ঐ
৯৩ বি.এন. ২য় খন্ড. পৃঃ ৭৭

নারায়ণের বিদ্রোহী ভ্রাতা চন্দ্র নারায়ণকে পরাজিত করে ব্রক্ষ্মপুত্রের উত্তর পাড়ের কারিবারি প্রথম পুনরুদ্ধার করা হয়, আর চন্দ্র নারায়ণ আসামে পালিয়ে যায়।[৯৪] পরবর্তী পর্যায়ে দক্ষিণকূল বা নদীর দক্ষিণ পাড়ের অঞ্চলসমূহ পুনরুদ্ধার করে, তারপর ধুবরীর দিকে অগ্রসর হয় এবং সেখান থেকে ছত্রজিতকে বন্দী করা হয়। বিশ্বাসঘাতককে ঢাকায় প্রেরণ করা হয় এবং সেখানেই তাকে শিরোচ্ছেদ করা হয়।[৯৫] আসামীরা পরে গোয়াল পাড়ার নিকটবর্তী জোগীগোফায় অবস্থান গ্রহণ করে এবং সেখানেও তাদেরকে বিপুল ক্ষয়ক্ষতিসহ পরাজিত করা হয়; তাই তারা বানাস নদীর অপর পাড়ে পশ্চাদপসারণ করতে বাধ্য হয়।[৯৬] এ সময় চন্দ্র নারায়ণ গুটি বসন্তে মারা যান। তার মৃত্যু এবং ছত্রজিতের শিরোচ্ছেদ আসামীদের অবস্থানকে ভীষণ দূর্বল করে দেয়। তথাপি সুসেংফার জামাতা বালি নারায়ণের অধিনায়কত্বে ২০০০০ আসামী সৈন্যের সাহায্য নিয়ে কালাপানি নদীর ধারে মোগলদের বিরুদ্ধে তারা সর্বশেষ প্রতিরোধ গড়ে তোলেন; কিন্তু সেখানে ১৩৩৭ খ্রিস্টাব্দের ৩রা অক্টোবর তিনি চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন। যুদ্ধে প্রায় ৪০০০ আসামী সৈন্য, কয়েকজন সেনাধ্যক্ষ এবং আসাম রাজার জামাতা নিহত হন। বালি নারায়ণ দাড়াং এ পশ্চাদপসারণ করেন, আর তার সেনাবাহিনীর একাংশ শ্রীঘাট এবং পান্ডুতে আশ্রয় নেয়। মোগলরা অবশ্য বিজয়ের পরে দ্রুত শত্রুদের পশ্চাদধাবন করে এবং ১৬৩৭ সালের ডিসেম্বরে আসামীদেরও শ্রীঘাট এবং পান্ডু থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়। আসামিদের ৫০০ রণতরী এবং প্রায় ৩০০ কামান মোগলদের হস্তগত হয়।[৯৭] মোগল বাহিনী পরে বালি নারায়ণকে খুঁজে বের করার জন্য দাড়াং পর্যন্ত অগ্রসর হয়; আর তিনি আসামে পালিয়ে যান এবং সেখানে তার মৃত্যু পর্যন্ত ভীষণ দুঃখ কষ্টের মধ্যে একজন পলাতক ব্যক্তির মত জীবন যাপন করেন। দাড়াংকে মোগলরা তাদের সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেয়।

বালি নারায়ণের আসামে পলায়ন এবং দাড়াংকে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসামের সঙ্গে মোগলদের দ্বিতীয় যুদ্ধের বাস্তব পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৬৩৮-১৬৩৯ সালে আলাপ-আলোচনার দ্বারা একটি আপোষ-রফার মাধ্যমে তাদের মধ্যকার শত্রুতার আনুষ্ঠানিক অবসান হয় এবং বারনদীকে উত্তর এবং আশুরালীকে মোগল সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমানা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়।

---

৯৪. ঐ পৃঃ ৭৭-৭৮
৯৫. ঐ - পৃঃ ৭৯
৯৬.. বি.এন. ২য় খন্ড, পৃঃ ৮০-৮১
৯৭. বি.এন. ২য় খন্ড, পৃঃ ৮৮

গৌহাটিকে মোগলদের সদর দপ্তর হিসেবে বাছাই করা হয়। শাহজাহানের অবশিষ্ট শাসনামলে অহোম্মদের সঙ্গে আর কোন বিবাদ বাধেনি, তবে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সীমান্ত সমস্যা নিয়ে মাঝে মধ্যে দু'দেশের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছে।

(খ) আরাকানের সাথে গোলযোগ

আসামের সহিত সংঘর্ষের সমাপ্তির দিকে হঠাৎ এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, তা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আরাকানের সহিত শত্রুতা শুরু হয়ে যাওয়ার মত হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের রাজা থিরি থুধাম্মার মৃত্যু হয় এবং তার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত রাণীর একজন প্রেমিক কর্মচারী তাঁর সিংহাসন জবর দখল করেন এবং নরপতি উপাধি ধারণ করেন। এতে পরলোকগত রাজার ভ্রাতা এবং চট্টগ্রামের গবর্ণর মাটক রায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং জবর দখলকারীকে অপসারণ করতে চেষ্টা করেন। তবে মাটক রায়ের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কারণ তার প্রয়োজনীয় নৌ-শক্তি ছিলনা এবং পরিণতিতে তিনি ভুলুয়ার (নোয়াখালীর) মোগল থানাদারের নিকট আশ্রয় চাইতে বাধ্য হন। ইসলাম খান মাশহাদী ভুলুয়া এবং জাগাদিয়ার থানাদারকে আরাকানের পলাতক রাজপুত্রকে সহায়তা করার জন্য নির্দেশ দেন। তিনি যখন ভুলুয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন আরাকানের ২০০ নৌ-তরীর একটি বহর ফেনী নদী পর্যন্ত তাকে ধাওয়া করে এবং তাকে ফেনী নদী পার হওয়ায় বাধা দিতে চেষ্ট করে। মোগল থানাদারেরা অব্যাহতভাবে কামান দাগিয়ে আরাকানী নৌ-বহরকে তাড়িয়ে দেয় এবং মাটক রায়কে নিরাপদে ফেনী নদী পার হওয়া এবং তার পরিবার ও প্রায় ৯০০০ আরাকানী অনুসারী নিয়ে জাহাঙ্গীর নগরে পৌঁছার সুযোগ করে দেয়।[৯৮] ইসলাম খান তাকে এবং অন্যান্য পলাতকদের ঢাকায় অবস্থান করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দেন।[৯৯]

নরপতি অবশ্য মাটক রায়কে ধরার জন্য প্রচেষ্টা ত্যাগ করেননি এবং বাংলার বিরুদ্ধে একটি পূর্ণ নৌ-অভিযানের জন্য ৬৫০টিরও বেশি বিভিন্ন ধরণের রণতরীর একটি বিরাট বহর সজ্জিত করেন। ইসলাম খান ঢাকা থেকে সেনাবাহিনী প্রেরণ এবং মেঘনা নদীর মোহনায় নৌ-বাহিনী মোতায়েন করে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এই হুমকী মোকাবেলা করেন। যদিও আরাকানী বাহিনী নদীর মোহনায় প্রবেশ করেছিল, কিন্তু আর সামনে অগ্রসর হতে সাহস করেনি এবং দ্রুত পশ্চাদপসারণ করে।[১০০]

---

৯৮ বি.এন. ২য় খন্ড. পৃঃ ১১৮

৯৯ ঐ পৃঃ ১২০

১০০ বি.এন. ২য় খন্ড. পৃঃ ১২১

আরাকানীদের গৃহ বিবাদের জের বাংলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ফল বয়ে আনে। চট্টগ্রামের পর্তুগীজ উপনিবেশকারীরা মাটক রায়ের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। তাই তারা নরপতির প্রতিহিংসা থেকে বাঁচার জন্য চট্টগ্রাম পরিত্যাগ করে এবং উপমহাদেশের অন্যান্য স্থানের পর্তুগীজ বস্তিগুলোতে চলে যায়। তাদের কেহ কেহ বাংলায় মোগলদের নিকটও আশ্রয় গ্রহণ করে। বাংলার প্রায় ১২০০০ লোক যাদেরকে ফিরিঙ্গীরা বলপূর্বক দাসে পরিণত করেছিল, তারা মুক্তি পায় এবং তাদের বাড়ী ঘরে ফিরে আসে।[১০১] চট্টগ্রাম থেকে পর্তুগীজরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ায় আরো দু'দিক দিয়ে সুফল লাভ হয়। বাংলার ভাটি অঞ্চলে নিরাপদে জলদস্যুতা করার জন্য সাময়িকভাবে হলেও ঐ অঞ্চল তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। তাই পরবর্তীকালে শাহজাদা শুজার সুবাদারীর সময় তাদের উৎপাত উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। দ্বিতীয়তঃ এতে আরাকান রাজের আক্রমণাত্মক ক্ষমতাও হ্রাস পায়। কারণ "ফিরিঙ্গীদের" পক্ষ হতে তিনি আর কোন নৌ-সাহায্য সহযোগিতাও পাচ্ছিলেন না। যদিও পরবর্তী সময়ে কিছু সংখ্যক পর্তুগীজ চট্টগ্রামে ফিরে আসে। কিন্তু পূর্বের ন্যায় আর কখনো মগ-ফিরিঙ্গী সখ্যতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাদের মধ্যকার সম্পর্কের এই ফাটলকে আওরঙ্গজেবের সুবাদার শায়েস্তা খান ভালভাবেই কাজে লাগিয়েছিলেন। তিনি চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গীদেরকে তার পক্ষে টেনে নেন এবং ২৮বৎসর পর আরাকানীদের হাত থেকে চট্টগ্রাম জয় করেন। এসব দিক থেকেই মাটক রায়ের ঘটনা ছিল ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে হুগলী জয়ের পরিপূরক মাত্র।

]

৩. বাংলার সুবাদার হিসেবে শাহজাদা শুজা

মাটক রায়ের ঘটনা এবং আসাম যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পরই প্রধান মন্ত্রীর (Wazir-i-Diwan-i-Ala) পদ গ্রহণ করার জন্য ইসলাম খান মাশহাদীকে দিল্লিতে ডেকে পাঠান। শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহাজাদা শুজাকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করা হয়। যেহেতু শাহজাদা তখন কাবুলে ছিলেন, তাই তার না পৌঁছা পর্যন্ত বিহারের গভর্ণর সাইফ খানকে বাংলার শাসন পরিচালনার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। তিনি সম্রাটের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং বিয়ে করেছিলেন সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের বোন এবং আসফ খানের কন্যা মালিকা বানুকে। সাইফ খান ১০৪৯ হিঃ/১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় ইন্তিকাল করেন এবং পরের বৎসর তার স্ত্রীও সেখানে মারা যান।

---

১০১ ঐ পৃঃ ১১৯

শাহাজাদা শুজা ১০৪৯ থেকে ১০৭০ হিঃ (১৬৩৯-১৬৬০ খ্রিঃ) সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২১ বৎসর বাংলার সুবাদার ছিলেন। এ সময়ের মধ্যে মাত্র দু'বার ১৬৪৭ সালের মার্চ থেকে ১৬৪৮ সালের মার্চ এবং ১৬৫২ সালের মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উত্তর পশ্চিম সীমান্তে অভিযান পরিচালনা উপলক্ষে তার পিতাকে সাহায্য করার জন্য তিনি বাংলা ত্যাগ করেছিলেন। একজন শাহজাদাকে এই পূর্ব সীমান্তের প্রদেশটিতে সুবাদার নিয়োগ করা থেকে বুঝা যায় যে, সম্রাট এ প্রদেশের কার্যক্রম এবং সুশাসনের উপর খুব গুরুত্ব দিতেন। শাহাজাদা শুজার সুবাদারীর দীর্ঘ সময়ে বাংলার জীবন যাত্রার সর্ব পর্যায়েই শান্তি ও অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়।

বাংলায় এসে শাহাজাদা শুজা ঢাকার পরিবর্তে রাজমহলকে তাঁর সদর দপ্তরে পরিণত এবং ঢাকায় তাঁর একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। তাঁর এই পদক্ষেপের পিছনে বিহারের নিকটবর্তী অপেক্ষাকৃত কোন শুস্ক স্থানে তাঁর বসবাস করার ইচ্ছা ছিল একদিকে, অন্যদিকে ছিল প্রদেশের সমগ্র অঞ্চলের উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা। আর তখন শুধু পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোতেই নয় বরং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কামরূপও ছিল এ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। সম্ভবতঃ তিনি রাজধানী দিল্লীর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতর সংযোগ রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কারণ এক মতানুসারে বাংলায় তাঁর সুবাদারীর প্রথম দিক থেকেই দিল্লীর সিংহাসনের প্রতি তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতেন।[১০২] সে যাই হোক, রাজমহলে অবস্থানের কারণে তিনি বিদেশী বণিকদের (যথা- ইংরেজ, ওলন্দাজ এবং পর্তুগীজদের) উপর নিকটতর স্থানে থেকে নজর রাখতে পারতেন; তারা তাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করতেন প্রধানতঃ হুগলী বন্দর থেকে এবং পাটনা (বিহার) থেকে রাজমহল এবং মাকসুদাবাদের (মুর্শিদাবাদের) মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদী পথে। নতুন রাজধানী তাঁর জন্য বিশেষ সুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়, যখন ১৬৪২ সালে উড়িষ্যাকেও তাঁর নিয়ন্ত্রণে দেয়া হয়। এই অঞ্চলটি এই পর্যন্ত একজন স্বতন্ত্র গভর্ণরের শাসনাধীন ছিল, কিন্তু এর প্রশাসন মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। বিশেষ করে এর প্রাক্তন গভর্ণর শাহনওয়াজ খান প্রদেশের রাজস্ব প্রশাসনকে দারুন অব্যবস্থাপনার মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন। এই দূরাবস্থার প্রতিকার হিসেবে এবং সম্ভবতঃ শাহজাদার অধীনে দিয়ে ঐ সুবাহর মর্যাদা উন্নীত করার জন্য শাহজাহান উড়িষ্যাকে বাংলার সঙ্গে যুক্ত করে দেন। এই নির্দেশ দেয়ার সময় সম্রাট শাহজাদাকে এই বলে উৎসাহিত করেছিলেনঃ "যেহেতু তুমি রাজমহলে বাস করতে পছন্দ কর, তবে

১০২ এফ.আই. ১৬৪২-১৬৪৫. পৃঃ ৫৮-৫৯

তোমাকে তোমার প্রদেশটিতে অফিসিয়ালভাবে পরিদর্শনে যেতে হবে; তুমি রাজমহল থেকে বর্ধমান যাবে এবং সেখান থেকে যাবে মেদিনীপুর। এই শেষোক্ত শহরটি উড়িষ্যা সীমান্তে অবস্থিত; সেখানে তুমি উড়িষ্যা থেকে তোমার যাকে ইচ্ছা, তাকে ডেকে পাঠাবে এবং তাদের থেকে হিসাব এবং প্রদেশ সম্পর্কে প্রতিবেদন নিবে। মেদিনীপুর থেকে তুমি যাবে জাহানাবাদ (হুগলীর আধুনিক আরামবাগ), সেখান থেকে সপ্তগ্রাম-হুগলী, মাকসুদাবাদ এবং শেষে রাজমহলে প্রত্যাবর্তন করবে। এটা তোমাকে দেশের অবস্থা ও জনগণ সম্পর্কে জানতে সহায়তা করবে; আর শিকারের আনন্দ এবং যাতায়াতের পথে মনোহর দৃশ্যাবলী তো আছেই।"[১০৩] শাহজাদা এই আদেশ পালন করেন এবং উড়িষ্যার জন্য একজন নায়েব সুবাদার নিয়োগ দেন। প্রশাসনিক এই পুনর্বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশব্যাপী উপযুক্ত আর্থিক সংস্কার করা হয়। শুজার সুবাদারীর শেষভাগে "বাংলার জন্য একটি নতুন খাজনার তালিকা প্রস্তুত করা হয়। এতে দেখা যায় যে, আবওয়াব ব্যতীত খলিসা জায়গীর ভূমির উপর মোট রাজস্ব হচ্ছে ১৩,১১৫,৯০৭ টাকা এবং সরকারের সংখ্যা ৩৪ এবং মহালের সংখ্যা ১৩৫০টি।"[১০৪] সম্রাটের নিকট প্রেরিত এক পত্রে শুজা নিজেই তাঁর প্রশাসনিক সাফল্য সম্পর্কে লিখেছেন, "আমি এই অঞ্চলের দায়িত্ব গ্রহণের পরে দেশের উন্নতির জন্য যে পরিশ্রম করেছি, তার লিখিত প্রতিবেদন আপনাকে দেয়া হয়েছে। আমি আশা করি পাটনা সুবাহও আমাকে দেয়া হবে। মোরাং এবং কাছারের প্রধানগণ, যারা আমার পূর্ববর্তী বাংলার কোন শাসককেই কোন কর দেননি, তারা সকলেই এখন আনুগত্য ও সদাচারের ঘোষণা দিয়ে অনুগতদের মতই আচরণ করছেন। তারা কিছু সংখ্যক হাতি উপঢৌকন দিয়েছেন, যা দরবারে পাঠিয়ে দেয়া হল।"[১০৫] শুজা দেশের কৃষির উন্নতির জন্য সমভাবে দৃষ্টি রাখতেন। একই পত্রে শুজা আরো লিখেছেন, "যেহেতু কৃষির উন্নতি এবং জনসাধারণের সুখই জাহাপনার চিন্তার বিশেষ লক্ষ্য, তাই আমি এই দীর্ঘ সময়ব্যাপী কৃষির উন্নতি এবং পতিত ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য অনেক পরিশ্রম করেছি এবং এই পরিশ্রমও প্রচেষ্টার চিহ্ন উভয় সুবাহতেই প্রতিদিন পরিলক্ষিত হচ্ছে।"[১০৬] বিহার প্রদেশটি তাঁকে প্রদান করার জন্য শুজা পুনরায় তাঁর পিতাকে অনুরোধ করেন এবং তাঁর আবেদনে বলেন যে, বাংলায় তাঁর সন্তানদের স্বাস্থ্য

---

১০৩. এইচ.বি. তে উদ্ধৃত, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৩৪
১০৪. রিয়াদে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২১৩, টীকা-১
১০৫. শুজার পত্র(ফায়াদ-আল-কাওয়ানীস) আই ও এল এম এস এস ৩৯০১ আই এইচ আরসিতে অনুদিত, ১৯২৮, পৃঃ ১৩৯-৪০ এবং কে.এম. করিম কর্তৃক উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩২।
১০৬. শুজার পত্র, পূর্বোক্ত----

ভাল যাচ্ছে না। তাই তাঁকে প্রদেশটি দেয়া হলে তিনি তাঁর অল্প বয়স্ক সন্তানদেরকে অধিক স্বাস্থ্যকর স্থান পাটনায় রেখে তিনি "সুবাহগুলোর শাসন কাজে আত্মনিয়োগ করবেন।"[১০৭] আত্ম-প্রশান্তিমূলক হলেও শুজাকে তাঁর উপর ন্যস্ত প্রদেশগুলোর প্রশাসনিক অগ্রগতি সম্পর্কে মাঝে মধ্যে সম্রাটকে লিখে জানাতে হত। এই পত্র থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, শুজা প্রশাসনিক ব্যাপারে পূর্ণ সক্রিয় থাকতেন। বিশেষ করে বিহার প্রদেশের শাসনভার তাঁকে প্রদান করতে তাঁর পিতাকে সম্মত করতে তিনি তাঁর নিজ উপযুক্ততা ও সামর্থ সম্পর্কে পিতার মনে সুধারণা সৃষ্টি করতে চাইতেন। যদিও বিহার প্রদেশের শাসন ভার পাওয়ার পিছনে শুজা তাঁর সন্তানদের স্বাস্থের যুক্তি পেশ করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে উত্তরাধিকার যুদ্ধে তাঁর ভূমিকা দেখে এইরূপ ধরে নেয়া যুক্তিসঙ্গত যে, আসলে তিনি বিহার প্রদেশ পেয়ে নিজের অবস্থানকে আরো শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন। তবে প্রশাসনিক কাজে শুজা অমনোযোগী এবং উদাসীন বলে যে মত রয়েছে[১০৮] তা সতর্কতার সাথে গ্রহণ করতে হবে। আসলে মনে হচ্ছে যে, উত্তরাধিকার নিয়ে সংগ্রামে তাঁর ব্যর্থতা এবং ঐ সংগ্রাম চলাকালীন সময়ে অর্থাৎ যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, তাই হয়ত বাংলার সুবাদার হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব এবং সামর্থ বিচারের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে।

PLATE XVI

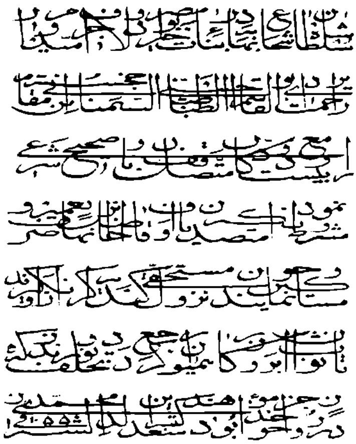

Bara Katra (Dacca) Inscription of the time of Prince Shuja' dated 1055 H. (Reproduced from D'Oyly, *Antiquities of Dacca*, No. 3 London 1825, preserved in the British Museum (press mark 1788 c.3) With the kind permission of the British Library (British Museum) London)

১০৭. ঐ

১০৮. উদাহরণ হিসেবে দ্রষ্টব্য, জে.এন. সরকার হিস্টি অব বেঙ্গল, প্রথম খন্ড, ৯ম অধ্যায়

শুজার সুবাদারীর সময় বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শান্তিপূর্ণভাবে বাণিজ্য করার জন্য পর্তুগীজদেরকে হুগলীতে ফিরে আসার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। এই সময়ে ওলান্দাজ এবং ইংরেজদের ব্যবসারও উন্নতি ঘটে। ১৬৩৩ সালে উড়িষ্যার বালাশোরে প্রথম ইংরেজ কুঠি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬৫০ সালে ইংরেজরা সম্রাট শাহজাহানের নিকট থেকে একটি 'ফরমান' লাভ করে এবং তাতে নির্দেশ দেয়া হয় যে, "যে সকল অফিসার আগ্রা এবং বাংলা এবং আগ্রা ও সুরাটের মধ্যবর্তী রাস্তার দায়িত্বে থাকবেন, সে রাস্তা বুরহানপুর বা আহমদাবাদ, যে দিক দিয়েই যাকনা কেন- তারা ইংরেজদেরকে সুরাট, ব্রোচ বা লাহরী বন্দরে স্বাভাবিক শুল্ক দেয়ার পরে আর অতিরিক্ত কোন কিছু দাবি করে তাদেরকে (ইংরেজদেরকে) হয়রানী করতে পারবে না।"[১০৯] ইংরেজ 'কুঠি'র দলিল পত্রের সম্পাদক স্বীকার করেছেন[১১০] যে, এই ফরমানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, বুরহানপুর বা আহমদাবাদ হয়ে রপ্তানীর জন্য ভারতের পশ্চিম উপকূলের দিকে প্রেরিত পণ্যের উপর অভ্যন্তরীণ চলাচল কর প্রদান থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দেয়া। এই ফরমান সুরাট, ব্রোচ বা পশ্চিম উপকূলের বন্দরসমূহে আরোপযোগ্য স্বাভাবিক শুল্ক বিলোপ করেনি বা এই শর্ত বাংলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা তখনও বাংলায় কোম্পানীর কোন কুঠি ছিল না। বাংলায় ইংরেজদের দালালেরা বাণিজ্যিক সুবিধা ভোগের জন্য শুজার নিকট এই ফরমানের বিষয়বস্তুকে দুইভাবে ভুল ব্যাখ্যা করে। শাহজাদা ইংরেজদের মৌখিক কথার উপর বিশ্বাস রেখে তাদেরকে আর মূল ফরমান দেখাতে বলেননি। এটা অবশ্য বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তাঁর গৃহীত নীতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। সে অনুযায়ী তিনি ১০৬১/১৬৫১ সালে ৩০০০ টাকা সালামী নিয়ে তাদেরকে একটি নিশান (permit) দেন, নিশানের ভাষা ছিল নিম্নরূপ:-

"এই মর্মে জাঁহাপনাকে জানানো হয়েছে যে, এক শাহী ফরমানের দ্বারা ইংরেজ কোম্পানীর পণ্য-দ্রব্যকে কর থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু তা স্বত্ত্বেও করের জন্য বালাশোর এবং উড়িষ্যার অন্যান্য বন্দরের শুল্ক কর্মকর্তারা ইংরেজ বণিকদেরকে হয়রানি করেন, তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বাধা সৃষ্টি করেন এবং পথিমধ্যেও তাদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করা হয়। জাঁহাপনা আদেশ দিচ্ছেন যে, বন্দর বা পথিমধ্যে তাদের নিকট হতে কোন কর দাবী করা যাবে না বা অন্য কোন প্রকারেও তাদের জন্য কোন বাধা সৃষ্টি করা যাবে না।"[১১১]

---

১০৯. ই.এফ.আই. ১৬৫৫-১৬৬০, পৃঃ ৪১৪-৪১৫
১১০. ঐ, পৃঃ ১০৯
১১১. ই.এফ. আই. . ১৬৫৫-১৬৬০ পৃঃ ৪১৫

শাহী ফরমান প্রকৃত পক্ষে পশ্চিমাঞ্চলের বন্দর সমূহে ইংরেজ বণিকদের জন্য "সাধারণ শুল্ক" প্রদান আবশ্যক করে দেয় এবং আগের ফরমানটির অর্থ সম্পর্কে ভুল তথ্যের ভিত্তিতে প্রদত্ত ১৬৫১ সালের শুজার নিশান তাদেরকে সকল প্রকার কর থেকেই অব্যাহতি দিয়ে দেয়। ইংরেজদের দালালরা তাদের এই দ্ব্যর্থবোধক অবস্থান সম্পর্কে সজাগ ছিল। কারণ পরবর্তী সুবাদারের সময় বিষয়টি পুনরায় বিবেচনার প্রশ্ন আসায় তারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এবং স্বীকার করে যে, "শুল্ক মওকুফ সম্পর্কে শাহী ফরমানের বরাত দিয়ে কৌশল করে শাহজাদার নিশান আদায় করা হয়। এবং "তথাকথিত সুবিধা মঞ্জুরের বিষয়টি ছিল ভুয়া, ইংরেজদের বলা কথা বিশ্বাস করানোর জন্য প্রতি বৎসরই দেশীয় কর্মচারীদের উৎকোচ প্রদান করা হত।"[১১২] যাহোক, শুজার নিশান বাংলায় ইংরেজদের বাণিজ্যকে দারুনভাবে চাঙ্গা করে তোলে এবং সেই বৎসরই হুগলীতে প্রথম ইংরেজ কুঠি স্থাপিত হয়।

শাহ শুজার অধীনে বাংলায় যথেষ্ট দীর্ঘ সময়ব্যাপী শান্তি বিরাজ করায় কৃষি ও ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি সম্ভব হয়েছিল। একমাত্র তার সুবাদারীর সময়ই বাংলা সবরকম আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও সীমান্ত যুদ্ধ থেকে মুক্ত ছিল। সাময়িক ধরণের মাত্র দুটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এর একটি ছিল হিজলীর জমিদার বাহাদুর শাহর অবাধ্যতা দমন। তিনি ছিলেন ইসলাম খান চিশতী[১১৩] কর্তৃক পরাভূত আফগান সর্দার সালিম খানের ভাতিজা এবং উত্তরাধিকারী। বাহাদুর খান একবার ইব্রাহিম খান ফতেহ জং এর সময় বিদ্রোহ করেছিলেন এবং তিনি তাকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছিলেন এবং তার অপরাধের জন্য তার উপর ৩ লক্ষ টাকা জরিমানা ধার্য করেছিলেন, তবে পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী তাকে তার বাড়ী এবং জমিদারীতে বহাল রাখা হয়েছিল।[১১৪] তিনি উড়িষ্যার মোগল গভর্ণরের অধীনে কাজ করতেন এবং তাকে কর দিতেন। উড়িষ্যা যখন শুজার অধীনে দেয়া হয়, তখন তিনি বাহাদুর খানের খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি করেন। অফিসিয়াল ইতিহাস বেত্তার ভাষ্য অনুযায়ী তিনি কর প্রদানে বিলম্ব করেন। তাই ১৬৫১ সালে শুজা হিজলী বিজয় এবং বাহাদুর খানকে বন্দী করার জন্য তার একজন প্রতিনিধির অধীনে এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন। এই বাহিনী নির্দেশানুযায়ী কাজ করে এবং তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে।[১১৫] অন্য ঘটনাটি হচ্ছে

---

১১২. হল টু ব্রিজ এবং ব্রিজ টু [redacted], ১২ই মে, ১৬৬৯, ই.এফ. আই. ১৬৬৮-১৬৬৯, পৃঃ ২৯৮-২৯৯

১১৩. উপরোক্ত, পৃঃ ৩০২

১১৪. বি.জি. ২য় খন্ড, পৃঃ ৬৩৬-৬৩৭

১১৫. ওয়ারিস.এইচ.বি-তে উদ্ধৃত, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৩৩। আরো দেখুন এ.এস.৩য় পৃঃ১২২

আরাকানীরা বরিশাল জেলার দক্ষিনাঞ্চলে হানা দিলে তাদের বিরুদ্ধে এক সফল নৌ-যুদ্ধে তাদের পরাজিত এবং পশ্চাদপসারণ করতে বাধ্য করা হয়। ভবিষ্যতে আরাকানীদের হামলা মোকাবেলা করার জন্য শুজা আধুনিক বরিশাল শহরের প্রায় ৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ঝালকাঠির নিকটবর্তী শুজাবাদ, ইন্দ্রপাশা এবং রুপাসিয়ায় চক্রাকারে দুর্গ নির্মাণ করান। বরিশাল জেলা ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের সম্পাদক যথার্থই ধরে নিয়েছেন যে, শুজাবাদ শব্দটি শুজার নাম থেকেই গৃহীত হয়েছে।[১১৬] যে সকল আফগান আরাকানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন, তিনি তাদেরকে ৭৭ একর লাখেরাজ (কর বিহীন) সম্পত্তি মঞ্জুরী দিয়েছিলেন।[১১৭]

৪. উত্তরাধিকার যুদ্ধ এবং শুজার জীবনের সমাপ্তি

১০৬৭ হিজরীর শেষ দিক এবং ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শাহজাহান ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই ঘটনা তার চার পুত্র, যথা- দারাশিকো, শুজা, আওরঙ্গজেব এবং মুরাদের মধ্যে উত্তরাধিকারিত্ব নিয়ে এক যুদ্ধের সংকেত দেয়। সবার বড় দারা রাজধানীর কাছে আগ্রাতে ছিলেন, আর অপর পুত্রগণ তাদের পিতার কাছ থেকে অনেক দূরে ছিলেন; তারা ছিলেন যথাক্রমে বাংলা , দাক্ষিণাত্য এবং গুজরাট প্রদেশের গভর্ণর। শাহজাদা এবং আমির ওমরাহগণ ইতিপূর্বেই ব্যক্তিগত এবং ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। সাধারণতঃ ব্যক্তিগত বিশ্বাসের দিক থেকে দারা ছিলেন অধার্মিক, তাই স্বাভাবিকভাবেই যারা তার মত ছিলেন, তারা এবং দরবারের অমুসলমানদের অধিকাংশই তাকে পছন্দ করতেন। বিপরীতক্রমে ধর্মের দৃঢ় বিশ্বাসের জন্য আওরঙ্গজেবের খ্যাতি ছিল এবং এজন্য তিনি অধিকাংশ আমির ওমরাহ এবং সৈন্য বাহিনীর নিকট প্রিয় ছিলেন। শুজা অবশ্য বাংলা ও উড়িষ্যার সুবাদার হিসেবে সাফল্যের পরিচয় দিলেও তাঁর আগের শৌর্যবীর্য এবং দরবারের আমির-ওমরাহদের উপর তাঁর প্রভাব হারিয়ে ফেলেছিলেন। সে যাই হোক, তিনি ব্যক্তিগত গুণাবলী এবং সামরিক কুশলতার দিক দিয়ে দারা এবং আওরঙ্গজেবের চেয়ে অনেক নিম্ন পর্যায়ের ছিলেন। সর্ব কনিষ্ঠ মুরাদ সম্পর্কে খুব বললেও বলতে হয় যে, তিনি ছিলেন মধ্যম যোগ্যতা সম্পন্ন একজন লোক এবং তার জ্যেষ্ঠ তিন ভ্রাতার সঙ্গে মোটেই তুলনীয় নন। অতএব, এই অবস্থায় সিংহাসনের জন্য মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুষ্ঠিত হয় দারা এবং আওরঙ্গজেবের মধ্যে।

---

১১৬. বাকেরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, পৃঃ ১৬
১১৭. ঐ, পৃঃ ১৯

দারার কিছু কাজে সংকট আরো ত্বরান্বিত হয়। পিতা অসুস্থ্য হয়ে পড়ার সাথে সাথে তিনি সরকারের ক্ষমতা করায়ত্ত্ব করেন এবং সম্রাটকে নিজের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য শাহী ধন-ভান্ডারসহ বলপূর্বক তাকে (সফর, ১০৬৮ হিঃ/ নভেম্বর, ১৬৫৮ খ্রিঃ) দিল্লী থেকে আগ্রায় স্থানান্তর করেন। জনসাধারণের দৃষ্টি থেকে সম্রাটকে এভাবে সরিয়ে নেয়ায় এইরূপ গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, সম্রাট আসলে ইন্তিকাল করেছেন। শুজা এবং মুরাদ উভয়ে নিজ নিজ প্রদেশে নিজেদেরকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন এবং তাদের সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। আওরঙ্গজেব আরও সতর্ক ছিলেন, তিনি নিজকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেননি এবং সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাত করার ঘোষিত লক্ষ্য নিয়ে তাঁর সৈন্য-সামন্তসহ উত্তর দিকে অগ্রসর হন, তবে যে কোন বাধা মোকাবেলা করার জন্য তাঁর পূর্ণ প্রস্তুতিও ছিল। দারা তার ভাইদের মধ্যে কাউকেও নিজ পক্ষে টানার চেষ্টা না করে সকলের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ এবং তাদেরকে খতম করার চেষ্ট করেন। এই চিন্তা থেকে তিনি তার পুত্র সুলাইমানের নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী শুজার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং তাকে (সুলাইমানকে সহায়তা করার জন্য রাজা জয় সিংকে দেন। রাজা যশোয়ান্ত সিংহের নেতৃত্বে আরেকটি সুসজ্জিত বাহিনী প্রেরণ করেন মুরাদের বিরুদ্ধে। আওরঙ্গজেবের উত্তর দিকে অগ্রসর হওয়া প্রতিরোধ করতেও তাকে নির্দেশ দেন। সোলায়মান ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী (১০৬৮ হিজরীর জমাদিউল আওয়াল) মাসে আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে বেনারসের নিকট শুজাকে পরাজিত করেন এবং বিহারের মুঙ্গের পর্যন্ত তাকে পশ্চাদধাবন করেন।[১১৮] ইত্যবসরে আওরঙ্গজেব মুরাদকে তাঁর পক্ষে টেনে নেন এবং উভয়ের মিলিত বাহিনী দিয়ে ১২ এপ্রিল, ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে (রজব, ১০৬৮) ধর্মটের যুদ্ধে যশোবন্ত সিংহের নেতৃত্বাধীন দারার বাহিনীকে চরমভাবে পরাজিত করেন।[১১৯] এই পরাজয়ের সংবাদ যখন সোলায়মানের নিকট পৌঁছে, তখন তিনি শুজার পশ্চাদধাবন পরিত্যাগ করেন এবং তড়িঘড়ি ৭ই মে এক চুক্তি সম্পন্ন করে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যাকে তাঁর অধীনে রেখে দিয়ে পিতাকে সাহায্য করার জন্য আগ্রা অভিমুখে রওয়ানা করেন। কিন্তু সোলায়মান পৌঁছার পূর্বেই আওরঙ্গজেব ২৫শে মে, ১৬৫৮ (৭ই রমজান, ১০৫৮) আগ্রা থেকে আট মাইল পূর্বে সামগড়ের (ধোলপুরের) যুদ্ধে দারাকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত এবং তাকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন। তিনি প্রথমে আগ্রা, পরে পাঞ্জাব এবং অন্যান্য স্থানে পালিয়ে বেড়ান। আওরঙ্গজেব বিজয়ীর বেশে আগ্রা প্রবেশ করেন এবং সেখানে সকল আমির-ওমরাহ, এমনকি দারা ও মুরাদের

---

১১৮. এ.এন. পৃঃ ৩১

১১৯. ঐ, পৃঃ ৪৩,৫৫-৫৬, ৬৭-৭৪

উর্ধতন কর্মকর্তাগণও আওরঙ্গজেবের পক্ষে যোগ দেন।[১২০] "তবে এটা একটা আশ্চার্যজনক ঘটনা যে," টেভার্নিয়েরে যিনি উত্তরাধিকার যুদ্ধে কোন ধর্মীয় চেতনা সম্পৃক্ত ছিল বলে স্বীকার করেননি, তিনি লিখেছেন যে, "সে মহান সম্রাটের (শাহজাহানের) একজন কর্মচারীও তাকে (দারাকে) সাহায্য করতে এগিয়ে আসেননি, তাঁর সকল প্রজাই তাকে পরিত্যাগ করে এবং উদীয়মান সূর্যের দিকেই ফিরে তাকায় এবং অন্য আর কাউকেই নয়। শুধু আওরঙ্গজেবকেই সম্রাট বলে স্বীকৃতি দেয়।" আগ্রা অধিকার এবং দারাকে বিতাড়িত করে তাঁর পিতাকে আগ্রা দূর্গে আটক করে রাখার ব্যাপারে আওরঙ্গজেব দারার গৃহীত ব্যবস্থাই বহাল রাখেন এবং মুরাদের মধ্যে অনানুগত্যের আভাস পেয়ে তাকে গোয়ালিয়র দূর্গে বন্দী করে রাখেন।

এইভাবে পুরো পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে আওরঙ্গজেব শুজার সঙ্গে একটি আপোষ-রফার চেষ্টা করেন এবং ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে জুন তাঁকে লিখিত এক পত্রে বলেন যে, "যেহেতু আপনি সম্রাট শাহজাহানের নিকট বিহার প্রদেশের জন্য প্রায়ই আবেদন করতেন, এখন আমি এটাকে আপনার সুবাদারীর অন্তর্ভূক্ত করে দিচ্ছি। এখন কিছু দিন শান্তিপূর্ণভাবে এই প্রদেশের শাসন কাজ পরিচালনা করুন এবং আপনার যে শক্তি ক্ষয় হয়েছে তাও পূরণ করার চেষ্টা করুন। দারার ব্যাপারটা শেষ করে যখন আমি প্রত্যাবর্তন করব, তখন আমি আপনার অন্যান্য ইচ্ছা পূরণ করার চেষ্টা করব। একজন সত্যিকার ভাইয়ের মত আমি আপনার কোন ইচ্ছা অপূর্ণ রাখব না, তা ভূখন্ড বা অর্থ-যাই হোক।"[১২১] শুজা অবশ্য বিহারের ব্যাপারে বেশি উৎসাহী ছিলেন না এবং তিনি এই মনে করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন যে, আওরঙ্গজেব দারার পশ্চাদাবনে খুব বেশি ব্যস্ত আছেন। ১৬৫৮-সালের অক্টোবরে শুজা এক বিরাট সৈন্যবাহিনী এবং রণতরীর বহর নিয়ে রাজধানী অভিমুখে রওয়ানা করেন এবং যাত্রাপথের রোহটাস, চুনার, বেনারস এবং এলাহাবাদের দুর্গ দখল করে ভারতের আধুনিক উত্তর প্রদেশের খাজোয়া পর্যন্ত অগ্রসর হন। সেখানে ভাই আওরঙ্গজেব তাঁকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন (জানুয়ারী, ১৬৫৯) এবং বাংলার দিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন।[১২২] শুজার পশ্চাদধাবনের জন্য মুয়াজ্জম খান ওরফে মীর জুমলার নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী বাহিনী রেখে আওরঙ্গজেব দারাকে মোকাবেলা করার জন্য রাজধানীতে ফিরে আসেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে বন্দী এবং শিরোচ্ছেদ করা হয়।

---

১২০. দেখুন, টেভার্নিয়েরে, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৬৬, ২৭২
১২১. এইচ.বি.-তে উদ্ধৃত, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৩৭
১২২. এ.এন. পৃঃ ২৪৩

মীর জুমলার তাড়া খেয়ে শুজা মুঙ্গেরে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হন এবং রাজমহলে ফিরে আসেন। মীর জুমলা বীরভূমের আফগান জমিদার খাজা কামালের সাহায্যে ঝাড়খন্ডের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে শুজাকে অতিক্রম করে চলে আসেন এবং গঙ্গা নদী দিয়ে অগ্রসর হয়ে শুজার উপর চাপ সৃষ্টি করেন। শুজা রাজমহল ত্যাগ করে গৌড়ের চার মাইল পশ্চিমে টান্ডায় পশ্চাদপসারণ করতে বাধ্য হন। মীর জুমলা ১৬৫৯ সালের ১৩ই এপ্রিল রাজমহল দখল করেন। সেখানে তিনি কিছু রণতরী সংগ্রহ করেন এবং অল্প পরেই বিহারের শাসনকর্তা দাউদ খান আরো সৈন্য নিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। বর্ষাকালে মীর জুমলাকে রাজমহল থেকে অপসারণের চেষ্টা করে শুজা কিছুটা সফল হয়েছিলেন। কিন্তু বর্ষা শেষে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে মীর জুমলা তাঁকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। শুজা টান্ডা থেকে ঢাকায় পলায়ন করেন। কিন্তু মীর জুমলা তাঁকে তীব্রভাবে পশ্চাদধাবন করেন।[১২৩] আর কোন প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়ে তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন এবং তাঁর পরিবার পরিজন এবং ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের নিয়ে প্রতিবেশী রাজ্য আরাকানের আশ্রয় চান।[১২৪] মীর জুমলা ১৬৬০ সালের ৯ই মে বিজয়ীর বেশে ঢাকায় প্রবেশ করেন। বার্ণিয়ের লিখেছেন, "সে মহান ব্যক্তি শুজার প্রতি কোন নিষ্ঠুর আচরণ বা বিশ্বাস ভঙ্গ করেননি, যেমন করেছেন কুখ্যাত পাঠান জুয়িন খান দারার প্রতি বা শ্রীনগরের রাজা করেছেন সুলায়মান শিকোহর প্রতি। তিনি একজন কুশলী সেনাপতির মত রাজ্যটি অধিকার করেন। শুজাকে ধরার জন্য কোন ঘৃণ্য এবং অশোভন কৌশল অবলম্বন করেননি। পরাজিত শাহজাদাকে সাগরের দিকে তাড়িয়ে দিয়ে এবং দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করেই তিনি সন্তুষ্ট থেকেছেন।"[১২৫]

সে যাই হোক, শুজার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে। তাকে মক্কা শরীফ যাওয়ার উদ্দেশ্যে একটি জাহাজ সরবরাহ করার জন্য আরাকান রাজার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি মিথ্যা প্রমাণিত হয়। তিনি চেয়েছিলেন তার (শুজার) মেয়েকে বিয়ে করতে। তাঁর সকল অর্থ-সম্পদ এবং মূল্যবান সামগ্রী আত্মসাৎ করতে এবং এমন কি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে কারারুদ্ধ করতেও পরিকল্পনা করেছিলেন। উপায়ান্ত না দেখে শুজা আরাকানের মুসলমান প্রজাদের সাহায্যে রাজার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটাতে চেষ্টা করেছিলেন। তবে এই পরিকল্পনা ধরা পড়ে যায় এবং দূর্ভাগা শাহজাদা পেগুর দিকে পালাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পশ্চাদধাবন করে তাঁকে হত্যা করা হয় এবং তার পরিবারের সকল লোক,

---

১২৩. এ.এন. পৃঃ ৪৯৫-৫৬১
১২৪. ঐ. পৃঃ ৫৬২
১২৫ . বার্ণিয়ের. পৃঃ ১৩৯

এমনকি তাঁর যে কন্যাকে আরাকান রাজ বলপূর্বক বিয়ে করেছিলেন, তাকেসহ সকলকেই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়।[১২৬] তাঁর পলায়নের পরিস্থিতি এবং মৃত্যু কিছুটা অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে এবং কিছু কাল পর্যন্ত এ নিয়ে গুজব চলতে থাকে। বার্ণিয়ের সংক্ষিপ্তভাবে এই অবস্থার খুব সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন:

যারা তখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, আমি তাদের নিকট থেকেই শাহজাদার ভাগ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ পৃথক তিনটি কি চারটি বিবরণ শুনেছি। কেহ কেহ আমাকে নিশ্চিত করে বলেছেন যে, নিহতদের মধ্যে তাঁর লাশও পাওয়া গিয়েছিল। ঐ অঞ্চলের ওলান্দাজদের একটি কুঠির জনৈক প্রধানের ব্যক্তিগতভাবে লেখা একটা চিঠিও আমি দেখেছি, তাতেও একই বিষয় উল্লেখ আছে। এ বিষয়ে বিরাট অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে, যে কারণে দিল্লীতে আমাদেরকে অনেক ভীতিকর অবস্থায় থাকতে হয়েছে। এক সময় জানা গিয়েছিল যে, তিনি মসলিপট্টমে পৌঁছেছেন এবং গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের রাজন্যদ্বয় তাদের সকল সৈন্য সামন্ত নিয়ে তাকে সমর্থন দিয়েছেন। আবার অন্য এক সময় অত্যন্ত নিশ্চয়তাসহকারে বলা হত যে, শ্যাম বা পেগুর রাজার উপঢৌকন হিসেবে প্রদত্ত দু'টি লাল রঙের জাহাজে চড়ে তিনি সুরাট থেকে দৃষ্টি সীমার মধ্যে দিয়েই অতিক্রম করেছেন। আবার আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, শাহজাদা পারস্যে আছেন এবং তাকে শিরাজে এবং অল্প পরেই আবার কান্দাহারে দেখা গেছে। তিনি কাবুল আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত কিন্তু আমার মতে উপরোক্ত বর্ণনাগুলোর কোনটিই কখনো ঘটেনি। আমি সর্বাধিক গুরুত্ব দিই ওলন্দাজ ভদ্রলোকের চিঠিকে, যাতে বলা হয়েছে যে, পালাতে চেষ্টা করার সময় তাকে হত্যা করা হয়েছে এবং সুলতান শুজার একজন খোজা, যার সঙ্গে বাংলা থেকে মসলিপট্রম পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেছি এবং তার গোলন্দাজ বাহিনীর একজন সাবেক সেনাধ্যক্ষ এবং যিনি বর্তমানে গোলকুণ্ডার রাজার অধীনে চাকুরী করছেন, তাঁরা উভয়েই আমাকে নিশ্চিত করেছেন যে, তাদের মনিব আর নেই। যদিও তারা এর থেকে বেশি কিছু তথ্য প্রকাশ করতে নারাজ। ফরাসী ব্যবসায়ীদের মধ্যে যাদের সঙ্গে আমার দিল্লীতে সাক্ষাত হয়েছে এবং যারা ইস্পাহান থেকে এসেছেন, তারা কখনো শুজা নামে পারস্যে বাস করে এমন কোন সুলতানের নামের একটি অক্ষরও শোনেননি। এটাও মনে হয় যে, তাঁর পরাজয়ের পর পরই তাঁর তরবারী এবং ছোরা পাওয়া গিয়েছিল: কিছু লোকের দাবি অনুযায়ী যদি তিনি বনে গিয়ে থাকেন, তাহলে এ সম্ভাবনা খুবই কম যে, তিনি বেঁচে গেছেন। তবে এইরূপ সম্ভবনা আছে যে, তিনি ডাকাতদের হাতে পড়েছেন অথবা সে দেশের বন-জঙ্গল ভর্তি যে বাঘ বা হাতি রয়েছে, তিনি সেগুলোর শিকারে পরিনত হয়েছেন।"[১২৭]

---

১২৬ ঐ. পৃঃ ১০৯-১১৫
১২৭ বার্ণিয়ের পৃঃ ১১২-১১৪

তৃতীয় অধ্যায়[১২৮]
মীর জুমলার সুবাদারী
(১৬৬০ খ্রিঃ -১৬৬৩ খ্রিঃ)

শুজার আরাকানে পালিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাধিকার যুদ্ধেরও সমাপ্তি ঘটে। মীর জুমলা এখন বাংলায় তাঁর ক্ষমতা সুসংহত করার কাজে মনোনিবেশ করতে পারছেন। "তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান, উদ্যোগী, সাহসী, সম্পদশালী, একটি বিজয়ী বাহিনীর শীর্ষে; হিন্দুস্থানের শীর্ষ প্রদেশটির উত্তরাধিকারী এবং সৈন্যরা তাঁকে ভালবাসত এবং ভয় করত।"[১২৯] যদিও তিনি আগে একবার বাংলার গভর্ণরের পদ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন, এবার তিনি বাংলায় থাকার ইচ্ছা করলেন এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের তাঁর সাথে যোগ দেয়ার জন্য সম্রাটের অনুমতি প্রার্থনা করলেন।[১৩০] আওরঙ্গজেবের দিক হতে বাংলায় মীর জুমলাকে দায়িত্বে বহাল রাখার পক্ষে অনেক যুক্তি ছিল। তিনি ছিলেন বিখ্যাত সেনাপতি, যে বিরাট কাজ করেছেন সেজন্য তার পুরস্কার প্রাপ্য ছিল। তাছাড়া প্রদেশের সকল অঞ্চলের ওপর আওরঙ্গজেবের কর্তৃত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করাও ছিল আবশ্যক। উত্তরাধিকার যুদ্ধের সময় প্রদেশের প্রশাসন ব্যবস্থাও কিছুটা বিশৃঙ্খলায় পড়ে গিয়েছিল। প্রদেশের উত্তর-পূর্ব দিকে নতুন করে সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, যখন কুচবিহারের শাসক মোগল শক্তির প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করে এবং কামরূপ জয়ের জন্য চেষ্টা করে। আসামের শাসনকর্তাও ইসলাম খান মাশহাদীর সুবাদারীর সময়ে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে এবং কামরূপ আক্রমণ করে। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে হিজলীর জমিদার বাহাদুর খান আটক অবস্থা থেকে পালিয়ে যান এবং আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। শুজার আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ এবং মগদের আক্রমণের হুমকি ছাড়াও এসব সমস্যার কারণে বাংলায় একজন যোগ্য এবং বিশ্বস্ত সুবাদার নিয়োগ দেয়াটা অত্যাবশ্যক ছিল; এ কাজের জন্য অন্য কেহ মীর জুমলা থেকে অধিকতর যোগ্য বিবেচিত হয়নি এবং "যিনি যুদ্ধ এবং রাষ্ট্রীয় বিষয় উভয় দিকেই ছিলেন সমভাবে পারদর্শী।" এই বিবেচনা থেকে আওরঙ্গজেব মীর জুমলার মনসব (পদমর্যাদা) বাড়িয়ে ৭০০০-এ

---

১২৮ মূল বইয়ে অষ্টাদশ অধ্যায়
১২৯ বার্নিয়ের পৃঃ ১৬৯
১৩০ বার্নিয়ের পৃঃ ১৬৯

উন্নীত করেন, এইগুলোর মধ্যে ৫০০০ ছিল du-aspa, seh- aspa (দুই ঘোড়া, তিন ঘোড়া),[১৩১] তাকে খান-ই-খানান উপাধিতে ভূষিত করেন, "এটা ছিল সম্রাট কর্তৃক তাঁর কোন প্রিয়জনকে প্রদেয় সর্বোচ্চ খেতাব," বাংলায় তাঁকে তাঁর পছন্দমত একটি জায়গীর প্রদান করেন, যেখান থেকে বাৎসরিক বেতন আসত এক কোটি ডাম। তাছাড়া, তাঁকে অনেক মূল্যবান উপঢৌকন প্রদান করেন, যার মধ্যে ছিল ১০টি দ্রুতগামী আরবী এবং ইরাকী ঘোড়া, একটি খিলাত, একটি রত্ন খচিত তরবারী এবং বহু সংখ্যক হাতি। সম্রাট তাঁকে বাংলার সুবাদারীতে স্থায়ী করেন এবং তাঁর স্ত্রী, কন্যা এবং পুত্রের সন্তানদেরকেও তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। মীর জুমলার পুত্র মুহাম্মদ আমীর খানকে কেন্দ্রীয় মীর-ই-বখশী অথবা বেতন প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। এই পদটি ছিল "দেশের দ্বিতীয় বা তৃতীয়" গুরুত্বপূর্ণ পদ এবং তাকেও দরবারেই রাখা হয়েছিল।

নিয়োগপত্র হিসেবে তাঁকে প্রদত্ত সম্রাটের 'ফরমান' থেকে প্রকাশ পায় যে, মীর জুমলার ওপর আওরঙ্গজেবের কি আস্থা ছিল এবং তিনি তাঁর থেকে কি কি কাজ আশা করতেন। তাঁকে বলা হয়েছিল কার্যকরভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে প্রদেশ শাসন করতে। বিদ্রোহীদেরকে কঠোর শাস্তি দিতে, একটি সুষ্ঠু নীতির ভিত্তিতে রাজস্ব ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করতে, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের নিরাপত্তা বিধান করতে, শুল্ক আদায় পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করতে, নৌ-বহর পুনঃনির্মাণ এবং মগদের দমন করতে এবং কুচবিহার ও আসাম রাজ্য জয় করতে। সর্বোপরি, মীর জুমলাকে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান এবং শরিয়তের ভিত্তিতে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। সম্রাট লিখেছিলেন; "দুর্বলের ওপর থেকে সবলের হাত এবং মজলুমের ওপর থেকে জালিমের হাত অপসারণ করতে হবে। কোন অবস্থায়ই তুমি শরিয়তের আইন এবং বিশ্বনন্দিত ন্যায় বিচারের সীমা লংঘন করবে না। আল্লাহর সৃষ্ট সকল সৃষ্টির কল্যাণ, দেশবাসী এবং বিদেশী পর্যটকদের মনের শান্তি এবং সীমান্তের নিরাপত্তার প্রতি তুমি তোমার সমগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে। তুমি এমনভাবে কাজ করবে, যেন সকল লোক অত্যাচারীদের অত্যাচার থেকে নিরাপদ থেকে নির্বিঘ্নে তাদের পেশাগত ও চাষাবাদের কাজ করে যেতে পারে।" [১৩২]

---

১৩১. মোগল কর্মকর্তাদের মর্যাদা নির্ধারিত হত তাদের নিকট থেকে কাঙ্ক্ষিত, তাদের অধীনস্থ বা সরবরাহকৃত সৈন্য সংখ্যা দিয়ে, তবে সৈন্যদের জন্য নির্ধারিত অশ্বের সংখ্যার ভিত্তিতে আরেকটি শ্রেণী বিন্যাস করা হত। এটাই ছিল শ্রেণী বিন্যাসের ধারা। তবে মনসবদারদের অধীনস্থ সৈন্য বা ঘোড়ার সঙ্গে এই সংখ্যার মিল থাকা আবশ্যক ছিল না।

১৩২ জে.এন. সরকারের "দি লাইফ অব মীর জুমলা" গ্রন্থে উদ্ধৃত, কলিকাতা, ১৯৫১, পৃঃ ২০৯

বাংলার সুবাদার হিসেবে মীর জুমলার নিয়োগ ছিল একটি সফল জীবনের শীর্ষে আরোহন। পারস্য থেকে আগত ভাগ্যান্বেষী একজন বণিকের পুত্র মীর জুমলার মূল নাম ছিল মুহাম্মদ সা'দ। তিনিও ভাগ্যান্বেষণে ভারতে চলে আসেন এবং গোলকুণ্ডার শাসনকর্তা সুলতান কুতুবের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। নিজের অসাধারণ যোগ্যতাবলে তিনি ক্রমান্বয়ে মর্যাদাপূর্ণ ওয়াজিরের পদ অধিকার করেন। তিনি দাক্ষিনাত্যে খনি থেকে হীরা আহরণ করে এবং অন্যান্য ব্যবসা করে বিপুল সম্পদের মালিক হন এবং তিনি প্রায় কুড়ি মণ হীরার মালিক হয়েছিলেন।[১৩৩] গোলকুণ্ডার সুলতানের জন্য তিনি কর্ণাটক জয় করেন। তবে সুলতানের সঙ্গে মীর জুমলার মতভেদ দেখা দেয় এবং এই অবস্থায় দাক্ষিণাত্যের মোঘল গভর্ণর শাহজাহানের পুত্র আওরঙ্গজেব তাঁকে নিজ পক্ষে টেনে নেন। মীর জুমলা কিছুদিন খান্দেশের গভর্ণর ছিলেন। উত্তরাধিকার যুদ্ধের সময় তিনি একজন সেনাধ্যক্ষ এবং বিশ্বস্ত উপদেষ্টা হিসেবে আওরঙ্গজেবকে বিরাট সাহায্য করেছেন। তাই বাংলার সুবাদার হিসেবে মীর জুমলার ওপর আওরঙ্গজেব যে আস্থা ও বিশ্বাস রেখেছিলেন, তিনি পুরোপুরি তার যথার্থতার প্রমাণ দিয়েছেন।[১৩৪]

১. প্রশাসনিক পুনর্গঠন

উত্তরাধিকার যুদ্ধ এবং আরাকানের দিকে শুজার পলায়নের পরে প্রশাসনিক পুনর্গঠন আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। মীর জুমলা শুরুতেই রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় পুনরায় স্থানান্তর করেন। কারণ, পর্তুগীজ জলদস্যুদের উপদ্রব বন্ধ, আরাকানীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করা এবং শেষোক্তদের সাহায্য নিয়ে পলাতক শাহজাদা শুজার পুনরায় ফিরে আসার সম্ভাব্য চেষ্টা প্রতিহত করার জন্য তিনি রাজধানী স্থানান্তর করেছিলেন। এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য নিয়ে মীর জুমলা ধলেশ্বরী নদীর তীরবর্তী ইদরাকপুরে (আধুনিক মুন্সিগঞ্জ) একটি দূর্গ নির্মাণ করেন। আধুনিক ঢাকা শহরের পাঁচ মাইল দক্ষিণে বুড়িগঙ্গার তীরস্থ ফতুল্লায় ২য় দূর্গ এবং তৃতীয় দূর্গটি নির্মাণ করেন নদীর অপর পাড়ে। তিনি অবশ্য খিজিরপুর, (নারায়ণগঞ্জ) সোনাকান্দা এবং হাজীগঞ্জের প্রাচীন দূর্গগুলোর শক্তি বৃদ্ধি করেন।[১৩৫] ঢাকা থেকে ফতুল্লা হয়ে খিজিরপুর যাওয়ার জন্য তিনি একটি রাস্তা নির্মাণ করেন এবং তাঁর নির্দেশে পাগলায় নির্মাণ করা হয় একটি সেতু।[১৩৬] এক

---

১৩৩ দেখুন টেভার্নিয়েরের ১ম খন্ড, টীকা ১৩৮, পৃঃ ২৩০ এবং ২য় খন্ড, পৃঃ ৬৭ এবং পরিশিষ্ট-১.

১৩৪ বাংলার সুবাদার হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্তির পূর্বে মীর জুমলার জীবনের বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন জে.এন. সরকার, পূর্বোক্ত, অধ্যায় ১-৪।

১৩৫ দেখুন, এ.এস.আই.আর চতুর্দশ সংখ্যা, পৃঃ ৯৩-৯৪; এবং ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার পৃঃ ৩০, ১৮৬ এবং ১৮৯

১৩৬ টেভার্নিয়েরের ১ম খন্ড, পৃঃ ১০৪।

পর্যায়ে তিনি শাহ সুজার বিরুদ্ধে ওলন্দাজ এবং ইংরেজ কোম্পানীর নৌবাহিনীর সাহায্য চেয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার আর দরকার হয়নি। কারণ, আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শাহজাদা শুজা অল্পদিন পরেই আরাকানে করুণভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

একই সময়ে মীর জুমলা দুর্নীতিপরায়ণ এবং অনির্ভরযোগ্য কর্মকর্তাদেরকে প্রশাসন ব্যবস্থা থেকে অপসারণ করার জন্য মনোনিবেশ করেন। এই ব্যাপারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঢাকার কাজী বা বিচারক মোল্লা মোস্তফা এবং বিচার বিভাগের প্রধান মীর-ই-আদলকে তাদের স্ব স্ব পদ থেকে অপসারণ; প্রথম জনকে ঘুষ গ্রহণের দায়ে এবং দ্বিতীয় জনকে পরগাছা বলে গণ্য করা হত। তাদের অপসারণের পরে মীর জুমলা বিচার বিভাগের দায়িত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। তিনি অবশ্য সে সকল অফিসারদেরকে তাদের চাকুরিতে বহাল রাখেন, যারা ছিলেন আন্তরিক এবং অনুগত। সম্রাটের নির্দেশ অনুযায়ী মীর জুমলা রাজস্ব প্রশাসন ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করেন। উত্তরাধিকার যুদ্ধের সময় প্রশাসন ব্যবস্থার এই শাখাটি সবচেয়ে বেশি অব্যবস্থার শিকার হয়েছিল। দুটি ক্ষতিকর ব্যবস্থা তাঁর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি দেখতে পান যে, কিছু সংখ্যক পরগনার (রাজস্ব বিভাগে) উপর বহু সংখ্যক মনসবদার যৌথভাবে মালিকানা ভোগ করছেন। এতে অনেক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, রাজস্ব আদায়ে অপচয় এবং কৃষকদের উপর অত্যাচার করা হয়। দ্বিতীয়তঃ এমন অনেক অযোগ্য লোক রয়েছে, যারা পেনশন এবং মাদাদ-ই- মা'আশ ভূমি (জীবিকা নির্বাহের জন্য ভূমি দান) ভোগ করছেন। মীর জুমলা ধার্মিক ও সাধু আইমাদারদের পেনশনভোগী এবং সম্রাটের ফরমান বলে প্রাপ্ত জায়গীরগুলোকে বলবৎ রাখেন। কিন্তু প্রধান কাজীর (বিচারপতি) পরামর্শে তিনি অন্যান্যদের পেনশন, মাদাদ-ই-মাআশ এবং জায়গীর বাতিল করে দেন। মীর জুমলা আইমাদারদেরকে তাদের নামে বরাদ্দকৃত জমি চাষ করতে এবং রাষ্ট্রকে রাজস্ব প্রদান করার জন্য নির্দেশ দেন, দ্বিতীয়তঃ তিনি চাষীদের নিকট থেকে বুদ্ধিমত্তা এবং সংযমের সঙ্গে খাজনা আদায় করার জন্য তাঁর কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন। তদুপরি সচ্ছল মুসলমানদের নিকট থেকে যাকাত (পুরো এক বৎসরের সঞ্চয়ের উপর ৪০ ভাগের ১ ভাগ) আদায়, একই হারে মুসলমান ও অমুসলমান, ব্যবসায়ী ও কারিগরদের নিকট থেকে নিয়মিত শুল্ক আদায় করা হয়। যেসব ব্যবসায়ী অবিবেচকের মত অস্বাভাবিকহারে মুনাফা করত, তিনি তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিতেন। এইভাবে তিনি ঢাকার খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীদেরকে অতি মুনাফার জন্য ২৫,০০০ হাজার টাকা মুনাফা কর দিতে বাধ্য করেন। কারণ,

কুচবিহার অভিযানের প্রাক্কালে দীর্ঘদিন এখানে সেনা-শিবির থাকায় এখানকার অবস্থার সুবিধা নিয়ে তারা অবৈধভাবে প্রচুর মুনাফা করেছিলেন। আগেই সুবাদারের কঠোর মনোভাবের পরিচয় পেয়ে শহরের ব্যাংকারগণ স্বেচ্ছায় তিন লক্ষ টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে সমর্পণ করেন।[১৩৭]

মীর জুমলা সম্রাটের পক্ষ হতে ততদিন পর্যন্ত উড়িষ্যাও শাসন করেছেন, যতদিন পর্যন্ত না সে অঞ্চলের জন্য অন্য একজন শাসনকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শুজার সুবাদারীর সময় প্রদেশটি বাংলার প্রশাসনের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছিল। তাঁর পরাজয় এবং আরাকানে পলায়ন উড়িষ্যার প্রশাসনেও একটি শূন্যতা সৃষ্টি করেছিল। অতএব, সেখানে আওরঙ্গজেবের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য মীর জুমলা প্রথমেই পদক্ষেপ নেন। তাই পশ্চিম বাংলায় নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অল্প পরেই মীর জুমলা ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে উড়িষ্যার দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য ইহতিশাম খানকে সেখানে প্রেরণ করেন। প্রদেশের সামন্ত সর্দারদের একজন রাজা নীলকান্ত দেব উত্তরাধিকার যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে সরকারকে রাজস্ব প্রদান স্থগিত করে দিয়েছিলেন। অতএব, আওরঙ্গজেবের নির্দেশ অনুযায়ী তার ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। অনুরূপভাবে গোয়ালপাড়া সরকারভুক্ত কুতুবপুরের অবাধ্য আবুল খায়েরের ভোগকৃত মাদাদ-ই-মা'য়াশ ভূমি বাজেয়াপ্ত করা হয়।[১৩৮]

১৬৬০ সালের মাঝামাঝি খান-ই দৌরানকে উড়িষ্যার গভর্ণর নিয়োগ করা হয়। এর পরও মীর জুমলা ঐ প্রদেশের প্রশাসনের উপর সাধারণ তত্ত্বাবধান অব্যাহত রাখেন এবং প্রদেশের রাজস্ব বাংলার রাজস্বের সঙ্গে একত্র করে রাজমহল হয়ে মোগল দরবারে প্রেরণ অব্যাহত রাখেন।

উড়িষ্যার ব্যাপারে মীর জুমলার অব্যাহত আগ্রহের কারণ ছিল একদিকে হিজলীর বিদ্রোহী জমিদার বাহাদুর খানকে দমন এবং অন্যদিকে হুগলী ও বালাশোর বন্দর দু'টির মাধ্যমে পরিচালিত ইউরোপীয় কোম্পানীসমূহের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা। শাহ্ শুজার সুবেদারীর সময় বাহাদুর খান বিদ্রোহ করেছিল, তার বিদ্রোহ দমন করে তাকে আটক করা হয়েছিল। শুজা যখন উত্তরাধিকারিত্বের যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত, তখন বাহাদুর খান কারাগার থেকে পালিয়ে যান এবং হিজলীতে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন; ঐ এলাকাটি ছিল উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত। বাহাদুর খানের বিদ্রোহ কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার জন্য মীর জুমলা হিজলীকে বাংলার নিকট হস্তান্তর

---

১৩৭ বাটাভিয়া দাগ রেজিষ্টার, নভেম্বর ১৬৬১ মারল্যান্ড কর্তৃক উদ্ধৃত, ফ্রম আকবর টু আওরঙ্গজেব, পৃঃ ২৯২
১৩৮ জে.এন. সরকার, পূর্বোক্ত পৃঃ ২১২-২১৩

[illegible] জন্য সম্রাট আওরঙ্গজেবকে অনুরোধ করেন। তাঁর অনুরোধ রক্ষা করা হয় এবং ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে মীর জুমলা বাংলার পর্তুগীজ বণিকদের নিকট থেকে নৌ-সাহায্য নিয়ে বাহাদুর খানকে পরাভূত করেন এবং হিজলী জয় করেন এবং তার ভাই কামাল খানকে হত্যা করা হয়। ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দের ৬ই মে তার ১১ জন সঙ্গী-সাথীসহ তাকে বন্দী করে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়।[১৩৯]

২. ইউরোপীয় কোম্পানী সমূহের সঙ্গে সম্পর্ক

(ক) যখন তিনি দাক্ষিণাত্যে ছিলেন

বাংলায় মীর জুমলার সঙ্গে ইউরোপীয় কোম্পানীসমূহের সম্পর্ক, বিশেষ করে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সম্পর্ক ছিল দাক্ষিণাত্যে তাদের সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক, তারই ধারাবাহিকতা। বাংলার স্থানীয় অবস্থা ও অন্যান্য বিবেচনা থেকে এ সম্পর্ককে কিছুটা সংস্কার করা হয়েছিল। অতএব, বাংলায় আসার পূর্বে তাদের সঙ্গে মীর জুমলার যে সম্পর্ক ছিল, তা সংক্ষেপে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে সার্বিক দিক থেকে দু'টি বিষয়কে বিবেচনায় নিতে হবে। প্রথমত: খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপনের দিক থেকে পর্তুগীজ শক্তির দ্রুত পতন ঘটে এবং ইংরেজদের আবির্ভাব ঘটে। তারা এশিয়ার যেসব দেশের সঙ্গে তাদের বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল, তাদের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকেও তারা সে সকল দেশে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল। ফলে এর দ্বারা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মনোভাব প্রভাবিত হয়, যেমন হয়েছিল তাদের প্রতি মীর জুমলার মনোভাব। দ্বিতীয়ত, মীর জুমলা একজন সুদক্ষ সেনাপতি এবং প্রশাসক হওয়া ছাড়া তিনি নিজেও একজন বড় মাপের বণিক ছিলেন। গোলকুণ্ডা রাজ্যে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ছিলেন এবং ১৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দের পরে একে একে মসলিপটমের গভর্ণর, মন্ত্রী এবং কর্ণাটকের বিজেতা-শাসক ছিলেন। এই সময়ে তিনি খনি থেকে হীরা উত্তোলনসহ বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য করে বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে তার ছিল ৪০০০ ঘোড়া, ৩০০ হাতি, প্রায় ৫০০ উট এবং ১০,০০০ বলদ এবং এগুলো দ্বারা তিনি গোলকুণ্ডা, বিজাপুরা এবং মোগল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তাঁর পণ্যদ্রব্য পরিবহন করতেন। তিনি আরাকান, পেগু, তেন্নাসেরিন, অচিন, পেরুক, মাকাস্সার, মালদ্বীপ, বাংলা, শ্রীলংকা, পারস্য এবং আরব দেশের সঙ্গে

---

১৩৯. বাটাভিয়ার নিকট ওলন্দাজ কুঠিয়াল ভ্যান ডেন ব্রোয়েকের পত্র; ১০ই অক্টোবর ১৬৬১ ই.এফ.আই-তে উদ্ধৃত, ১৬৬১-১৬৬৪, পৃঃ ৭০

বাণিজ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বহির্দেশীয় বাণিজ্য পরিচালনার জন্য এক ডজনেরও বেশি বড় জাহাজ বা বাণিজ্যিক পোতের সমন্বয়ে তিনি বেশ বড় আকারের একটি বাণিজ্যিক নৌ-পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন।[১৪০] অতএব, বিদেশী বণিকদের সঙ্গে ব্যবহারে তিনি স্বাভাবিকভাবেই তাঁর নিজের এবং রাষ্ট্রের স্বার্থের প্রতি সচেতন ছিলেন। এটা তাঁর একটি বিরাট কৃতিত্ব যে, তিনি এই দুই ধরণের স্বার্থের মধ্যেও একটি সুন্দর ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং কখনো নিজের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের স্বার্থের দ্বারা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বার্থকে পদদলিত করতে দেননি।

রাষ্ট্রের মধ্যে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান বিবেচনা করে বিদেশী বণিকেরা, বিশেষ করে ইংরেজ এবং ওলন্দাজগণ তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করতেন এবং কখনো কখনো তাঁকে উপঢৌকন প্রেরণ করতেন, তাঁর জাহাজ চালানোর জন্য লোক ধার দিতেন, এমনকি বিভিন্ন গন্তব্যে বিনা ভাড়ায় তাঁর পণ্যদ্রব্য পরিবহন করে দিতেন। মীর জুমলা তাঁর পক্ষ থেকে তাদেরকে তাদের বাণিজ্যিক সুবিধার নিশ্চয়তা দিতেন। সময়মত বিনিয়োগের জন্য তাদেরকে টাকা ধার দিতেন এবং তাদেরকে তাঁর জাহাজ ও সারেং ধার দিতেন। যখন দেখা যেতো যে, তারা তাদেরকে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার অপব্যবহার করছে, তখন তিনি তাদের প্রতি কঠোর দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতেন। এই ধরণের পরিস্থিতির ফলেই বিদেশী বণিকেরা তাঁর বিরুদ্ধে অত্যাচার ও লোভ-লালসার অভিযোগ উত্থাপন করতেন। তবে তাদের নিজস্ব দলিল ও নথি-পত্র সুক্ষভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, মীর জুমলা যদিও কখনো তাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করে থাকেন, তবে সেজন্য তারা নিজেরাই দায়ী। চূড়ান্ত পর্যায়ে এই দ্বন্দ্বটা একদিকে স্থলশক্তি ও অন্যদিকে সামুদ্রিক এবং নৌ-শক্তির মধ্যকার দ্বন্দ্বের রূপ পরিগ্রহ করে। মীর জুমলা দেশের অভ্যন্তরে তাদের বাণিজ্য বন্ধ করে দেন এবং তাদের কুঠিসমূহ আক্রমণ করেন। অন্যদিকে, তারা উপকূলীয় শহরগুলোর উপর গোলা বর্ষণ করে, সমুদ্রে চলাচলের পথে দাক্ষিণাত্যের জাহাজগুলিকে বাধা প্রদান করে। এমনকি মীর জুমলার নিজস্ব জাহাজও আটক করে।

এ ধরণের প্রথম সংঘর্ষ ঘটে ১৬৩৭ সালে, যখন গোলকুণ্ডার শাসনকর্তা ১৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দের গোল্ডেন ফরমান "Golden Forman" দ্বারা ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে বাৎসরিক ৮০০ প্যাগোডা পর্যন্ত বাণিজ্যিক শুল্ক 'মওকুফ' করে দেন, অর্থাৎ যদি তাদের প্রদেয় বাণিজ্যিক শুল্কের পরিমাণ এর থেকে বেশি

১৪০ বাটাভিয়ার নিকট ওলন্দাজ কুঠিয়াল ভ্যান ডেন ব্রোয়েকের পত্র, ১৬৩৭-৪১। পৃঃ ৭৯-৮০, ১৬৪২-৪৫, পৃঃ ৫৫, ৮০, ১৬৫১-৫৪, পৃঃ ১২

না হয়, তাহলে তাদেরকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার জন্য অনুমতি দেন। মীর জুমলা দেখতে পান যে, তাদের পরিচালিত বাণিজ্যের পরিমাণ এই সীমাকে ছাড়িয়ে শুধু বহু দূরেই যায়নি, তারা নিজেরা আবার লাইসেন্স বিহীন ব্যবসা-বাণিজ্যেও লিপ্ত রয়েছে। তাই তিনি সামুদ্রিক বন্দর মসলিপটমের কর্মকর্তাদেরকে ইংরেজদের নিকট থেকে অতিরিক্ত পাওনা শুল্ক দাবী করার নির্দেশ দেন। শীঘ্রই তাদের সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে বিরোধ বেঁধে যায় এবং ইংরেজরা মসলিপটমের উপর কামানের গোলা নিক্ষেপ করে।[১৪১] তবে ইংরেজরা শীঘ্রই তাদের ভুল বুঝতে পারে এবং সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য অবিলম্বে হেনরি কোগানের নেতৃত্বে গোলকুণ্ডায় এক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে।[১৪২] একই সময়ে বিজয়নগরের শাসনকর্তার প্রতিনিধি রাজা চন্দ্রগিরির অনুমতি নিয়ে তারা মাদ্রাজের সেন্ট জর্জ দূর্গের গোড়াপত্তন করে। কোগানের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দল সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে সফল হয় এবং মীর জুমলা সম্মানের সঙ্গে কোগানকে গ্রহণ করেন এবং ইংরেজদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করার জন্য মসলিপটের গভর্ণরের নিকট বিশেষ নির্দেশ প্রেরণ করেন।[১৪৩] এর কয়েক বৎসর পর ১৬৪১-১৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে দিনেমারদের আচরণের কারণে আরেকবার সংঘাত বেঁধে যায়, কারণ তারা স্বেচ্ছাচারীভাবে সমুদ্রের বুকে মীর জুমলার একটি বাণিজ্যপোত আটক করে। তাই দিনেমারদের উপর চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে গোলকুণ্ডায় ইংরেজ এবং পর্তুগীজদেরসহ সকল বিদেশী বণিকদের বাণিজ্যের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। তখন দিনেমাররা আটককৃত জাহাজ ছেড়ে দেয় এবং শীঘ্রই বিবাদও মিটে যায়।

মীর জুমলার কর্নাটক বিজয়ের সাথে বিদেশী কোম্পানীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়। ইংরেজরা যখন দেখতে পায় যে, তাদের নতুন দূর্গ যে মাদ্রাজে অবস্থিত, সে মাদ্রাজ অঞ্চল বিজয়নগর থেকে গোলকুণ্ডার অধীনে চলে যাচ্ছে, তখন তারা মীর জুমলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আরো আগ্রহী হয়ে উঠে। তাই যখন তিনি ১৬৪৬ খ্রিষ্টাব্দে মাদ্রাজের নিকটবর্তী সান থোম অবরোধের জন্য শিবির স্থাপন করেন, তখন ইংরেজরা তাঁকে একটি পিতলের কামান, একজন গোলন্দাজ সৈন্য ও কয়েকজন সাধারণ সৈন্য দিয়ে এবং আরো বিভিন্নভাবে তাঁকে সহায়তা করে।[১৪৪] মীর জুমলা তাদের এই বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের প্রতি যথার্থভাবে সাড়া দেন এবং অঞ্চলটি দখলের পরে

---

১৪১ ই.এফ.আই. ১৯৩৬, পৃঃ ৭৮-৭৯
১৪২ ই.এফ.আই. ১৯৩৬, পৃঃ ১৪৩-১৪৪, ১৪৫
১৪৩ ই.এফ.আই ১৯৪৫ পৃঃ ২৭-২৯
১৪৪ ই.এফ.আই. ১৬৪৫-৫০, পৃঃ ২৭-২৯, ২৫

১৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দের জুলাইতে ইংরেজ এবং ওলন্দাজ উভয় কোম্পানীর বিদ্যমান বাণিজ্যিক সুবিধাসমূহ স্থায়ী করে দেন।[১৪৫] অবস্থা মোটামুটি এরূপই চলছিল। কিন্তু ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে ওলন্দাজদের দ্বারা "সম্পূর্ণ ভারতীয় বাণিজ্য" একচেটিয়াভাবে দখল করার প্রচেষ্টার কারণে কোয়েডা এবং অচিনের সঙ্গে তাঁর বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করার কারণে মীর জুমলা ওলন্দাজদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন।[১৪৬]

যদিও হিন্দু শাসনকর্তার নিকট থেকে পর্তুগীজরা যে ব্যবহার পেত তাঁর নিকট থেকে তার চেয়েও উত্তম ব্যবহার তারা লাভ করে। এই সময়ে ওলন্দাজ এবং ইংরেজদের মধ্যে সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটার কারণে পঞ্চাশের দশকের শুরুতে ইংরেজ-ওলন্দাজ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই ঘটনা ইংরেজ এবং মীর জুমলাকে আরো ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ করে দেয়। তিনি চেয়েছিলেন ওলন্দাজদের একচেটিয়ামূলক মনোভাব খর্ব করে নিজেই একচেটিয়াভাবে কাপড়ের ব্যবসা করতে। তিনি প্রস্তাব করেন যে, ইংরেজরা ইউরোপ থেকে যত পণ্য আনবে, তিনি একাই তা নিবেন এবং ইংরেজরা তাঁর থেকে কর্ণাটকের সকল কাপড় ও অন্যান্য পণ্যসামগ্রী নিবে। এই উদ্দেশ্যে ১৬৫০-৫২ খ্রিস্টাব্দে ভেন্টক বর্মণসহ এড্ওয়ার্ড লেটল্টনের বিখ্যাত মিশন মীর জুমলার দরবারে গমন করে।[১৪৭] তাদের আলাপ-আলোচনায় অবশ্য কোন আনুষ্ঠানিক মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ঠিক একই সময়ে ওলন্দাজরা তাদের উপনিবেশ পুলিকটে দূর্গ নির্মাণ এবং তাদের বাণিজ্যিক সুবিধা সম্প্রসারণের অনুমতি চেয়ে মীর জুমলার নিকট এক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে।

মীর জুমলা তাদের ইতিপূর্বে প্রদত্ত সুবিধাদি নবায়ন করে দেন। কিন্তু সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের বিষয়টি গোলকুণ্ডার সুলতানের নিকট প্রেরণ করেন। মীর জুমলা অবশ্য পুলিকটে তাদেরকে দূর্গ নির্মাণ করার অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন, যদিও তিনি ইংরেজদেরকে সেন্ট জর্জ দূর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার অনুমতি দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে ওলন্দাজ এবং ইংরেজদের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ায় ওলন্দাজরা মীর জুমলার প্রতি আরো ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠে। ১৬৫৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে তারা মীর জুমলা এবং কর্ণাটকের জাহাজগুলোকে শ্রীলংকা-অচিন এবং অন্যান্য স্থানে চলাচল করার জন্য ছাড় দিতে অস্বীকার করে এবং এমনকি পর্তুগীজদের পাহারায় মীর জুমলার একটি জাহাজ মাকাসার[১৪৮] যাওয়ার পথে

---

১৪৫ ই.এফ.আই. পৃঃ ১৬৬-১৬৭

১৪৬ ই.এফ.আই. পৃঃ ১৬৫১-৫৪, পৃঃ ১৩

১৪৭ ই.এফ.আই. ১৬৫১-৫৪, পৃঃ ২২-২৪, ২৩২-৩৩, ৩৬১-৬২

১৪৮ সম্ভবত ইন্দোনেশিয়ার মাকাসার।

ওলন্দাজরা তা দখল করে নেয়। এরপর যখন মীর জুমলা পুলিকট আক্রমণের হুমকি দেন, শুধু তখনই ওলন্দাজরা তাঁর জাহাজ প্রত্যার্পণ এবং কর্ণাটকের জাহাজ চলাচলের জন্য ছাড়পত্র মঞ্জুর করতে সম্মত হয়।

ইতিমধ্যে গোলকুণ্ডার শাসনকর্তা সুলতান কুতুব শাহ্ কর্তৃক কর্ণাটকে মীর জুমলার প্রায় স্বাধীন অবস্থান খর্ব করার প্রচেষ্টা নেয়ায় তিনি বিদ্রোহী হয়ে উঠেন (১৬৫৩-১৬৫৫ সাল পর্যন্ত) এবং চূড়ান্তভাবে মোগলদের অধীনে চাকুরি নিয়ে সম্রাটের নিকট থেকে তাঁর ব্যক্তিগত জায়গীর হিসেবে তিনি কর্ণাটক লাভ করেন। এই ঘটনায় বিদেশী কোম্পানীগুলো বিশেষ করে ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায় শুরু হয়। তাঁর দাক্ষিণাত্য ত্যাগ এবং ফিরে এসে পুনরায় কর্ণাটকের উপর তাঁর কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের আর কোন সম্ভাবনা আদৌ না থাকায় ইংরেজরা তাদেরকে প্রদত্ত বাণিজ্যিক সুবিধার অপব্যবহার এবং আগের থেকে অনেক বেশি ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত হতে সাহসী হয়ে উঠে। তদুপরি ওলন্দাজদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে তারা দাক্ষিণাত্যে আরো মজবুত ও নিরাপদ অবস্থান লাভের জন্য আগ্রহী হয়ে উঠে। এই নীতির অংশ হিসেবেই তারা গোপনে চন্দ্রগিরির রাজার নেতৃত্বে কর্ণাটকে এক হিন্দু-বিদ্রোহ সংঘটনে উস্কানী দেয়।[১৪৯] বিপরীতক্রমে, ওলন্দাজরা দাক্ষিণাত্যে একটি সফল হিন্দু বিদ্রোহের পরিনামে ইংরেজদের ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধি পাবে এই আশংকায় মীর জুমলার প্রতি আরো বেশি ঝুঁকে পড়ে এবং হিন্দুদের দ্বারা পুলিকট আক্রান্ত হলে তাকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

মীর জুমলা ও ইংরেজদের মধ্যকার সম্পর্কের এই টানাপোড়েনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে একদিকে নির্যাতন ও হয়রানি করার অভিযোগ এনে এবং অন্যদিকে তাদেরকে প্রদত্ত বাণিজ্যিক সুবিধা লঙ্ঘন ও শত্রুতা করার পাল্টা অভিযোগের মধ্য দিয়ে। এই বিবাদ ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্টে চরমে পৌঁছে, যখন ইংরেজরা লোহিত সাগরে (মক্কা) মীর জুমলার একটি জাহাজ ও মালামাল এবং ৪টি আগ্নেয়াস্ত্র আটক করে। ইংরেজদের এই কাজের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মীর জুমলার সৈন্যরা মাদ্রাজের সেন্ট জর্জ দূর্গ আক্রমণ করে। অবশেষে ইংরেজদের প্রতিনিধি গ্রীণহিল ও মীর জুমলার প্রতিনিধিদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হয় এবং ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে তাদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তির শর্তানুযায়ী মীর জুমলা বাৎসরিক ৩৮০ প্যাগোডার বিনিময়ে মাদ্রাজের শুল্ক ও রাজস্বের উপর থেকে তাঁর

---

১৪৯ ই.এফ.আই. ১৬৫৫-১৬৬০, পৃঃ ৯২-৯৪, ২৮৮

দাবী ত্যাগ করেন। আরো আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মসলিপটমে মীর জুমলার প্রতিনিধির নিকট তার বাণিজ্য· পোতটি সমর্পণ করা হয়। কিন্তু অল্প পরেই ইংরেজরা এটি পুনঃদখল করে নেয়।[১৫০]

(খ) বাংলার বিদেশী বণিকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক

উত্তরাধিকার যুদ্ধে আওরঙ্গজেবকে সাহায্য করার জন্য ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে মীর জুমলা বিহারে আসেন এবং পরে শাহ শুজার পশ্চাদধাবন করার জন্য তাঁকে বাংলায় প্রেরণ করা হয় বলে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে তিনি যখন বাংলায় আসেন, তখনও তাঁর বাণিজ্যিক পোত নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর বিবাদ অমীমাংসিত ছিল। তবে ওলন্দাজদের সঙ্গে তখন তাঁর সম্পর্ক মোটামুটি মিত্রতাপূর্ণ ছিল। নতুন প্রদেশে তাদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারে স্বাভাবিকভাবেই এসব বিষয়ের প্রতিফলন ঘটে। ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহানের দেয়া ফরমানের উদ্দেশ্য অপব্যাখ্যা করে শাহ শুজার নিকট থেকে ইংরেজরা যে সন্দেহজনক ও চাতুর্যপূর্ণ বাণিজ্যিক সুবিধা আদায় করে, তা তাদের অবস্থানকে আরো জটিল করে তোলে[১৫১]।

বিহারের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় মীর জুমলা মাদ্রাজ উপকূলে আটককৃত তাঁর জাহাজ ও পণ্য সামগ্রীর ক্ষতিপূরণ না দেয়া পর্যন্ত ইংরেজদেরকে পাটনায় ব্যবসা-বানিজ্য এবং পণ্য সামগ্রী পরিবহন করার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পাটনার ইংরেজ কুঠিয়াল চ্যাম্বারলেন একাধিকবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং সাড়ে চার মাসের মধ্যে হয় জাহাজ ফেরত নয় ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হন। চ্যাম্বারলেন এই ব্যাপারে মাদ্রাজ কর্তৃপক্ষের নিকট জরুরী বার্তা প্রেরণ করেন এবং পাটনায় তার পক্ষ থেকে মধ্যস্থতা করার জন্য প্রভাবশালী বন্ধুদেরও নিয়োগ করেন। এই ব্যবস্থার ফলে মীর জুমলা পাটনায় ব্যবসা করার জন্য ইংরেজদের উপর হতে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে দেন।[১৫২] তবে মাদ্রাজ কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে দ্রুত মীমাংসা করার জন্য তেমন আগ্রহী ছিলেন না। তারা ধীরে চলার নীতি এবং শাহ শুজার বিরুদ্ধে মীর জুমলার অভিযানের শেষ ফলাফল দেখার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এমনকি তারা শাহ শুজার সাফল্যও কামনা করতেন। বাস্তবিকই কিছুদিন পর্যন্ত মীর জুমলা প্রধানতঃ

---

১৫০ ই.এফ.আই পৃঃ ২৬৩, ২৬৪-৫
১৫১ ই.এফ.আই. ১৬৫৫-১৬৬০, পৃঃ ৪১, ৪২, ৯৩
১৫২ ই.এফ.আই. ১৬৫৫-১৬৬০, পৃঃ ২৮০-২৮২

তাকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। এইভাবে বাংলায় প্রবেশ করার পর শুজার আক্রমণের বিরুদ্ধে নদ-নদীসমূহের নিরাপত্তা রক্ষায় তিনি পর্তুগীজদের নৌ-সাহায্য চেয়েছিলেন এবং পেয়ে ছিলেন। ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠির প্রধান কেন (Ken) ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে মীর জুমলার সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং তাঁকে প্রচলিত উপঢৌকন পেশ করেন। মীর জুমলা উপঢৌকন গ্রহণ করতে অস্বীকার জ্ঞাপন করেন এবং দু'মাসের মধ্যে তাঁর জাহাজ ফেরত এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবী পুনঃ উত্থাপন করেন এবং এই দাবী অমান্য করলে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়ার জন্য আবার হুমকী প্রদান করেন।[১৫৩] দুই মাস সময় নির্ধারণ করা মনে হয় পাটনায় ফেব্রুয়ারিতে চেম্বারলেন সাড়ে চার মাসের মধ্যে বিষয়টি মিটমাট করার জন্য যে অঙ্গীকার করেছিলেন, তার সঙ্গে সম্পর্কিত। মীর জুমলার কঠোর মনোভাবের প্রেক্ষিতে হুগলীর ইংরেজ প্রতিনিধি হলষ্টীড (Halstead) একজন স্থানীয় কর্মকর্তার প্রদত্ত পত্র নিয়ে মে মাসের শেষের দিকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এর প্রেক্ষিতে মীর জুমলা তাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি দিতে সম্মত হন, যদি হলষ্টিড (Halstead) এবং কেন (Ken) উভয়ে তাঁকে লিখিত অঙ্গীকারনামা দেন যে, এক মাসের মধ্যে তারা তাঁর সকল ক্ষতি পূরণ করে দিবেন।[১৫৪]

অঙ্গীকারনামাটি সত্যিকারভাবে দেয়া হয়েছিল কি না, তা জানা যায়নি। "তা দেয়া হোক বা না হোক, মীর জুমলার পক্ষে তাঁর ইউরোপীয় পরিদর্শকদের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার সময় খুব কমই ছিল" লিখেছেন ইংরেজ কুঠির নথি-পত্রের সম্পাদক। কারণ তিনি একটি চমকপ্রদ খবর জানতে পারেন যে, সুলতান মুহাম্মদ (মীর জুমলার সঙ্গে আসা আওরঙ্গজেবের পুত্র) ৮ই জুন পালিয়ে গিয়ে শাহ্ শুজার পক্ষে যোগ দিয়েছেন।[১৫৫]

১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দের জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত মীর জুমলা শুজার সঙ্গে যুদ্ধে খুবই ব্যস্ত ছিলেন। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা বাণিজ্যিক পোতের বিষয়টি আর নিস্পত্তি করেনি। আগস্টের শেষের দিকে যুদ্ধের মোড় সুনিশ্চিতভাবে মীর জুমলার পক্ষে ঘুরে যায়। তখন তিনি কেনকে (Ken) কাশিমবাজার থেকে মুর্শিদাবাদে ডেকে পাঠান এবং বাংলায় নবনিযুক্ত প্রধান ইংরেজ কুঠিয়াল ট্রেভিসা (Trevisa) না পৌঁছা পর্যন্তঅপেক্ষা করতে বলেন। তিনি ২৩শে আগস্ট বালাশোরে পৌঁছেন, তবে নভেম্বরের পূর্বে তার সদর দপ্তর

---

১৫৩ ই.এফ.আই. ১৬৫৫-১৬৬০, পৃঃ ২৮০-২৮৭

১৫৪ ই.এফ.আই. ১৬৫৫-১৬৬০, পৃঃ ২৮০-২৮৭

১৫৫ হলষ্টিড এবং কেনের (Ken) মাদ্রাজে যুক্তভাবে লেখা পত্র, জুন ৮, ১৬৩৯, পৃঃ ২৭৫।

গুজবে বিশ্বাস করে মাদ্রাজ কর্তৃপক্ষ ট্রেভিসাকে (Trevisa) উপদেশ দেন যে, যদি মীর জুমলার কার্যকলাপে তাদের বাণিজ্যেক স্বার্থহানি হয়, তাহলে তিনি (ট্রেভিসা) যেন তাকে এই বলে হুমকি দেন যে, "ইংরেজদের নিজ স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার মত শক্তি-সামর্থ রয়েছে।" যেহেতু মাদ্রাজ কর্তৃপক্ষের ধারণা থেকে বাংলার পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাই ট্রেভিসা আর বাস্তবে এমন কোন হুমকি প্রদান করেননি। মীর জুমলা শেষ পর্যন্ত পদক্ষেপ নেন। তিনি ট্রেভিসাকে হুগলীতে প্রেরণ করার জন্য বালাশোরের শাসনকর্তাকে নির্দেশ দেন এবং ইংরেজদের সকল রপ্তানির উপর ৪% কর ধার্য এবং জাহাজের জন্য নোঙর কর আরোপ করারও নির্দেশ দেন। কিন্তু মীর জুমলা যে ইংরেজদের বাণিজ্য বন্ধ করে দেননি বা তাদের পণ্যসামগ্রী আটক করেননি, যেমন তিনি প্রথম দিকে হুমকি দিয়েছিলেন, তা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি সংযম এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করাই পছন্দ করতেন। ৪% হারে শুল্ক দাবী করা অত্যধিক কিছু ছিল না, যেহেতু সমগ্র মোগল সাম্রাজ্যব্যাপীই পর্তুগীজদেরসহ সকল বিদেশী বণিকদের নিকট থেকে কম-বেশি এই হারেই কর আদায় করা হত। তদুপরি ইংরেজদেরকে শাহ শুজার প্রদত্ত কোন মঞ্জুরী সম্পর্কে মীর জুমলার জানা থাকার কথা নয়, আবার তাও ছিল ত্রুটিপূর্ণ। মীর জুমলা কর্তৃক এই দাবি উত্থাপনের পূর্বে তারাও কখনো মীর জুমলার নিকট এই প্রসঙ্গটি তোলেননি। তদুপরি, যেহেতু মীর জুমলা শুজার সঙ্গে যুদ্ধরত ছিলেন, তাই তারাও (ইংরেজরা) এই বিষয়ে তাঁর নিকট স্বাভাবিকভাবে কোন দাবি পেশ করতে পারেন না। জাহাজ নোঙর করার জন্য কর আরোপের বিষয়টিও নতুন, যদিও পোত সংক্রান্ত ব্যাপারটি নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে স্পষ্টতই চাপ প্রয়োগের জন্যই তা করা হয়েছিল।

১৬৫৯ সালের জন্য অবশ্য শুল্ক বা নোঙর কর কোনটাই আদায় বা পরিশোধ করা হয়নি, কারণ মাদ্রাজ থেকে বাংলায় যে সকল জাহাজ প্রেরণ করা হয়েছিল, সেগুলো ইতিমধ্যেই পণ্য বোঝাই করে পুনরায় চলে গিয়েছিল।[১৫৮] ঐ সব জাহাজে যে সকল পণ্য বহন করা হয়েছিল, সে সম্পর্কে জানা যায় কোম্পানীর প্রতিনিধিদেরকে পণ্য কেনার জন্য প্রেরিত অর্থের পরিমাণ থেকে। যেমন পাটনায় প্রেরণ করা হয়েছিল ৫০০০ পাউন্ড এবং কাশিমবাজারে ৪০০০ পাউন্ড। এই অর্থ দ্বারা ৮,০০০-১০,০০০ পিস দীর্ঘ তাফেতা কাপড়, ৫০০০ পিস সরু, ৮০০ টন সোরা (প্রতি টন প্রায় ৬ পাউন্ড), ৭০০ টন চিনি, ১০০ বেল রেশম (৯০-১০০ টাকা প্রতি মণ), ৪০০ বেল সূতার পেটি, ৩০ টন হলুদ, ১,০০০টি আদাতে স্যান্নোস (এক ধরণের কাপড়), ২০০০টি হাররাপুর স্যান্নোস

১৫৮ হলষ্টিড এবং কেনের পত্র, পৃঃ ২৭৫

এবং দারুচিনি যা সম্ভব, সংগ্রহ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয় ।[১৫৯] এসব পণ্যের মধ্যে শুধু সোরা সংগ্রহ হত পাটনা থেকে, আর অন্যান্য সকল পণ্য বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করা হত।

তবে মীর জুমলার দাবী ইংরেজ কুঠিয়ালদের জন্য কিছুটা কষ্টকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। স্থানীয় বেনিয়ারা ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা এবং অর্থ লগ্নি করতে ইতস্ততঃ করত, কেননা মীর জুমলা কর্তৃক ইংরেজদের পণ্য সামগ্রী আটক করা হতে পারে। এই অবস্থায় ট্রেভিসা এই "বিশেষ সমস্যার" বর্ণনা দিয়ে সুরাট ও মাদ্রাজে তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র লিখেন এবং তাদেরকে অনুরোধ করে বলেন যে, যদি তারা "ভারতের মধ্যে সর্বাধিক বিকাশমান" বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে পূর্ণ সুবিধা লাভ করতে চান, তাহলে যেন "অপ্রীতিকর ও সমস্যা সৃষ্টিকারী" জাহাজের ব্যাপারটির একটি মীমাংসা করে ফেলেন।[১৬০] এই পত্র প্রেরণের পরে মাদ্রাজ ও সুরাটের কর্তৃপক্ষ জাহাজের ব্যাপারটি নিষ্পত্তির জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেন এবং বাণিজ্যিক সুবিধার জন্য আওরঙ্গজেবের নিকট আবেদন করেন।[১৬১] ইতিমধ্যে কেনসহ (Ken) ট্রেভিসা ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে মীর জুমলার সহিত সাক্ষাত করেন এবং তাঁর সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তি অনুযায়ী (ক) মীর জুমলার পোত এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'অন্য সকল জিনিস' যা মাদ্রাজের ইংরেজ প্রতিনিধি এবং অন্যরা নিয়েছে, তা সবই তাঁকে (মীর জুমলাকে) ফেরত প্রদান করা হবে এবং (খ) পুরা ব্যাপারটি মীর জুমলার মসলিপটমের প্রতিনিধি তাবাতাবাই এবং ট্রেভিসার মনোনীত ব্যক্তিগণ চার মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করে দেবেন।[১৬২] এই চুক্তির পরে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী মীর জুমলা সম্রাট শাহ জাহান এবং শাহ শুজা কর্তৃক তাদেরকে প্রদত্ত সুবিধা অনুযায়ী ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়ে এক পরওয়ানা জারী করেন।[১৬৩] এইসব থেকে বুঝা যায় যে, মীর জুমলা তাদের সঙ্গে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত আচরণ করেছেন। ট্রেভিসা লিখেছেন যে, "আমি চিন্তা করেছিলাম যে, তাঁর সকল দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমি মুক্তি পাব না। কিন্তু আল্লাহকে ধন্যবাদ যে, ব্যাপারটি অন্য রকম প্রমাণিত হল। সুতরাং আমি তাঁর

---

১৫৯. হলষ্টিড এবং কেনের পত্র, পৃঃ ২৭৫-২৭৬, ওলন্দাজদের বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল এর থেকে অনেক বেশি
১৬০. হলষ্টিড এবং কেনের যৌথভাবে লেখা পত্র, পৃঃ ২৯৪-২৯৭
১৬১. মাদ্রাজের নিকট লেখা সুরাটের পত্র, ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৬৬০ এবং বাংলার নিকট মাদ্রাজের পত্র ২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৬৬০, পৃঃ ৩৮৯-৩৯০
১৬২. মাদ্রাজের নিকট লেখা সুরাটের পত্র, ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৬৬০ এবং বাংলার নিকট মাদ্রাজের পত্র ২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৬৬০, পৃঃ ৩৯০-৩৯১
১৬৩. মাদ্রাজের নিকট লেখা সুরাটের পত্র, ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৬৬০ এবং বাংলার নিকট মাদ্রাজের পত্র ২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৬৬০, পৃঃ ৩৯১,৪১৬

পরওয়ানা পেয়ে গেছি, যা দ্বারা আমরা পূর্বে যে সকল সুবিধা ভোগ করেছি, বৃদ্ধ রাজা (শাহ জাহান) এবং শাহজাদা আমাদেরকে যা দিয়েছিলেন, তিনি তা সবই নিশ্চিত করেছেন"।[১৬৪]

কিন্তু মাদ্রাজের ইংরেজ কর্তৃপক্ষ সমভাবে যুক্তিযুক্ত আচরণ করেননি, তারা শুধু জাহাজটি ফেরত প্রদানের উপর জেদ ধরেন, যেহেতু "এটাকে ভালভাবে মেরামত এবং সুসজ্জিত করা হয়েছে"; আর জাহাজের পণ্যসামগ্রী এবং ক্ষতিপূরণ মিলিয়ে ৫০,০০০ প্যাগোডার দাবী প্রত্যাহার করে নেয়ার আবেদন জানান। ফলে উপরোক্ত চুক্তির শর্তানুযায়ী চার মাসের মধ্যে বিষয়টির নিষ্পত্তি করা হয়নি। ইংরেজদের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা বিশেষ করে শাহজাদা শুজার প্রদত্ত সুবিধার ধরণ নিয়ে মতভেদের সৃষ্টি হয়।

সম্রাটের ফরমান অসত্যভাবে উত্থাপন করে আদায়কৃত সুযোগ-সুবিধার শর্তাবলী এবং ভিত্তি উভয়ই ছিল ত্রুটিপূর্ণ[১৬৫] এবং দেখা যাবে যে, ঐ ফরমান দ্বারা তাদেরকে আসলে কি দেয়া হয়েছিল, সে সম্পর্কে ইংরেজদেরও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। মনে হচ্ছে মীর জুমলা এমনভাবে ব্যাখ্যা করতেন যে, এর দ্বারা ইংরেজরা নিয়মিত শুল্ক দেয়ার পরিবর্তে বাৎসরিক মাত্র ৩০০০ টাকা প্রদান করবেন। যেহেতু জাহাজের সমস্যাটি নিষ্পত্তি করা হয়নি, তাই তিনি নোঙর কর প্রদানের বিষয়টি পুনঃউত্থাপন করবেন বলে মনে হচ্ছে। ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের জুনের শেষের দিকে মাদ্রাজের কর্তৃপক্ষ শক্তি প্রয়োগের বিষয় চিন্তা-ভাবনা করছিলেন এবং বাংলার কুঠিয়ালকে এই মর্মে পরামর্শ দেন যে, তাদেরকে দেশটি (বাংলা) ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, যদি মীর জুমলা শুধু জাহাজটি ফেরত নিয়ে সন্তুষ্ট না হয়, "যেন আমরা মুরদের (মুসলমানদের) বিরুদ্ধে অন্য ভাষা প্রয়োগ করতে পারি। যদি তারা তোমার কোম্পানীর সকল বিষয় সম্পদ আটকও করে, তবু তোমাকে সে দেশ ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। যদিও তুমি সকল সম্পদ হারাও (তাতে তেমন ক্ষতি নেই), কারণ আমরা সেগুলো শীঘ্রই পুনরুদ্ধার করব"।[১৬৬] এক সপ্তাহ পরে আরেক পত্রে মাদ্রাজের কর্তৃপক্ষ "শক্তি প্রয়োগের" ইচ্ছা পুনরুল্লেখ করেন। তারা ট্রেভিসার কাছে আরো জানতে চান যে, "তোমার প্রতি কি কি অন্যায় করা হয়েছে এবং কি কি বিষয়ে তোমার ক্ষোভ বা অভিযোগ রয়েছে।" তাকে বাণিজ্য সংক্রান্ত শুল্কের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে বলা হয়েছে, "যেন আমরা এ ব্যাপারটি বুঝতে পারি; উদাহরণস্বরূপ,

---

১৬৪ বান্টামের কুঠিয়ালদের লেখা ট্রেভিসার পত্র, ২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৬৬০, পৃঃ ৩৯১

১৬৫ বান্টামের কুঠিয়ালদের নিকট লেখা ট্রেভিসার পত্র, পৃঃ ৩৭২-৩৭৪

১৬৬. মদ্রাজের পত্র ট্রেভিসার নিকট, ২১শে জুন ১৬৬০, ই.এফ.আই. ১৬৫৫-১৬৬০, পৃঃ ৩৯১-৩৯২

সাবেক রাজার মঞ্জুরীর ফলে তোমাদের কি কাউকে কিছু দিতে হত না বা এটা ছিল গভর্ণরের শুধু সৌজন্য এবং কত দীর্ঘ সময়ব্যাপী তোমরা তা প্রদান করছ না ইত্যাদি। আমাদের জাহাজ নোঙরের জন্য আমরা কোন কিছুই প্রদান করব না"।[১৬৭] এই বার্তা থেকে দেখা যায় যে, (১) মাদ্রাজের কর্তৃপক্ষ মীর জুমলার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের চিন্তা করলেও তারা সঠিকভাবে জানতেন না যে, তিনি বাংলায় ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি কি অন্যায় বা ক্ষতিসাধন করেছেন; এবং (২) তারা (মাদ্রাজের কর্তৃপক্ষ) এ ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে কিছু জানতেন না যে, শাহ শুজার মঞ্জুরী দ্বারা তারা কি পেয়েছিলেন। একই বার্তায় তারা সম্রাট আওরঙ্গজেবের দরবারে বাণিজ্যিক সুবিধা আদায়ের জন্য একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন, তা থেকেই এই বিষয়ে তাদের সন্দেহের ব্যাপারটি আরো প্রকাশ হয়ে পড়ে।[১৬৮]

শুল্ক থেকে অব্যাহতি পাওয়ার ব্যাপারে ট্রেভিসা কি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, তা জানা যায়নি। তবে ৪ঠা জুলাই তিনি মাদ্রাজের কাউন্সিল এবং প্রেসিডেন্টকে অবহিত করেন যে, জাহাজের ব্যাপারে মসলিপটমের আলাপ-আলোচনায় মীর জুমলা অসন্তুষ্ট হয়ে কাশিমবাজারের ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দিয়েছিলেন।[১৬৯] এটা ছিল স্পষ্টতই আংশিক নিষেধাজ্ঞা; কারণ ট্রেভিসা অন্যান্য জায়গার ব্যবসা সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেননি। মাদ্রাজের কর্তৃপক্ষ ইতিপূর্বেই শক্তি প্রয়োগ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতেছিলেন এবং এখন এই পত্র পাওয়ার পর তারা সিদ্ধান্ত করেন যে, "যদি এই গবর্ণর (মীর জুমলা) সেখানে থাকেন, তাহলে আমরা সেখানে থাকব না, আমাদেরকে চলেই আসতে হবে।" যেহেতু আওরঙ্গজেবের দরবারে এই নিয়ে আলাপ-আলোচনা সমাপ্ত হয়নি, সেখান থেকে কোন সুবিধাজনক মীমাংসাও হতে পারে। তাই এ ব্যাপারে ট্রেভিসাকে সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়ে বলা হয়, "কিছু উপঢৌকন দিয়ে মীর জুমলার মুখ বন্ধ করে দিন, জাহাজটি ফেরত দেয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিও দিতে পারেন এবং এতে যেন কোন ভুল না হয়। আপনি তাঁর সঙ্গে ভাল ভাল কথা বলে অবশিষ্ট বিষয়েও তাঁর মনে আশার সঞ্চার করুন," ট্রেভিসার প্রতি মাদ্রাজ কর্তৃপক্ষের উপদেশ[১৭০]। মাদ্রাজ কর্তৃপক্ষ বাংলায় এক "বিরাট জাহাজের বহর" প্রেরণ করেন এবং আরো বলেন, "এমনও হতে পারে যে, এই বিরাট জাহাজের বহর পৌঁছতে দেখে তারা (মীর জুমলা এবং তাঁর লোকজন) ভয় পেয়ে যাবে

---

১৬৭ মাদ্রাজের পত্র ট্রেভিসার নিকট, ২৮শে জুন ১৬৬০, পৃঃ ৩৯২।

১৬৮ ট্রেভিসার নিকট মাদ্রাজের পত্র, জুন ২৮, ১৬৬০, পৃঃ ৩৯২ ·

১৬৯ মাদ্রাজে লেখা ট্রেভিসার পত্র, ৪ঠা জুলাই, ১৬৬০, পৃঃ ৩৯২

১৭০ ট্রেভিসাকে লেখা মাদ্রাজের পত্র, ২৯শে আগস্ট ১৬৬০, পৃঃ ৩৯২-৩৯৩

এবং (সম্ভব হলে নদীর উজানে এগুলো নিয়ে যাবেন) মেনে নিবে আমাদের শর্ত।" মোটের উপর ট্রেভিসাকে শেয়ালের বেশে সিংহের ভূমিকা পালন করতে বলা হয়; "আপনি অবশ্যই তাঁকে উপঢৌকন দিবেন এবং সিংহের গায়ে শিয়ালের চামড়া জড়িয়ে নিন।"[১৭১]

এবারও দক্ষিণ ভারতের কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ মীর জুমলা সম্পর্কে যা ধারণা করেছিলেন, তা থেকে তাকে অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত মনে হয়। বাংলায় তাদের বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দিলেও তিনি হুগলীর কুঠিয়াল ট্রেভিসাকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য ডেকে পাঠান।[১৭২] ট্রেভিসা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং তাদের বাণিজ্য সুবিধা নিয়ে মীর জুমলার সঙ্গে আলোচনার পর ট্রেভিসা তার ন্যায়সঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ বাৎসরিক সর্বসাকুল্যে তিন হাজার টাকা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আশ্বস্থ হন। মনে হচ্ছে যে, এই টাকা অবিলম্বেই প্রদান করা হয়েছিল এবং তাদেরকে পূর্বের মতই স্বাভাবিকভাবে বাংলায় বাণিজ্য করার অনুমতি দেয়া হয়। এই খবর জানতে পেরে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের ৩রা নভেম্বর সুরাটের কর্তৃপক্ষ ট্রেভিসাকে লিখেন যে, "অন্যের অধিকার হরণকারীদের দ্বারা প্রবর্তিত একটি কুপ্রথা চলতে দিয়ে আপনি একটি খারাপ কাজ করছেন। একজন ক্ষুদ্র গভর্ণরকে তিন হাজার টাকা দেয়ার মত একটি বড় উপঢৌকন দিয়েছেন যা আমরা সাধারণতঃ রাজাকে দিয়ে থাকি।"[১৭৩] ট্রেভিসা অবশ্য ভালভাবে পরিস্থিতি উপলব্ধি করার মত অবস্থানে ছিলেন এবং তিনি লিখেছেন যে, নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের ব্যবসা ভালভাবে চলার সম্ভাবনা রয়েছে এবং বাংলায় ১৫০০ মণ সোরা জাহাজে তোলার অপেক্ষায় আছে।[১৭৪]

এই ঘটনা দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্বস্তি নিয়ে আসে। এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ট্রেভিসা ছাড়াও কোম্পানীর দক্ষিণ ভারতের কর্তৃপক্ষ উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, পূর্ব থেকেই "শুল্ক" হিসেবে বছরে যে তিন হাজার টাকা প্রদান করা হয়ে থাকে, আসলে শাহ শুজাই এই ব্যবস্থা করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ এই ঘটনা থেকে আরো বুঝা যায় যে, যদিও মীর জুমলা তাঁর জাহাজটি ফেরত এবং এর পণ্যদ্রব্যের জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়ের দাবীতে অটল ছিলেন, তবুও তিনি এই বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য আরো সময় দিতে এবং বাংলায় ইংরেজদেরকে বাণিজ্য করতে অনুমতি দিতেও ইচ্ছুক ছিলেন, যদি ইংরেজরা দেশের প্রচলিত আইন-

১৭১ ট্রেভিসাকে লেখা মাদ্রাজের পত্র, ২৯শে আগস্ট ১৬৬০, পৃঃ ৩৯৩
১৭২ মাদ্রাজে লেখা ট্রেভিসার পত্র
১৭৩ ট্রেভিসাকে লেখা সুরাটের পত্র, ৩রা নভেম্বর, ১৬৬০, ঐ
১৭৪ সুরাটে লেখা মাদ্রাজের পত্রে উদ্ধৃত, ঐ

কানুন মেনে চলে এবং পূর্ব থেকেই তারা যে টাকা শুল্ক হিসেবে প্রদান করার অঙ্গীকার করেছিল, তা দিতে রাজী থাকে। বাস্তবিকপক্ষে, মীর জুমলার জীবদ্দশায় জাহাজের ব্যাপারটি আর মীমাংসা হয়নি। ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দে এক দুর্ঘটনায় জাহাজটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যায় এবং মাদ্রাজ কর্তৃপক্ষ এটার পরিবর্তে অন্য একটি জাহাজ প্রদানের প্রস্তাব দেয়, দৃশ্যত তা ছিল অনেক নিম্নমানের এবং তারা আরো জানায় যে, আটককৃত মালামাল এবং জাহাজটি ব্যবহারের জন্যও তারা কোন ক্ষতিপূরণ দেবে না।[১৭৫] এই আলোচনা ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে মীর জুমলার মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত থাকে এবং তখন তারা তাদের ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষকে জানায় যে, এই বিষয়টি এবার বিস্মৃতির অতল তলে পাঠিয়ে দিতে সুবিধা হবে।

মীর জুমলা কর্তৃক জাহাজ সমস্যাটির নিষ্পত্তির ব্যাপারে পরোক্ষভাবে সময় দেয়ার একটি কারণ মনে হচ্ছে এই যে, তিনি ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে হিজলীর বিদ্রোহী জমিদার বাহাদুর খানকে দমনের জন্য ব্যতিব্যস্ত ছিলেন।[১৭৬] আরেকটা কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, ইংরেজরা যদি বাংলায় তাদের নিয়মিত বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালু রাখে, তাহলে তিনি নিজেও তাদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যেতে পারবেন। যেমন তাদের নিকট তাঁর অর্থ লগ্নি করা এবং তাদের জাহাজের সাহায্যে পারস্যে তাঁর পণ্য রপ্তানী করা। প্রকৃতপক্ষে এ সময় থেকে বাংলায় কোম্পানীর প্রতিনিধি ট্রেভিসা তার ব্যক্তিগত ব্যবসা এবং কোম্পানীর বিনিয়োগের জন্য তাঁর থেকে বিশাল অংকের টাকা ঋণ নিয়েছেন। মাদ্রাজের কর্তৃপক্ষ ট্রেভিসার এই ধরণের লেন-দেনের প্রতি প্রথম দিকে সম্মতি দিলেও পরে একে তার ব্যক্তিগত দায় বলে গণ্য করতে শুরু করেন।[১৭৭]

১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে ট্রেভিসা কিছুসংখ্যক স্থানীয় বণিকের নিকট থেকে তার পাওনা আদায়ের উদ্দেশ্যে জামিন করার জন্য ঔদ্ধত্যের সঙ্গে মীর জুমলার একটি নৌকা হুগলীতে আটক করে। মীর জুমলা এই বিষয়ে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন এবং ইংরেজদেরকে বাংলা থেকে বহিষ্কার করার হুমকি দেন। তাই মাদ্রাজ কর্তৃপক্ষ ট্রেভিসাকে নৌকা ফেরত দিয়ে মীর জুমলার নিকট দুঃখ প্রকাশ করার জন্য নির্দেশ দেন এবং ট্রেভিসা তাই করেন। একই বৎসর দেখা যায় যে, ইংরেজরা বাংলায় ওলন্দাজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে, বিশেষ করে পাটনায় সোরা সংগ্রহের ব্যাপারে। সেখানে ইংরেজ কুঠিয়াল চেম্বারলেন

---

১৭৫ ই.এফ.আই. ১৬৬১-১৬৬৪, পৃঃ ১৪৮-১৪৯
১৭৬ উপরোক্ত পৃঃ ৩৮৪
১৭৭ ই.এফ.আই. ১৬৬১-১৬৬৪, পৃঃ ১৪৮-১৪৯

দীওয়ান মির্যা লুৎফুল্লাহ বেগকে একচেটিয়াভাবে সোরার ব্যবসা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন এবং তার সঙ্গে এই সমঝোতায় পৌঁছেন যে, ইংরেজরা তার নিকট থেকে সমস্ত সোরা কিনে নেবে। অতএব, "এরপর মির্যা লুৎফুল্লাহ বেগ তার নিকট সোরা প্রদানের জন্য বণিকদের উপর বল প্রয়োগ শুরু করেন, এমনকি ওলন্দাজদের সঙ্গে তাদের সম্পাদিত চুক্তি উপেক্ষা করে হলেও"।[১৭৮] হুগলীর ওলন্দাজ প্রধান, মেথুসভ্যান ডেন ব্রোয়েক মীর জুমলা এবং ট্রেভিসা উভয়ের নিকট অভিযোগ করেন। ট্রেভিসা এই ব্যাপারে কিছু জানেন না বলে জানান এবং দীওয়ানের সঙ্গে কোন কারবার করবেন না বলে ওলন্দাজ প্রধানের সঙ্গে একমত হন। মীর জুমলা এই ব্যাপারে দ্রুত মির্যা লুৎফুল্লাহ বেগের নিকট একটি পরোয়ানা প্রেরণ করেন এবং ওলন্দাজদের স্বাধীনভাবে এই পণ্যের ব্যবসায় বাধা না দেয়ার জন্য তাকে নির্দেশ দেন।[১৭৯] কিন্তু তা সত্ত্বেও চেম্বারলেন গোপনে লুৎফুল্লাহর নিকট থেকে সোরা কেনা অব্যাহত রাখেন।[১৮০]

বাংলায় ওলন্দাজদের ব্যবসা ইংরেজদের ব্যবসা থেকে অনেক বেশি বড় আকারের ছিল। বলা হয়েছে যে, ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে ওলন্দাজদের মুনাফা হয়েছিল ১,৫৫,৭৪৪ স্বর্নের দিনার এবং পরবর্তী বৎসরগুলিতে ২,০৪.২০০ স্বর্নের দিনার করে[১৮১]। ওলন্দাজরা কোন সমস্যা সৃষ্টি না করেই নিয়মিতভাবে শুল্ক প্রদান করত এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট থেকেও দ্রুত একটি নতুন ফরমান সংগ্রহ করে।[১৮২] তারা সামরিক দিক থেকেও মীর জুমলার জন্য অধিক সহায়তাকারী ছিল; তবু তিনি ব্যবসার ক্ষেত্রে তাদের এবং ইংরেজদের মধ্যে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতেন। একমাত্র তিনি যখন আসাম অভিযানে দূরে চলে গিয়েছিলেন, সম্ভবত তখন পাটনায় চেম্বারলেনের ওলন্দাজ বিরোধী কাজকারবারের প্রতিশোধ নিতে ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দে বালাশোরের ওলন্দাজরা বালাশোরের গভর্ণরকে ইংরেজদের দ্বারা ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত পণ্যসামগ্রী হুগলীতে প্রেরণে বাধা সৃষ্টি করার জন্য উস্কানী দেয়। মাদ্রাজের ইংরেজ কুঠিয়াল লিখেছেন যে, "এটা হচ্ছে ওলন্দাজদের কর্ম, কারণ তারা সেখানে একটি কুঠি স্থাপন করতে যাচ্ছে এবং তাকে খুব বড় আকারের উপঢৌকন দিয়েছে।"[১৮৩]

---

১৭৮ হুগলী থেকে ওলন্দাজদের পত্র. ২৯শে জানুয়ারি ১৬৬১. বাটাভিয়া দাগ রেজিস্টার. ১৬৬১. পৃঃ ৭৫. ই.এফ.আই.-তে উদ্ধৃত. পৃঃ ৬৯

১৭৯ হুগলী থেকে ওলন্দাজদের পত্র. ২৯শে জানুয়ারি ১৬৬১. বাটাভিয়া দাগ রেজিস্টার. ১৬৬১. পৃঃ ৬৯-৭০

১৮০ হুগলী থেকে ওলন্দাজদের পত্র. ২৯শে জানুয়ারি ১৬৬১. বাটাভিয়া দাগ রেজিস্টার. ১৬৬১. পৃঃ ৭০-৭১

১৮১ বাটাভিয়া দাগ রেজিস্টার. ১৬৬১. পৃঃ ৭ এবং ৩৯৭. ই.অএফ.আই-তে উদ্ধৃত পৃঃ ৭০-৭১

১৮২ বাটাভিয়া দাগ রেজিস্টার. ১৬৬১. পৃঃ ১৮৫

১৮৩ মদ্রাজ থেকে কোম্পানীকে লিখিত পত্র. ১০ জানুয়ারি. ১৬৬৩. ঐ পৃঃ ১৭৮

১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দের সমাপ্তির সঙ্গে বাংলায় মীর জুমলার সাথে ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানীর সম্পর্কের কাহিনীর যথার্থই ইতি টানা যেতে পারে। কারণ ঐ বৎসর নভেম্বরের শুরুতেই তিনি কুচবিহার ও আসাম অভিযানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন এবং দেখা যায় যে, ১৬৬২ খ্রিষ্টাব্দের পুরোটাই তিনি ঐ অভিযানে নিজেকে পুরোপুরি ব্যস্ত রাখেন এবং রাজধানীতে ফিরার পথে ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকেই তিনি ইন্তেকাল করেন। তথাপি ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় ইংরেজদের বাণিজ্য সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা সুবেদারের নীতির ব্যাপারে যে নজীর উপস্থাপন করে, তা উল্লেখ করা যেতে পারে। সে বৎসর ট্রেভিসার পরিবর্তে উইলিয়াম ব্লেককে বাংলায় ইংরেজ কোম্পানীর প্রধান এজেন্ট (দালাল) নিয়োগ করা হয়, কারণ ছিল সন্দেহাতিতভাবে তার উদ্ধত এবং অনিয়মিত কার্যকলাপ।

ব্লেককে বঙ্গপোসাগর এলাকায় "পণ্যদ্রব্য ক্রয় করার জন্য ২৫০০০ পাউন্ড নিয়ে আসতে বলা হয়েছিল"[১৮৪] এবং "বাংলায় বিনিয়োগের জন্য" আরও ২০০০০ রিয়াল ঋণগ্রহণ করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।[১৮৫] তাকে নতুন সরকার থেকে একটি ফরমান (মঞ্জুরী) নেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয় এবং তাকে এরূপ সতর্ক থাকতে বলা হয় যেন, "তাদেরকে ভবিষ্যতে সকল প্রকার কর, মাশুল, শুল্ক বা অন্য কোন অর্থ ধার্য করা থেকে মুক্ত করে দেয় এবং এটা সংগ্রহের জন্য আমাদেরকে পাঁচ থেকে ছয়শত পাউন্ড স্টার্লিং এর বেশি ব্যয় করতে হবে না,"[১৮৬] এই বৎসরের শেষে মাদ্রাজের কর্তৃপক্ষ ইংল্যাণ্ডে তাদের মনিবদের নিকট বাংলায় বাণিজ্য বৃদ্ধির যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রস্তাব পাঠায়, কারণ বাণিজ্য কম বা বেশি যা-ই করা হোক না কেন, হুগলীর গবর্ণর তাকে বৎসরে ৩ হাজার টাকা প্রদানের দাবী করেন"।[১৮৭] তাছাড়া, এই ব্যাপারে আবারো জোর দিয়ে বলা হয় যে, সোরার জন্য তাদেরকে "অবশ্যই বাংলার উপর নির্ভর করতে হবে।" নৌকাযোগে বালাশোরে পণ্য পরিবহনে খরচ বাঁচানোর জন্য হুগলী নদী দিয়ে জাহাজ উজানে প্রেরণের জন্য অনুমতি চায়।[১৮৮] এইসব বার্তা ইঙ্গিত দেয় যে, মীর জুমলার সময়ে বাংলায় ইংরেজদের বাণিজ্য একদিকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং অন্যদিকে ১৬৬২ খ্রিষ্টাব্দের দিকে মাদ্রাজের কর্তৃপক্ষ একটি নতুন

---

১৮৪ মাদ্রাজ থেকে কোম্পানীকে লিখিত পত্র, ১০ জানুয়ারি, ১৬৬৩, ঐ পৃঃ ১৬৪
১৮৫ মাদ্রাজ থেকে কোম্পানীকে লিখিত পত্র, ১০ জানুয়ারি, ১৬৬৩, ঐ পৃঃ ১৬৭
১৮৬ মাদ্রাজ থেকে কোম্পানীর নিকট লিখিত পত্র, পূর্বোক্ত ১৬৫ দেখুন, মাদ্রাজে লেখা সুরাটের পত্র, ৬ই নভেম্বর, ১৬৬২, ঐ পৃঃ ১৮৫
১৮৭ ঐ পৃঃ ১৭৭
১৮৮ ঐ পৃঃ ১৭৭, ১৭৮

ফরমান সংগ্রহের জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেন। কারণ, আগের ফরমানটি সত্যিকার অর্থে তাদেরকে শুল্ক প্রদান করা থেকে অব্যাহতি দেয়নি। এটাও এখন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, বাংলায় ইংরেজরা বৎসরে মাত্র একবার নির্ধারিত ৩০০০ টাকা শুল্ক হিসেবে প্রদান করত এবং তা প্রদান করেছে খুব সম্ভব মাত্র ১৬৬০, ১৬৬১ এবং ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দের জন্য; কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই বিষয়ে মীর জুমলা দৃষ্টি দেয়ার পূর্বেই জাহাজগুলো পণ্য বোঝাই করে পণ্য নিয়ে বাংলা ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। স্থানীয় কর্মকর্তাদেরকে "উপঢৌকন" দেয়া এবং অতিরিক্ত টাকা দাবীর ব্যাপারে মাঝে মাঝে এবং অস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু কোথায় কোন নথিতে সঠিকভাবে কত টাকা দেয়া হয়েছে, তার কোন উল্লেখ নেই। পক্ষান্তরে বাংলার ইংরেজ কুঠিগুলোর হিসাব-নিকাশে যে মারাত্মক অনিয়ম বিরাজমান ছিল এবং কোম্পানীর দালালদের যে ব্যক্তিগত ব্যবসা, তা বিচার করলে মনে হবে যে, প্রায়ই তারা যে কর্মকর্তাদের অতিরিক্ত অর্থ দাবীর অভিযোগ উত্থাপন করেছে এবং হিসাবেও দেখানো হয়েছে, তা অনিয়মকে আড়াল করার জন্যেই করা হয়েছে। হুগলী কুঠির ১৬৫৮-৫৯ সালের হিসাব-নিকাশ এবং কাশিমবাজার ও পাটনার ১৬৬০-৬১ খ্রিষ্টাব্দের হিসাব-নিকাশ ১৬৬২ খ্রিষ্টাব্দ শেষ হওয়ার পূর্বে মাদ্রাজে প্রেরণ করা হয়নি।[১৮৯]

১৬৬২ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে কোম্পানীর নিকট লিখা উপরোক্ত মাদ্রাজের পত্রে বাংলার হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে, "হিসাবের খাতাপত্রসমূহ দেশে পাঠানোর জন্য খুব বেশি অসম্পূর্ণ।"[১৯০] কোন কোন সময় বাংলায় যা ঘটতো, তা মাদ্রাজে বিকৃত করা হতো অথবা ভুল বুঝে সেভাবেই ইংল্যান্ডে জানানো হতো। উদাহরণস্বরূপ ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে পাটনায় চেম্বারলেনের ঘটনাটি উল্লেখ করা যায়। এই সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, চেম্বারলেন ওলন্দাজদের ক্ষতি করে সেখানকার দীওয়ানের মাধ্যমে একচেটিয়াভাবে সকল সোরা ক্রয়ের চেষ্টা করেছিলেন। অথচ এই ঘটনাকে মাদ্রাজ কর্তৃপক্ষ "বাংলার সকল পণ্যে মীর জুমলার পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপ" বলে জানিয়েছেন।[১৯১] বৎসরে তিন হাজার টাকার অতিরিক্ত কোন অর্থ বা সম্মানী মীর জুমলা ইংরেজদের থেকে

---

১৮৯ পূর্বোক্ত. পৃষ্ঠা ১৪৯

১৯০ পূর্বোক্ত পৃষ্ঠ ১৮৩

১৯১ পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৬৭ কে ৬৯ পৃষ্ঠার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সেখানে ওলন্দাজদের রেকর্ড পত্রের বরাত দিয়ে ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। কুঠির দলিল-পত্রের সম্পাদক ফষ্টার অনিয়ম চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, মাদ্রাজ কর্তৃপক্ষের এই প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করেই যদুনাথ সরকার এবং জগদিশ নারায়ণ সরকার উভয়েই বলেছেন যে, বাংলায় মীর জুমলার আর্থিক ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল একচেটিয়া কারবার। তিনি চেষ্টা করতেন যে, তিনি একাই সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যের একমাত্র মজুদদার হবেন। পরে বেশি দামে বিক্রি করবেন (এইচ.বি. ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৪, জগদিশনারায়ণ সরকার পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২১৬)। মীর জুমলা সম্পর্কে এই ধরণের বক্তব্যের কোন ভিত্তি নেই।

গ্রহণ করেছেন বলে জানা যায়নি। যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর জাহাজ নিয়ে বিবাদের কারণে মীর জুমলা ১৯৫৯ এবং ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের নিকট হতে প্রচলিত উপঢৌকন গ্রহণ করতেও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন। ১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কোন উপঢৌকন গ্রহণ করেছিলেন কি না তা জানা যায়নি। তবে তাঁর জীবনের অবশিষ্টাংশ তিনি কুচবিহার ও আসাম অভিযানে ব্যয় করেছেন। ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে তিনি যখন ইন্তেকাল করেন, তখন ইংরেজরাই তাঁর নিকট বিপুলভাবে ঋণী ছিল। তাঁর যে জাহাজ তারা অন্যায়ভাবে দখল করেছিল এবং তা ফেরত দেয়ার জন্য তারা বার বার যে অঙ্গীকার করেছে, তা তারা তাঁর মৃত্যুর পূর্বে বা পরে আর কখনো ফেরত দেয়নি, এমনকি দখলকৃত জাহাজের যেসকল পণ্যদ্রব্য তারা নিয়েছিল, তার জন্যও কোন ক্ষতিপূরণ তারা দেয়নি। যদিও ইংরেজরা মনে করতো যে, তাঁর যে সকল পণ্যদ্রব্য তারা নিজেদের জাহাজে প্রায়ই পরিবহন করতো, (তার আনুকূল্য পাওয়ার জন্য) তার ভাড়া ঐ পণ্যের মূল্যের সমতা বিধান করবে, তবে কখনো ইংরেজদের দ্বারা ঐ জাহাজ ব্যবহারের কথাও উল্লেখ করা হতো না। তা সত্ত্বেও তারা নিজেরা নিজেরাই স্বীকার করতো যে, জাহাজের মূল্য বাদেই তাঁর পণ্যদ্রব্যের ক্ষতিপূরণের জন্য "লাগবে ৭০০০ পাউন্ডেরও বেশি।"[১৯২] তদুপরি ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দে যখন ট্রেভিসাকে বাংলা থেকে প্রত্যাহার করে নেয়া হয় এবং মীর জুমলা আসামে, তখনও কিন্তু তার নিকট ট্রেভিসার ১,২৫,০০০ টাকার ঋণ ছিল।[১৯৩] পরবর্তীকালে আংশিকভাবে এই ঋণ পরিশোধ করা হয়েছিল।[১৯৪] চেম্বারলেন নিজেও পাটনায় অনেক ঋণ পরিশোধ না করেই চলে গিয়েছিলেন।[১৯৫] তাছাড়া, মীর জুমলার নিকট মসলিপটম থেকে তাঁর প্রতিনিধি ইংরেজদের মাধ্যমে দুই বাক্স রত্ন পাঠিয়েছিলেন, তাও ইংরেজরা তাঁকে প্রদান করেনি। এইভাবে দেখা যায় যে, মীর জুমলা ইংরেজদের নিকট থেকে যে সুবিধা নিয়েছিলেন, ইংরেজরা তাঁর থেকে তারচেয়ে অনেক বেশি সুবিধা নিয়েছে। নিজে বাণিজ্যিক কারবারে জড়িত থাকা সত্ত্বেও মীর জুমলা রাষ্ট্রের স্বার্থকে কখনো বিসর্জন দেননি এবং বাংলায় ইংরেজ এবং ওলন্দাজদের দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানীর মধ্যে সুচিন্তিতভাবে নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করেছেন এবং একটিকে অপরটির দ্বারা ক্ষতি করা থেকে বিরত রেখেছেন। অতএব, মীর জুমলা যখন ইন্তেকাল করেন, তখন ইংরেজরা প্রকৃতভাবেই আক্ষেপ করে এবং আশংকা করে যে, বন্দর শহর বালাশোরে

---

১৯২ মাদ্রাজের আলোচনা, ২৭শে আগস্ট, ১৬৬২, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১৬৭
১৯৩ পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১৮৩
১৯৪ ই.এফ.আই. ১৬৬৫-৬৮, পৃষ্ঠা ১৩৫-১৪৫
১৯৫ ঐ ১৬৬১-৬৪, পৃষ্ঠা ৭১

মীর জুমলার নিকট মসলিপটম থেকে তাঁর প্রতিনিধি ইংরেজদের মাধ্যমে দুই বাক্স রত্ন পাঠিয়েছিলেন, তাও ইংরেজরা তাঁকে প্রদান করেনি। এইভাবে দেখা যায় যে, মীর জুমলা ইংরেজদের নিকট থেকে যে সুবিধা নিয়েছিলেন, ইংরেজরা তাঁর থেকে তারচেয়ে অনেক বেশি সুবিধা নিয়েছে। নিজে বাণিজ্যিক কারবারে জড়িত থাকা সত্ত্বেও মীর জুমলা রাষ্ট্রের স্বার্থকে কখনো বিসর্জন দেননি এবং বাংলায় ইংরেজ এবং ওলন্দাজদের দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানীর মধ্যে সুচিন্তিতভাবে নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করেছেন এবং একটিকে অপরটির দ্বারা ক্ষতি করা থেকে বিরত রেখেছেন। অতএব, মীর জুমলা যখন ইন্তেকাল করেন, তখন ইংরেজরা প্রকৃতভাবেই আক্ষেপ করে এবং আশংকা করে যে, বন্দর শহর বালাশোরে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে, যেমন পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ওলন্দাজরা স্থানীয় অফিসারদেরকে ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্যে বাধা সৃষ্টির জন্য উস্কানী দেয়। ২৮শে এপ্রিল বালাশোর থেকে ব্লেক এবং ব্রিজেস দু:খের সঙ্গে লিখেন "যদি খান-ই-খানান (মীর জুমলা) বেঁচে থাকতেন, তাহলে আমরা এখানে কিছুটা প্রতিকার আশা করতে পারতাম। আমরা সব সময়ই তাঁকে আমাদের জাতির প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন পেয়েছি এবং এই অঞ্চলে একজন বিবেকবানকে হারিয়েছি; কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে (যে নিখুঁত সংবাদ পাওয়া গেছে, তার ভিত্তিতেই বলছি) এই অঞ্চলে বর্তমানে কোম্পানীর বাণিজ্যে বাধা শূন্য নয় বরং বৃদ্ধির আশংকা করছি।"[১৯৬]

৩. কুচবিহার এবং আসাম অভিযান

(ক) পটভূমি এবং কারণ

মীর জুমলার জীবনের শেষ এক বৎসর এবং আরো কয়েকমাস কুচবিহার, কামরূপ এবং আসাম অভিযানে ব্যয় হয়। শাহজাহানের রাজত্বকালের মতই এই যুদ্ধ মোগলদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং এই যুদ্ধ ছিল উত্তরাধিকার যুদ্ধের দ্বারা সৃষ্ট সমস্যা সমূহের শাখা-প্রশাখা মাত্র। কুচবিহার ৯৮৬ হিজরী/১৫৭৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল[১৯৭] এবং ১০০৫ হিজরী/১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে এটি নিশ্চিতভাবে একটি করদ রাজ্যের মর্যাদাই মেনে নেয়।[১৯৮] কামরূপও এই রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল, কিন্তু একটি অভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে ৯৮৯ হিজরী/১৫৮১ খ্রিস্টাব্দে এটি আলাদা হয়ে যায়

---

১৯৬ সুরাটে ব্লেক এবং ব্রিজেসের লিখা পত্র, ২৮শে এপ্রিল, ১৬৬৩, পূর্বোক্ত

১৯৭ আকবরনামা (লক্ষ্ণৌ সংস্করণ) ৩য় খন্ড, পৃষ্টা ২০৭। সে সময় কুচবিহারের রাজা আকবরের নিকট ৫০টি অশ্ব, ৪টি হাতি এবং অন্যান্য মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করেছিলেন বলে বর্ণিত আছে

১৯৮ আইন, ব্লেকম্যানের অনুবাদ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৬২। আরো দেখুন উপরোক্ত গ্রন্থ পৃষ্ঠা ২৮৫

এবং কুচ রাজপরিবারের একটি শাখাই এই রাজ্যটিও শাসন করে আসছিল। কামরূপ এক সময় আফগান সর্দার মুসা খানের মিত্র ছিল এবং প্রচুর সংখ্যক আফগান পলাতকের অভয়ারণ্য ছিল। তাই ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সুবাদার ইসলাম খান করদ রাজ্য কুচবিহারের আংশিক সাহায্য নিয়ে এটিকে বাংলার অন্তর্ভূক্ত করে নেন। তবে শাহজাহানের রাজত্বকালে মোগল থানাদার ছত্রজিতের বিশ্বাসঘাতকতা এবং আসামের শাসনকর্তা সুসেংকার আগ্রাসনের কারণে কামরূপের উপর মোগলদের কর্তৃত্ব সাময়িকভাবে বিলুপ্ত হয় বলে আগের অধ্যায়েই উল্লেখ করা হয়েছে। তাই ১০৪৭/১৬৩৭-৩৮ খ্রিষ্টাব্দে এর পুনর্দখল এবং আসাম রাজ্যের সঙ্গে একটি সীমান্ত চুক্তি সম্পাদন জরুরী হয়ে পড়ে।

শাহজাহানের রাজত্বের শেষ দিকে উত্তরাধিকার যুদ্ধ শুরু এবং সিংহাসনের জন্য লড়াই করতে শাহ্ শুজা কর্তৃক সীমান্ত অঞ্চল থেকে সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহারের কারণে[১৯৯] ঐ সকল অঞ্চলের উপর মোগলদের কর্তৃত্ব দূর্বল হয়ে পড়ে। এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে কুচবিহারের রাজা ভীম নারায়ণ (বা প্রাণ নারায়ণ) (১৬৩৩-১৬৬৬ খ্রিঃ) ঘোড়াঘাটে হামলা করেন এবং "সম্রাটের বহুসংখ্যক প্রজা, নারী-পুরুষকে ধরে নিয়ে যান।" তিনি তার মন্ত্রী ভবনাথের নেতৃত্বে একটি সৈন্যদল কামরূপে প্রেরণ করেন। এর ফলে সেখানকার করদ রাজা দুর্লভ নারায়ণ আক্রমণের শিকার হন এবং আধুনিক গোয়ালপাড়ার অধীন বড়নগরের জমিদার পরাজিত হন এবং আসামে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। ভবনাথও প্রজাদের উপর ভীষণ অত্যাচার-নির্যাতন করেন। গৌহাটির মোগল ফৌজদার লুৎফুল্লাহ সিরাজী কুচবিহারের আগ্রাসী বাহিনীকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যক সৈন্য না থাকায় বেশি কিছু করতে পারেননি। একই সময়ে আসামের শাসনকর্তা জায়ধাজ সিং সীমান্ত চুক্তি লঙ্ঘন করে কামরূপের বিরুদ্ধে নৌ-বাহিনীসহ একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। মীর লুৎফুল্লাহ এখন নিজকে দু'দিক থেকে আক্রান্ত দেখে এবং আক্রমণকারীদেরকে প্রতিরোধ করার মত সৈন্য-সামন্ত না থাকায় তার জাহাজে আরোহন করেন এবং ঢাকায় চলে আসেন।[২০০] কুচবিহারের মন্ত্রী ভবনাথ কামরূপকে বিভক্ত করে নেয়ার বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাকে বিতাড়িত করে দেয়া হয়। এইভাবে ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে কারিবাড়ী পর্যন্ত সমগ্র কামরূপ আসামের শাসনকর্তার অধীনে চলে যায়।

---

১৯৯ ফাতিয়াহ-ই-ইবরিয়াহ, ব্লেকম্যান কর্তৃক অনুদিত/জে.এ.এস.বি. ১৮৭২, পৃষ্ঠা ৬৩
২০০ ফাতিয়াহ-ই-ইবরিয়াহ ব্লেকম্যান কর্তৃক অনুদিত/জে.এ.এস.বি. ১৮৭২, পৃষ্ঠা ৬৩

অতএব, শুজা যখন চুড়ান্তভাবে পরাজিত হন এবং আরাকানে পালিয়ে যান, মীর জুমলা তখন বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। সম্রাট আওরঙ্গজেব তাকে যেসব নির্দেশ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে বিশেষ বিশেষ নির্দেশ ছিল কুচবিহারের রাজাকে কঠোর শাস্তি দেয়া এবং আসামের নিকট থেকে কামরূপ পুনরুদ্ধার করা।[২০১] অবশ্য ইউরোপীয় পর্যটক বার্নিয়ের এই বলে আওরঙ্গজেবের প্রতি একটি অশোভন উক্তি করেছেন যে, তিনি তাঁর শক্তিশালী সুবাদারকে ভয় পেতেন, তাই তিনি তাঁকে বিদেশে যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত রাখতে চেয়েছিলেন। বার্নিয়ের লিখেছেন, "এই প্রদেশে প্রায় বার মাস এই ভাবেই কেটে যায়, তখন মোগলরা মীর জুমলাকে ঢাকার উত্তর দিকে অবস্থিত আসামের ধনী ও শক্তিশালী রাজার বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধ পরিচালনায় নিয়োজিত করেন। আওরঙ্গজেব যথার্থই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, একজন উচ্চাভিলাষী সৈন্যকে দীর্ঘদিন একটি শান্ত পরিবেশে আটকিয়ে রাখা যাবে না, যদি বৈদেশিক যুদ্ধ থেকে মুক্ত থাকে, তাহলে সে অভ্যন্তরীণ উত্তেজনা সৃষ্টির সুযোগ খুঁজবে।" বার্নিয়ের আরো লিখেছেন, "আমির নিজেই দীর্ঘদিন যাবত এই ধরণের একটি উদ্যোগের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন, যা তার শক্তিকে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত করবে বলে তিনি আশা করেছিলেন এবং তার নাম ও যশকে অমর করে রাখবে"।[২০২] তার এই বক্তব্যটি নিছক কল্পনাপ্রসূত। বার্নিয়ের এই জন্য ভুল করেছেন যে, তিনি পূর্ববর্তী ঘটনাবলীর প্রতি লক্ষ্য করেননি, মীর জুমলার সুবাদার নিযুক্ত হওয়ার এক বৎসরের মধ্যে কামরূপ ও আসাম অভিযানের জন্য তাকে প্রাথমিক নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এমন কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণ নেই যা এমন ইঙ্গিত দেয় যে, সম্রাট তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন। তাছাড়া বার্নিয়ের একই সঙ্গে বলেছেন যে, মীর জুমলা খ্যাতি অর্জনের জন্য দীর্ঘদিন যাবত এরূপ একটি উদ্যোগের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন এবং আওরঙ্গজেব তাঁকে কৌশলে আসামের শক্তিশালী রাজার বিরুদ্ধে নিয়োজিত করেন। সম্রাটের যে এইরূপ কোন উদ্দেশ্য ছিল না, তা এই বিষয় থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সম্রাট চেয়েছিলেন যে মীর জুমলা আগে যেন আরাকান থেকে শাহ শুজার পরিবার ও সন্তানদেরকে উদ্ধার করে আনেন, যেহেতু ইতিমধ্যে শুজা নিহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছিল। মীর জুমলার প্রতি বার্নিয়ের এরূপ একটি অপরিমিত ও অসংযত উচ্চাভিলাষ আরোপ তার আরেকটি সমান কাল্পনিক উক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত, যেখানে বার্নিয়ের বলেন যে, "দুর্বল এবং বয়সে ভারাক্রান্ত মীর জুমলা" তাঁর জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি তাঁর স্ত্রী ও সন্তানাদিদের

---

২০১ ফাতিয়াহ-ই-ইবরিয়াহ, ব্লেকম্যান কর্তৃক অনুদিত/জে.এ.এস.বি. ১৮৭২, পৃষ্ঠা ৩৮১

২০২ বার্নিয়ের পৃষ্ঠা ১৭১

নিয়ে বাংলায় কাটাতে চেয়েছিলেন।[২০৩] সমসাময়িক ঘটনাবলীও তার এই উক্তিকে অসত্য প্রমাণ করে। কারণ মীর জুমলা শুধু তখনই এই অভিযান প্রেরণ করেছিলেন, যখন তিনি দেখলেন যে, এই অঞ্চলের উপর মোগলদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সকল শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টা এবং তার অধঃস্তন কর্মকর্তাদের সব চেষ্টা-তদবিরও ব্যর্থ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন পরিস্থিতিই সুবাদারকে কামরূপ-আসাম অভিযান পরিচালনার জন্য বাধ্য করেছিল। এমনকি যদি শুজা বা অন্য কোন শাহজাদা মোগল সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হতেন এবং মীর জুমলার পরিবর্তে অন্য কেহ বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হতেন, তাহলেও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপর মোগলদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং কুচবিহার ও আসামের রাজাদের হাতে বন্দী মুসলমান নারী ও পুরুষদের উদ্ধারের জন্য তাকেও একই প্রক্রিয়া ও কার্যক্রম গ্রহণ করতে হতো। তাই, সমসাময়িক ইতিহাস বেত্তা শিহাবুদ্দীন তালিশ "মুসলমানদেরকে উদ্ধার" এবং "ইসলামের পতাকা সমুন্নত" রাখার জন্য এই যুদ্ধকে "আসামের কাফিরদের বিরুদ্ধে পবিত্র জিহাদ বলে গণ্য করেছেন।"

প্রায় দুই বৎসর পর্যন্ত আসামীরা কামরূপ অধিকার করে রাখে। যখন শাহ শুজা আরাকানে পালিয়ে যান এবং মীর জুমলা জাহাঙ্গীর নগরে (ঢাকায়) দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন, তখন আসামীরা যথার্থই আশংকা করে যে, এবার মোগলরা কামরূপের দিকে তাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে। সে অনুযায়ী আসামের শাসনকর্তা জায়ধাজ এই বলে মীর জুমলার নিকট একজন দূত প্রেরণ করেন যে, তার কামরূপ দখল করার পিছনে "উদ্দেশ্য ছিল শুধু কুচীদেরকে দূরে রাখা, এছাড়া তার আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না" এবং এখন এই উদ্দেশ্যে সুবাদার যাকেই এখানে প্রেরণ করেন, তিনি তার নিকট এই অঞ্চল হস্তান্তর করতে প্রস্তুত।[২০৪] অবস্থার এই পরিবর্তনে মীর জুমলা খুশী হন এবং তিনি দূতকে একটি 'খিলাত' উপঢৌকন দেন এবং আসামীদের নিকট হতে কামরূপের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তিনি রশিদ খানকে প্রেরণ করেন এবং তার সাথে দেন সাইয়িদ নাসিরুদ্দীন খান, সাইয়িদ সালার খান, আগার খান এবং আরো অনেককে। একই সময়ে কুচবিহারের শাসক ভীম নারায়ণ ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে একজন দূত প্রেরণ করেন; কিন্তু মীর জুমলা কুচবিহারের শাসনকর্তাকেই গোলযোগের মূল কারণ গণ্য করে দূতকে বন্দী করেন এবং কুচবিহারের শাসককে বিতাড়িত এবং কুচবিহার দখল করার জন্য রাজা সুভান (অথবা সুজন) সিংহ বুন্দেলাহকে এবং তার সাহায্যকারী হিসেবে মির্যা বেগকে ১০০০ অশ্বারোহীসহ প্রেরণ করেন। অবশ্য পরে আসাম ও

২০৩ বার্নিয়ের, পৃষ্ঠা ১৬৯
২০৪ ই.এফ.আই. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৬৩

কুচবিহারের রাজার শান্তি প্রস্তাবকে অধিকতর সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণের লক্ষ্যে সময় ক্ষেপণের জন্য কূটচাল বলে প্রমাণিত হয়। রশিদ খান কারিবাড়ী পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং বিনা বাধায় কামরূপ সীমান্তের রাঙামাটি পর্যন্ত অগ্রসর হন। তিনি সেখানেই যাত্রা বিরতি করেন এবং জানতে পারেন যে, আসামীরা যুদ্ধের জন্য ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। সুভান সিংহ ও কুচবিহারের প্রবেশ পথ এক দুয়ারের বেশি অগ্রসর হতে পারেননি। আসামের রাজা একটি ধৃষ্টতাপূর্ণ পত্রসহ রাঙামাটিতে রশিদ খানের নিকট একজন দূত প্রেরণ করেন। রশিদ খান একটি অগ্রায়ণ পত্র দিয়ে ঐ চিঠিসহ দূতকে মীর জুমলার নিকট প্রেরণ করেন। মীর জুমলা দূতকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন যে, যদি আসামের রাজা তার দখলকৃত অঞ্চল ফেরত দেন, পেশকাশ (সম্মানজনক উপঢৌকন) প্রেরণ করেন, কামরূপ থেকে তিনি যে সকল বন্দুক-কামান ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে গিয়েছেন, তা ফেরত দেন এবং এই মর্মে একটি চুক্তি করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে, ভবিষ্যতে তিনি "কোন প্রকার আগ্রাসী আচরণ করা থেকে বিরত থাকবেন" তাহলে তিনি তার অবস্থানে থাকতে পারবেন, তার বিরুদ্ধে কোন অভিযান প্রেরণ করা হবে না। ঐতিহাসিক সিহাবুদ্দীন তালিশ লিখেছেন এটা নিশ্চিত যে, "নওয়াব মোটামুটি একটি পেশকাশ নিয়ে কামরূপ সমর্পণ করে দেয়ার বন্দোবস্ত পছন্দ করতেন, যেহেতু বর্ষা শেষে তিনি আরাকানে অভিযান প্রেরণের জন্য ইচ্ছা করেছিলেন। কারণ, সম্রাট আওরঙ্গজেব শুজার পুত্র-কন্যা এবং স্ত্রীদেরকে রাজদরবারে প্রেরণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন"।[২০৫] আসামের শাসক মীর জুমলার শান্তি প্রস্তাবের কোন উত্তর দেননি। তাই তিনি আরাকান অভিযান স্থগিত রেখে প্রথম কুচবিহার এবং কামরূপ পূনরুদ্ধার করার অনুমতি প্রার্থনা করেন।[২০৬] হিজরী ১০৭২ সালের মুহাররম মাসের শেষে (সেপ্টেম্বর ১৬৬১) সম্রাটের প্রয়োজনীয় অনুমতি পাওয়া যায়।[২০৭]

(খ) কুচবিহার অধিকার

১০৭২ হিজরী সালের রবিউল আওয়াল মাসের ১৮ তারিখে (১লা নভেম্বর ১৬৬১) মীর জুমলা কুচবিহার ও আসাম অভিযানের জন্য যাত্রা শুরু করেন। তিনি ইহতিশাম খানকে রাজধানী এবং খিজিরপুর দূর্গ, মুখলিস খানকে আকবর নগরের

২০৫ ই.এফ.আই. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৭০

২০৬ ই.এফ.আই. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৬৪

২০৭ হুগলী থেকে ওলন্দাজদের পত্র, ১০ অক্টোবর ১৬৬১; বাটাভিয়া দাগ রেজিস্টার, ১৬৬১, পৃষ্ঠা ৩৮৭। ই.এফ.আই-তে উদ্ধৃত ১৬৬১-১৬৬৪ পৃষ্ঠা ৭০। এটা হচ্ছে সেই অনুমতি যে সম্পর্কে বার্নিয়ের বলেছেন যে, আওরঙ্গজেব আসাম জয় করার আদেশ দিয়েছেন।

(রাজমহলের) দায়িত্ব এবং ভগতি দাস এবং খাজা ভগবন্ত দাসকে আর্থিক বিষয়ের দায়িত্ব দিয়ে যান। মীর জুমলার বাহিনীতে হাতি ছাড়াও ১২০০০ অশ্ব, ৩০০০ পদাতিক এবং কমপক্ষে ৩২৩টি রণতরীসহ বিশাল এক নৌবহরও ছিল।[২০৮] কোম্পানীর কর্মচারী নহেন এমন কয়েকজন ইংরেজ, পর্তুগীজ এবং ওলন্দাজ নাবিক তাঁর সঙ্গে অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।[২০৯]

বারীতলার পথ ধরে অগ্রসর হয়ে রবিউসসানী (১০৭২) মাসের শেষ দিন, ১২ই ডিসেম্বর ১৬৬১, মীর জুমলা কামরূপ সীমান্তের একদুয়ারে এসে পৌঁছেন এবং আগে থেকেই সেখানে অবস্থান গ্রহণকারী সুভান সিংহ তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। একদুয়ার দিয়ে প্রবেশ পথটি ছিল শক্তিশালী দূর্গ দিয়ে সুরক্ষিত এবং "প্রশস্ত পরীখা এবং জঙ্গল দ্বারা পরিবেষ্টিত"। কুচবিহার যাওয়ার আরেকটি পথ ছিল রাঙ্গামাটি থেকে খুন্তাঘাট হয়ে; কিন্তু রাস্তা ছিল সরু এবং "অনেক খাল-বিল দ্বারা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন।" অতএব, মীর জুমলা তৃতীয় একটি আল-পথ বা বেঁড়িবাধ ধরে অগ্রসর হন। যেহেতু এই পথটি ছিল ঘণ বাঁশের ঝোপ-ঝাড়ে পরিপূর্ণ এবং একটি সেনাবাহিনী চলাচলের জন্য অনুপযুক্ত, তাই কুচের রাজা এই পথটি অরক্ষিতই রেখেছিলেন। ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে ঘোড়াঘাটের সংযোগ স্থাপনকারী একটি ছোট নদীতে নৌবহরকে মোতায়েন রেখে মীর জুমলা বাঁশের ঝোপ কেটে কেটে এই পথ ধরে অগ্রসর হন। মোগল বাহিনীকে প্রতিরোধ করা অসম্ভব দেখে রাজা ভীম নারায়ণ ভুটান এবং তাঁর মন্ত্রী মুরাং-এ পালিয়ে যান। ৭ই জমাদিউল আওয়াল, ১০৭২, (১৯শে ডিসেম্বর ১৬৬১) মীর জুমলা কুচবিহারের রাজধানীতে প্রবেশ করেন এবং সদর মোহাম্মদ সালিহ প্রাসাদের চূড়া থেকে আযান দেন।[২১০] সেনাবাহিনী পৌঁছার পূর্বে শহরবাসীগণ ভয়ে পালিয়ে যান। মীর জুমলা কঠোরভাবে লুটতরাজ নিষিদ্ধ করে দেন এবং অপরাধী সৈন্যদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেন। কতিপয় সৈন্য লুণ্ঠন করে কিছু কলা, একটি গাভী বা একটি ছাগল ধরে নিয়ে আসায় তিনি তাদের নাকে বর্শা বিদ্ধ করেন এবং গলায় লুণ্ঠিত দ্রব্য ঝুলিয়ে দিয়ে শিবির এবং শহরের রাস্তাা দিয়ে ঘোরান। এতে শহরবাসীগণ অভয় পান এবং শহরে ফিরে আসেন।[২১১] রাজার পুত্র বিষ্ণু নারায়ণ পিতার নিকট থেকে

---

২০৮. শিহাবুদ্দীন তালিশ (পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৭৩) বিভিন্ন ধরণের রণতরীর যে তালিকা দিয়েছেন, তা হচ্ছে ১৫৯টি কোসাহ, ৪৮টি জালবাহা, ১০টি খার্বস, ৭টি পারিন্দাহ, ১টি পালিল , ১টি বহর, ২টি বালাম, ১০টি খাটগিরি, ৫টি মহাগিরি, ২৪টি পালওয়ারাহ এবং অন্যান্য। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই ঐতিহাসিক অন্যান্য ধরণের জাহাজের আর কোন বর্ণনা দেননি।

২০৯. ই.এফ.আই. ১৬৬১, পৃষ্ঠা ৭০, টীকা-৩

২১০. ই এফ.আই. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৬৫

২১১ ই.এফ.আই. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৬৭

পালিয়ে মীর জুমলার সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।[২১২] এই অভিযানে "১০৬টি বন্দুক, ১৪৫টি জাম্বুরাক, ১১টি রণচঙ্গী, ১২৩টি ম্যাচলক এবং আরো অনেক জিনিসপত্র আটক করা হয়।" প্রাথমিক বিষয়গুলো সামাল দিয়ে মীর জুমলা পরলোকগত আল্লাহইয়ার খানের পুত্র ইস্কান্দিয়ারকে কুচ রাজার মন্ত্রী ভবনাথকে বন্দী করার জন্য মোরাং প্রেরণ করেন। তাকে ধরে বন্দী করে রাখা হয়। এরপর রাজাকে ধরার জন্য ভূটান পাহাড়ের পাদদেশে কাঁঠালিবাড়িতে এক সেনাদলকে পাঠানো হয়, কিন্তু যেহেতু তিনি ভূটানে চলে গিয়েছিলেন, তাই ভূটানের রাজা ১২০ বৎসরেরও বেশি বয়স্ক ধর্মরাজার নিকট একজন ভূটানী বার্তাবাহককে এই অনুরোধ বার্তা দিয়ে পাঠানো হয় যে, তিনি যেন ভীম নারায়ণকে আটক করে মীর জুমলার নিকট পাঠিয়ে দেন। অন্ততঃ তাকে যেন এই পাহাড়ী দেশ থেকে বিতাড়িত করে দেয়া হয়। ধর্মরাজ এ কাজে তাঁর অপারগতা প্রকাশ করে প্রেরিত এক জওয়াবে বলেন যে, "তিনি নিজে ভীম নারায়ণকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আনেননি, যেহেতু তিনি অনাহুত অবস্থায় এসেছেন, এই অবস্থায় তিনি একজন মেহমানকে বিতাড়িত করতে পারেন না।[২১৩] এই বিষয়ে আরো অগ্রসর হওয়ার মত সময় মীর জুমলার ছিল না। তিনি পুরো এলাকাটিকে বাংলার সাথে একীভূত করে নেন এবং রাজধানী শহর কুচবিহারের নাম পরিবর্তন করে রাখেন আলমগীর নগর। আসকার খানকে এই অঞ্চলে ফৌজদার নিয়োগ করা হয়। তবে তিনি পৌঁছার আগ পর্যন্ত পরলোকগত আল্লাহইয়ার খানের পুত্র ইস্ফান্দিয়ার খানকে দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং কাজী সামুই সুজাইকে দীওয়ান, মীর আব্দুর রাজ্জাক এবং খাজা কিশওয়ার দাস মনসবদারকে আমীন নিয়োগ দেয়া হয়। ইস্ফান্দিয়ার খানের অধীনে ৪০০ অশ্বারোহী এবং ১০০০ বন্দুকধারীকে রেখে যাওয়া হয়।[২১৪]

(গ) কামরূপ পুনরুদ্ধার

কুচবিহারে মাত্র ১৬ দিন অবস্থান করার পর মীর জুমলা ২৩শে জামাদিউল আউয়াল, ১০৭২ হিজরী (৪ঠা জানুয়ারি ১৬৬২) কামরূপের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। তিনি খুন্তাঘাট এবং রাঙ্গামাটির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। শেষোক্ত জায়গায় পূর্ব থেকে অবস্থানকারী রশিদ খান তাঁর সঙ্গে যোগ দেন।

২১২ এফ.আই. আরো দেখুন. এ.এন. পৃষ্ঠা ৬৮৮
২১৩ এফ.আই. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৬৮
২১৪ এফ.আই. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৬৮

সেনাবাহিনীকে ঘণ জঙ্গল এবং প্রচুর সংখ্যক ছোট নদী অতিক্রম করে অগ্রসর হতে হয়। তাই দৈনিক ৫ মাইলের বেশি অগ্রসর হতে পারতো না, মোগল বাহিনী এসে পৌঁছার সাথে সাথে আসামের সৈন্যরা আরো উত্তরে পশ্চাদপসারণ করে। ৯ই জামাদিউসসানি (২০শে জানুয়ারি ১৬৬২) অভিযানকারী বাহিনী এসে পৌঁছে এবং ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে বানাস নদীর মিলিত স্থানের নিকটবর্তী এবং গোয়ালপাড়ার বিপরীত দিকে জোগীঘোপা দূর্গ দখল করে। শত্রুরা একটি আঘাতও না করে পালিয়ে যায়। জোগীঘোপার অধিনায়ক হিসেবে আতাউল্লাহকে রেখে মীর জুমলা মূল বাহিনী নিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদীর উত্তর কূল ঘেঁষে অগ্রসর হন। সেনাবাহিনীর একটি ক্ষুদ্র অংশ নদী অতিক্রম করে এবং নাসিরউদ্দীন খান, ইয়াদগার খান এবং অন্যান্য অধিনায়কদের নেতৃত্বে নদীর দক্ষিণ পাড় দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে, আর নৌবহর নদী দিয়ে অগ্রসর হয়। ২৪শে জমাদিউসসানী (৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৬৬২) মীর জুমলা গৌহাটির নিকটে এসে উপস্থিত হন। এর মাত্র ২ মাইল দূরত্বে ছিল দু'টি দূর্গের অবস্থান, একটি দূর্গ হচ্ছে শ্রীঘাট এবং অপরটি হচ্ছে পান্ডু দূর্গ। নদীর উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ে ঠিক একটির বিপরীতে অপরটি অবস্থিত। শ্রীঘাট দূর্গটি ছিল জোগীঘোপা দূর্গ থেকে অনেক বড় এবং উঁচু। আর পান্ডু দূর্গটি শ্রীঘাট দূর্গের সমানই ছিল। আসামের রাজা শ্রীঘাট দূর্গে আরো সৈন্য প্রেরণ করতে চেষ্টা করেছি, তবে তাদের পৌঁছার পূর্বেই মীর জুমলা দূর্গটি দখল করে নিতে সক্ষম হন। আসামের দূর্গ রক্ষীবাহিনী আরো পূর্ব দিকে পালিয়ে কাজলীতে চলে যায়, পান্ডু দূর্গও প্রায় বিনা বাধায় বিজিত হয় এবং মোগল সৈন্যবাহিনীর আগমনে আসামের সৈন্যরা পালিয়ে যায়। পরে মীর জুমলা গৌহাটি দখল করেন এবং সেখান থেকে আরো পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্র এবং কালাং নদীর মিলিত স্থান থেকেও ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত কাজলী দূর্গের দিকে অগ্রসর হন। আসামের সৈন্যরা এই দূর্গটি পরিত্যাগ করে চলে গেলে তিনি এটিও দখল করেন। মীর জুমলার কাজলী পর্যন্ত এরূপ অপ্রতিরোধ্য গতিতে অগ্রসর হন যে, আসামের সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে যায়। আসাম রাজের অধীনস্থ দারাং রাজ মাকারধাজ বা মাকরোপাঞ্জ নিজেই কাজলীতে এসে মোগলদের নিকট আনুগত্য স্বীকার করেন। তিনি "আসলেন এবং নওয়াবকে তার সম্মান জানালেন এবং তাকে একটি হাতি উপঢৌকন দেন। তিনি একটি খালা'ত এবং নিরাপত্তার অঙ্গীকার লাভ করেন এবং মোগল বাহিনীর সঙ্গে তাকেও চলতে নির্দেশ দেয়া হয়[২১৫] এবং তিনি তা পালন করেন। গৌহাটি এবং কাজলী দখল করা হলে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত সাবেক

২১৫. এফ.আই. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৭০

অঞ্চল পুর্নদখল সম্পূর্ণ হয়।[২১৬] মীর জুমলার একজন পোষ্য মোহাম্মদ বেগকে গৌহাটির ফৌজদার এবং তাঁর একজন চাকর হাসান বেগ জংগনাহকে কাজলীর থানাদার নিয়োগ করা হয়।

(ঘ) মূল আসামে অভিযান

গৌহাটিতে কিছুদিন অবস্থান করে ও মীর জুমলা আসামের রাজার নিকট হতে তাঁর শান্তি প্রস্তাবের কোন জওয়াব না পাওয়ায় তিনি ২৭শে জমাদিউসসানি ১০৭২ হিজরী (৭ই ফেব্রুয়ারি ১৬৬২সালে) মূল আসাম ভূ-খন্ডের উদ্দেশ্যে অভিযানে বের হন। আধুনিক জেলা শহর শিবসাগরের নিকটবর্তী ব্রহ্মপুত্র নদীর ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত গাড়গাঁওয়ের দিকে অভিযান পরিচালিত হয়। তিনি তেজপুর এবং গৌহাটির মধ্যবর্তী 'বার্তিনাহ' নামক স্থান দিয়ে তাঁর সেনাবাহিনীসহ নদী পার হয়ে দক্ষিণ পাড়ে চলে আসেন। এখানে আসাম রাজের প্রজাদের মধ্যে একজন ব্রহ্মপুত্র নদীর দক্ষিণ পাড়ের ডুমুরিয়ার রাজা মীর জুমলার আনুগত্য স্বীকার করেন এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য একটি হাতিসহ তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে প্রেরণ করেন এবং অসুস্থতাহেতু নিজে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকেন। আসাম রাজ এবার প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, মোগলরা হয়তো সর্বাধিক তেজপুর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারে, যেমনটি ঘটেছিল তাদের পূর্ববর্তী অভিযানসমূহের সময়। তাই আসামরাজ তেজপুরের বিপরীত দিকে নদীর দক্ষিণ পাড়ে পরস্পর কাছাকাছি দুটি দূর্গ সামধারা এবং সিমলাগড়ের শক্তি বৃদ্ধি এবং সেখানে সৈন্য মোতায়েন করেন।[২১৭]

সিমলাগড় প্রথম দখল করা প্রয়োজন দেখা দিল। এই "দূর্গটি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং উঁচুতে অবস্থিত এবং এর প্রতিরক্ষার জন্য" "পিঁপড়া এবং পঙ্গপালের মত" অসংখ্য রক্ষী নিয়োজিত ছিল। দূর্গটির চতুর্পার্শ্বে ছিল পাহাড়, কামান বসানো উঁচু দেয়াল এবং এর চতুর্পার্শ্বে পরীখা খনন করে এখানে পৌঁছা অসম্ভব করে তোলা হয়েছিল। আরো ছিল প্রচলিত পদ্ধতির গর্তে ফাঞ্জি বসানো অর্থাৎ ভূমিতে ঘণ তীক্ষ্ণ বাঁশ বসানো। ১০৭২ হিজরির ১১ই রজব (২০শে ফেব্রুয়ারি ১৬৬২) মীর জুমলার বাহিনী দূর্গের পাদদেশে শিবির স্থাপন করে। অবরোধ আরোপ করার জন্য প্রাথমিক প্রচেষ্টা এবং কিছু খন্ড যুদ্ধের পর ১৫ই রজব রাতের বেলা দিলির খান, ফরহাদ খান এবং মীর মুর্তাযার নেতৃত্বে চূড়ান্ত

---

২১৬. দ্রুত কামরূপ দখল করার বিষয়ে বার্নিয়েরেও প্রমাণ পাওয়া যায়. হাজো এবং কামরূপ অবরোধ এবং এক পক্ষকালেরকম সময়ে দখল করে নেয়া হয় বলে তিনি লিখেছেন. বার্নিয়েরের পৃষ্ঠা ১৭২

২১৭ এফ.আই. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৭২।

হামলা পরিচালনা করা হয়। আসামীরা প্রবল এবং অনমনীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলে। দিলির খানের হাতি ২৫ জায়গায় আহত হয়, আগার খান এবং ফরহাদ খান উভয়ই আহত হন। অসাধারণ সাহস দেখিয়ে দিলির খান দূর্গ টপকাতে এবং দখল করতে সক্ষম হন। মীর জুমলা দূর্গে প্রবেশ করেন পরের দিন ১৬ই রজব ১০৭২ (২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৬৬২) ভোরে এবং দূর্গের মজবুত রক্ষা ব্যবস্থা দেখে বিস্মিত হন। প্রচুর পরিমাণ যুদ্ধ সামগ্রী এবং বলপূর্বক দূর্গে আটক বহু সংখ্যক মুসলমান নারী-পুরুষকে উদ্ধার করা হয়।[২১৮] দূর্গ পরিদর্শন শেষে মীর জুমলা পার্শ্ববর্তী স্থান কুলায়বারে একই দিন শিবির স্থাপন করেন। সিমলাগড় দূর্গের পতন আসামের সৈন্যদেরকে এমনভাবে নিরুৎসাহিত করে যে, তারা সামধারা পরিত্যাগ করে পালিয়ে যায় এবং পরে মীর জুমলা এটাকেও দখল করে নেন। "কোন রকম লুটতরাজের অনুমতি দেয়া হয়নি" এবং সৈয়দ নাসিরুদ্দীন কুলায়বারের ফৌজদার নিযুক্ত হন এবং সৈয়দ মির্যা, সৈয়দ নিসার এবং রাজা কিশন সিংহকে সৈন্যসামন্তসহ সামধারা দূর্গ রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়।

আসামীরা অবশ্য প্রতিরোধ পুরোপুরি ত্যাগ করেনি। ২০শে রজব (২রা মার্চ ১৬৬২) মোগল বাহিনী পাহাড়ের কারণে নদীর পাড় দিয়ে কিছুটা দূরে অগ্রসর হয়েছিল এবং এভাবে নৌবহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। আসামীরা সামরিক কৌশলের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই স্থানে আক্রমণ করার জন্য অপেক্ষা করছিল। পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে, মোগলদের রণতরীগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে দুই ভাগ হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবতঃ তারা যে প্রবল স্রোতের উজানে অগ্রসর হচ্ছিল, সে জন্যই তা ঘটেছিল এবং জমিদার মুনাওয়ার খান এবং আলী বেগের অধিনায়কত্বে মাত্র ১০০ রণতরী বাকীগুলোর আগে আগে অগ্রসর হতে পেরেছিল। ২১শে রজব (৩রা মার্চ) মাগরিবের নামাজের পর হঠাৎ ৭০০ থেকে ৮০০ শত্রু রণতরী তাদেরকে আক্রমণ করে। মুনোয়ার খান ও আলী বেগ তাদের অবশিষ্ট জাহাজসমূহ না আসা পর্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে এই অসম যুদ্ধ চালিয়ে যান। সারারাতব্যাপী অবিশ্রান্তভাবে কামানের গোলা বর্ষণ চলতে থাকে যা স্থল বাহিনী শুনতে পাচ্ছিল। মীর জুমলা অবিলম্বে নৌবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য মুহাম্মদ মুমিন বেগের নেতৃত্বে এক বিরাট সেনাদল প্রেরণ করেন। মুমিন বেগ ২২শে রজব খুব ভোরে এসে সংঘর্ষস্থলে পৌঁছেন এবং শীঘ্রই বিজয়ের তুর্য বাজান।

---

২১৮ ব্রোকম্যান লিখেছেন যে, "সামধরা তেজপুরের বিপরীত দিকে অবস্থিত, নকশায় সামধুরী মহল এবং একই নামের একটি স্থান চিহ্নিত আছে .... সিমলাগড় .... আমাদের নকশায় নেই, কিন্তু এটি তেজপুর থেকে দূরে হবে না, যেহেতু এটিকে সামধুরাহর বিপরীত দিকে অবস্থিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।" জে.এ.এস. বি. পৃষ্ঠা ৭১ (টীকা)

আসামীরা দেখতে পায় যে, মোগলরা তাদেরকে নদীর পাড় দিয়ে প্রায় ঘিরে ফেলেছে, তাই আসামের রণতরীগুলো যুদ্ধ বন্ধ করে দেয় এবং প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০ রণতরী পশ্চাতে ফেলে পালিয়ে যায় এবং এগুলোর প্রতিটিতে একটি করে কামান সজ্জিত ছিল। প্রচুর সংখ্যক আসামী সৈন্য ধৃত এবং নিহত হয়।

(ঙ) রাজধানী গাড়গাঁও অধিকার ঃ আপোষমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ

সিমলাগড়ের পতন এবং কুলায়বারের উজানে নৌ-যুদ্ধে পরাজয়ের পর আসাম রাজ উপলব্ধি করেন যে, সম্মুখ যুদ্ধে মোগল সৈন্যদের মোকাবেলা করা আর সম্ভব নয়। তিনি পাহাড়ের দিকে পশ্চাদপসারণ করেন এবং 'আকস্মিক নৈশ হামলা'র নীতি গ্রহণ করেন। এরপর মীর জুমলা সোনাগড়ে এসে পৌঁছেন এবং আসাম রাজের কয়েকজন দূত শান্তির প্রস্তাব নিয়ে এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। যেহেতু তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল "বিলম্ব ঘটানো এবং সতর্কতা হ্রাস করানো"। মীর জুমলা তাদেরকে প্রত্যখ্যান করেন এবং লাখুগড়ের দিকে অগ্রসর হন। লাখুগড় খুব সম্ভবত মাজুলী দ্বীপের নিকটে অবস্থিত ছিল এবং ১০৭২ হিজরীর ২৮শে রজব (৯ই মার্চ ১৬৬২) তিনি সেখানে পৌঁছেন। সেখানে আরেকজন দূত "একটি সোনার পানদান, দুটি রৌপ্যের কলস, ১০০ সোনার মোহরসহ রাজার একটি আনুগত্য পত্র নিয়ে" মীর জুমলার সঙ্গে সাক্ষাত করেন। নওয়াব পত্রটিকে কৃত্রিম বলে গণ্য করলেন এবং জওয়াবে লিখেন যে, তিনি শীঘ্রই গাড়গাঁও যাবেন এবং "সেখানে তিনি এককভাবে রাজার সঙ্গে বোঝাপড়া করবেন।"[২১৯]

নৌ-বহরকে লাখুগড়ে রেখে মীর জুমলা ১লা শাবান, (১২ই মার্চ ১৬৬২) রাজধানী গাড়গাঁওয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। যাত্রাপথ ছিল অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল এবং অভিযানের ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, যাত্রাপথটি "এত বেশি সংখ্যক ছোট ছোট নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল যে, প্রতিটির নাম আলাদাভাবে উল্লেখ করতে পারছি না"।[২২০] মীর জুমলাকে অত্যন্ত সতর্কভাবে এবং আকস্মিক নৈশ হামলার আশংকা মনে রেখে অগ্রসর হতে হচ্ছিল। পিছনের সংযোগ সড়ক খোলা রাখার জন্য তাকে যাত্রা পথের অল্প দূরে দূরে থানা বা সামরিক ফাঁড়ি প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল। লাখুগড়ের পরে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ফাঁড়ি ছিল দেওয়ালগাঁও, আলী রিজা ছিলেন সেখানকার থানাদার। সেখানে নওয়াব কিছু

২১৯ এফ.আই. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৭৩
২২০ এফ.আই. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৭৫

সংখ্যক মুসলমানের সাক্ষাত পান, তারা তাকে জানান যে, রাজা বহু সংখ্যক মুসলমানকে বন্দী করে রেখেছেন এবং তার মূল্যবাদ ধন-সম্পদ নিয়ে আসামের একেবারে পূর্বাঞ্চল নামরূপে চলে গিয়েছেন।[২২১]

অতএব, রাজধানীতে তখনো যে সকল হাতি এবং অন্যান্য ধন-সম্পদ অবশিষ্ট ছিল, মীর জুমলা তা আটক করার জন্য একটি অগ্রবর্তী সেনাদল প্রেরণ করেন। তিনি যাত্রাপথের বিভিন্ন স্থান গাজীপুর, তারামহনী বা তারাহ্হানী এবং নামডাং এ থানা স্থাপন করে ১৬ই সাবান ১০৭২ (১০ই মার্চ ১৬৬২) গাড়গাঁওয়ে প্রবেশ করেন। "পরের দিন একটি পুকুর থেকে বহু সংখ্যক বন্দুক উদ্ধার করা হয়, যেগুলো রাজা পলায়নের আগে সেখানে নিক্ষেপ করেছিলেন। তাছাড়া ৮২টি হাতি এবং সোনা-রূপর মুদ্রায় ৩,০০,০০০ টাকা পাওয়া যায়। অভিযানের শুরু থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত যে সকল কামান-বন্দুক হস্তগত হয় সেগুলোর সংখ্যা ছিল ৬৭৫, এগুলোর মধ্যে একটি কামান এত বড় ছিল যে এর গোলার ওজন ছিল ৩ মণ (১১০ কেজি); ১৩৪৩টি জামবুরাক, ১২০০টি রামচঙ্গি; বিপুল পরিমাণ সোরা, লৌহ, গন্ধক এবং সীসা; বিভিন্ন ধরণের ১০০০ জাহাজ, যার অনেকগুলোতে ৬০, ৭০ এবং ৮০জন সৈন্যের স্থান সংকুলান হতো। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ১২৩টি বাছারী জাহাজ ছাপড়ার নীচে রক্ষিত অবস্থায় ছিল, যেগুলো কয়েকজন আসামী আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। অনুরূপ আর কোনো জাহাজ গাড়গাঁওয়ের ঘাটে ছিল না। দশ মণ থেকে এক হাজার মণ ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১৭৩টি চালের গুদাম আবিস্কৃত হয় এবং ম্যাচলক বন্দুকধারীগণ সেগুলো পাহারা দিত। এই গুদামগুলো অনেক কাজে আসে।"[২২২]

মীর জুমলা যুদ্ধ লব্ধ সম্পদকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে মনে করতেন এবং যত্নের সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণ করে জাহাঙ্গীরনগরে প্রেরণ করেন। ইউরোপীয় পর্যটক মানুক্কী সে সময় ঢাকায় ছিলেন এবং তিনি দেখতে পান যে, মীর জুমলা কর্তৃক "আসাম থেকে প্রেরিত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে বহু সংখ্যক জাহাজ এসেছে"।[২২৩] কবরস্থ কুঠুরী থেকেও কিছু সম্পদ উদ্ধার করা হয়। শিহাবুদ্দীন তালিশ লিখেছেন যে, আসামীরা তাদের মৃতকে পূর্বদিকে মাথা এবং পশ্চিম দিকে পা রেখে কবর দিত। "শাসকগণ তাদের মৃতদের জন্য শব-কুঠুরী তৈরী করতেন, মৃতদের স্ত্রীলোক এবং চাকরদের হত্যা করতেন এবং কয়েক বৎসরের জন্য প্রয়োজনীয়

---

২২১ এফ.আই. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৭৪। অন্যত্র ঐতিহাসিক (শিহাবুদ্দীন তালিশ) লিখেছেন, "বলা হয় যে, আসামে এখন যাদেরকে মুসলমান বলা হয়, তারা হচ্ছেন হুসেন শাহর সৈন্যদের মধ্য থেকে ধৃতদের বংশধর।" ঐ

২২২ এফ.আই. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৭০

২২৩ ম্যানুক্কী. ২য় খন্ড. পৃষ্ঠা ১০০

জিনিস যথা, হাতি, সোনা-রূপার পাত্র, মৃতদেহ, কাপড়-চোপড় এবং খাদ্য শব-কুঠুরীতে রেখে দিতেন। তারা শবের মাথাকে শক্ত করে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিতেন এবং প্রচুর পরিমাণ তেলসহ একটি বাতি এবং একজন জীবিত মশালচীকে (বাতি বহনকারী) বাতি দেখাশোনা করার জন্য কুঠুরীতে রাখতেন। নওয়াবের আদেশে এরূপ দশটি কুঠুরী খোলা হয় এবং প্রায় ৯০,০০০ টাকা উদ্ধার করা হয়।[২২৪] তবে সেখানে ব্যাপকভাবে মন্দির বা কবরকে কোনরূপ তছনছ করা হয়নি। বিপরীতক্রমে, মীর জুমলা লুটতরাজ এবং নারী ধর্ষণ কঠোরভাবে নিষেধ করে দেন। ফলে "কোন আমীর, সেনাধ্যক্ষ, সৈন্য বা অনুসারী" কেহ কারও সম্পদ বা স্ত্রীর উপর কোনরূপ লোভাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে সাহস করেনি। তবে শত্রুদের প্রতি কঠোর হলেও মীর জুমলা সাধারণ জনগণের প্রতি সংযমের নীতি অবলম্বন এবং তাদের মন জয় করতে চেষ্টা করতেন। একটি সাধারণ ঘোষণার দ্বারা তিনি সকলের জান-মালের নিশ্চয়তা প্রদান করেন এবং এক বৎসরের জন্য সকলকে সকল প্রকার খাজনা ও কর থেকে অব্যহতি প্রদান করেন। আসামীরা যে সকল প্রজাকে তাদের গ্রাম ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছিল, তারা ক্রমান্বয়ে বেশি সংখ্যায় মোগলদের ফাঁড়ি যথা লাখাউ এবং দেওয়াল গাঁয়ে ফিরে আসতে শুরু করে এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পেয়ে তাদের বাড়িঘরে পুনরায় বসতি শুরু করে।"[২২৫] মোটের উপর দক্ষিণকূলের অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিন পাড়ের লোকজন তাদের "অবস্থায় সন্তুষ্ট হয়" এবং উত্তরকূলের লোকজনও আনুগত্য স্বীকার করতে আগ্রহী হয়ে উঠে।[২২৬] আরেকটি সাধারণ ঘোষণা দ্বারা তিনি মোগলদের সকল প্রজা, মুসলমান বা অমুসলমান, যাদেরকে আসামরাজ বন্দী করে বা দাস-দাসী বানিয়ে রেখেছিল বা তার লোকদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিল, তাদেরকে মুক্ত করে দেন।

---

২২৪ এফ.আই. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৮২। এই ঐতিহাসিক আসামীদের আরও যেসব অদ্ভূত বিষয় লক্ষ্য করেছেন, তা হচ্ছে দু'জন স্ত্রীর কম এমন লোক নেই বললেই চলে। অধিকাংশ লোকের স্ত্রীই ৪ জন বা ৫ জন। (ঐ, পৃষ্ঠা ৮০) এবং "রাজার স্ত্রীর শুধু কন্যা সন্তান হয়, তার কোন পুত্র নেই।" (ঐ পৃষ্ঠা ৭৯) তালিশ কর্তৃক বর্ণিত আসামীদের কয়েকটি কবর বৃটিশ আামলেও খনন করা হয়েছিল। দেখুন এ.এস.বি. খন্ড ১৭শ, অংশ ১, ১৮৪৭, পৃষ্ঠা ৪৭৩। কর্ণেল ডালটন ফাতহিয়াই-ইবরিয়া অনুবাদ করার সময় এক পত্রে ব্লাকম্যানকে জানিয়েছেন, আসামের সম্পদশালীদের দাফনের বিবরণ সাম্প্রতিককালে কয়েকটি কবর সংস্কারের সময় যা প্রকাশ পেয়েছে, তাতে আরো প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রায় ২০ বৎসর আগে আসামের রাজাদের কবর বলে পরিচিত কয়েকটি ঢিবি বা উচ্চ ভূমি খনন করা হয়েছিল এবং সেখানে শুধু রাজাদের দেহাবশেষই নয়, বরং পাতালে সেবা করার জন্য যে সকল নারী-পুরুষ দাস-দাসী, জানোয়ার উৎসর্গ করা হয়েছিল, তাদের দেহাবশেষও পাওয়া যায়, এমনকি সোনা-দানার পাত্র, খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, অস্ত্র ইত্যাদিরও কোন কমতি ছিল না।"ব্লোকম্যান কর্তৃক উদ্ধৃত এফ.আই. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৮২ টীকা।

২২৫ জগদিশ নারায়ণ সরকার, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২৫১

২২৬ এফ.আই. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৮৬

(চ) আগাম বর্ষার প্রকোপ ঃ মীর জুমলার সমস্যা

আসামের রাজা ফুকান নামে পরিচিত তার সভাসদদের নিয়ে দেশের একেবারে পূর্বাঞ্চল নামরূপে পালিয়ে যান। নামরূপের অবস্থান ছিল "তিনটি উঁচু পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা এবং ঢালু জায়গা এবং এর আবহাওয়া বেবিলনের অন্ধ কূপের আবহাওয়া থেকেও খারাপ ছিল। রাজন্যবর্গ যাদেরকে তরবারী থেকে রেহাই দিতেন, তাদেরকে সেখানে নির্বাসনে পাঠাতেন।" সে অঞ্চলে যাওয়ার জন্য শুধু মাত্র একটি কঠিন রাস্তা ছিল। গাড়গাঁওয়ের উত্তর দিক থেকে ছিল এর শুরু এবং এর এই শুরুই ছিল এক মাইল "এমন ঘণ জঙ্গলে আকীর্ণ যে, কেহ এ এলাকা দিয়ে যাওয়ার চিন্তাই করতে পারতো না।" পরবর্তী বার মাইল ছিল শিলায় পূর্ণ, সংকীর্ণ গিরি পথ এবং দু'টি উঁচু পাহাড়ের মধ্যবর্তী কর্দমাক্ত পথ। বারগোসাইন (আবার বার গোহাইনও বলা হয়) নামে পরিচিত রাজার প্রধান আমীর তার লোকজন নিয়ে এই অঞ্চলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। অন্যান্য ফুকানগণ "বিপুল সংখ্যক লোক নিয়ে ব্রহ্মপুত্র ও দিহিং নদীর মধ্যবর্তী দ্বীপে শিবির স্থাপন করেছিলেন।"[২২৭] এরূপ একটি ভূ-খন্ডে শত্রুদের পশ্চাদধাবন সত্যিই কঠিন কাজ; এবং সেই বৎসর আগাম বর্ষার প্রাদুর্ভাব এই কাজকে প্রায় অসম্ভব করে ফেলেছিল। ঠিক সে সময় "তিন দিন ও তিন রাত বৃষ্টিপাত হওয়ায় তাঁবুতে বাস করাও কঠিন হয়ে যাওয়ায় মীর জুমলা বর্ষা কালটি লেখুগড়ে কাটাতে চেয়েছিলেন, নৌবহরও এখানে নোঙ্গর করা ছিল, কিন্তু বর্ষা পুরোপুরি শুরু না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ লব্ধ সামগ্রী এবং হস্তিসমূহ সেখানে পরিবহন করাও অসম্ভব ছিল। তাই তিনি স্থান পরিবর্তন করে গাড়গাঁও থেকে ৭ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে একটি পাহাড়ের পাদদেশ মথুরাপুরে গমনের সিদ্ধান্ত করেন। সে অনুযায়ী তিনি গাড়গাঁওয়ে একটি সেনা শিবির রেখে যান এবং যে সকল সামগ্রী মজুদযোগ্য এবং যে সকল সামগ্রী জাহাঙ্গীরনগরে প্রেরিতব্য, সে সকল সামগ্রীর দায়িত্ব মীর মুর্তাজাকে প্রদান করেন। গাড়গাঁওয়ের দক্ষিণে দুটি থানা বা পর্যবেক্ষণ ফাঁড়ি স্থাপন করা হয়, একটি করা হয় দিওপানিতে এবং গাজী খানকে থানাদার নিয়োগ দেয়া হয়, অপরটি প্রতিষ্ঠা করা হয় আরো দক্ষিণে, সালহাটি বা সালপানিতে এবং মিয়ানা খানকে করা হয় থানাদার। গাড়গাঁও যে নদীর তীরে অবস্থিত, সে দিহিং নদীর পাহারাদার নিয়োগ করা হয় জালাল খান দারিয়াবাদীকে। এই ব্যবস্থা সম্পন্ন করে এবং গাড়গাঁওয়ে মাত্র ৪ দিন অবস্থান করে মীর জুমলা ২০শে সাবান (২১ শে মার্চ ১৬৬২) মথুরাপুর গমন করেন এবং আদম খানকে একটি অগ্রবর্তী প্রহরী দল দিয়ে আরও ১৬ মাইল দূরে অভিপুরের দিকে প্রেরণ করেন।

---

২২৭ এফ.আই. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৮৫। খুব সম্ভব উল্লেখিত দ্বীপটি ছিল মাজুলী দ্বীপ

শীঘ্রই পূর্ণ শক্তি নিয়ে বর্ষা আগমন করে সারা দেশকে ভাসিয়ে দেয়, যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, বিশাল জলরাশির মধ্যে তাদের থানাগুলোকে বিচ্ছিন্ন শিবিরে পরিণত করে ফেলে এবং তাদের যে অশ্বগুলোকে আসামীরা ভীষণ ভয় পেত, এই পানি ও কর্দমাক্ত মাটিতে সেগুলো পুরোপুরি অকেজো হয়ে যাওয়ায় মীর জুমলা এবং তাঁর লোকজন এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর ১৬৬২ পর্যন্ত প্রায় ছয় মাস অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন এবং তা ছিলো আসামীদের শৌর্যবীর্য থেকেও অধিক নির্মম ও জলবায়ুর কারণে অপ্রতিরোধ্য। এই পরিস্থিতির সঙ্গে অধিক অভ্যস্ত আসামীরা পরিস্থিতির সুযোগ নিতে পিছ পা হয়নি এবং গাড়গাঁওসহ বিভিন্ন ফাঁড়িতে অনবরত গেরিলা ও নৈশ হামলা করে শত্রুদের অবস্থা সত্যিই খুবই কঠিন করে তোলে। অসাধারণ সতর্কতা এবং সক্রিয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে মীর জুমলা নিজের আধিপত্য এবং তাঁর বাহিনীকে সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করেন। বার্নিয়ের মন্তব্য করেছেন যে, "অধিনায়ক একটু কম দক্ষ হলে তারা সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যেত।"[২২৮] এটা মীর জুমলার সাহস এবং ধৈর্যের পরিচয় যে, অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তিনি পশ্চাদাপসারণের চিন্তা করেননি। যদি করতেন, তাহলে ধ্বংস ছিল অনিবার্য। গাড়গাঁওয়ে তিনি যে চালের মজুদ পেয়েছিলেন, তা বিপদের সময় দারুন কাজে লাগে। লাখুগড়ে নোঙ্গর করা নৌবহরের অধিনায়ক ইবন-ই-হোসেন বুদ্ধি করে মুহাম্মদ মুরাদের নেতৃত্বে রসদ যোগান দিয়ে দিখো নদীর উজানে রণতরীর যে একটি বহর প্রেরণ করেছিলেন, সেটিও নিরাপদে গাড়গাঁওয়ে পৌঁছে।

বর্ষা মৌসুমে পাল্টা হামলায় আসামীরা লাখুগড় এবং গাড়গাঁওয়ের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছন্ন করে দেয়ার প্রতি স্বাভাবিকভাবেই তাদের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করেছিল। বর্ষা মৌসুমের শুরুতেই তারা লাখুগড়ের নিকটবর্তী দেওয়ালগাঁওয়ের থানাদার আলী রিজার উপর এক নৈশ হামলা পরিচালনা করে। মীর জুমলা কর্তৃক সময়মত সৈন্য প্রেরণ করায় এই হামলা প্রতিহত করা হয়। আসামীদের প্রথম উল্লেখযোগ্য সফল আক্রমণ ছিল ১লা শাওয়াল, ১০৭২ (৯ই মে ১৬৬২) গজপুর থানা আক্রমণ। থানাদার আনোয়ার বেগ এবং তার লোকজনকে হত্যা করা হয়। আসামীরা থানা দখল করে এবং "সৈন্যদের জন্য রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে লাখুগড় পর্যন্ত দিহিং নদীর অপর পাড়ে পরিখা খনন করে"।[২২৯] নওয়াব সারান্দাজ খানের অধীনে একটি উদ্ধারকারী দল প্রেরণ করেন, কিন্তু তিনি 'টিক' পর্যন্ত গিয়ে আর অগ্রসর হতে পারেননি। তাকে সাহায্য করার জন্য একটি

২২৮ বার্নিয়ের পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ১৭৩
২২৯ এফ.আই. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৮৬

রণতরীর বহরসহ মুহাম্মদ মুরাদকে প্রেরণ করা হয়; তিনি লাখুগড় থেকে রসদ নিয়ে এসেছিলেন এবং সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করায় পরাজিত হন ১৪ই শাবান (২৩ শে মে)। তার "রণতরীসমূহের পুরো বহরই আসামীদের হস্তগত হয়ে যায় এবং নাবিকদেরকে হত্যা করা হয়।" তবে চার দিন পরে ফরহাদ খান এবং কারাওয়াল খানের নেতৃত্বে আরো অধিক সৈন্যসহ শক্তিশালী একটি বাহিনী প্রেরণ করা হয় এবং সারান্দাজ খানের সঙ্গে যোগ দিয়ে আসামীদেরকে পরাজিত এবং তাদের ৪৯টি রণতরী করায়ত্ত করা হয়।[২৩০] ইবন-ই-হোসেন কর্তৃক প্রেরিত আরেকটি উদ্ধারকারী বাহিনী এসে মুহাম্মদ মুরাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া রণতরীসমূহ আসামীদের নিকট থেকে সাফল্যের সঙ্গে পুনরুদ্ধার করে ।[২৩১] এই সময় বারগোসাইনের ভাই ১০,০০০ থেকে ১২,০০০ সৈন্য নিয়ে গাজী খানের দিওপানি থানা আক্রমণ করে এবং তখন সেখানে মাত্র ২০ জন অশ্বারোহী এবং ৫০ জন পদাতিক সেনা মোতায়েন ছিল। গাজী খানের এক সৈন্য ইব্রাহীম খান বীরত্বসহকারে এই হামলা প্রতিহত করেন এবং তিনি অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এক পাল্টা হামলা চালিয়ে তাদের নেতাকে হত্যা করায় তাদের মধ্যে দ্রুত আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং বিপুল সংখ্যক আসামী সৈন্য পশ্চাদপসারণ করে। তবে বর্ষা এবং বন্যা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে আসামীরাও বিভিন্ন থানার উপর তাদের গেরিলা হামলা তীব্রতর করে। বিভিন্ন থানার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ায় মীর জুমলা বিভিন্ন থানা থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে গাড়গাঁও এবং মথুরাপুরে সৈন্য মোতায়েন কেন্দ্রীভূত করতে বাধ্য হন। আসামের রাজা নামরূপ থেকে চলে আসেন এবং সোলাগরীতে অবস্থান গ্রহণ করেন।

আসাম রাজ ফুকান বিজদিলিকে তার সেনাবাহিনীর দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং বিজদিলি নিকটবর্তী অবস্থান থেকে নৈশ আক্রমণের মাধ্যমে গাড়গাঁওয়ের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। এইসব আক্রমণ কষ্ট সহকারে প্রতিহত করা হয়। ১৬ই জিলহজ্ব ১০৭২ (১৫ই জুলাই ১৬৬২) মোগল সৈন্যরা রশিদ খানের নেতৃত্বে "কাকুজান নালাহ" পরীখার উপর এক সফল পাল্টা আক্রমণ চালায় এবং ১৭০ জন আসামীকে বন্দী করে নিয়ে আসে। এই সময় প্রতিরোধ যুদ্ধ মোকাবেলায় মীর জুমলার সাফল্য দেখে আসামীদের বোধদয় ঘটে, কারণ ফুকান বিজদিলি নওয়াবের নিকট একজন দূত প্রেরণ করেন এবং শত্রুতা অবসানের জন্য আহ্বান জানান। নওয়াব মীর জুমলা এই প্রস্তাবের প্রতি তাঁর সম্মতি জানিয়ে দেন, যদি "আসাম রাজ নিজের জন্য নামরূপ এবং সমগ্র পার্বত্য জেলাগুলো রাখেন এবং

---

২৩০ এফ.আই. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৮৭-৮৮
২৩১ এফ.আই. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৯০

অবশিষ্ট যে অঞ্চলে মোগলরা পৌঁছেছে, আসামের সে অঞ্চল মোগলদেরকে অর্পণ, যুদ্ধের জন্য একটি নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ এবং বাৎসরিক কর প্রদান করেন।" ফুকান এইসব ধারা অনুমোদন করেন এবং বলেন যে, যদি রাজা এগুলো গ্রহণ না করেন, তাহলে তিনি নিজে চলে আসবেন এবং নওয়াবের সঙ্গে যোগদান করবেন।[২৩২] পাহাড় থেকে আসা দূষিত হাওয়া ও পানির কারণে মথুরাপুরে এক ভয়াবহ মহামারীর প্রাদুর্ভাব হওয়ায় শান্তি আলোচনা ব্যহত হয়। এতে বহু লোকের প্রাণ নাশ হয় এবং মীর জুমলা বাধ্য হয়ে ১২ মুহাররম ১০৭৩ (১৭ই আগস্ট ১৬৬২) মথুরাপুর ত্যাগ করে গাড়গাঁওয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। আসামীরা এই গতিবিধিকে মোগলদের দুর্বলতার লক্ষণ বলে গণ্য করে এবং "বিজদিলি তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আর আসেননি।"[২৩৩] মথুরাপুরের মহামারী দারুণ ক্ষতি সাধন করে। যেমন, "যুদ্ধের শুরুতে দিলির খানের অধীনে ছিল ১৫০০ অশ্বারোহী, কিন্তু নামরূপ অভিযান এবং বর্ষা শেষে তিনি মাত্র ৪০০ থেকে ৫০০ অশ্বারোহী সংগঠিত করতে পারেন।"[২৩৪] উল্লেখযোগ্য বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা মথুরাপুরে মারা যান, তাঁরা হচ্ছেন, দারাং-এর রাজা মকরধাজ, যিনি আনুগত্য স্বীকার করে মোগল সৈন্যদের সঙ্গী হয়েছিলেন। অনেক আহত ও রুগ্ন ব্যক্তিকে এবং মজুদ শালি চালের এক চতুর্থাংশকে পরিবহন ব্যবস্থার অভাবে পিছনে ফেলে আসতে হয়। কাদায় আটকে যাওয়া কিছু সংখ্যক কামানও পরিত্যাগ করা হয়।[২৩৫]

বর্ষা মৌসুমে মোগলদেরকে কুচবিহারের ফাঁড়িগুলিকেও পরিত্যাগ করে আসতে হয়। সেখানে রাজস্ব বন্দোবস্তের কারণে লোকজনের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। এই অবস্থা এবং মীর জুমলার বহুদূর আসামে থাকার সুযোগ নিয়ে কুচবিহারের রাজা ভূটান থেকে চলে আসেন এবং কাঁঠালবাড়িতে মোগল কর্মকর্তা মোহাম্মদ সালিহকে পরাজিত এবং হত্যা করেন। অপর কর্মকর্তা ইসফান্দিয়ার খান ঘোড়াঘাটে পশ্চাদপসারণ করেন।

---

২৩২ এফ.আই. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৮৯

২৩৩ এফ.আই. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৮৯

২৩৪ এফ.আই. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৯১

২৩৫ এফ.আই. পূর্বোক্ত। মি. ফষ্টার নামে নাযিরাহর জনৈক ইংরেজ অফিসার ১৮৭২ সালে ব্লোকম্যানকে লিখেন, "আশেপাশে বহু সংখ্যক বড় আকারের লোহার কামান রয়েছে। এখান থেকে সাত মাইল দূরের একটি কামান ১৮.৩ ইঞ্চি, সাড়ে ৬ ইঞ্চি বোরের এবং এর ৪টি টুরিনিয়ন আছে। আমার বাংলো থেকে এক-চতুর্থাংশ মাইলের মধ্যে ১৪ ফুট লম্বা তিনটি কামান আছে। পরবর্তী মৌসুমে এগুলো দিখো নদীতে বিলীন হয়ে যাবে, কারণ এখন এগুলো পাড় থেকে মাত্র ১৫ ফুট দূরে রয়েছে এবং দ্রুত পাড় ভাংছে। আমার মনে হয় ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মোগলরা যখন প্রত্যাবর্তন করে তখন এগুলো ফেলে যায়। ব্লোকম্যান কর্তৃক উপরোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত

(ছ) পুনরায় আক্রমণ শুরু এবং শান্তিচুক্তি সম্পাদন

আগস্টের শেষের দিকে বর্ষণের প্রকোপ হ্রাস পায় এবং বন্যা কমতে শুরু করে। তাই ১০৭৩ হিজরীর সফর মাসের প্রথম দিকে (মধ্য সেপ্টেম্বর ১৬৬২) দেওয়ালগাঁও পুরুদ্ধার করা হয়। সফর মাসের মাঝামাঝি বৃষ্টি বন্ধ হয় (সেপ্টেম্বরের শেষে) এবং ২১শে রবিউল আউয়াল (২৪শে অক্টোবর) স্থল পথে প্রথম রসদ সরবরাহ আসে এবং এর এক সপ্তাহ পরে ২৮শে সফর (২রা নভেম্বর) জাহাজ ভর্তি রসদ গাড়গাঁওয়ে পৌঁছে। এবার মীর জুমলা আসামীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করেন। রাজা প্রথমে সোলাগরী এবং পরে নামরূপে পশ্চাদপসারণ করেন। তার দুজন প্রধান 'ফুকান' (আমির) বিজদিলি এবং কারকুম্বা, দিহিং নদীর পাড়ের পরীখায় অবস্থান গ্রহণ করেন। মীর জুমলা নিজ সৈন্যদেরকে তাদের অবস্থানে অক্রমণ করার নির্দেশ দান করেন। ৮ই রবিউসসানি (১০ই নভেম্বর) জনৈক নৌ-কর্মকর্তা আবুল হাসানকে নদীপথে তার বহর নিয়ে অগ্রসর হয়ে বিজদিলির পরীখার অবস্থানের পিছন দিক থেকে আক্রমণের নির্দেশ দেয়া হয়, আর মীর জুমলা নিজে দিহিং নদীর দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। বিজদিলি পুনরায় শান্তি প্রস্তাবসহ একজন দূত প্রেরণ করেন, কিন্তু তার প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। মীর জুমলা দিহিং নদীর তীরে পৌঁছেন কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি শুরু হয়। তিনি একদিন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তবে এতদিনে আসামীদের উপলব্ধি ঘটে যে, যেহেতু মীর জুমলা ও তাঁর সৈন্যদেরকে বর্ষার মৌসুমেই হটানো যায়নি, তাই তাদেরকে আর এই শুষ্ক মৌসুমে প্রতিরোধ করা যাবে না। এই উপলব্ধি আসামীদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে। বাদলি ফুকান তার তিন ভাইসহ এসে মীর জুমলাকে সম্মান জানান এবং তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। অন্যান্য আমির-ওমরাহগণও আনুগত্য স্বীকার করার বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন। ফুকানদের এই পক্ষ ত্যাগ করায় রাজা শঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং তিনি বিজদিলির যুদ্ধ পরিচালনায় অসন্তুষ্ট হয়ে বা তারও পক্ষ ত্যাগ আশঙ্কা করে "তাকে এবং তার পুরো পরিবার নারী-পুরুষ সকলকে হত্যা করেন।[২৩৬]

বাদলি ফুকানের পক্ষ ত্যাগ অভিযানের মোড় সম্পূর্ণভাবে ঘুরিয়ে দেয় তিনি তিন থেকে চার হাজার যোদ্ধা সংগ্রহ করেন এবং রাজাকে খুঁজে বের করার জন্য একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। মীর জুমলা তাকে গাড়গাঁও এবং নামরূপের

২৩৬ এফ.আই. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৯২

মধ্যবর্তী এলাকার জন্য সুবাদার নিয়োগ করেন এবং ১লা জামাদিউল আউয়াল ১০৭৩ (১লা ডিসেম্বর ১৬৬২), দরবেশ বেগের নেতৃত্বে একটি সেনাদলসহ তাকে সোলাগরি দখল করার জন্য প্রেরণ করেন। তারা ৬ই জমাদিউল আউয়াল (৬ই ডিসেম্বর ১৬৬২) সেখানে পৌঁছেন। মীর জুমলা ৭ তারিখে দিহিং নদী অতিক্রম করেন এবং কামরূপের দিকে অগ্রসর হন। এখন রাজা শান্তি চুক্তি করার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। এর দুই দিন পরে মীর জুমলা "জ্বরে আক্রান্ত হন এবং বুকে তীব্র ব্যাথা অনুভব করেন।" তথাপি তিনি সামনে অগ্রসর হন এবং পালকিতে চড়ে আরো এক ধাপ এগিয়ে ১৪ তারিখে কামরূপের জঙ্গলের প্রান্তদেশ বাটাম বা পাটামে পৌঁছেন। আসাম রাজ পুনরায় শান্তির জন্য আবেদন করেন, বিশেষ করে দিলির খানকে তার পক্ষ থেকে নওয়াবের সঙ্গে মধ্যস্থতা করার জন্য অনুরোধ করেন। নওয়াব কিছুটা তাঁর অসুস্থতা এবং কিছুটা দিলির খানের মতো তাঁর অফিসারদের পীড়াপীড়িতে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত নিম্নোক্ত শর্তসমূহের উপর ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়:

(১) রাজা তার কন্যাদের মধ্য হতে একজনকে সম্রাটের হেরেমে প্রেরণ করবেন;

(২) তাকে সত্বর যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ২০,০০০ তোলা স্বর্ণ, ১,২০,০০০ তোলা রৌপ্য, ৩৫টি হাতি (মীর জুমলা এবং সম্রাটের জন্য ১৫টি করে এবং দিলির খানের জন্য ৫টি) প্রদান করতে হবে;

(৩) তাকে পরবর্তী বৎসরের মধ্যে আরো ৩ লক্ষ তোলা রূপা এবং ৯০টি হাতি ৪ মাস অন্তর অন্তর তিনটি কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে;

(৪) এই শর্তসমূহ (৩) পূরণ না হওয়া পর্যন্ত রাজার প্রধান চার আমির যথা, বুধ গোসাইন, কারকাস- হা, বার গোসাইন এবং প্রাবাতারের পুত্রদেরকে জিম্মী হিসেবে নওয়াবের নিকট রাখতে হবে;

(৫) তারপর থেকে কর হিসেবে বৎসরে ২০টি হাতি প্রদান করতে হবে;

(৬) নিম্নোক্ত অঞ্চলসমূহ মোগলদের নিকট ছেড়ে দিতে হবেঃ "উত্তরকূল অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পাড়, সরকার দারাং, যার একদিকে গৌহাটি এবং অন্যদিকে সামধারা দূর্গের নিকট দিয়ে প্রবাহমান আলি বুরারী (ভারেলী নদী); এবং দক্ষিণকূলে অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদীর দক্ষিণ পাড়ের জেলাসমূহ, যথাঃ নাকিরানি, নাগাপাহাড়, বেলতলী এবং ডুমুরিয়া;

(৭) সর্বশেষে, রাজা কামরূপের যে সকল অধিবাসীকে পাহাড় এবং নামরূপে বন্দী করে রেখেছেন, তাদের সকলকে মুক্তি দিতে হবে এবং বাদলি ফুকানের পরিবারবর্গকেও ছেড়ে দিতে হবে।"[২৩৭]

এইভাবে বর্ণিত অঞ্চলসমূহ সহজেই সনাক্ত করা সম্ভব। ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে যে সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে তা হলো, "আলি বুরারি নদী যা আধুনিক শহর তেজপুরের ১০ মাইল পূর্ব দিক দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। দক্ষিণকূল অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদীর দক্ষিণ দিক সম্পর্কে অভিযানের ঐতিহাসিক বিশেষ খেয়াল করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, নাকিরানি জেলা "গারো পাহাড়ের নিকটে অবস্থিত" এবং ডুমুরিয়া "কুলাং নদী এবং কাছারের সীমান্ত পর্যন্ত" বিস্তৃত এবং সেখান থেকে "হাতি এসে ডুমুরিয়ায় প্রবেশ করতো"।[২৩৮] কুলাং নদী আধুনিক গৌহাটি শহরের ১৫ মাইল পূর্ব দিক দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। "ফাতিয়া-ই-ইবরিয়া"র অনুবাদক ব্লকম্যান বলেছেন যে, "নাগা পাহাড়সমূহ" বলতে মনে হয় "মিকির এবং রেংমা নাগা পাহাড়সমূহ" বুঝানো হচ্ছে।[২৩৯] এই পাহাড় দুটি আধুনিক নাউগং এবং সিবসাগর জেলা দুটির উপর বিস্তৃত। এখানে আরো উল্লেখযোগ্য যে, যে তিনটি উপনদী পাহাড়ে সৃষ্টি হয়ে নিম্নভূমিতে এসে একত্রে মিলিত হয়ে কুলাং নদীর সৃষ্টি করেছে, সেগুলোর উৎপত্তি হয়েছে মিকির পাহাড়, রেংমা পাহাড় এবং কাছাড়ের পাহাড়সমূহে। তবে "বেলতলী" সম্পর্কে কোন ঘ্যাখ্যা নেই। যাহোক, উপরের তথ্যসমূহ একত্র করলে ব্রহ্মপুত্র নদীর দক্ষিণ পাড়ের অন্তর্ভূক্ত অঞ্চলগুলো সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায়, তা হচ্ছে এই যে, আধুনিক গোয়ালপাড়ার নিম্ন অঞ্চল এবং কামরূপ জেলা ছাড়াও গারো পাহাড়ের জেলাগুলো (ময়মনসিংহ জেলার উত্তরে অবস্থিত) খাসিয়া এবং জয়ন্তিয়া পাহাড় (সিলেটের উত্তরে এবং কাছারের উত্তর, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত) এবং কুলাং নদীর উর্ধ্বাংশ এবং মিকির পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত নাউগং জেলার বৃহত্তর অংশ ঐ অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত ছিল।[২৪০]

---

২৩৭ এফ.আই. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৯৪ এবং এ.এন. পৃষ্ঠা ৮০৮; রিয়াদ পৃষ্ঠা ২২৬ টীকা

২৩৮ এফ.আই. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৯৪

২৩৯ এফ.আই. পূর্বোক্ত টীকা

২৪০ একটু পরই শিহাবুদ্দীন তালিশ নওয়াবের প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে যা বলেছেন, তা থেকে এই অঞ্চলের সীমানা সম্পর্কে যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তার যথার্থতার প্রমাণ মিলে। তিনি বলেছেন যে, মাজুলী দ্বীপের নিকটবর্তী লাখুগড় থেকে রওয়ানা দিয়ে নওয়াব পথিমধ্যে বর্তমানে সংযোজিত ডুমুরিয়া জেলার অংশসমূহ পরিদর্শন করেন এবং পালকীতে চড়ে কাজলীর সমভূমি অতিক্রম করে তা, যেখান দিয়ে ইতিপূর্বে কোন সেনাবাহিনী অতিক্রম করেনি প্রথম দু'দিনের প্রতিদিন আট ক্রোশ, তৃতীয় দিনে ১৪, চতুর্থ দিনে ১২ ক্রোশ অতিক্রম করেন। এরপর তিনি কুনাং নদী এবং কাজলী দূর্গ অতিক্রম করেন (ঐ পৃষ্ঠা ৯৫)। এইভাবে তিনি কুলাং নদী পর্যন্ড় আসতে যে সংযোজিত ভূমি অতিক্রম করেন তা প্রায় ৮৪ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

উপরোক্ত শর্তসমূহ গৃহীত হওয়ায় উভয় পক্ষ সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষর করে। ৫ই জামাদিউসসানি (৪ঠা জানুয়ারি ১৬৬৩) রাজা তার "কন্যা, সোনা-রূপা, দশটি হাতি এবং জিম্মীদের নওয়াবের নিকট প্রেরণ করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন আরও ত্রিশটি হাতি লাখুগড়ে প্রেরণ করবেন।[২৪১] ৯ই জামাদিউসসানি আরও ১১টি হাতি আনা হয় এবং মীর জুমলা লাখুগড়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেওয়ার পূর্বেই রাজা নামরূপে যাদেরকে বন্দী এবং আটক করে রেখেছিলেন, তারা সকলে এবং আরো ২০টি হাতি এসে পৌঁছে। অনুরূপভাবে মীর মুর্তাজা গাড়গাঁওয়ে যে সকল সামগ্রী আটক করেছিলেন, সে সকল সামগ্রীও নিয়ে আসেন।[২৪২]

৪. মীর জুমলার প্রত্যাবর্তন এবং মৃত্যু

এইভাবে আসাম রাজের আনুগত্য আদায় করে এবং তার রাজ্যের বৃহত্তর অংশ সংযোজন করে ১০ই জামাদিউসসানি (৯ই জানুয়ারি ১৬৬৩) মীর জুমলা প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন। মোটামুটি এই অভিযান ছিল নজীরবিহীনভাবে সফল। অভিযানের ঐতিহাসিক যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, "প্রত্যার্পিত দক্ষিণকূলের অঞ্চলসমূহ পূর্বে কখনোই মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল না।"[২৪৩] কেহ কেহ যে বলেছেন, তিনি বাধ্য হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছেন, তা ঠিক নয়, বরং তাঁর প্রত্যাবর্তন ছিল বিজয়ীর প্রত্যাবর্তন। প্রকৃতপক্ষে মীর জুমলা সংকল্প করেছিলেন যে, তিনি গোহাটি গিয়ে "আর্থিক বিষয়ের" বন্দোবস্ত করবেন এবং তারপর কুচবিহারের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করবেন। অতএব, তিনি জিম্মীদের নিয়ে "লাখুগড় থেকে জাহাজে আরোহন করেন এবং তাঁর সেনাবাহিনীর প্রধান অংশকে দক্ষিণকূল হয়ে বারিতলা প্রেরণ করেন" এবং সেখান থেকেই তারা ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করবেন।[২৪৪] কুলাং নদীর মোহনা কাজলীতে দারাং-এর মৃত রাজা মকরধাজের মা এবং ডুমুরিয়ার রাজার মা এবং ভ্রাতুষ্পুত্র, যাদেরকে তাদের বাড়ি ফিরে যেতে অনুমতি দেয়া হয়েছিল, তারা এসে মীর জুমলার সঙ্গে সাক্ষাত করেন। রশিদ খানকে কামরূপের ফৌজদার নিয়োগ করা হয় এবং তার সদর সপ্তর ছিল গৌহাটি এবং সেখানকার সাবেক ফৌজদার মোহাম্মদ বেগকে রশিদ খানের অধীনে কাজলির থানাদার নিয়োগ করা হয়। শেষোক্ত এই দু'জন কর্মকর্তা

---

২৪১ এফ.আই. পূর্বোক্ত প্রষ্ঠা ৯৪
২৪২ এফ.আই. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৯৫
২৪৩ এফ.আই. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৯৫
২৪৪ এফ.আই. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৯৫

দারাং এবং ডুমুরিয়ার রাজার উত্তরাধিকারীগণকে অধীনস্থ মিত্র হিসেবে তাদের সহযোগিতা নিয়ে সংযোজিত অঞ্চলের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করবেন। কাজলীতে কয়েক দিন বিশ্রাম নিয়ে এবং ঐ প্রশাসনিক বন্দোবস্ত সম্পন্ন এবং মুহাম্মদ বেগ কর্তৃক দারাং-এ ধৃত হাতিগুলো সংগ্রহ করে[২৪৫] মীর জুমলা গৌহাটির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। সেখানে তিনি "কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক বিষয় নিষ্পত্তি করেন" এবং ২৬শে রজব ১০৭৩ (২২শে ফেব্রুয়ারি ১৬৬৩) বারিতলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এই শেষোক্ত স্থানে তিনি ২৬ দিন অবস্থান করেন এবং এখানে তার "রোগ আরো তীব্র হয় এবং আরো ঘন ঘন বেহুঁশ হয়ে যান।" ডাক্তাররা তাঁকে জরুরী ভিত্তিতে রাজধানীতে ফেরার পরামর্শ দেন। সে অনুযায়ী তিনি ২৬শে শাবান কুচবিহারের বিরুদ্ধে নতুন করে আক্রমণ পরিচালনার জন্য আসকার খানকে নিযুক্ত করেন এবং নৌকায় করে জাহাঙ্গীরনগরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। ২রা রমজান ১০৭৩ (৩০শে মার্চ ১৬৬৩) "খিজিরপুরের (নারায়ণগঞ্জের) ২ ক্রোশ উজানে" থাকতেই পথিমধ্যে ইন্তিকাল করেন।

রাজধানীতে পৌঁছার পূর্বে পথিমধ্যে মীর জুমলার মৃত্যুতে তাঁর আসাম অভিযানের ক্ষেত্রে আসলেই একটি বিপর্যয় যোগ করে, কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে সেনাবাহিনীকে দারুণভাবে নিঃশেষ করে এবং তাঁর নৌবহর ধ্বংস করে পরাজিত হয়ে ফিরেননি। মথুরাপুরের মহামারীতে কিছু লোকের মারা যাওয়া ছাড়া প্রাণহানীর সংখ্যা ছিল একেবারেই নগণ্য। তাঁর বাহিনী কোথাও পরাজিত হয়নি। রণতরীর বহরও অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসে[২৪৬] বরং আসামীদের যুদ্ধ জাহাজ হস্তগত হওয়ায় নৌবহর বিশাল আকার ধারণ করে। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে যে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং হাতি পাওয়া যায়, জিম্মীদেরসহ সেগুলো বাংলায় নিয়ে আসা হয়। আসাম রাজের কন্যাকে পরে ইসলামে দীক্ষিত করা হয় ও তার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় রহমত বানু এবং শাহজাদা আজমের সঙ্গে তার বিয়ে হয়।[২৪৭] পরাজয়, গ্লানি এবং ভূমি হারিয়ে আসামের রাজা এমনভাবে ভেঙ্গে পড়েন যে, ঐ বৎসরের কয়েক মাস পরেই তার মৃত্যু হয় (১৬৬৩)।[২৪৮] তার মৃত্যুর কারণে পরবর্তী বৎসরের মধ্যে যুদ্ধের আরো যে ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথা

---

২৪৫ এফ.আই. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৯৫

২৪৬ দেওয়ানগঞ্জে অল্পসংখ্যক রণতরী খোয়া গেলেও পরে অবস্থার উন্নতি হয় এবং সেগুলোর অধিকাংশই পুনরুদ্ধার করা হয়

২৪৭ মা' সির-ই-আলমগীরী পৃষ্ঠা ৭৩

২৪৮ আসামীজ বুরুঞ্জী, দ্যা আসাম ক্রোনিকল, জে.এ.এস./বি-তে উদ্ধৃত, ১৮৭২, পৃষ্ঠা ৯৭

ছিল এবং তারপর প্রতি বৎসর কর হিসেবে যে ২০টি হাতি প্রদেয় ছিল, তা মনে হয় আর দেয়া হয়নি। কিন্তু উত্তরকূল ও দক্ষিণকূল এলাকাগুলো মোগলদের নিকট ছেড়ে দেয়া এবং সেগুলো অধিনস্থ ডুমুরিয়া এবং দারাং-এর রাজাদের ব্যবস্থাধীনে থাকায় এলাকাটি একটি মধ্যবর্তী অঞ্চলে (Buffer Territories) পরিণত হয়, তবে মোগলদের কর্তৃত্বের স্বীকৃতি অব্যাহত থাকে, আর গৌহাটির ফৌজদার এবং কাজলীর থানাদার কমপক্ষে আরো চার বৎসর পর্যন্ত নিরুপদ্রবে কাটান, তারপর আবার সেখানে বিরোধ সৃষ্টি হয়।[২৪৯]

PLATE XLV.

The Sonakanda Fort, Narayanganj, built during Mir Jumla's time. (Reproduced from *M.A.A.T.P.*, Pl. 63b).

মীর জুমলা ছিলেন একজন মহান ব্যক্তি। যুদ্ধ এবং শান্তি উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে মহান। দাক্ষিণাত্য এবং বাংলা, উভয় জায়গায় একজন সেনাপতি এবং প্রশাসক হিসেবে তাঁর খ্যাতি অতি উজ্জ্বল। কুচ-আসাম অভিযান বাদ দিলে তিনি মাত্র দেড় বৎসর বাস্তবে বাংলা শাসন করেছিলেন। কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যেও তিনি প্রদেশব্যাপী তাঁর কর্তৃত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, প্রশাসন সুবিন্যস্ত করেন এবং

২৪৯ দেখুন এ.এন. পৃষ্ঠা ১০৬৮ এবং আরো এম.এ. পৃষ্ঠা ৬৫।

সাধারণভাবে গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে ঘরে শান্তি আনেন। নিজে একজন খাঁটি মুসলমান হিসেবে তাঁর রাজস্ব এবং বিচার ব্যবস্থা মানবিক বিবেচনা এবং শরিয়তের মূলনীতির উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হতো। আসামযুদ্ধ এবং অন্যান্য অভিযানেও তিনি তাঁর সৈন্যদেরকে কোন প্রকার বাড়াবাড়ি করতে দেননি এবং বিজিত লোকদের কল্যাণের প্রতি সদয় দৃষ্টি দিতেন। তিনি দক্ষতা, বিশ্বস্ততা এবং ধৈর্য্যের সঙ্গে তাঁর মনিবের জন্য কাজ করতেন।

ইউরোপীয় লেখকগণ তাঁর প্রতি সর্বদাই অবাধ্য থাকার যে দোষারোপ করেছেন, তা ভিত্তিহীন এবং বাস্তব ঘটনাবলী সে সাক্ষ্য দেয় না। আসাম যুদ্ধ তাঁর ব্যক্তিগত অসংযত উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফল ছিল না, আর না ছিল তা তাঁর সম্রাটের কল্পিত মেকাইয়াভেলীয়ান উদ্দেশ্যের কারণে। এই যুদ্ধটা আসলে পূর্বের মতোই মোগলদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল।

মীর জুমলা কর্তৃক দারাং এবং ডুমুরিয়ার রাজাদেরকে অধীনস্ত মিত্র হিসেবে তাদের নিজ নিজ রাজ্যে রেখে দেয়াটা মনে হয় মোগল সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের পরিস্থিতি সম্পর্কে যথাযথ উপলব্ধির ভিত্তিতে একটি বাস্তবসম্মত এবং সুবিবেচনাপ্রসূত পদক্ষেপ ছিল। বাংলায় ইউরোপীয় কোম্পানীগুলোর সঙ্গে তাঁর ব্যবহারও ছিল ন্যায়সঙ্গত, ব্যবসায়ী এবং রাষ্ট্রের স্বার্থের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদানের নীতির উপর ভিত্তিশীল। দাক্ষিণাত্য এবং বাংলায় তিনি সকল ব্যবসায়ী পণ্যের উপর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন বলে যে মত রয়েছে, তা হচ্ছে সম্পূর্ণ অমূলক এবং এর ভিত্তি হচ্ছে ইংরেজ কুঠিয়ালদের কতিপয় বিচ্ছিন্ন পত্রের ভাসা-ভাসা পর্যালোচনা এবং এর সঙ্গে অন্যান্য নথিপত্র না মিলিয়ে এবং তাদের সঙ্গে মীর জুমলার সামগ্রিক সম্পর্কের বিষয়টি বিবেচনায় না নিয়ে ঢালাও মন্তব্য। বাংলায় ইংরেজ দালালেরা অন্যান্য ইউরোপীয় সম্প্রদায় থেকে বেশি না হোক, অন্তত: তাদের সকলের মতোই তারাও তাঁর মৃত্যুতে শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়[২৫০]

শায়েস্তা খানঃ বিজয় এবং শাসন ব্যবস্থা

(১০৭৪-১০৮৮, ১০৮৯-১০৯৮হিজরি /১৬৬৪-১৬৭৮, ১৬৭৯-১৬৮৮খ্রিস্টাব্দ)

১. মীর জুমলার মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা

মীর জুমলার মৃত্যু "স্বাভাবিকভাবেই সারা ভারতব্যাপী একটি বড় রকমের আলোড়ন সৃষ্টি করে"[২৫১] এবং বাংলায় সৃষ্টি করে একটি শিথিলভাব; যেমন, যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী ছিল, সেগুলোও পরবর্তী সুবাদার না আসা পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়। আসকার খানের ওপর অর্পিত কুচবিহার অভিযান প্রেরিত হয়নি। তিনি শুধু "কুচবিহারের বেড়িবাঁধের বাহিরে অবস্থিত চাকলা ফতেহপুর পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং তা দখল করে সেখানেই অপেক্ষা করতে থাকেন। আসাম অভিযান থেকে ফিরে এসে মীর জুমলার আরাকানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার ইচ্ছাও অবাস্তবায়িত থেকে যায়। মীর জুমলার আসামে অবস্থানের সময় ঢাকায় এক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং একই সঙ্গে এলাকার উপর দিয়ে একটি প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়।[২৫২] দুর্ভিক্ষের একটি আংশিক কারণ ছিল সে বৎসরের দীর্ঘায়িত বর্ষণ এবং বন্যা এবং আরেকটি আংশিক কারণ ছিল খাদ্যশষ্য ব্যবসায়ীদের বিবেকহীন আচরণ। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, মীর জুমলার অভিযান নিয়ে আসাম যাওয়ার প্রাক্কালে খাদ্য ব্যবসায়ীদের অযৌক্তিক এবং অত্যাধিক দর কষাকষির জন্য তিনি তাদের উপর জরিমানা ধার্য করেছিলেন।[২৫৩] অবশ্য মীর জুমলার প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই দুর্ভিক্ষ চলে যায়; প্রয়োজন ছিল পূনর্গঠন এবং পূনর্বাসনের কাজে জরুরী দৃষ্টি দেয়া।

তখন সেখানকার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ তাদের কাজের জন্য তাদের ওপর কোন তত্ত্বাবধায়ক এবং সমন্বয়কারী দেখতে না পেয়ে নিজেরা পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়ে পড়েন। দুটি উপদলের একটি গঠিত হয় ইহ্‌তিশাম খানকে কেন্দ্র করে, যাকে মীর জুমলা আসাম অভিযানের সময়

---

২৫০ মূল বইয়ের উনবিংশতম অধ্যায়

২৫১ বার্নিয়ের পূর্বোক্ত পৃঃ১৭৩

২৫২ এফ. আই. . ১৬৬১-১৬৬৪ পৃঃ ১৭৬

২৫৩ ঐ পৃষ্ঠা ৩৮৩

প্রদেশের দায়িত্বে নিয়োগ করে গিয়ে ছিলেন এবং আরেকটি গঠিত হয় দিলির খানের নেতৃত্বে, যিনি আসাম অভিযানের সময় মীর জুমলার সঙ্গী হয়েছিলেন এবং তাদের অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি। তারা উভয়ে নিজদের প্রভাবও প্রতিপত্তি বাড়ানোর জন্য নিজ নিজ সমর্থক এবং অনুসারীদেরকে বিভিন্ন রকম মজুরী ও আনুকূল্য প্রদান করেন। ঐতিহাসিক শিহাবুদ্দীন তালিশ কোন পক্ষ থেকেই কোন আনুকূল্য না পেয়ে এভাবে তার ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন: "প্রত্যেকেই যার যার পছন্দানুযায়ী চাহিদা পেশ করে এবং এই প্রশাসক সর্বাধিক উদারতার সহিত তাদের দাবী মঞ্জুর করেন, যেমন কোন আবেদনকারীকে পানি সরবরাহের জন্য নদীর প্রতি নির্দেশ জারী করেন। এটাকে তারা সহজে জনপ্রিয়তা অর্জনের উপায় বলে মনে করেন। এই লেখকসহ যারা ঐ সকল হঠাৎ ক্ষমতাশালীদের নিকট কোন আবেদন করেননি, তারা কিছুই পাননি"।[২৫৪] ক্ষুদ্ধ লেখক আরো উল্লেখ করেছেন যে, এই সকল উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ নিজেদের মধ্যে মতভেদের কারণে মীর জুমলার মৃত্যুর ৪ সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত ঈদুল ফিতরের নামাজ খিজিরপুর শহরের তিন জায়গায় আদায় করেন; এবং সাবেক প্রশাসনের সকল "অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মকর্তাগণ" প্রদেশ ত্যাগ করে সম্রাটের দরবারের উদ্দেশ্যে চলে যান।

ঐতিহাসিকের শেষ মন্তব্যটি স্পষ্টতই অসত্য। আর মীর জুমলার মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে তার বর্ণনাও স্পষ্টতঃ অতিরঞ্জিত। তার বিবরণে এমন কিছু পাওয়া যায় না, যে জন্য ধরে নিতে হবে যে তখন "প্রদেশে চলছিল রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা" এবং "সিংহাসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্য ১৬৫৭ সালে শুজার বাংলা ত্যাগ করার ফলে আভ্যন্তরীণ প্রশাসন ব্যবস্থা যেভাবে ভেঙ্গে পড়ে, ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা মার্চ সুবাদার হিসেবে শায়েস্তা খান রাজমহলে প্রবেশ করার পরই তার অবসান ঘটে"।[২৫৫] এই কথা সত্য যে, মীর জুমলা তাঁর

---

২৫৪ তালিশের ধারাবাহিক এইচ বি ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৩৭২

২৫৫ যদুনাথ সরকার, এইচ বি, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৭২। যদুনার্থ সরকার মনে হয় কর্মকর্তাদের উপর আরো কলঙ্ক লেপনের জন্য তালিশের অতিরঞ্জিত বর্ণনাটিকে অযৌক্তিকভাবে আরো বাড়িয়ে তুলেছেন। এইভাবে সরকার দেখেছেন (এইচ.বি.২য়. পৃঃ ৩৭১): "ঢাকার অফিসারদের মীর জুমলার মৃত্যু সংবাদ সম্রাটের নিকট পৌছাতে এবং এই শূন্যস্থান পূরণের জন্য তাঁর আদেশ আনতে ৭ সপ্তাহ লেগে যায়, সম্রাট সে সময় কাশ্মীর যাওয়ার পথে বহুদূর লাহোরে ছিলেন... এই আদেশ ১৭ই মে, ১৬৬৩, ঢাকা এসে পৌঁছে ..."। মীর জুমলা ৩১শে মার্চ ইনতিকাল করেছিলেন এবং দেখা যায় যে এই আদেশ ঢাকা পৌঁছতে ঠিক ৬ সপ্তাহ এবং আরো ২দিন লাগে। এটা নিশ্চিত যে, এই দীর্ঘ সময় শুধু ঢাকার কর্মকর্তাদের অবহেলার জন্যই লাগেনি। প্রকৃতপক্ষে আওরঙ্গজেব মীর জুমলার মৃত্যু সংবাদ পেয়েছিলেন ২৩শে এপ্রিল অর্থাৎ তিন সপ্তাহ ২দিন পর। এটা পরিষ্কার যে, অন্য তিন সপ্তাহ লেগেছে রাজকীয় আদেশ লাহোর থেকে ঢাকায় পৌঁছতে। অতএব, একেবারে সমান সময় লেগেছিল ঢাকা থেকে সংবাদ লাহোর প্রেরণ করতে আবার লাহোর থেকে ঢাকায় আসতে। কাজেই, ঢাকা থেকে মীর জুমলার মৃত্যু সংবাদ হয় তার মৃত্যুর দিন, অথবা তার পরেরই দিনই প্রেরণ করা হয়েছিল। মজার ব্যাপার হলো যে, সরকারের লেখা আরেকজন লেখককে বোকা বানায় যিনি ঠিক

সুবাদারীর প্রায় অর্ধেক সময় আসাম অভিযানে ব্যয় করেছেন। কিন্তু সে সময় প্রশাসন ব্যবস্থা মোটেই ভেঙ্গে পড়েনি, এমনকি উত্তরাধিকার যুদ্ধের সময়ও তা হয়নি। যুদ্ধে যতটুকু অব্যবস্থাই ঘটেছিল, মীর জুমলা এসে সুবাদারীর দায়িত্ব গ্রহণের পরে নতুন করে অফিসিয়াল কিছু দায়-দায়িত্ব পুনর্বন্টন করে তিনি আসামে অভিযান পরিচালনার জন্য স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন। এমন কি শায়েস্তা খানও যখন রাজমহলে পৌঁছেন, তখনও তিনি প্রদেশের কথিত ভেঙ্গে পড়া প্রশাসন সংস্কারের কোন আশু বাধ্য-বাধকতা বোধ করেননি। পক্ষান্তরে তিনি প্রশাসনকে এমন স্বাভাবিক ও স্থিতিশীল দেখতে পেলেন যে, তিনি ঢাকা রওয়ানা করার পূর্বে কুচবিহারের রাজার অবাধ্যতা মোকাবেলার জন্য সাত মাসের চেয়েও বেশি সময় রাজমহলে থাকা পছন্দ করলেন। শায়েস্তা খান যে বিভিন্ন প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, তা সবই ছিল স্ববিস্তারে প্রশাসনিক খুঁটিনাটি এবং তা কোনভাবেই তার পৌঁছার পূর্বে প্রশাসন ভেঙ্গে-পড়ার কোন ইঙ্গিত বহন করে না।

মীর জুমলার মৃত্যু সংবাদ আওরঙ্গজেবের নিকট পৌঁছে ২৩ শে এপ্রিল ১৬৬৩,[২৫৬] তখন তিনি কাশ্মীর যাওয়ার পথে লাহোরে পৌঁছেছিলেন। এই সংবাদে স্বাভাবিকভাবেই তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং পরলোকগত সুবাদারের পুত্র মুহাম্মদ আমীনকে বিশেষ অনুগ্রহ করে তার বখশী পদে তাকে স্থায়ী করেন এবং তার মাসিক ভাতা এক হাজার টাকা বাড়িয়ে দেন এবং তাকে তার পিতার সম্পদের একমাত্র উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।[২৫৭] অন্যদিকে, সম্রাট বাংলা থেকে ইহ্‌তিশাম খানকে দরবারে ডেকে পাঠান এবং বাংলার একজন স্বতন্ত্র সুবাদার নিয়োগ না দেয়া পর্যন্ত বিহারের তৎকালীন সুবাদার দাউদ খানকে অস্থায়ী সুবাদার হিসেবে বাংলায় বদলী করেন এবং দাউদ খানের বাংলায় পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত দিলির খানকে বাংলার প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করেন। ১৬৬৩ সালের ১৭ই মে এই আদেশ ঢাকায় পৌঁছে। প্রদেশের প্রশাসন ব্যবস্থা যে ভেঙ্গে পড়েনি বা "রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও দেখা দেয়নি," তার আরো প্রমান এই যে, এই সকল আদেশ যথারীতি বাস্তবায়িত হয়েছিল। ইহ্‌তিশাম খান পরলোকগত সুবাদারের পরিবারের সদস্যবর্গ, তার বিষয় সম্পদ এবং হাতিসমূহ, অর্থ-কড়ি এবং আসাম বিজয়ের স্মৃতিচিহ্নসহ দিল্লী রওয়ানা করেন। দিলির খান ২৭শে

তাকে অনুসরণ করে আরো সাহসের সঙ্গে বলেছেন: " মীর জুমলার মৃত্যু সংবাদ সম্রাটের নিকট পৌঁছাতে বাংলার কর্মকর্তাদের লেগেছিল সাত সপ্তাহ. সম্রাট তখন কাশ্মীর গমন উপলক্ষে লাহোর অবস্থান করেছিলেন।" (এ.সি. রায়. হিষ্টি অব বেঙ্গল. মোগল পিরিয়ড ১৫১৬-১৭৭৬. কলিকাতা. ১৯৬৮ পৃঃ ২৫৭)

২৫৬ জে.এন. সরকার, পৃঃ ২২১

২৫৭ বার্নিয়ের পৃঃ ১৭৩ বার্নিয়ের লিখেছেন. মীর জুমলার শক্তি ও প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় আওরঙ্গজেব শঙ্কিত ছিলেন বলে তার মৃত্যুতে তিনি প্রকৃতপক্ষে খুশী হয়েছিলেন বক্তব্যটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক এবং আলমগীর নামার বক্তব্যের সঙ্গেও সাংঘর্ষিক

সেপ্টেম্বর অস্থায়ী সুবাদার দাউদ খানের ঢাকা পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত প্রদেশের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে ঢাকায় ত্রাণ এবং পূনর্বাসনের কাজ করেন এবং নিজ দায়িত্বে সে বৎসরের ফসলের যাকাত প্রেরণ করেন।[২৫৮]

২. শায়েস্তা খানের আগমন এবং কুচবিহার পুনঃ অধিকার

শায়েস্তা খান এসে দাউদ খানকে অব্যাহতি দেন। শায়েস্তা খান ছিলেন মমতাজ মহলের ভ্রাতা ইয়ামিন আল দৌলত আসফখানের পুত্র এবং সেজন্য সম্পর্কে আওরঙ্গজেবের একজন মামা। সম্রাট তাকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতেন এবং মীর জুমলার মৃত্যুর পরে তাঁকে 'আমীরুল ওমারা' খেতাবে ভূষিত করেন এবং তাঁকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করেন। বাংলায় আসার পূর্বে শায়েস্তা খান অনেক যুদ্ধ জয়ের সম্মান অর্জন করেছিলেন এবং বিহার, আগ্রা এবং দাক্ষিনাত্যের সুবাদার হিসেবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে দায়িত্ব পালন করেছেন। যখন তিনি বাংলায় আসেন, তখন তাঁর বয়স ৬৩ বৎসর এবং অভিজ্ঞতায় ভরপুর। তখন তাঁর শৌর্যবীর্য এবং কর্মশক্তি ছিল অক্ষুন্ন।[২৫৯] তিনি প্রায় এক চতুর্থাংশ শতাব্দী অত্যন্ত দক্ষতা ও যোগ্যতার সঙ্গে প্রদেশ শাসন করেন। তবে ১৪ বৎসর পর্যন্ত অব্যাহতভাবে শাসন করার পর এক বৎসরের একটি ছেদ ছিল।

সুবাদার শায়েস্তা খানের শাসনকাল এবং তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং কৃতিত্বের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথমতঃ তিনি জায়গীরদার, আইমাদার এবং নিসকর মাদাদ-ই-মা'আশ ভোগকারীদের সুবিধার জন্য কয়েকটি কল্যাণকর প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করেন। এতে বহু সংখ্যক মুসলমান নিশ্চিন্ত এবং স্থায়ীভাবে দেশে বসবাসের সুযোগ পান।

---

২৫৮. তালিশের ধারাবাহিকতা পৃঃ ১১২

২৫৯. যদুনাথ সরকার যে, বলেছেন, যখন শায়েস্তা খান বাংলায় আসেন, তখন তিনি ছিলেন "একজন ক্লান্ত বৃদ্ধ লোক, যিনি তার অভিযানসমূহের দায়িত্ব তার অধীনস্থ, বিশেষ করে তার যোগ্য সন্তানদের উপর অর্পন করতেন এবং তিনি নিজে তার বহু হারেমের মধ্যে আরাম-আয়েশে জীবন যাপন করতেন", (এইচ.বি., ২য় খন্ড, পৃঃ৩৭৩), স্পষ্টত:ই বোধগম্য যে, তার এই বক্তব্য পক্ষপাতদুষ্ট, সমসাময়িক কোন সূত্র, এমনকি ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এজেন্টদের শত্রুভাবাপন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সত্ত্বেও তাদের কোন বক্তব্য থেকে ও এ কথার কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে, মনে হচ্ছে সরকার শায়েস্তা খানের ওপর একটি কলঙ্কচিহ্ন অংকন করতে চাচ্ছেন এবং তার আলোচনাকে সুবাদারের হারেমে কথিত আরামের জীবন, অমিতব্যায়িতা, জনগণকে শোষন করা, বনিকদেরকে নির্যাতন এবং শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি বিষয়ের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করেছে। এমনকি শায়েস্তা খানের অসংখ্য স্থাপত্য শিল্পের কৃতিত্বকে তাঁর ব্যয়বহুল অমিতাচার এবং তাঁর সময়ের খাদ্য শষ্যের সুলভমূল্যকে হাস্যকরভাবে এই বলে খাটো করে দেখাতে চেয়েছেন যে, বাংলার চালের গোলার কেন্দ্র হচ্ছে ঢাকা, তাই চালের কম দামে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।" পূর্বোক্ত পৃঃ ৩৮৭।

দ্বিতীয়ত: কুচবিহার পুন:অধিকার করা ছাড়াও তিনি চট্টগ্রাম পুনরায় জয় করেন এবং দক্ষিণ বাংলার বিপুল সংখ্যক লোককে মগ এবং ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের যুগ যুগব্যাপী ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করেন। এই চট্টগ্রামকে জলদস্যুরা তাদের আক্রমণাত্মক কাজের জন্য ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করত। এই একটি মাত্র কীর্তির জন্যই পরবর্তী বংশধরদের তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

তৃতীয়ত: তার শাসনকালে বাংলায় দীর্ঘদিনব্যাপী অব্যাহতভাবে শান্তি বিরাজ করেছে, যা হোসেন শাহী শাসকদের পর আর দেখা যায়নি। তাঁর উদারনীতি ও পৃষ্টপোষকতায় কৃষ্টি এবং ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি হয় এবং দেশে এক নজীরবিহীন অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়।

চতুর্থত: শায়েস্তা খান তাঁর সময় এবং শক্তি-সামর্থ দিয়ে বহু জনকল্যাণমূলক কাজ, যথা- দালান-কৌঠা, মসজিদ, রাস্তা, সেতু এবং সরাইখানা ইত্যাদি নির্মান করেছেন।

Sàt Gumbad (Seven-domed) Mosque, Dacca, built during Shaista Khan's time (58' × 27').
(Reproduced from *M.A.A.T.P.*, Pl. 6)

তিনি বিদেশী বণিকদের প্রতিও ন্যায় সঙ্গত এবং সদাশয় নীতি অনুসরণ করেছেন। একমাত্র ইংরেজদের সঙ্গে, যাদের বাণিজ্যের পরিমান গুলান্দাজদের থেকে অনেক কম ছিল, তিনি শেষ পর্যন্তও সুসম্পর্ক রক্ষা করতে পারেননি। এটা বোধগম্য যে, তারা তাঁর বিরুদ্ধে অত্যাচার এবং অবিচারের অভিযোগ উত্থাপন

করেছে। সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি নিক্ষেপ এবং পরবর্তী ঘটনাবলী বিচার করলে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সমসাময়িক মোগল প্রশাসকদের মধ্যে সম্ভবত: শায়েস্তা খানই প্রথম, যিনি বাংলায় ইংরেজদের কার্যকলাপের ধরণ এবং উদ্দেশ্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শায়েস্তা খান ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ই মার্চ (১০৭৪ হিজরী) রাজমহলে পৌঁছেন এবং কুচ বিহারের বিদ্রোহী রাজার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সেখানেই যাত্রা-বিরতি করেন। সুবাদার তাঁর পুত্রকে ঢাকায় প্রেরণ করেন এবং ঘোষণা দেন যে, তিনি কুচবিহারের রাজার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করবেন। কুচবিহারের রাজা আসামে অভিযানের জন্য মীর জুমলার অনুপস্থিতি, তারপর তাঁর অসুস্থ্যতা ও মৃত্যুর সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি ভাল করেই জানতেন যে, মোগল সৈন্যদের মোকাবেলা করার শক্তি তার নেই। তাই তিনি আনুগত্য স্বীকার এবং ক্ষমা চেয়ে দ্রুত শায়েস্তা খানের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন এবং বৎসরে সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা কর দেয়ার অঙ্গীকার করেন। সুবাদার তার এই প্রস্তাব মেনে নেন এবং আসকার খানকে তার সৈন্যবাহিনীসহ কুচবিহারের সীমান্ত থেকে ফেরত আনেন।[২৬০] অনুরূপভাবে, জৈন্তিয়ার রাজা (আসামের অন্তর্গত) আসাম সীমান্তে গোলযোগ সৃষ্টি করছিলেন। তিনি বাংলায় শায়েস্তা খানের আগমনের সংবাদ পেয়ে আনুগত্য স্বীকার করে একটি পত্র এবং তার নিজের সেরা হাতিটি উপঢৌকন হিসেবে প্রেরণ করেন।[২৬১] কুচবিহার এবং কামরূপে ১৩৬৭ (১০৭৮ হিজরী) খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আর কোন গোলযোগ দেখা দেয়নি। সে বৎসর আসামীরা সম্ভবত শায়েস্তা খানের চট্টগ্রামের অভিযান নিয়ে ব্যস্ত থাকার সুযোগ গ্রহণ করে গৌহাটি আক্রমণ এবং এর থানাদার সায়িদ ফিরুজ খানকে পরাজিত এবং হত্যা করে। ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম বিজয় সম্পন্ন হয়ে যায়, তখন রাজা রাম সিংহের নেতৃত্বে সেখানে এক অভিযান প্রেরণ করা হয় এবং তার সঙ্গে অন্যান্য আরো কয়েকজন মনসবদারকেও দেয়া হয়। আসামীদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং মোগলদের কর্তৃত্ব পুন: প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৬২] ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে কুচবিহারের রাজা (মধ নারায়ণ) কর দেয়া বন্ধ করে দেন, যার পরিমাণ ছিল দশ লাখ টাকা, তাই তিনি তাঁর পুত্র ইরাদাত খান, যিনি তখন কামরূপের অন্তর্গত রাঙ্গামাটিতে একজন থানাদার ছিলেন।

২৬০ তালিশের ধারাবাহিকতা পৃ ১২১ এ বি
২৬১ তালিশের ধারাবাহিকতা পৃ ১২১ এ বি
২৬২ এ.এন. পৃ: ১০৬৮ এম.এ. পৃ: ৬৫, ১৫৪

তাকে কুচবিহারে একটি অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেন। রাজা তার দেশ থেকে পালিয়ে যান এবং কুচবিহারকে সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ পর্যন্ত কুচবিহার মোগলদের অধিকারে ছিল।

৩. প্রশাসনিক এবং রাজস্ব ব্যবস্থা

শায়েস্তা খান ১৩ ই অক্টোবর রাজমহল ত্যাগ করেন এবং ১৩ই ডিসেম্বর, ১৬৬৪ সালে ঢাকা এসে পৌঁছেন। তাঁর সুবাদারীর প্রথম দুই বৎসরে তিনি বেশ কিছু সংখ্যক রাজস্ব এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং একই সঙ্গে চট্টগ্রাম জয়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল মীর জুমলা কর্তৃক শুরু করা মনসবদারদের বেতন এবং জাগীর (ভূমি বরাদ্দ প্রদান) বিধিসম্মত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। মনসবদারদের জায়গীরসমূহ বিভিন্ন পরগনায় (রাজস্ব বিভাগ) অবস্থিত ছিল। কোন বিশেষ পরগনায় বহুসংখ্যক শরীক থাকায় পদ্ধতিগত জটিলতার কারণে রাজস্ব সংগ্রহে প্রচুর অর্থের অপচয় ঘটত, যেহেতু প্রত্যেক জায়গীরদারকে একই পরগনায় নিজ নিজ শিকদার এবং আমলা প্রেরণ করতে হত। এতে প্রজাদের নিকট বারবার কর দাবী এবং মাঝে মধ্যে নির্যাতনও করা হত। তাই, শায়েস্তা খান দীউয়ান-ই-তান (Pay master) কে আলাদা আলাদা জায়গা থেকে প্রত্যেক জায়গীরদারকে বেতন-ভাতা দিতে নির্দেশ দেন; যদি কোন পরগনার রাজস্ব জায়গীরদারের পাওনা থেকে অতিরিক্ত হয়, তাহলে তা আদায়ের দায়িত্বও জায়গীরদারকে দিতে হবে এবং জায়গীরদারই অতিরিক্ত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দিবেন।[২৬৩] দীউয়ান-ই-তান নিষ্ঠার সঙ্গে এই ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করেন। এতে রাজকীয় ভূমি বিভাগের প্রচুর অর্থ সাশ্রয় হয়; কারণ তাতে জায়গীরদারের পরগনায় আর নিজস্ব কর সংগ্রাহক নিয়োগ করার প্রয়োজন হতো না; আবার জায়গীরদাররাও বিভিন্ন জায়গা থেকে তাদের অর্থ আদায়ের সমস্যা থেকে রেহাই পান। প্রজাদের নিকট থেকে বারবার কর দাবী করার ক্ষতিকর ব্যবস্থাটির অবসান হয়। তারপর শায়েস্তা খান মীর জুমলার মৃত্যুর পর অস্থায়ী সুবাদারদের দ্বারা নিয়োজিত এবং পদোন্নতি প্রাপ্তদের প্রতি নজর দেন। দেখা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রেই তাদের নিয়োগ ছিল অপ্রয়োজনীয় এবং বাড়তি। তাদের অধিকাংশকেই বরখাস্ত করা হয়; যে কয়েকজন প্রশাসনের জন্য আবশ্যক ছিল, তাদেরকে চাকুরীতে অব্যাহত রাখা হয়।" [২৬৪]

---

২৬৩ তালিশের ধারাবাহিক পৃ ১১৭ এ বি

২৬৪ ঐ পৃ ১১৮ এ এখানে তালিশের বিবরণ শায়েস্তা খানের স্তুতি পাবার জন্য স্পষ্টতই অতিরঞ্জিত

শায়েস্তা খানের তৃতীয় পদক্ষেপ ছিল দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মুসলমান বসতিস্থাপনকারী ও নিস্কর ভূমি প্রাপ্ত যেমন মাদাদ-ই-মায়াশ অথবা আইমা ভোগীদের সম্পর্ক। এই দুটি পরিভাষা দ্বারা মুসলমান ধর্মীয় নেতা, আলেম এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক, যাদেরকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য প্রয়োজন বলে নিস্কর ভূমি বরাদ্দ প্রদান করা হত, তাদেরকে বুঝানো হচ্ছে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, মীর জুমলা তাঁর নিজ জায়গীরের মধ্যে এ ধরণের নিস্কর ভূমির অধিকারীদের যারা তাঁদের বিদ্যা-বুদ্ধি এবং সদ গুণাবলীর জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তিনি তাদেরকে স্থায়ীত্ব দান করেন এবং তাদেরকেও স্থায়ী করেন, "যারা সম্রাটের নিকট থেকে ফরমান পেয়েছিলেন"। অন্য সকল লোক যারা রাজকীয় ভূমি বা জাগীরদারের জন্য বরাদ্দকৃত ভূমিতে মাদাদ-ই-মায়াশ বা রাষ্ট্রীয় ভাতা ভোগ করতেন, তাদের সকলের ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য তিনি প্রধান কাজী রিজভীকে নির্দেশ দেন। কাজী রিজভী নিস্কর জমি ভোগকারীদের অনেকের সনদ বা প্রমানপত্র প্রত্যাখান করেছেন বলে কথিত আছে। তাদের বৃত্তি এবং জীবিকা ভাতা বাতিল করা হয়। তবে তাদেরকে তাদের জমি থেকে উৎখাত করা হয়নি, কিন্তু নির্দেশ দেয়া হয় যে, "মাদাদ-ই-মায়াশ হিসেবে ভোগকৃত সকল ভূমিই তাদেরকে চাষাবাদ করতে এবং সরকার বা জায়গীরদারকে কর প্রদান করতে হবে"। এই আদেশ কঠোরভাবে বলবৎ করা হয়। অভিযোগ করা হয়ে থাকে যে, এই সকল লোকের অনেকেই কর প্রদান করতে অসমর্থ হয়ে "তাদের জমি-জমা বিক্রি অথবা "তাদের সন্তানদেরকে বন্ধক রাখতে বাধ্য হন"।[২৬৫] এমনকি আমলারা চাপ বা শাস্তি প্রদান করেও এই সকল লোককে কৃষি কাজে নিয়োগ করতে ব্যর্থ হন। তাই জমি পতিত পড়ে থাকে এবং আয়মাদারগণ ক্ষুব্ধ হন। যাহোক, এই সকল লোক তাদের সমস্যা নিয়ে শায়েস্তা খানের দরবারে যান এবং তিনি নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন–

ক) রাজকীয় ভূমিতে সাবেক শাসকদের প্রদত্ত নির্ভরযোগ্য সনদের ভিত্তিতে মাদাদ-ই মায়াশ এবং ওয়াজিফা ভূমিকে পুরোপুরি স্বীকৃতি প্রদানের জন্য তিনি সদর মীর সায়িদ সাদিককে নির্দেশ দেন।[২৬৬]

খ) জায়গীদারদের জায়গীরের মধ্যে যে সকল নিস্কর জমি ছিল, সে সকল জমি সম্পর্কে এই নির্দেশ দেয়া হয় যে, যদি ঐ সকল জমির কর জায়গীরদারের মোট করের $\frac{১}{৪০}$ ভাগের সমান হয়, তাহলে তিনি যেন তা তার সম্পদের উপর যাকাত হিসেবে গণ্য করেন এবং এটা মেনে নেন। আর যদি নিস্কর

২৬৫. তালিশের ধারাবাহিকতা পৃ ১১৭ বি
২৬৬. ঐ পৃ ১২০ বি

জমি $\frac{১}{৪০}$ ভাগের থেকে বেশি হয়, তাহলে তাকে এটাকে সম্মান দেখানো বা অতিরিক্ত অংশটুকু বাজেয়াপ্ত করে নেয়ার স্বাধীনতা দেয়া হয়।[২৬৭]

গ) শায়েস্তা খানের নিজের জায়গীর সম্পর্কে এই নির্দেশ দেয়া হয় যে, "নওয়াবের জায়গীরভূক্ত পরগনায় যে কেউ এবং যার দেয়া সনদের ভিত্তিতেই হোক, যে পরিমান নিস্কর জমি ভোগ করুক না কেন, তা কোন রকম হ্রাস না করেই নিশ্চয়তা দিতে হবে এবং কোনভাবেই কোন কর চেয়ে তাদেরকে হয়রানী করা হবে না"।[২৬৮]

ঘ) "যাদের বেঁচে থাকার কোন অবলম্বন ছিল না এবং এখন, প্রথমবারের মত ভিক্ষা করে দিন গুজরান করতে হতো, এইজন্য নওয়াবের জায়গীরের অন্তর্ভূক্ত এলাকা থেকে জমি প্রত্যাশা করতো" শায়েস্তাখান কোন বিলম্ব না করে তাদের ইচ্ছা পূরণের জন্য দীউয়ানী কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন।[২৬৯]

তালিশ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, রাজকীয় ভূমি এবং জায়গীরদারদের জাগীর সম্পর্কে উপরোক্ত নির্দেশসমূহ সদর (কাজী) বাস্তবায়ন করেন, আর নওয়াবের জায়গীর সম্পর্কে তাঁর দীউয়ান-ই-বায়ূতা খাজা মুরলিধর অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং পরিশ্রম করে তা সম্পন্ন করেন।

"প্রতিদিন দুই থেকে তিনশত আয়মাদার তাঁর নিকট তাদের সনদ পেশ করতেন এবং চলে যেতেন। পরের দিন, নওয়াবের উপস্থিতিতে তিনি সেগুলো রেকর্ড অফিস থেকে যাচাই এবং সিলমোহর করে আয়মাদারদের নিকট ফেরত প্রদান করতেন। সংক্ষেপে, এই বিষয়ে তিনি এত বেশি শ্রম দিতেন এবং প্রশংসনীয় কাজ করতেন যে, এই শ্রেণীর লোকদের প্রত্যেকেই তার চাহিদা অনুযায়ী পেয়ে যেতেন। প্রত্যেকেই যা চাইতেন, তিনি তার চাহিদা অনুযায়ী তা পেয়ে যেতেন"।

চতুর্থতঃ শায়েস্তা খান জনগণের অবস্থা উন্নয়নের জন্য রাজস্ব বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে বেশ কিছু সংখ্যক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

(১) তিনি আদেশ জারি করেন যে, তার জায়গীরভুক্ত পরগনার রাজস্ব কর্তকর্তাগণ নির্ধারিত রাজস্বের অতিরিক্ত যা কিছু আদায় করেছেন, তা প্রজাদের নিকট ফেরত দিতে হবে"।[২৭০]

---

২৬৭. ঐ
২৬৮ তালিশের ধারাবাহিকতা পৃ ১২০ বি
২৬৯ ঐ
২৭০ তালিশের পৃ ১২০ বি

(২) তিনি "খাদ্য-দ্রব্য সংক্রান্ত সকল পণ্য, কাপড় এবং আরো অন্যান্য বহু জিনিস কেনা-বিচার ক্ষেত্রে" পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেন এবং এসব পণ্যের ক্ষেত্রে যে কোন প্রকার ইজারা বা একচেটিয়া কারবার বিলোপ করেন।[২৭১]

(৩) তিনি উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের দ্বারা হাতিসহ অন্যান্য জন্তু অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কেনার প্রচলিত রীতি বাতিল করেন। তালিশ লিখেছেন যে, "যখনই প্রদেশের বন্দরসমূহে হাতি এবং অন্যান্য জন্তু বোঝাই করে জাহাজ এসে ভিড়ত, তখনই সুবাদারের লোকজন দিয়ে সেগুলো ক্রোক করত এবং তারা যেগুলো পছন্দ করতেন, সেগুলো তারা নিজেদের নির্ধারিত মূল্য দিয়ে নিয়ে আসতেন। শায়েস্তা খান একাজ নিষিদ্ধ করে দেন।[২৭২]

(৪) আওরঙ্গজেবের নির্দেশ অনুসরণে তিনি "বণিক এবং পর্যটকদের নিকট থেকে যাকাত আদায় এবং ব্যবসায়ী, কারিগর এবং নবাগত হিন্দু এবং মুসলমান ভেদাভেদ না করে সকলের নিকট থেকে সমভাবে শুল্ক আদায়" বন্ধ করে দেন।[২৭৩] সম্রাটের আদেশ ছিল শুধু "রাজকীয় ভূমির অন্তর্ভূক্ত পরগনাহ থেকে এইসব আদায় করার জন্য।" তালিশ লিখেছেন, "এই ন্যায়পরায়ন, আল্লাহ ভীরু এবং দয়ালু সুবাদার তাঁর নিজ ন্যায়বোধ এবং খোদাভক্তির কারণে তাঁর নিজ জাগীরভূক্ত এলাকা থেকে যে ১৫ লাখ টাকা শুল্ক সংগৃহীত হত, তাও তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, জনগণকে অব্যাহতি দেয়া এবং তাঁর মনিবের (আওরঙ্গজেবের) অনুসরণে বিলোপ করে দেন"।[২৭৪]

(৫) অঙ্কুরা নামের একটি কুপ্রথাও তিনি বাতিল করেন। তালিশ লিখেছেন, "অনেক পরগনায় এই ঘৃণ্য প্রথা দীর্ঘদিন যাবত চলে আসছিল। যদি কোন লোক, রায়ত (প্রজা) অথবা নবাগত (খোশনেশীন) পুত্রহীন অবস্থায় মারা যেত, তাহলে তার স্ত্রী-কন্যাসহ সকল সম্পদ রাজকীয় ভূমি দপ্তর কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হত অথবা জায়গীরদার বা জমিদারেরও এই অধিগ্রহণ ক্ষমতা ছিল; এই প্রথাকেই অঙ্কুরা বলা হত। নওয়াব এই জঘন্য প্রথাও দমন করেন"।[২৭৫]

---

২৭১ তালিশের পৃ ১২৭ বি
২৭২ ঐ
২৭৩ ঐ
২৭৪ তালিশের পূর্বোক্ত পৃ ১৩১ এ বি
২৭৫ ঐ পৃ ১৩১ বি

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তালিশ শায়েস্তা খানের প্রশংসায় তাঁর সাহসী পদক্ষেপগুলো তুলে ধরার জন্য প্রায়ই তাঁর পূর্বসূরীদের সম্পর্কে অসত্য এবং অতিরঞ্জিত বিবরণ দিয়েছেন। এইভাবে দেখা যায় যে, খাদ্য সংক্রান্ত পণ্যদ্রব্য বেচা-কেনার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার (উপরের প্যারা নং ২) সম্পর্কে তালিশ সাধারণভাবে উল্লেখ করেছেন যে," বাংলার প্রাক্তন সুবাদারগণ সকল খাদ্যদ্রব্য এবং কাপড়ের ক্ষেত্রে একচেটিয়া ব্যবসা করতেন (ইজারা)" এবং তারপর তাঁরা তা তাঁদের ইচ্ছামত দামে বিক্রি করতেন এবং অসহায় জনগণকে সে দামেই ক্রয় করতে হত"।[২৭৬] স্পষ্টতই, এটা একটি অতিরঞ্জিত ঘটনা এবং প্রাক্তন "সুবাদারদের" সম্পর্কে তার এই বিবরণ সঠিক বলা উচিত হবে না। শায়েস্তা খান যে ক্ষতিকর প্রথার প্রতিকার করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তা খুব সম্ভব ঐ প্রথা, যে জন্য মীর জুমলা কিছু সংখ্যক অবিবেচক ব্যবসায়ীকে জরিমানা করে শাস্তি দেয়া প্রয়োজন বোধ করেছিলেন অথবা দুর্ভিক্ষ এবং মীর জুমলার মৃত্যু এবং শায়েস্তা খানের আসা পর্যন্ত ক্রান্তিকালে কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী যে একচেটিয়া কারবারে লিপ্ত হয়েছিলেন, তাও হতে পারে।

অনুরূপভাবে যাকাত আদায় বন্ধ করা সম্পর্কে তালিশের বক্তব্যকে সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। নির্ধারিত পরিমান সম্পদের (নিসাব) মালিক একজন মুসলমানের উপর যাকাত প্রদান ফরজ। আওরঙ্গজেব দূরে থাক, কোন মুসলমান শাসকই তা বন্ধ করতে পারেন না। আর আওরঙ্গজেবতো তাঁর সুবাদারদেরকে প্রশাসন ব্যবস্থায় শরীয়তের নীতিমালা অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাই তিনি যাকাত সংগ্রহ বন্ধ করে দেয়ার আদেশ দিতে পারেন কিভাবে? বস্তুত:পক্ষে, এই প্রসঙ্গে তালিশ কর্তৃক "বণিক এবং পর্যটকদের" একই শ্রেণীভূক্ত করার বিষয়টিই বিভ্রান্তিকর। এদিক থেকে আবার বলা যায় যে, "পর্যটকরা" যাকাত প্রদানের জন্য কোন বিশেষ শ্রেণীভুক্ত নয়। অতএব, যাকাত মওকুফের ব্যাপারে সম্রাটের আদেশের দ্বারা গত দুর্ভিক্ষে যে সকল লোক বা এলাকা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, তাদেরকে বোঝানো হতে পারে।

শায়েস্তা খান কর্তৃক উচ্ছেদকৃত অঙ্কুরা প্রথা সম্পর্কে তালিশের বর্ণনাও একই রকমভাবে অস্পষ্ট। প্রায় প্রতিটি আইনী ব্যবস্থারই এই রকম একটি নিয়ম থাকে যে, কেহ যদি উত্তরাধিকারবিহীন অবস্থায় মারা যায়, তাহলে তার পরিত্যক্ত সম্পদ রাষ্ট্রের মালিকানায় ফিরে আসে, ইসলামে মৃত ব্যক্তির সম্পদে নারী-পুরুষ

---

২৭৬ ঐ পৃ ১২৭ বি

উভয়ের উত্তরাধিকারী হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে, হিন্দু আইনে পিতার সম্পত্তিতে কন্যাদের উত্তরাধিকারী হওয়ার কোন বিধান নেই। কিন্তু স্ত্রীদের স্বামীর সম্পদে উত্তরাধিকারী হওয়ার বিধান রয়েছে। অতএব, এটা উপলব্ধিতে আসে না যে, কেহ পুত্রহীন অবস্থায় মারা গেলে কেন তার "স্ত্রী এবং কন্যাসহ 'সকল সম্পদ" রাজকীয় ভূমি বিভাগ, অথবা জায়গীরদার অথবা জমিদারের অধিকারে চলে যাবে"। অবশ্যই এই প্রথা সম্পর্কে আরো কিছু বলার অবকাশ ছিল। তবে এই প্রথাটির বৈশিষ্ট যাই ছিল না কেন, এটা শায়েস্তা খানের কৃতিত্ব যে, তিনি প্রথাটি উচ্ছেদ করেছিলেন।

সর্বশেষে, শায়েস্তা খান বিচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য বিশেষ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

(ক) বিচার কাজের জন্য তিনি "প্রতিদিন উন্মুক্ত দরবার বসাতেন এবং দ্রুত অন্যায়ের প্রতিকার করতেন, তিনি এই কাজকে তার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে গণ্য করতেন"।[২৭৭]

(খ) আগেকার দিনের প্রথা ছিল এই যে, যখন কোন লোক অন্য কোন লোকের বিরুদ্ধে তার প্রদত্ত ঋণ বা অন্য কোন দাবী প্রমাণ করতে পারত, তখন তার পাওনা তাকে আদায় করে দেয়ার জন্য ফিস হিসেবে এক চতুর্থাংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে রেখে দিত। নওয়াব এই ব্যবস্থাও বাতিল করে দেন"।[২৭৮]

অনুরূপভাবে তিনি ফৌজদারী আদালতে বাদী কর্তৃক দৈনিক প্রদেয় ফিসও বিলোপ করেন। আরো উল্লেখ রয়েছে যে, বাদী-বিবাদী উভয়ে যখন আদালতে হাজির হত, তখন উভয়কেই আটকে রাখা হত, যেন তারা ইচ্ছা করে মামলাকে বিলম্বিত করতে না পারে অথবা তাদেরকে দৈনিক একটি নির্ধারিত ফিস দেয়ার শর্তে জামিনে মুক্তি দেয়া হত"। এই প্রথাও তিনি বিলোপ করেন"[২৭৯]

এইভাবে শায়েস্তা খান বেশ কিছু সংখ্যক উপকারী এবং কল্যাণকর সংস্কার সাধন করেন। একই পরগনায় শরিকী জায়গীরদারী প্রথা বিলোপ এবং নির্ধারিত খাজনা থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় নিষিদ্ধ করায় কৃষকদের বিরাট কল্যান সাধিত হয় এবং দেশে কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে। মাদাদ-ই-মায়াশ এবং নিস্কর আয়মা

---

২৭৭ তালিশের বিবরণ পৃ ১২৭ এ
২৭৮ তালিশ পৃ ১৩১ বি
২৭৯ এইচ বি ২য় খন্ড পৃ ৩৭৫

ভূমি মালিকদের সম্পর্কে তাঁর আদেশ অনেক খ্যাতনামা এবং যোগ্য মুসলমানকে এদেশে স্থায়ী এবং শান্তিপূর্ণভাবে বসতি স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করে। অনুরূপভাবে, একচেটিয়া ব্যবসা বন্ধ, শুল্ক ও কর রহিত করায় দেশের সাধারণ জনগণেরই শুধু উন্নতি হয়নি, বরং দেশে ব্যবসা বানিজ্যের নজীরবিহীন উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যদুনাথ সরকারের মত একথা ধরে নেয়ার কোন সুযোগ নেই যে, তিনি এই ব্যবস্থা রদ করে দিয়েছিলেন অথবা তার সুবাদারীর সময় এই ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়েছিল। সরকার লিখেছেন: "এই কথা সত্য যে, শিহাবুদ্দীন তালিশের বর্ণনানুযায়ী ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় এসে শায়েস্তা খান তাঁর পূর্ববর্তী শাসনকর্তাদের একচেটিয়া ব্যবস্থা বিলোপ করেন এবং রাজকীয় ফরমান দ্বারা আবওয়াব নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু তার লোভ এবং ভয়ভীতি দেখিয়ে অর্থ আদায় সম্পর্কে ইউরোপীয়দের সাক্ষ্য অনস্বীকার্য"।[২৮০] কিন্তু "তালিশ কর্তৃক এর বিপরীত বর্ণনা" সরকার এই বলে উড়িয়ে দিয়েছেন যে, শায়েস্তা খানের সুবাদারীর তৃতীয় বৎসরেই তালিশের লেখাবন্ধ হয়ে যায় এবং লেখক তার বই সম্পূর্ণ সংশোধন করার জন্য আর জীবিত ছিলেন না। সরকার লিখেছেন, "এটা ধরে নেয়া যুক্তিসঙ্গত যে, শায়েস্তা খান প্রথম দিকে একচেটিয়া ব্যবসা বন্ধ করে আদেশ জারী করেছিলেন, কিন্তু কয়েক বৎসর পর তাঁর অধীনস্থগণ তাঁর দুর্বল শাসনের সুযোগ নিয়ে এবং তাঁর সীমাহীন বিলাসিতার জন্য পুরানো অসৎ ও নীতি বিগর্হিত পন্থায় অর্থ আদায় শুরু করেন এবং তিনি কোন প্রশ্ন তোলেননি।"[২৮১] ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে,[২৮২] মনে হয় সরকার শায়েস্তা খানকে অপবাদ দেয়ার জন্য বিশেষভাবে উদগ্রীব ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, সুবাদারের উপর যদুনাথ সরকারের পুরো অধ্যায়টিই এই উদ্দেশ্যে সাজানো।

এই গ্রন্থের পরবর্তী একটি অধ্যায়ে বিদেশী কোম্পানীসমূহের সঙ্গে শায়েস্তা খানের সম্পর্ক, বিশেষ করে ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের উপর বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে। সেখানে দেখা যাবে যে, ইউরোপীয় সূত্র, বিশেষ করে ইংরেজ সূত্র সম্পর্কে সরকার অত্যন্ত অমনোযোগীতা ও উদাসীনতার সঙ্গে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করেছেন এবং মনে হয় যে, ইংরেজ এজেন্টদের থেকেও তিনি অধিক বিদ্বিষ্ট। সরকারের মতানুযায়ী "ইউরোপীয়দের সাক্ষ্য অনস্বীকার্য" হওয়া দূরে থাকুক, সর্বক্ষেত্রে সত্যও নয়। এমনকি সত্যিকার অর্থে

---

২৮০ এইচ বি ২য় খন্ড পৃ ৩৭৫
২৮১ এইচ বি ২য় খন্ড পৃ ৩৭৫
২৮২ তালিশ পৃ ৪২৫ টীকা ১

নিঃস্বার্থ ও নয়। আরো আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, তালিশের বিবরণকে তিনি শায়েস্তা খানের সুবাদারীর মাত্র প্রথম তিন বৎসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে গণ্য করলেও এই উৎসকেই তিনি সুবাদারের বিরুদ্ধে তার চূড়ান্ত অভিযোগ উত্থাপনের জন্য ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। "সুবাদারের প্রশ্নহীন খ্যাতিকে খাটো করে দেখানোর চেষ্টায় সরকার বলেন যে, তালিশের বিবরণের সঠিক ব্যাখ্যা থেকে দেখা যায় যে, বাংলায় শায়েস্তা খানের খ্যাতির কারণ হচ্ছে আপামর জনসাধারণের নিকট তাঁর জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য তাঁর সহজ প্রাচ্যদেশীয় উপায় অনুসরণ, আর তা হচ্ছে রাজকীয় জাক-জমক এবং অমিতব্যায়িতার সঙ্গে জীবন যাপন, বিপুল সংখ্যক নিষ্প্রয়োজনীয় চাকর-বাকর এবং পরগাছা শ্রেণীর উচ্ছিষ্টভোগীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকা এবং বহু ভণ্ড-সাধু এবং আলেম, অলস ও কর্মবিমুখ এবং নিজেদেরকে ধর্ম পথের পথিক ও যাচঞাকারী হিসেবে পরিচয়দানকারীদের মধ্যে বাছ-বিচার বিহীনভাবে দান-খয়রাত করা ইত্যাদি"।[২৮৩] মুসলমান আলেম, শিক্ষিতব্যক্তি, অভিজাত পরিবারের বংশধর এবং অন্যান্য যারা রাষ্ট্রীয় মঞ্জুরী এবং নিস্কর ভূমি বরাদ্দ পেতেন তাদেরকে "অলস-কর্মবিমুখ" "ভন্ড সাধু" এবং "উচ্ছিষ্ট ভোগী" ইত্যাদি বলায় সরকারের রুচি নিয়ে কেহ প্রশ্ন না তুলুক, কিন্তু যে কেহ অবশ্যই জিজ্ঞেস করতে পারে যে, যদি শায়েস্তা খান তাঁর প্রাথমিক নীতি পাল্টিয়েই থাকেন এবং তাঁর অধীনস্থদেরকে "অসৎ ও নীতি বিগর্হিত পন্থায়" অর্থ আদায়ের অনুমতি দিয়ে থাকেন, তাহলে কেন এবং কিভাবে তিনি তাঁর বদান্যতার জন্য জনসাধারণের নিকট সাবেক জনপ্রিয়তা অক্ষুন্ন এবং অব্যাহত রাখতে পারলেন; পুনরায় যদি তিনি অর্থ লোভী এবং অত্যাচারী হয়ে থাকেন, তাহলে কেন তিনি কোন বাছ-বিচার না করে সবাইকে দান-খয়রাত করা অব্যাহত রাখলেন? প্রকৃতপক্ষে, সরকার তাঁর তীব্র বিদ্বেষের জন্য শায়েস্তা খানের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগের মধ্যেই যে অন্তর্নিহিত বৈপরিত্য রয়েছে, তা দেখার জন্য একটুও অবকাশ পাননি।

৪. চট্টগ্রাম জয়

চট্টগ্রাম জয় বা পুনরুদ্ধার করা ছিল দীর্ঘ প্রতীক্ষিত একটি বিষয়। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ এই অঞ্চলকে বাংলার সুলতানদের শাসনাধীনে আনয়ন করেছিলেন।[২৮৪] ক্ষমতার জন্য মোগল আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় আরাকানের রাজা এলাকাটি দখল করে নেন। তখন থেকে মগ এবং ফিরিঙ্গী জলদস্যুরা দক্ষিণ

---

২৮৩ এইচ বি ২য় খন্ড পৃ ৩৮৭
২৮৪ এইচ বি ২য় খন্ড পৃ ৩৭৫

বাংলায় হামলার জন্য এই এলাকাটিকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে আসছিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে নোয়াখালী জেলার উপর মোগলদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং শাহজাহানের রাজত্বকালে হুগলীর পর্তুগীজদের দমন জলদস্যুদের ঘাঁটি চট্টগ্রামের উপর চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। মীর জুমলার উদ্দেশ্য ছিল আসাম অভিযান থেকে ফিরে এসে চট্টগ্রামে অভিযান পরিচালনা করা। কিন্তু মৃত্যু তাঁর পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করতে দেয়নি। আওরঙ্গজেব কাজটি সম্পন্ন করার জন্যই শায়েস্তা খানকে বিশেষভাবে দায়িত্ব প্রদান করেন।

বার্ণিয়ের লিখেছেন যে, এই অভিযান প্রেরণের পিছনে দুটি প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে এই যে, "বর্বর (মগ এবং পর্তুগীজ) জলদস্যুদের নিষ্ঠুর এবং ধ্বংসাত্মক হামলা থেকে বাংলার মানুষকে মুক্তি দেয়া" এবং "শাহ সুজা ও তাঁর পরিবারের প্রতি আরাকান রাজের নিষ্ঠুরতার জন্য এবং ঐ সকল বিখ্যাত ব্যক্তিদের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তাকে (আরাকানের রাজাকে) শাস্তি দিতে আওরঙ্গজেব ছিলেন সংকল্পবদ্ধ"।[২৮৫] মগ ও ফিরিঙ্গীদের ধ্বংসাত্মক কাজ ও লুণ্ঠনের কিছু বিবরণ পূর্ববর্তী চতুর্দশ অধ্যায়ে দেয়া হয়েছে। এমনকি হুগলী অধিকার করার পরও ফিরিঙ্গীরা চট্টগ্রামে বসবাস করত এবং আরাকানের জমিদারের (রাজার) ছত্রছায়ায় থেকে বাংলায় লুটপাট করে তার অর্ধেক তাকে প্রদান করত"।[২৮৬] ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে বার্ণিয়ের পর্যটক হিসেবে বাংলায় আসেন। তিনি ঢাকায়ও এসেছিলেন (এই বৎসরই শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম জয় করেন) এবং তিনি লিখেছেন: শায়েস্তা খান যে ধরনের অভিযানের চিন্তা করেছিলেন, তা বুঝা এবং বঙ্গোপসাগরে সংঘটিত ঘটনাসমূহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভের জন্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আরাকানের বা মগ রাজা অনেক বৎসর যাবত কিছু সংখ্যক পর্তুগীজ বসতি স্থাপনকারী, বিপুল সংখ্যক খ্রিস্টান দাস অথবা আধা-পর্তুগীজ এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা অন্যান্য লোকদেরকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিতেন। ঐ দেশটি ছিল গোয়া, শ্রীলংকা, কোচিন, মালাক্কা এবং পর্তুগীজদের সাবেক মালিকানাধীন ভারতীয় দীপপুঞ্জ থেকে পলাতক লোকদের জন্য আশ্রয়স্থল। যারা সেখানে আশ্রম ছেড়ে পালিয়ে আসে, দুই বা তিনটা বিয়ে করেছে বা অন্যান্য বড় বড় অপরাধ করেছে, তাদের থেকে বেশি সাদরে অন্য কাউকেই গ্রহণ করা হতো না। এসব লোক শুধু নামে মাত্র খ্রিস্টান ছিল: তারা যে জীবন যাপন করত, তা ছিল অত্যন্ত ঘৃণ্য। কোন রকম অনুতাপ বা অনুশোচনা না করেই একে অপরকে

২৮৫ বার্নিয়ের পৃ ১৭১
২৮৬ তালিশের ধারাবাহিক পৃ ১১৬ বি

হত্যা করত, বিষ প্রয়োগ করত এবং কোন কোন সময় তারা তাদের পুরোহিতদেরকেও হত্যা করত। সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, তাদের হত্যাকারীদের থেকে তারাও ভাল ছিল না।"[২৮৭] বার্নিয়ের আরো লিখেছেন যে, আরাকানের রাজা "এসব বিদেশীদের এক ধরনের অগ্রবর্তী সেনাদল হিসেবে ব্যবহার করতেন" এবং তাদেরকে ভূমি বরাদ্দ প্রদান করতেন। তারা গ্যালিয়াসেস নামক এক ধরণের একতলা পাল-তোলা জাহাজ নিয়ে পার্শ্ববর্তী সাগর, তীরবর্তী এলাকা চষে বেড়াতো এবং গঙ্গা নদীর বহু শাখা-প্রশাখায় প্রবেশ করে বাংলার নিম্নাঞ্চলের দ্বীপসমূহ ছারখার এবং বিধ্বস্ত করে দিত। তারা কোন কোন সময় দেশের অভ্যন্তরে প্রায় দুইশত পঁচিশ মাইল থেকে দুইশত পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত ঢুকে পড়ত। হাটের দিন বা কোন বিয়ে বা অন্য কোন অনুষ্ঠানে যখন লোকজন জড়ো হতেন, তখন তারা হঠাৎ এসে উপস্থিত হতো এবং গ্রামের প্রায় সকল লোককে ধরে নিয়ে যেতো। এই লুণ্ঠনকারী ও মানুষ শিকারী পর্তুগীজ জলদস্যুরা তাদের ধৃত দূর্ভাগা ব্যক্তিদেরকে দাসে পরিনত করত এবং যা তারা পুটপাট করে নিয়ে যেতে পারতো না, তা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিত। তাদের এইরূপ বারবার লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞের ফলে গঙ্গার মোহনায় এক সময় যে সকল ঘনবসতিপূর্ণ চমৎকার দ্বীপ ছিল, তা এখন সম্পূর্ণভাবে মনুষ্য বসতি শূন্য হিংস্র জীব-জন্তু-বাঘ ও ভাল্লুকের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়।[২৮৮]

ফিরিঙ্গী (পর্তুগীজ) জলদস্যুরা তাদের ধরে নেয়া এরূপ দাসদের সঙ্গে অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করতো। "প্রায়ই দেখা যেত যে, বহু তরুন, যারা সময়মত পালিয়ে নিজেরা আত্মরক্ষা করতে পারলেও দস্যুরা তাদের পিতামাতাদেরকে আগের দিন ধরে নিয়ে গিয়েছে এবং পরের দিন তারা তাদেরকে উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করছে। তাদের মধ্যে যারা বয়সের ভারে কর্মক্ষমতা হারায়নি তাদেরকে তারা হয় তাদের সঙ্গে কাজে নিয়োগের জন্য হত্যাকাণ্ড এবং ডাকাতিতে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ দিত অথবা গোয়া, শ্রীলংকা, সানথোম এবং অন্যান্য স্থানের পর্তুগীজদের নিকট দাস হিসেবে বিক্রি করে দিত। এমনকি হুগলীর পর্তুগীজরাও এইসব হতভাগ্য ও ধৃতব্যক্তিদেরকে কোন রকম দ্বিধা-সংকোচ না করে ক্রয় করত।[২৮৯] কেপডাস পামাস (Capedas Palmas) উড়িষ্যার উপকূলবর্তী (নিকটবর্তী-গ্যালেস) দ্বীপে এই ভয়াবহ ও অবৈধ ব্যবসা

২৮৭ বার্নিয়ের পৃ ১৭৪, ১৭৫
২৮৮ বার্নিয়ের পৃ ১৭৪, ১৭৫
২৮৯ মোগলরা হুগলি অধিকার করার পরই এই অমানবিক ব্যবসা বন্ধ করা হয়

পরিচালিত হত। পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে এই জলদস্যুরা বাংলা থেকে পর্তুগীজদের (জাহাজ আসার) অপেক্ষায় থাকতো এবং সস্তায় পুরো জাহাজের সকল বন্দীকেই কিনে নিত। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, পর্তুগীজদের শক্তি হ্রাস পাওয়ার পর অন্যান্য ইউরোপীয়রাও এই জলদস্যুদের সঙ্গে ঐ ঘৃণ্য ও পৈশাচিক ব্যবসা চালিয়ে যেত এবং এই কুখ্যাত দুর্বৃত্তরাই আবার গর্ব করত যে, দশ বৎসরে ভারতীয় দ্বীপ পূঞ্জে খ্রিষ্টান মিশনারীরা যত লোককে খ্রিস্টান বানাতে পারেনি, তারা বার মাসেই তার চেয়ে বেশি লোককে খ্রিস্টান বানিয়েছে।[২৯০] এমন কি ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে শায়েস্তা খান যখন রাজমহল থেকে কুচবিহারের রাজার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্যস্ত ছিলেন, তখন এই জলদস্যুরা ঢাকার নিকটবর্তী বাগাদিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হয়। বাংলার নৌ-বাহিনীর সর্দার-ই-সায়রাব (Crushing admiral), মুনাওয়ার খান ঢাকার নায়েব সুবাদার এবং শায়েস্তা খানের পুত্র আকীদাত খানের প্রেরিত অতিরিক্ত সৈন্যবাহিনীর সাহায্য নিয়ে অতি কষ্টে জলদস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং তাদেরকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হন।[২৯১]

অতএব, ঢাকা পৌঁছার অব্যবহিত পরেই শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম জয়ের জন্য প্রস্তুতি শুরু করেন। প্রথমে তিনি দক্ষিণ সীমান্তের ফাঁড়িগুলিকে শক্তিশালী করেন এবং সেগুলিকে সতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত রাখেন। তিনি নোয়াখালী ফাঁড়িতে সায়িদ নামে একজন আফগানকে "৫০০ ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপকারী এবং বন্দুকধারী পদাতিক সৈন্যসহ" নিয়োগ করেন।[২৯২] তিনি হুগলীর ফৌজদার মুহাম্মদ শরীফকে "৫০০ ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপকারী, ১০০০ পদাতিক সৈন্য এবং ২০টি কামানসহ" আধুনিক চাঁদপুরের নিকটস্থ সংগ্রাম গড় ফাঁড়িটি পাহারা দেয়ার জন্য সেখানে বদলী করেন।[২৯৩] তাকে সহায়তা করার জন্য আবুল হাসানকে "২০০ রনতরীসহ" শ্রীপুরে (চাঁদপুরের নিকটে) এবং মুহাম্মদ বেগ অবকাশকে ১০০ রনতরীসহ ধাপায় নিয়োগ দেয়া হয়।[২৯৪] এই সকল কর্মকর্তাদের সবাই ছিলেন বিশেষভাবে দক্ষ এবং পরীক্ষিত। আবুল হাসান এবং মুহাম্মদ বেগ অবকাশ মীর জুমলার আসাম অভিযানের সময় তাদের দক্ষতা ও শৌর্যবীর্যের প্রমান দিয়েছিলেন। তিনি ধাপা থেকে সংগ্রামগড় পর্যন্ত প্রায় ৪০ মাইল দীর্ঘ একটি

২৯০ বার্নিয়ের পৃ ১৭৬
২৯১ তালিশের ধারাবাহিকতা পৃ ১২২ এ বি
২৯২ এ এন পৃ ৯৪৭
২৯৩ ঐ আরো দেখুন তালিশের ধারাবাহিকতায় পৃ ১৪০ এ
২৯৪ এ এন পৃ ৯৪৭

প্রশস্ত মহাসড়ক তৈরী করিয়েছিলেন। যেন বর্ষার মৌসুমেও ঢাকা থেকে সংগ্রামগড় পর্যন্ত সড়ক পথে পদাতিক ও আশ্বারোহী বাহিনী অগ্রসর হতে পারে।"[২৯৫] একই সময়ে শায়েস্তা খান একটি শক্তিশালী নৌ বহর গড়ে তোলার নির্দেশ দেন। মীর জুমলার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রণতরীর বহর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় বলে তালিশ যে কথা বলেছেন, তা আসলে ঠিক নয়, তিনি বরং এই ক্ষেত্রে শায়েস্তা খানের কৃতিত্বের উপর গুরুত্বারোপ এবং তাঁর প্রশংসা করার জন্যই যে সে কথা বলেছেন, তা স্পষ্ট। মীর জুমলার আসাম অভিযান সম্পর্কে তালিশের নিজের প্রদত্ত পূর্বের বর্ণনা থেকেই জানা যায় যে, মীর জুমলার আসাম অভিযান থেকে রণতরীর বহর প্রায় সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসেছে এবং চট্টগ্রাম বিজয় সম্পর্কে এই লেখকের বিবরণ থেকে দেখা যায় যে, নৌবহরের যে সকল কর্মকর্তা মীর জুমলার অধিনে আসাম অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন, সে সকল কর্মকর্তা যথা, মুনাওয়ার খান, ইবন-ই-হুসেন, আবুল হাসান, মুহাম্মদ বেগ অবকাশ, মুহাম্মদ মুকিম, ফারহাদ খান, সারান্দাজ খান এবং মীর মূর্তাজা প্রমুখই আবার চট্টগ্রাম বিজয়েও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে, যে নৌবহর ছিল, তা চট্টগ্রামের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্য যথাযথ ছিলনা। কারণ, সাগর পাড়ি দিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল আলাদা ধরণের নৌযান। অবশ্য নৌবহরে কিছুটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল, যেমন তালিশ উল্লেখ করেছেন যে, "নৌবহরের ব্যয় মিটানোর জন্য যে সকল পরগনা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল, হিন্দু ক্লার্কদের অত্যাচার ও বলপূর্বক অর্থ আদায়ের কারণে সেগুলো ধ্বংস হয়ে যায়" এবং নৌবাহিনীর অফিসার ও কর্মীদেরকে দরিদ্র করে ফেলে।[২৯৬]

---

২৯৫ এ.এন. পৃঃ ৯৪৩ এবং তালিশের ধারাবাহিকতায়, পৃঃ ১৪০ "আলমগীর নামায় বলা হয়েছে যে, শ্রীপুর থেকে আলমগীরনগর পর্যন্ত প্রায় ৫০ মাইল দীর্ঘ একটি বেড়িবাধ জাতীয় সড়ক নওয়াবের নির্দেশে সামরিক উদ্দেশ্যে এমনভাবে নির্মান করা হয় যেন বন্যার সময়েও তা নিমজ্জিত না হয়"। (এ.এন. পৃ ৯৪৩, রিয়াদে আবদুস সালামের ভাবান্তর, পৃ ২২৯ টীকা) এখানে আলমগীর নগরের উল্লেখ নিশ্চিতই ভুল, হবে জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকা)। এখানে আলমগীর নগর এবং শ্রীপুরের মধ্যকার দূরত্ব ২১(ক্রোশ) বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং আর ঢাকা এবং সংগ্রামগড়ের দূরত্ব ১৮ ক্রোশ উল্লেখ পাওয়া যায় তালিশের ধারাবাহিকতায়। অতএব, সংগ্রামগড় এবং শ্রীপুরের দূরত্ব অবশ্যই তিন ক্রোশ বা ৬ মাইল হবে। লক্ষণীয়, যে ধারাবহিকতায় ধাপা থেকে সংগ্রামগড় পর্যন্ত সড়ক নির্মানের কথা বলা হয়েছে, এটাই সঠিক বলে মনে হয়, কারণ এর পূর্বেই মীর জুমলা ফতুল্লা হয়ে খিজিরপুর (নারায়য়নগঞ্জ) পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মান করেছিলেন। শায়েস্তা খান কর্তৃক নির্মিত রাস্তা খুব সম্ভব সেই সড়কের নির্মান কাজেরই চূড়ান্ত রূপ; আলমগীর নামায় হয় উল্লেখিত ঢাকা থেকে শ্রীপুর পর্যন্ত নির্মিত রাস্তাটিতে কোন নূতন রাস্তা ছিল না।

২৯৬. তালিশের ধারাবাহিকতা "পৃ-১১৩এ। শায়েস্তা খানের শুল্ক মওকুফ সম্পর্কে অন্যত্র তালিশ বলেছেন; "আমি দৃঢ়ভাবে আশা করি যে, কৃষকগণ এবং বণিকগণ যেভাবে অত্যাচার এবং নতুন নতুন (কর) উদ্ভাবন থেকে পরিত্রান পেয়েছেন, সৈন্যদের দূরাবস্থা এবং চৌর্যবৃত্তি, ক্লার্কদের দ্বারা তাদের নিগৃহীত এবং অত্যাচারিত হয়ে ধ্বংস হওয়া সম্পর্কে কেহ না কেহ সম্রাটকে পুরোপরি এবং খোলাখুলি অবহিত করবেন এবং এইভাবে সৈন্যদের এইসব খোদাহীন ও অধার্মিক লোকদের নির্যাতন থেকে মুক্তি দেবে। হিন্দু ক্লার্ক ও তন্দ্রাচ্ছন্ন

যাহোক, শায়েস্তা খান "রনতরীর বহর পূণর্গঠন করার জন্য তাঁর সকল শক্তি নিয়োগ করেন। নওয়াবের একজন প্রৌঢ়, দক্ষ, শিক্ষিত, বিশ্বস্ত এবং ধার্মিক কর্মচারী হাকীম মুহাম্মদ হোসেনকে জাহাজ নির্মান বিভাগের প্রধান নিয়োগ করা হয়, আর বাংলার আরেকজন "অভিজ্ঞ, সুচতুর এবং কঠোর পরিশ্রমী কর্মকর্তা মুহাম্মদ মুকীমকে নৌবহরের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এবং মীর জুমলা আসাম অভিযানের সময় তাকে ঢাকার নৌবহর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন"।[২৯৭] কিশোর দাস নামক আরেকজন রাজকীয়, বিজ্ঞ ও দক্ষ ক্লার্ককে নৌবহরের জন্য নির্ধারিত পরগনাসমূহ এবং.নৌবাহিনীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বরাদ্দকৃত জাগিরের বৃত্তির দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়"।[২৯৮] তিনি প্রদেশের প্রতিটি মৌজা থেকে কাঠ ও জাহাজ নির্মাতা ঢাকায় আনার জন্য পরোয়ানাসহ নাজির বা প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে প্রেরণ করতেন। এই ব্যাপারে হুগলী বা যশোর, মুরাং, চিলমারী, যশোর এবং কারিবাড়ী ইত্যাদি প্রতিটি বন্দরে যতবেশি সম্ভব নৌকা তৈরী করে ঢাকায় প্রেরণ করার জন্য আদেশ প্রেরণ করা হয়।[২৯৯] এই প্রক্রিয়ায় স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রায় ৩০০ জাহাজ নির্মিত হয় এবং অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দ্বারা সজ্জিত করা হয়।

এই অভিযান পরিচালনার জন্য ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারের লক্ষ্যে গঙ্গার মোহনায় অবস্থিত স্বন্দীপ নামক দ্বীপটির দখল নেয়াছিল প্রথম প্রয়োজন। তখন সন্দীপ ছিল দিলাওয়ারের নিয়ন্ত্রণে। এই ব্যক্তি ইতিপূর্বে মোগলদের নৌবাহিনী থেকে পালিয়ে গিয়ে দ্বীপটির উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। শায়েস্তা খান দিলওয়ারের নিকট থেকে দ্বীপটি উদ্ধার করার জন্য আবুল হাসানকে একটি নৌবহরসহ সেখানে প্রেরণ করেন। একটি খন্ড যুদ্ধে তিনি দিলওয়ারকে পরাজিত করেন; কিন্তু শীঘ্রই আরাকানীদের একটি নৌবহর তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। আবুল হাসান আরাকানী নৌবহরের মোকাবেলা করেন এবং আরাকানীরা পশ্চাদপসারণ করে, তবে আবুল হাসান আর তাদের পশ্চাদধাবন করেননি, বরং নোয়াখালীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তার সাহায্যার্থে আরো সৈন্য আসার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন।[৩০০] শায়েস্তা খান তখন আবুল হাসানকে সাহায্যের জন্য

কর্মচারীরা সৈন্যবাহিনীকে অগ্নি উপাসক ক্রীতদাস থেকে ও হেয় এবং একজন ইহুদীর কুকুর থেকেও অপবিত্র গণ্য করে থাকে"। (উপরোক্ত পৃঃ ১২৯ এবং ১৩০ এ)। এই প্রসঙ্গে তালিশ ক্লার্কদের দ্বারা "প্রতারাণা মূলকভাবে সৈন্যদের বৃত্তি কর্তন" এবং বেতন-ভাতা বন্টনের ব্যাপার অন্যান্য নিগ্রহ সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

২৯৭. উপরোক্ত পৃ ১৩৭

২৯৮. তালিশের ধারাবাহিকতা পৃ ১৩৮ এ

২৯৯. ঐ পৃ ১১৬ এ

৩০০. এ এন পৃ ৯৪৩-৪৪

নৌবাহিনীর সুপারিনটেন্ডেন্ট ইবন-ই-হোসেনকে “১৫০০ গোলন্দাজ এবং ৪০০ অশ্বারোহী সৈন্যসহ” প্রেরণ করেন এবং তার সঙ্গে যান জামাল খান, সারান্দাজ খান, কারামাল খান এবং মুহাম্মদ বেগ অবকাশ। এই অতিরিক্ত সৈন্য সামন্তসহ ইবন-ই হোসেন নোয়াখালী পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং আরাকানীদের অগ্রাভিযান প্রতিহত করার জন্য মুহাম্মদ বেগসহ সেখানেই অবস্থান গ্রহণ করেন। আবুল হাসান এবার অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে স্বন্দীপ আক্রমণ করেন। দিলাওয়ারকে পরাজিত এবং তার সন্তান এবং অনুসারীদেরসহ তাকে বন্দী করেন এবং তাদেরকে বন্দী হিসেবে জাহাঙ্গীর নগরে প্রেরণ করেন। এইভাবে ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ই নভেম্বর চট্টগ্রাম বিজিত হয়। শায়েস্তা খান রশিদ খানের ভাই আবদুল করিমকে ২০০ অশ্বারোহী এবং ১০০০ গোলন্দাজ সৈন্যসহ স্বন্দীপের থানাদার নিয়োগ করেন।

স্বন্দীপ অধিকারে আসায় শায়েস্তা খান এবার চট্টগ্রাম জয়ের জন্য তার পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে যান। এই সময় তিনি আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি বাংলার ওলন্দাজ ক্যাপ্টেনের মাধ্যমে বাটাভিয়ার (জাকার্তা) ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁর চট্টগ্রামের বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত অভিযানে তাদের নৌ-সাহায্য কামনা করে পত্র লিখেন।[৩০১] বাটাভিয়ার ওলন্দাজ গভর্ণর বাংলায় গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক সুবিধা পাওয়ার লক্ষ্যে এবং পর্তুগীজদেরকে দুর্বল করার জন্য তাঁর প্রস্তাবে সাড়া দেন এবং বাংলায় দুটি জাহাজ প্রেরণ করেন।[৩০২] পরে অবশ্য এই সাহায্যের প্রয়োজন হয়নি এবং নওয়াব ধন্যবাদের সহিত তাদেরকে ফেরত পাঠান। আসলে তাঁর অন্য প্রচেষ্টা অর্থাৎ পর্তুগীজদেরকে আরাকানীদের পক্ষ ত্যাগ করে মোগলদের পক্ষে যোগ দিতে সম্মত করাতে সক্ষম হওয়ায় ওলন্দাজদের সাহায্য ছাড়াই তাঁর কার্যসিদ্ধি হয়ে যায়। নারিকল (চাঁদপুরের ১৩ মাইল পশ্চিমে), হুগলী এবং তমলুকে (মেদিনীপুর জেলায়) পর্তুগীজদের বাণিজ্য কুঠি ছিল। শায়েস্তা খান এই সকল স্থানের ফিরিঙ্গীদের মাধ্যমে চট্টগ্রামের “ফিরিঙ্গীদের” সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। তিনি শেখ জিয়াউদ্দীন নামক তাঁর একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে নারিকল বন্দরের দারোগা করে পাঠান; সেখানে ফিরিঙ্গী ব্যবসায়ীরা লবনের ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিল এবং “তিনি শেখ জিয়াউদ্দনকে নির্দেশ দেন, যেন তিনি সেখানকার ফিরিঙ্গীদেরকে তাদের ভাই, চট্টগ্রামের জলদস্যুদের (পর্তুগীজ) নিকট এই মর্মে পত্র লিখতে উদ্বুদ্ধ করেন যে,

৩০১. তালিশের ধারাবাহিক পৃ ১১৬ বি

৩০২. বার্নিয়ের পৃ ১৮১ ই এফ আই ১৬৬১-১৬৬৪ পৃ ৪০২-৪০৩ শায়েস্ত্র খানের চটগ্রাম অভিযানের প্রতি ইংরেজদের মনোভাব জানায়

তাদেরকে সম্রাটের পক্ষ থেকে অনুগৃহীত করা বা পুরস্কার দেয়া হবে এবং তারা যেন এগিয়ে এসে মোগলদের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করে"।[৩০৩] চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গীদের নিকট ব্যক্তিগতভাবে তার নিজের পক্ষ থেকে আপোষমূলক পত্র লেখার জন্য জিয়াউদ্দীনকে নির্দেশ দেয়া হয়। শায়েস্তা খান হুগলী এবং তমলুকের পর্তুগীজ অধিনায়কদের নিকট চট্টগ্রামে একই ধরনের পত্র লিখার জন্যও অনুরোধ জানান।[৩০৪] তাঁর অনুরোধ রক্ষা করে সেখানে পত্র লেখা হয় এবং এতে কাঙ্খিত ফল লাভ হয়।

কারণ, প্রথমতঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আরাকানের সাবেক শাসনকর্তার ভাই মাটক রায় ঢাকায় রাজনৈতিক আশ্রয় লাভের পর থেকেই আরাকান রাজের সঙ্গে চট্টগ্রামের পর্তুগীজদের সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে।[৩০৫] দ্বিতীয়ত: বার্নিয়েরের মতে শায়েস্তা খান ফিরিঙ্গীদের এই ধারণা দিয়েছেন যে, আওরঙ্গজেব আরাকানের রাজাকে শাস্তি দেয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং ওলন্দাজদের একটি শক্তিশালী ও অপ্রতিরোধ্য নৌবহরও নিকটেই অবস্থান করছে। অতএব, তাদের নিজেদের এবং তাদের পরিবারের নিরাপত্তার জন্যই তাদেরকে বাংলার পক্ষে যোগ দেয়াই উচিত। তাদেরকে আরো বলা হয় যে, বাংলায় তারা তাদের জন্য যতটুকু জমি প্রয়োজন বোধ করে, ঠিক ততটুকু জমিই তাদেরকে বরাদ্দ দেয়া হবে। তদুপরি, চট্টগ্রামে তারা যে বেতন পায়, তাদেরকে তার চেয়ে দ্বিগুণ বেতন দেয়া হবে।[৩০৬] তৃতীয়ত, আবার বার্ণিয়েরের মতে "পর্তুগীজরা এই সময় আরাকান রাজের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে হত্যা করে এবং এটা নিশ্চিত করে জানা যায়নি যে, তারা তাদের এই অপরাধের কারণে তাদের জন্য যে শাস্তি অপেক্ষা করছে, তার ভয়ে ভীত হয়েছিল, না শায়েস্তা খানের পত্রে যে হুমকি এবং অঙ্গীকার ছিল, তাতে আকৃষ্ট হয়েছিল"।[৩০৭] চতুর্থত, তালিশ এবং আলমগীরনামা, উভয়ের মতে ফিরিঙ্গীদের এই সিদ্ধান্তের পিছনে আশু কারণ ছিল আরাকানী রাজার একটি পদক্ষেপ। তিনি যখন শায়েস্তা খানের পত্র যোগাযোগ এবং মোগলদের সন্দ্বীপ জয়ের কথা জানতে পারেন, তখন তিনি চট্টগ্রামের গভর্ণরকে নির্দেশ দেন যেন, সেখানকার পর্তুগীজদের কড়া নজরে রাখে অথবা হত্যা করার জন্য আরাকানে প্রেরণ করে।[৩০৮] আরাকান রাজার এই

---

৩০৩. তালিশের ধারাবাহিতা পৃ ১১৬ বি
৩০৪. তালিশের বিবরণ পৃ ১৫১ বি
৩০৫. উপরোক্ত পৃ ৩৬৮-৩৬৯
৩০৬. ঐ পৃ ১৮০-১৮১
৩০৭ তালিশের ধারাবাহিকতা ১৮১
৩০৮ ঐ ধারাবাহিকতা পৃ ১৫১ বি ১৫২ এ

পরিকল্পনার আভাস পেয়ে ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর, ফিরিঙ্গীরা চট্টগ্রামে নোঙররত আরাকানীদের বহু সংখ্যক জাহাজে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং ৪০ থেকে ৫০টি জেলে নৌকায় করে নোয়াখালীতে এসে মোগলদের পক্ষে যোগ দেয়।[৩০৯] ভুলুয়ার পর্যবেক্ষণ ফাঁড়ির অধিনায়ক ফরহাদ খান তাদেরকে সাদর অভিনন্দন জানান এবং তাদের মধ্য থেকে স্বল্প সংখ্যককে তার নিকট রেখে অবশিষ্টদেরকে তাদের অধিনায়কসহ জাহাঙ্গীর নগরে (ঢাকায়) শায়েস্তা খানের নিকট প্রেরণ করেন। তিনিও তাদের সঙ্গে উদার আচরণ করেন।[৩১০]

শায়েস্তা খান "ফিরিঙ্গীদের তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়াকে বিজয়ের শুরু বলে গণ্য করতেন এবং বাস্তবেও তা হয়েছিল। ফিরিঙ্গীদের নেতা ক্যাপ্টেন মুরের পরামর্শ অনুযায়ী অবিলম্বে অভিযান পরিচালনার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নওয়াবের পুত্র বুজুর্গ উম্মেদ খানের উপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় এবং তিনি খাতনামা অফিসার যথা ইখতিসাস খান, সারান্দাজ খান, মীর মুর্তাজা, কারাওয়াল খান, এবং অন্যান্যদেরসহ একটি বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়ে ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর, ঢাকা থেকে অভিযানে বের হন। গোলন্দাজ বাহিনীর সুপারিন্টেন্ডেন্ট মীর মুর্তাজা এবং ভুলুয়ার থানাদার ফরহাদ খান একটি শক্তিশালী অগ্রগামী সেনা দল নিয়ে স্থল পথে অগ্রসর হন এবং বুজুর্গ উম্মেদ খান এবং অন্যান্যদের নেতৃত্বাধীন প্রধান সেনাবাহিনীর জন্য জঙ্গল কেটে রাস্তা করে দেয়া হয়; আর নৌবহর গঠিত হয় ইবন-ই-হোসেন এবং মুহাম্মদ বেগ অবকাশের নেতৃত্বাধীনে রাজকীয় রনতরীসমূহ নিয়ে। মুনাওয়ার খানের পরিচালনায় জমিদারদের ছোট ছোট রনতরীর বহর এবং ক্যাপ্টেন মুরের নেতৃত্বে পরিচালিত ফিরিঙ্গীদের নৌবহরসমূহ নিয়ে এবং স্থলবাহিনীর অগ্রবর্তী দলের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রেখে নৌবহর নদী ও সমুদ্রপথে অগ্রসর হতে থাকে। ইবনে হোসেনকে এই নৌবহরের সুপ্রীম কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়।[৩১১] শায়েস্তা খান পিছনে থেকে অভিযানের সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং রসদ সরবরাহ নিশ্চিত করেন। "যদি অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহলে দ্রুত অগ্রসর হয়ে তাঁর পুত্রের সঙ্গে মিলিত

৩০৯ ঐ আরো দেখুন, বার্নিয়েরে পৃ ১৮১

৩১০ এ.এন পৃ-৯৪৭। ফিরিঙ্গীদের অধিকাংশের জন্য ঢাকা থেকে ১২ মাইল দূরে ফিরিঙ্গী বাজারে বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে তাদের বংশধরদের ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও দেখা গেছে (স্টুয়ার্ট, হিস্ট্রিরি, অব বেঙ্গল, ১৮১২, পৃ ২৯৯)। এমন কি বর্তমান যুগে ও চট্টগ্রামে ফিরিঙ্গী বাজার নামে একটি এলাকা রয়েছে।

৩১১ জমিদারদের রনতরীসমূহ এবং পর্তুগীজদের নৌবহর বাদে রাজকীয় নৌবহরে ছিল ২৮৮টি জাহাজ এবং এর মধ্যে ছিল ২১টি খুরাব, ৩টি সাল্ব, ১৫৭টি কুসা, ৯৬টি জালবা, ২টি বাচারী, ৬টি পারেন্দা এবং ৩টি অন্যান্য নৌকা, ধারাবাহিক পৃষ্ঠা ১৪৯

হবেন"। তাছাড়া "আরাকানের এক সাবেক রাজার পুত্র কামাল, যিনি শাহজাহানের আমলে ঢাকায় পালিয়ে এসেছিলেন, তাকেও ঢাকায় বসবাসকারী মগদের একটি সেনাদল নিয়ে অগ্রবর্তী স্থল বাহিনীর সঙ্গে অভিযানে বের হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়"।[৩১২]

ফারহাদ খান এবং মীর মুর্তাজা "অগ্রবর্তী সৈন্যদল, জঙ্গল সাফকারী এবং কিছু সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে নোয়াখালী থেকে ১২ই জানুয়ারি ১৬৬৬ (১৬ রজব, ১০৭৫) যাত্রা শুরু করেন এবং ১৪ই জানুয়ারি ১৬৬৬, (১৮ রজব, ১০৭৫ হিজরী) ফেনী নদী অতিক্রম করেন। নৌবহরও একই সময়ে নোয়াখালী থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। বুজুর্গ উম্মেদ খান ১৭ই জানুয়ারি ফেনী নদী অতিক্রম করেন। ২১শে জানুয়ারি অগ্রবর্তী স্থল বাহিনী এবং নৌবহর কুমিরা খাঁড়িতে পৌঁছে; আর বুজুর্গ উম্মেদ খান "দ্রুত জঙ্গল কেটে" মূল বাহিনী নিয়ে ঐ স্থানের তিন ক্রোশের মধ্যে এসে পৌঁছেন।[৩১৩] কুমিরার নিকট সর্বপ্রথম আরাকানীদের নৌবহরের সঙ্গে মোগলবাহিনীর সংঘর্ষ ঘটে, ২৩শে জানুয়ারি, ১৬৬৬ (২৭ রজব, ১০৭৫)। তালিশ লিখেছেন যে, "শত্রুদের দশটি ঘুরাব এবং ৪৫টি জালবা নৌকা দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাদের কামান থেকেই গুলি ছোড়া হয়। ক্যাপ্টেন মুর এবং ফিরিঙ্গীরা, যারা অগ্রবর্তী বাহিনীটি পরিচালনা করেছিলেন, তারা সাহসের সঙ্গে ষ্টিয়ারিং চেপে ধরেন। ইবন হোসেন তাদের পিছু পিছু অগ্রসর হন। শত্রুরা এই আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেনি, ঘুরাবের লোকজন লাফিয়ে নেমে পড়ে এবং জালবাগুলো পালিয়ে যায়"[৩১৪] ইবন হোসেন তার দ্রুতগামী জাহাজ নিয়ে ধাওয়া করেন এবং দশটি ঘুরাবের সবকটি এবং তিনি জালবা নৌকা ধরে ফেলেন।[৩১৫] তবে শীঘ্রই পলাতক আরাকানী জালবা নৌকার সঙ্গে পিছনে অপেক্ষমান বড় জাহাজগুলো যোগ দেয়। ইবন-ই-হোসেন তার হালকা জাহাজ নিয়ে অগ্রসর হন এবং অব্যাহতভাবে গোলাগুলি করে শত্রুদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখেন। আবার বড় জাহাজ (সাল্ব) নিয়ে আসার জন্য একজন লোক প্রেরণ করেন এবং মাগরিবের নামাজের সময় সেগুলো এসে পৌঁছে। "তখন থেকে ভোর পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে কামানের গোলাগুলি চলতে থাকে"। পরদিন সকালে (২৪শে

---

৩১২ এ.এন. পৃ-৯৪৮। সম্ভবত: মাটক রায় ইসলাম গ্রহণ করে কামাল নাম ধারণ করেছিলেন, কারণ অন্য কোন আরাকানী রাজপুত্র তার অনুসারীদের নিয়ে ঢাকায় চলে এসেছিলেন বলে জানা যায় না।

৩১৩ এ এন পৃ ৯৪৯ ধারাবাহিকতা পৃ ১৬১ বি আলমগীর নামায় ঐ স্থানকে ডুমরিয়া বলা হয়েছিল; আর কেউ কেউ অবশ্য এই স্থানকে খামারিয়া বলে থাকেন

৩১৪ ধারাবাহিকতা পৃ ১৬৮ এ

৩১৫ এ এন পৃ ৯৫০

জানুয়ারি ১৬৬৬, ২৮শে রজব) সংঘটিত দ্বিতীয় নৌযুদ্ধে আরাকানী নৌবাহিনী পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায় এবং বিকেল ৩.০০টার দিকে কর্ণফুলী নদীতে প্রবেশ করে। মোগল বাহিনীও শত্রুদের পশ্চাধাবন করে এবং কর্নফুলী নদীতে প্রবেশ করে এর মোহনা অবরোধ করে।[৩১৬] ইতিমধ্যে যুদ্ধের অগ্রগতি সম্পর্কে অবগত হয়ে বুজুর্গ উম্মেদ খান অতিদ্রুত নৌবহরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য ফরহাদ খান এবং মীর মুর্তাজাকে নির্দেশ দেন। ফরহাদ খান এবং মীর মুর্তাজা তাদের সৈন্যবাহিনীসহ ঐ দিনই কর্ণফুলীর তীরে এসে পৌঁছেন (২৪শে জানুয়ারি)।[৩১৭] ইবন-ই-হোসেন তখন কর্ণফুলী নদীতে প্রবেশ করে আরাকানি রনতরীগুলোকে ক্ষিপ্রভাবে আক্রমণ করেন। ক্যাপ্টেন মুর এবং অন্যান্য ফিরিঙ্গী জলদস্যু বাহিনী এবং নওয়াবের অন্যান্য কর্মকর্তা যথা মুহাম্মদ বেগ অবকাশ এবং মুনাওয়ার খান জমিদার দ্রুত বিভিন্ন দিক থেকে এসে একত্রিত হন"। একটি প্রচন্ড যুদ্ধের পরে আরাকানীরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়, তাদের অনেকেই নিহত হয়, অনেকে আবার জাহাজ ফেলে পালিয়ে যায় এবং অবশিষ্টরা আত্মসমর্পণ করে, তাদের "অনেক জাহাজ আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হয় বা মোগলদের যুদ্ধ জাহাজ সেগুলোকে ধাক্কা দিয়ে ডুবিয়ে দেয়" এবং ১৩৫টি রনতরী মোগলদের হস্তগত হয়।[৩১৮]

কর্ণফুলী নদীতে ২৪শে জানুয়ারির যুদ্ধ চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ণয়কারী যুদ্ধ হিসেবে প্রমানিত হয়। আরাকানীরা তখন চট্টগ্রাম দুর্গ পরিত্যাগ করা শুরু করে। দুর্গের গবর্ণর ছিলেন "আরাকান রাজের ভ্রাতুস্পুত্র," তিনি ২৬ জানুয়ারি আত্মসমর্পণ করেন এবং তাকে, তার পুত্র এবং অন্যান্য নিকটাত্মীয়সহ তার গোত্রের প্রায় ৩৫০ জনকে বন্দী করা হয়"। বিভিন্ন যুদ্ধসরঞ্জামসহ ১০২৬ টি লোহা এবং ব্রঞ্জের বন্দুক, কামান এবং দুইটি বা তিনটি হাতিও তাদের হস্তগত হয়। "বাংলার বিপুল সংখ্যক কৃষক, যাদেরকে ধরে সেখানে নিয়ে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, তারা মগদের নির্যাতন থেকে মুক্তি পায় এবং তাদের বাড়ী ঘরে ফিরে আসে"।[৩১৯] নদীর অপর পাড়ে অবস্থিত দুর্গের মগরাও পালিয়ে যায় এবং এটিও মুসলমানদের করতলগত হয়। নদীর অপর পাড়ের কৃষকদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান; তাদেরকে বাংলা থেকেই অপহরণ করে নেয়া হয়েছিল, তারা পলায়ন পর

৩১৬ তালিশের ধারাবাহিকতা পৃ ১৬৯ বি ১৭০ এ

৩১৭ এ এন পৃ ৯৫০

৩১৮ ধারাবাহিকতা পৃ-১৭০বি এবং ১৭১এ. এ.এন. পৃ-৯৫১। আলমগীর নামায় উল্লেখ রয়েছে যে. ১৩২টি জাহাজ হস্তগত হয়েছিল। তালিশের বর্ণনা অনুযায়ী ধৃত বিভিন্ন ধরণের জাহাজের মধ্যে খালু হচ্ছে ২টি. ঘুবার ৯টি. জাঙ্গি ২২টি. কোসা-১২টি. জালবা ৬১ (৬৮) এবং বালাস ২২টি।

৩১৯ এ এন পৃ ৯৫৩ (অংশটুকু যে এন সরকারের অনুবাদ)

মগদেরকে আক্রমণ করে এবং তাদের একজন নেতাসহ অনেককে হত্যা করে এবং তাদের দুটি হাতি তারা হস্তগত করে, পরে এই হাতি দুটি ইবন-ই-হোসেনের নিকট আনা হয়।[৩২০] ২৭শে জানুয়ারি বুজুর্গ উম্মেদ খান চট্টগ্রাম দুর্গে প্রবেশ করে একটি সাধারণ ঘোষণা দ্বারা সকলের জান-মালের নিরাপত্তা দান করেন।[৩২১] তারপর তিনি চট্টগ্রামের সমগ্র উত্তরাঞ্চলের উপর কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন এবং মিয়ানা খানকে এর থানাদার নিয়োগ করেন, আর তাজ মিয়ানা খানকে চট্টগ্রাম থেকে ফেনী নদী পর্যন্ত সড়কের পাহারার জন্য থানাদার নিয়োগ করেন।[৩২২] চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চল দখলের জন্য মীর মূর্তাজার অধিনে আরেকটি অভিযান প্রেরণ করা হয়। তিনি ১২ দিন মার্চ করে "বন্ধুর পথ, গভীর জঙ্গল এবং ভয়ানক নদী" অতিক্রম করে আধুনিক কক্স বাজারের নিকটবর্তী রামুতে পৌঁছেন এবং আরাকানের রাজার ভ্রাতা এবং দুর্গের রক্ষক রাউলীর নিকট থেকে তা ছিনিয়ে নেন। "বাংলার বহু মুসলমান প্রজা, যাদেরকে সেখানে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, তারা মুক্ত হন এবং তাদের বাড়ী ঘরে প্রত্যাবর্তন করেন"।[৩২৩]

এইভাবে "জলদস্যুদের আস্তানা" ধ্বংস করা হয় এবং সমগ্র এলাকার উপর মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা থেকে যাত্রা করে চট্টগ্রাম অধিকার করা পর্যন্ত পূর্ণ অভিযানটি পরিচালনার জন্য সময় লেগেছিল ঠিক একমাস দুই দিন এবং নোয়াখালী থেকে যাত্রার পর হিসাব করলে তাতে লেগেছিল ঠিক দুই সপ্তাহ। দুই দিনে ২৩ শে ও ২৪শে জানুয়ারি ১৬৬৬, দুটি মাত্র প্রকৃত নৌযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল; তার একটি হয়েছিল সাগরে এবং অন্যটি হয়েছিল কর্ণফুলী নদীতে। এটা এখন পরিষ্কার যে, ফিরিঙ্গীরা আরাকানীদের ত্যাগ করার পরে তারা আর মোটেই মোগলদের সমকক্ষ ছিল না। এই নৌযুদ্ধে "ফিরিঙ্গী জলদস্যুরা" সত্যিকার অর্থেই একটি চমৎকার ভূমিকা পালন করেছিল, তবে ইবন-ই-হোসেন এবং মুনাওয়ার খানও কৌশল এবং শৌর্য-বীর্য কম দেখাননি; অভিযানের সাফল্যের প্রধান কারণ ছিল নৌ-বাহিনী ও স্থল বাহিনীর মধ্যে ঘনিষ্ট সহযোগিতা।

১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারি শায়েস্তা খানের নিকট বিজয়ের সংবাদ পৌঁছে। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় এবং গরীবদের মধ্যে দান-খয়রাত করার পর তিনি "সেনাবাহিনীর সকলকে উদারভাবে পোশাক, হাতি-ঘোড়া ইত্যাদি

---

৩২০ তালিশের ধারাবাহিকতা পৃ ১৭২ বি
৩২১ ঐ পৃ ১৭৫ বি
৩২২ এ এন পৃ ৯৫৩
৩২৩ ঐ পৃ ৯৫৫

উপঢোকন দিতে শুরু করেন। ফিরিঙ্গী দস্যুদেরকে অপরিমিত অর্থ দান করেন এবং তার নিজ অফিসার এবং নৌবাহিনীর নাবিকদেরকে উৎসাহ দেয়ার জন্য এক মাসের বেতন অতিরিক্ত প্রদান করেন"।[৩২৪] নওয়াব একই দিন এই বিজয় সম্পর্কে সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট এক পত্র প্রেরণ করেন। সম্রাট শাবান মাসের শেষদিকে (ফেব্রুয়ারি ১৬৬৬) এই সংবাদ প্রাপ্ত হন। তিনি চট্টগ্রামের নাম পরিবর্তন করে ইসলামাবাদ রাখার নির্দেশ দেন এবং আজো এই নামটি প্রচলিত আছে। সম্রাট শায়েস্তা খানকেও উপহার প্রদান করেন এবং তাঁর পুত্র বুজুর্গ উম্মেদ খান, ফারহাদ খান এবং মুনাওয়ারের পদমর্যাদা হাজার ও পানসাদী (এক হাজার এবং পাঁচশত) পর্যায়ে উন্নীত করেন এবং মীর মুর্তাজাকে মুজাহিদ খান এবং ইবন-ই-হোসেনকে মুজাফফর খান উপাধি প্রদান করেন।[৩২৫] মুহাম্মদ বেগ অবকাশকেও পদোন্নতি দেয়া হয়েছিল।

৫. চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মূল্যায়ন

বাংলার মোগল সুবাদারদের মধ্যে শায়েস্তা খান ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। এক বৎসরের চেয়ে সামান্য একটু বেশি সময়ের ছেদ ব্যতীত তিনি প্রায় সিকি শতাব্দী অত্যন্ত দক্ষতা, সততা, ন্যায়পরায়নতা, উদারতা এবং জনগণের কল্যাণের জন্য পিতা-সুলভ যত্ন নিয়ে এই প্রদেশটি শাসন করেন। তার প্রবল শক্তিমত্তা ও শ্রেষ্ঠত্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী এবং বিনয়ী, নম্র ও ভদ্র, ন্যায়পরায়ন, উদার, সাহসী, মহৎ এবং সংস্কারমুক্ত"।[৩২৬] তিনি তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত এবং সরকারী কাজে ইসলামের নীতিমালা কড়াকড়িভাবে অনুসরণ করে চলতেন এবং তিনি মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে সৎ, সবচেয়ে উদার এবং সবচেয়ে বিচক্ষণ হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করেছিলেন। ট্যাভারনিয়ের তাঁকে আওরঙ্গজেবের সমগ্র সাম্রাজ্যের মধ্যে "সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তি" বলে অভিহিত করেছেন।[৩২৭] সম্রাট তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতেন এবং তাঁকে "অজস্র সুযোগ-সুবিধা প্রদানসহ আধা রাজকীয় সম্মানে ভূষিত করেছিলেন।[৩২৮] শায়েস্তা খান অত্যন্ত সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত তার দৈহিক এবং মানষিক

---

৩২৪ ধারাবাহিকতা পৃ ১৭২ বি

৩২৫ এ এন পৃঃ ৯৫৬ তালিশের মতে ইবনে ই হোসেন কে মানসূর খান উপাধি দেয়া হয়েছিল (ধারাবাহিকতা পৃ ১৭৩ বি)

৩২৬. এ সালাম রিয়াদ পৃ ২২৭ এন আরা দেখুন জে সি মার্শম্যান হিস্ট্রি অব ইন্দিয়া ১ম খণ্ড পৃ ২০৯

৩২৭. ট্যাভারনিয়ার ১ম খণ্ড ১৬৫

৩২৮. এ সালাম পূর্বোক্ত

শক্তিও সাহস অক্ষুন্ন রেখেছিলেন।[৩২৯] তিনি বাংলা থেকে অবসর নিয়ে যাওয়ার ছয় বৎসর পর ৯৩ বৎসর বয়সে ইন্‌তিকাল করেন।

Lalbag Mosque, Dhaka. Built by Prince Muhammad A'zam in 1678-1679 & (65'·32'·4)

শায়েস্তা খানের সবচেয়ে গৌরবময় কৃতিত্ব হচ্ছে চট্টগ্রাম জয় এবং বাংলার মানুষের জান ও মাল মগ-ফিরিঙ্গী জলদস্যুদের ধ্বংসাত্মক হামলা থেকে নিরাপত্তা দান এবং দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। ব্রাডলি বাট যথার্থই লিখেছেন, "মোগলদের একটি প্রদেশের সুবাদার হিসেবে তিনি তাঁর সমসাময়িকদের সকলের ঊর্ধ্বে। সর্বোপরি, তিনি একটি অরাজকতাপূর্ণ দেশে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমানরা প্রথম বাংলায় আসার পর

---

৩২৯. শায়েস্তা খান সম্পর্কে যদুনাথ সরকার যে বর্ণনা দিয়েছেন (এইচ বি. ২য় পৃঃ ৩৭৩) তা হচ্ছে এই যে, তিনি ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন বাংলায় আসেন, তখন তিনি ছিলেন একজন ক্লান্ত বৃদ্ধ লোক, এবং তথাপি তিনি "অসংখ্য হারেমের মধ্যে আরাম-আয়েশী জীবন যাপন করতেন এবং তা এতবেশী ছিল যে, ৮২ বৎসর বয়সেও তাঁর একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে"। এই বক্তব্য হচ্ছে সমসাময়িক বিভিন্ন সূত্র থেকে লব্দ তথ্যের বিরোধী, বাস্তব ঘটনার একটি মারাত্মক বিকৃতি এবং এই কথা অবশ্য সরকারের নিজ বক্তব্যেরই বিরোধী।

থেকে সে যুগে এই প্রদেশটিতে আর কখনো এত দীর্ঘদিন শান্তি ও স্বস্তি ছিল না, যা তার প্রতিষ্ঠাতাকে বিশিষ্টতা দান করলেও পরবর্তীকালে তা আর তেমন প্রশংসা পায়নি।[৩৩০]

তাঁর রাজস্ব সংস্কার ও সমভাবে উল্লেখযোগ্য, যা কৃষিকাজকে উৎসাহ যোগায়, আর ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি তাঁর উৎসাহ দানের ফলে দেশে নজীরবিহীন অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়, যার ফলে স্থানীয় ও বিদেশী উভয় শ্রেণীর বণিকদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম বৃদ্ধি পায়। দেশের জনগণের প্রধান খাদ্য চালসহ প্রয়োজনীয় সকল পণ্যদ্রব্য তাঁর আমলে এতবেশি সস্তা ছিল যে, পরে তা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয় এবং তিনি এ প্রদেশ থেকে বিদায় নেয়ার পরেও মানুষ তাঁর যুগে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে লিখতে গিয়ে ষ্টুয়ার্ট এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন; "তাঁর স্মৃতি আজো প্রদেশব্যাপী সর্বোচ্চ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর শাসনামলে চাল এত সস্তায় বিক্রি হত যে, এক টাকায় ৭৪০ পাঃ (প্রায় ৮ মন) চাল পাওয়া যেত"।[৩৩১] মীর জুমলার সুবাদারীর শেষের দিকে ঢাকা এবং এর আশে পাশে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, তার পরে এসে এই অবস্থা সৃষ্টি শায়েস্তা খানের পক্ষে কম কৃতিত্বের ব্যাপার নয়; তিনি তার এই কৃতিত্বের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন, তাই শেষবারের মত প্রদেশ ত্যাগের সময় তিনি জাহাঙ্গীর নগরের (ঢাকার) পশ্চিম ফটকে এই কথা উৎকীর্ণ করে দিয়েছিলেন; "যিনি চালের দর এত সস্তায় নামিয়ে আনতে পারবেন, শুধু তিনিই যেন এ ফটক খোলেন"।[৩৩২] রিয়াদে লেখা হয়েছে যে, এই সময় থেকে সুজাউদ্দীন মুহাম্মদ খানের সুবাদারী পর্যন্ত এই ফটক বন্ধ ছিল। নওয়াব সরফরাজ খানের সুবাদারীর সময় এই ফটক পুনরায় খোলা হয়"।[৩৩৩]

ব্যবসায়ী ও বণিকদের প্রতি, বিশেষ করে বিদেশী বণিকদের প্রতি শায়েস্তা খানের নীতি ছিল ন্যায়সঙ্গত, উদার এবং পক্ষপাতহীন। এই সব বিষয়ে তিনি সর্বদাই দেশ ও জনগণের কল্যাণের চিন্তা মনে রাখতেন। ইংরেজ কুঠিয়ালরা অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে অনেক অপবাদ ছড়ানোসহ তাঁকে অনেক কটু কাটব্য করেছেন এবং তা থেকে অনেক আধুনিক লেখকও তাঁকে "অত্যাচারী" এবং "লোভী" বলে অভিহিত করেছেন।

---

৩৩০ এফ বি ব্র্যাডলি বার্ট দ্যা রোমান্স অব এন ইস্টার্ন ক্যাপিটাল, লণ্ডন ১৯০৬ পৃ ৩৬

৩৩১ স্টুয়ার্ট, পূর্বোক্ত পৃ ৩৫৩

৩৩২ রিয়াদ পৃ ২২৮

৩৩৩ ঐ, এই ব্যাপারে শায়েস্তা খানের সুনামকে ক্ষুণ্ণ করার জন্য যদুনাথ সরকারের প্রচেষ্টা সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

এই প্রশ্নটি অন্যত্র বিস্তারিতবাবে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখা যাবে যে, তিনি সে ধরণের কিছু ছিলেন না। এমনকি একটু কম পক্ষপাত দোষে দুষ্ট ইংরেজ ঐতিহাসিক লিখেছেন- "কোম্পানীর কুঠিয়ালরা শায়েস্তা খানের বিরুদ্ধে অতৃপ্ত গৃধ্নুতার অভিযোগ করেছেন, তবু তারা এটাও অস্বীকার করেননি যে, তিনি তাদের বাণিজ্যের সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন এবং তাদের জন্য দিল্লী থেকে সুবিধার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন"।[৩৩৪]

"অত্যাচারী" এবং "লোভী" হওয়া দূরে থাকুক, শায়েস্তা খান ছিলেন প্রকৃতপক্ষে অতিমাত্রায় উদার এবং দয়ালু। তিনি সবার জন্য ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং কাজী (Judges) নিয়োগের সময় মেধা এবং চারিত্রিক সততার উপর কড়াকড়ি আরোপ করতেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি অনেক জ্ঞানী-গুণী এবং যোগ্য ব্যক্তিকে নিস্কর জমিতে পূর্ণবাসনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন এবং আরো বহু নতুন আবেদনকারীকেও অনুরূপভাবে নিস্কর জমি বরাদ্দ দিয়েছিলেন। যেমন ষ্টুয়ার্টের মন্তব্য হচ্ছে: তিনি অনেক সম্মানী লোকের বিধবা স্ত্রী, সদবংশজাত এবং দরিদ্র ব্যক্তিদেরকে নিস্কর ভূমি বা গ্রাম বরাদ্দ দিয়েছিলেন।[৩৩৫] সমসাময়িক ইউরোপীয় পর্যটক ম্যানুক্কির লেখা থেকে জানা যায় যে, "শায়েস্তা খান ছিলেন একজন সুবিজ্ঞ, অত্যন্ত সম্পদশালী, শক্তিমান ও সুনামের অধিকারী ব্যক্তি। কারণ তিনি ছিলেন অত্যন্দ দানশীল এবং প্রতি বৎসর ৫০,০০০ টাকা দান খয়রাত করতেন। এই জন্য দেশের প্রতিটি বড় শহরে কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছিলেন, যারা অত্যন্ত অভাবগ্রস্থ লোকদের দৈনন্দিন খাদ্য ও কাপড় বিতরণ তদারকী এবং এতিম ও বিধবাদের ত্রাণকার্য সম্পাদন করতেন"।[৩৩৬]

শায়েস্তা খান একজন বড় নির্মাতাও ছিলেন। তিনি অনেক মসজিদ, মাদ্রাসা, সরাইখানা, সেতু এবং সড়ক নির্মাণ করেছিলেন।[৩৩৭] তিনি ঢাকায় অনেক প্রসিদ্ধ ইমরাত নির্মান করেছিলেন যথা, ছোট কাটরা, লালবাগ প্রাসাদ এবং আরো কিছু মসজিদ, যা আজো সযত্নে অনেক সুন্দর অবস্থায় আছে। ব্রাডলী বার্ট লিখেছেন, "তাঁর শাসনামলই ছিল ঢাকার সর্বাধিক উন্নতির যুগ। মুসলমানদের সকল কলা-কৌশল প্রয়োগে নির্মিত সুন্দর সুন্দর ইমারতসমূহ নগরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতো।

৩৩৪ মার্শম্যান পূর্বোক্ত পৃ ২২৯
৩৩৫. স্টুয়ার্ট পূর্বোক্ত পৃ ২২২।
৩৩৬. ম্যানুক্কী, ২য় খন্ড, পৃ: ৩২২
৩৩৭. এম এ পৃ: ৩৬৮

ঢাকার আর কোন গবর্ণর বা সুবাদার শহরের উপর তার এত বেশি স্মৃতি রেখে যান নি। এটা আসলেই শায়েস্তা খানের শহর"।[৩৩৮]

এই প্রসঙ্গটি ইতি টানার পূর্বে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শায়েস্তা খানের "লোভ" এবং "বলপূর্বক অর্থ আদায়" সম্পর্কে ইংরেজ কুঠিয়ালদের বর্ণনা যাচাই বাছাই না করে গ্রহণ এবং এর সঙ্গে শায়েস্তা খানের সন্দেহাতীত যশ এবং উদারতার বিষয় মিলিয়ে তালগোল পাকিয়ে যদুনাথ সরকার নওয়াবের চরিত্র সম্পর্কে একটি বিভ্রান্তিকর এবং স্ববিরোধী চিত্র অংকন করেছেন। এভাবে তাঁর আলোচনার প্রথম দিকে যদুনাথ সরকার শায়েস্তা খানের "লোভ" এবং "ভয়ভীতি দেখিয়ে অর্থ আদায় সম্পর্কে ইউরোপীয়দের সাক্ষ্য অনস্বীকার্য" বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং পরে সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট শায়েস্তা খানের উপঢোকন ও অর্থ প্রেরণকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করে সরকার নওয়াবকে তীব্র নিন্দা করে বলেন যে, "জনগণের নিকট থেকে বাধ্যতামূলকভাবে অর্থ আদায়" করে তিনি এরূপ 'অপচয়' চালিয়ে যেতেন এবং তাঁর অধিনস্থদেরকে "তাঁর জন্য তাদের চিন্তা অনুযায়ী প্রতিটি পন্থায় অর্থ আদায় করার ব্যাপারে স্বাধীনতা প্রদান করেছিলেন"।[৩৩৯]

তারপর শেষের দিকে আরেকটি পর্যায়ে এসে সরকার শায়েস্তা খানের সুনাম এবং উদারতা সম্পর্কে প্রচলিত যে প্রবাদ, তাকে চাপে ফেলার জন্য এবং একে তার "অমিতাচার এবং অপরিনামদর্শী ব্যয়" প্রমান করার জন্য এইরূপ যুক্তি পেশ করেন। যদুনাথ সরকার লিখেছেন, প্রকৃতপক্ষে, বাংলায় শায়েস্তা খানের খ্যাতির কারণ হচ্ছে আপামর জনসাধারণের নিকট তাঁর জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য তাঁর সহজ প্রাচ্য দেশীয় উপায় অনুসরণ, আর তা হচ্ছে রাজকীয় জাকজমক এবং অমিতব্যয়িতার সঙ্গে জীবন যাপন, বিপুল সংখ্যক নিষ্প্রয়োজনীয় চাকর-বাকর এবং পরগাছা শ্রেণীর উচ্ছিষ্টভোগীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকা এবং বহু ভণ্ড, সাধু ও আলেম, অলস ও কর্মবিমুখ এবং নিজদেরকে ধর্মপথের পথিক ও যাচঞ্চাকারী হিসেবে পরিচয়দানকরীদের মধ্যে বাছ বিচারবিহীনভাবে দান খয়রাত করা ইত্যাদি"।[৩৪০] সরকার আরো বলেন যে, "শায়েস্তা খানের অতি ব্যয় বাংলার বাজেটকে" বিপর্যস্ত করে ফেলে। "তাঁর সুবাদারীর প্রথম মেয়াদের শেষে ১৬৭৮

৩৩৮. ব্রাডলি বার্ট পূর্বোক্ত পৃ ২৬-২৭
৩৩৯. এইচ বি ২য় খন্ড পৃ ৩৭৪। সরকারকে অনুসরণ করে এ সি রায় শায়েস্তা খানকে এমনকি অপচয়কারী এবং ইন্দ্রিয়পরায়ন উভয় বিশেষণে বিশেষিত করেছেন (পূর্বোক্ত পৃ ২৮৭)
৩৪০. ঐ পৃ ৩৮৭

খ্রিস্টাব্দে প্রাদেশিক দীউয়ান সম্রাটের নিকট প্রেরিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যে, এই সূবাদার তাঁর জন্য নির্ধারিত বরাদ্দের চেয়ে অতিরিক্ত ১ কোটি বত্রিশ লক্ষ টাকা নিয়ে ব্যয় করেছেন। পূনরায় ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদের সময়ও এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছিল যে, তিনি অতিরিক্ত ৫২ লাখ টাকা ব্যয় করেছেন।[৩৪১]

সে সময়ের নিস্কর জমি বরাদ্দ গ্রহণ এবং অন্যান্য অনুদান প্রাপ্তদেরকে অলস, অকর্মন্য এবং ভণ্ড আলেম ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত করার ঔচিত্য নিয়ে কেহ প্রশ্ন না তুললেও সরকারের বক্তব্যের অর্ন্তনিহিত বৈপরিত্য ভালভাবেই তার দৃষ্টিগ্রাহ্য হতে পারে। একটি সাধারণ বিষয় হলো এই যে, একজন লোক একই সময়ে উদার এবং অত্যাচারী, লোভী এবং দানশীল হতে পারে না। তথাপি, সরকার ঠিক এ বিষয়টাই পাঠকদেরকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছেন। শায়েস্তা খানের বিরুদ্ধে ইংরেজ কুঠিয়ালদের অভিযোগের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং বিদেশী বণিকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে অন্যত্র আলোচনা পেশ করা হয়েছে। এতটুকুন মনে রাখা যথেষ্ট হবে যে, সমসাময়িক কোন সূত্রেই শায়েস্তা খান কর্তৃক কোন ছল ছুতায় বিদেশী বণিকদের নিকট থেকে বল প্রয়োগে অর্থ আদায়ের কোন নজীর নেই। সরকার কর্তৃক উল্লেখিত, এমন কি শায়েস্তা খানের প্রতিশ্রুত অর্থ মিলিয়ে আওরঙ্গজেবের নিকট প্রেরিত অর্থের পরিমান সর্বমোট ৭২ লাখের বেশি নয়।[৩৪২]

৩৪১ এইচ বি ২য় খন্ড পৃ ৩৮৬ টীকা ২ এম. এ. থেকে উদ্বৃত পৃঃ ১৭০, ২৩৪

৩৪২. প্রেরিত অর্থের যে পরিমান উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে (ক) ১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে তার প্রথম মেয়াদ শেষে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের সময় সম্রাটকে দেয়া উপঢোকন "৩০ লাখ টাকা নগদ এবং ৪ লাখ টাকা মূল্যের রত্ন" (খ), ১৬৮০

পঞ্চম অধ্যায়[৩৪৩]

১.শায়েস্তা খান এবং বাংলায় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য[৩৪৪]

(ক) প্রাথমিক মন্তব্য

শায়েস্তা খানের প্রথম দিকে চট্টগ্রাম বিজয় এবং শেষের দিকে ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে সংঘর্ষ ব্যতীত তাঁর সুবাদারীর (১৬৬৪-১৬৭৭, ১৬৭৯-১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দ) পুরো সময় বাংলায় নির্বিঘ্ন শান্তি এবং নজীর বিহীন আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার পরিলক্ষিত হয়। তাঁর সময়ে বাংলার যে উন্নতি ও অগ্রগতি হয়েছিল, তা আজো প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়ে আছে। তা সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যজনক হল এই যে, কিছু লেখক কর্তৃক তাঁর বাণিজ্যিক নীতি, বিশেষ করে বিদেশী বণিকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ব্যাপারে ভুল ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রথমেই এই সম্পর্কে বলে নেয়া ভাল যে, শুধু ইংরেজ বণিকদের অভিযোগের ভিত্তিতেই এই ভুল ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে। সে সময় বাংলায় ইংরেজদের চেয়ে ওলন্দাজ ও অন্যান্য বিদেশী বণিকদের বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল অনেক বেশি, তা সত্ত্বেও তারা ইংরেজ বণিকদের স্বীকৃতি অনুসারেই নিয়মিত শুল্ক প্রদান করত এবং তারা নওয়াব কর্তক "বলপূর্বক অর্থ আদায়" বা "অত্যাচারের" কোন অভিযোগ উত্থাপন করেননি এবং নওয়াবের সঙ্গে তাদের কোন দ্বন্দ্ব-সংঘাতও হয়নি। শুধু ইংরেজরাই বাংলায় তাদের বাণিজ্যের শুরু থেকেই শুল্ক প্রদান এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছে এবং আগের একটি অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এমন কি তারা মীর জুমলার সময়ে শক্তি প্রয়োগের ব্যাপারেও চিন্তা-ভাবনা করেছিল।[৩৪৫] শায়েস্তা খানের শাসনের শুরুতেই তারা শক্তি প্রয়োগের সে একই মনোভাব গ্রহণ করে এবং তাঁর সুবাদারীর শেষভাগে এসে বাস্তবে প্রথম ইংরেজ মোগল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই জন্য এবং শায়েস্তা খানের সঙ্গে ইংরেজদের এই যুদ্ধের মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই শেষ পর্যন্ত বাংলায় তারা তাদের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। তাই এখানে তাদের সঙ্গে নওয়াবের সম্পর্ক নিয়ে কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হল।

---

৩৪৩. মুল বইয়ে বিংশতিতম অধ্যায়

৩৪৪. এই বর্তমান অধ্যায়টি আমার (ড. মোহর আলীর) ইংরেজদের সঙ্গে শায়েস্তা খানের সম্পর্কের উপর লিখিত এবং জে.এ.এস.পি' ১৯৬৫ ২য় খন্ড, পৃঃ ৮৫-১১৯ এবং জে.ই.পি. এইচ. এ ৪মার্চ, ১৯৬৮, পৃঃ-১-৩৮ এর উপর ভিত্তি করে রচিত

৩৪৫ . পূর্ববর্তী অধ্যায়, দ্রঃ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে লিখতে গিয়ে চার্লস স্টুয়ার্ট শায়েস্তা খানকে বিদেশী বণিকদের জন্য একজন অত্যাচারী শাসক হিসেবে চিত্রিত করেছেন এবং তাঁর অত্যাচারই শেষ পর্যন্ত ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা[৩৪৬] করতে বাধ্য করে বলে উপসংহার টেনেছেন। এই বিষয়কেই পরবর্তী ইংরেজ লেখকগণ যথা সি.আর. উইলসন[৩৪৭] এবং ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার[৩৪৮] উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে লিখতে গিয়ে আরো বাড়িয়ে তুলেছেন। যাহোক, সে সময় এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কোম্পানীর প্রাথমিক পর্যায়ের আরো বেশ কিছু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ দলিল প্রকাশ করা হয়। এইগুলোর মধ্যে ১৬৮২-১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় কোম্পানীর এজেন্ট উইলিয়াম হেজের ডায়েরী,[৩৪৯] (প্রকাশ করা হয় ১৮৮৭-৮৯ খ্রিস্টাব্দে) এবং ১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় পরিদর্শক হিসেবে আগত কোম্পানীর আরেকজন এজেন্ট, ষ্ট্রেনশ্যাম মাস্টারের ডায়েরী, (১৯১১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত) ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩৫০] যাহোক, আরো গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র হচ্ছে উইলিয়াম ফস্টার কর্তৃক কোম্পানীর সপ্তদশ শতাব্দীর ভারতীয় কুঠির সম্পাদিত এবং সংক্ষেপিত দলিল পত্র। যেগুলো ১৯০৯ এবং ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করা হয়।[৩৫১] ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকারের দলিল পত্র সংরক্ষণের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা, জি. ডব্লিউ, ফরেস্ট বাংলায় এবং মাদ্রাজে সংরক্ষিত দলির পত্রের আরেকটি ক্রমপঞ্জি সংগ্রহ করেন। এই দলিল পত্রগুলো ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ৩ (তিন) খন্ডে প্রকাশ করা হয়।[৩৫২]

এই সকল প্রকাশিত দলিল পত্র একটু সতর্কভাবে পাঠ করলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে শায়েস্তা খানের সম্পর্কের ব্যাপারে পূর্বের ধারণা অনিবার্যভাবে পাল্টে যাবে। বাস্তবিকপক্ষে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে লিখতে গিয়ে ব্রাডলি-বার্ট স্টুয়ার্ট কর্তৃক প্রচলিত ধারণা থেকে সরে আসার ইঙ্গিত দেন এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতি শায়েস্তা খানের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আরো অনুকূল মনোভাব ব্যক্ত

---

৩৪৬. ষ্টুয়ার্ট হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ১৯০৩, পৃঃ ৩৪৭-৪৮, এই বইটি ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে পৃথম প্রকাশ করা হয়েছিল।

৩৪৭. সি.আর উইলসন, আর্লি এনালস অব দি ইংলিস ইন বেঙ্গল, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলার পাবলিক কনসাল্টেশন, কলিকাতা, ১৮৯৫

৩৪৮. ডব্লিউ,ডব্লিউ, হান্টার, এ হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, লন্ডন, ১৮৯৯-১৯০০, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৩৭-৫৪।

৩৪৯. ইউল (Yule) এইচ. (সম্পাদিত) দ্যা ডায়রী অব উইলিয়াম হেজেস, ৩য় খন্ড, লন্ডন, ১৮৮৭-৮৯

৩৫০. টেম্পল, আর.সি.(সম্পাদিত) দ্যা ডায়রীজ অব স্ট্রেনহ্যাস মাস্টার, ২য় খন্ড, লন্ডন, ১৯১১

৩৫১. ইংলিশ ফ্যাক্টরীজ ইন ইন্ডিয়, ১৬১৮-১৬৬৯, ১৩ খন্ড অক্সফোর্ড, ১৯০৬-১৯২৮। এই সব দলিল পত্রেরই একটি নতুন ক্রমপঞ্জী, যাতে ১৬৭০ সাল থেকে ১৬৮৪ সাল সময়ের দলিল পত্র সন্নিবেশিত এবং তা চার্লস ফউসেট কর্তৃক সম্পাদিত এবং ১৯৩৬ থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

৩৫২. বেঙ্গল এবং মাদ্রাজ পেপারস ৩য় খন্ড, ইম্পোরিয়াল রেকর্ড বিভাগ, কলিকাতা, ১৯২৮

করেন।[৩৫৩] যদিও ব্রাডলি বার্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, নওয়াব অত্যাচর না করলেও তাঁর সরকারের অদক্ষতার জন্য কোম্পানী নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য হয়।[৩৫৪] পরবর্তী লেখকগণ ব্রাডলি বার্টের এই মত গ্রহণ করেননি। ১৯৪৮ সালে লিখতে গিয়ে প্রয়াত স্যার যদুনাথ সরকার স্টুয়ার্টের মতবাদের দিকেই ফিরে গেছেন এবং এমন কি, শায়েস্তা খানের বণিজ্যিক নীতি সম্পর্কে আরো খারাপ চিত্র অংকন করেছেন। নওয়াবের কথিত "লোভ" এবং "অর্থ গৃধনুতা" সম্পর্কে একটু বিস্তারিতভাবে সরকার মন্তব্য করেছেনঃ

"শুধুমাত্র জনগণকে শোষণ করেই এরূপ অমিতাচার চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। তার অধীনস্থদেরকে তাদের চিন্তা অনুযায়ী প্রতিটি পন্থা অবলম্বন করে তাঁর জন্য অর্থ সংগ্রহের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল। প্রতিটি ফাঁড়িতে এবং ফেরিতে পণ্য সামগ্রী থামানো হত এবং আবার সরকারী পারমিট থাকা সত্ত্বেও তা উপেক্ষা করে বার বার শুল্ক দাবী করা হত। রাজকীয় ফরমান দ্বারা কর (আবওয়াব) বাতিল করা হলেও বাস্তবে তা আদায় করা অব্যাহত ছিল। তদুপরি, নওয়াব কিছু কিছু অত্যাবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্য বিক্রির ক্ষেত্রে একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করতেন। যথা- লবন, পান এবং অন্যান্য দ্রব্য। এইভাবে জনগণকে শোষণ করে তিনি নিজে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন, তাছাড়া ঢাকায় অনেক ব্যয়বহুল ইমারত নির্মাণ করেছিলেন, যেগুলোর স্মৃতি আজো বিদ্যমান আছে। প্রকৃতপক্ষে, বাংলার প্রতি তাঁর একমাত্র আকর্ষণ ছিল এইরূপ একটি কোমল জনগোষ্টিকে সহজে শাসন এবং স্বর্ণ সঞ্চয় করার জন্য।"[৩৫৫] ষ্টুয়ার্টের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সরকার আরো বলেছেন, "নওয়াবের অত্যাচার এবং বলপূর্বক অর্থ আদায়ের কারণে ইংরেজদের ধৈর্যের সীমা শেষ হয়ে যায়। ফলে, তারা মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং সপ্তদশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই তারা কলিকাতা বন্দরের পত্তন এবং একে সুরক্ষিত করে গড়ে তোলে।"[৩৫৬]

এইভাবে সরকার নওয়াবের বিরুদ্ধে তিনটি নির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করেছেন–

১. প্রতিটি ফাঁড়ি এবং ফেরিতে পণ্যদ্রব্য থামানো হত এবং সরকারী পারমিট থাকা সত্ত্বেও তা উপেক্ষা করে বার বার শুল্ক আদায় করা হত;
২. রাজকীয় ফরমানের দ্বারা কর বিলোপ করা হলেও তা আদায় করা হত এবং

---

৩৫৩. ব্রাডলি-বার্ট, দ্যা রোমান্স অব এন ইস্টার্ণ ক্যাপিটাল, লন্ডন, ১৯০৬, পৃঃ ১৪৭-১৪৮
৩৫৪. ব্রাডলি-বার্ট, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬২-৬৬
৩৫৫. যদুনাথ সরকার (সম্পাদিত): এইচ.বি. ২য় খন্ড, ২য় মুদ্রণ, ঢাকা, ১৯৭২, পৃঃ ৩৭৪
৩৫৬. ঐ, পৃঃ ৩৮৪

৩. লবন, পান এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ক্ষেত্রেও একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করা হত ।

এইসব অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং স্পষ্টতই স্ব-বিরোধী। প্রথমটি সম্পর্কে বলতে হয় যে, কে সরকারী পারমিট ইস্যু করেছিল- যা অমান্য করে বার বার শুল্ক আদায় করা হত? যদি শায়েস্তা খান বা তাঁর কর্মকর্তাগণ শুল্ক আদায় করার জন্য পণ্যদ্রব্য থামাতেন, তাহলে নিশ্চিতভাবে তারা নিজেরা কথিত পারমিট ইস্যু করেননি। কিন্তু তাদের ছাড়া বাংলায় অন্য কেহ অফিসিয়াল পারমিট ইস্যু করার অধিকারী বা কর্তৃত্বশীল ছিলেন না। "তাহলে কখনই বার বার শুল্ক আদায় করা হয়নি।" অনুরূপভাবে **দ্বিতীয়** অভিযোগটিরও কোন ভিত্তি নেই। রাজকীয় ফরমাণ দ্বারা বাতিল করা কোন করই (আবওয়াব) পুনরায় আরোপ করা হয়নি এবং এখনই দেখা যাবে যে, ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে কোন রাজকীয় ফরমান দ্বারাই কোম্পানীকে কোন অধিকার দেয়া হয়নি। **তৃতীয়** অভিযোগ যথা: লবন, পান এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে নওয়াবের একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করার অভিযোগটি একই রকম বানোয়াট। সে যাই হোক, এসবের ক্ষেত্রে কোন একচেটিয়া কারবারই কোম্পানীর ব্যবসায়ী স্বার্থকে ক্ষুন্ন করার কথা নয়; তার কারণ, প্রধান প্রধান বা খাস করে যে সকল পণ্য বাংলা থেকে সংগ্রহ করার জন্য কোম্পানী তার এজেন্টদেরকে নির্দেশ দিয়েছিল, তা হচ্ছে- সোরা, তাফাটি এবং মসলিন কাপড়।

প্রকৃতপক্ষে "অত্যাচার" এবং "বলপূর্বক অর্থ আদায়ের" অভিযোগ শায়েস্তা খানের আমলে বাংলার স্বীকৃত সমৃদ্ধির সাথেই শুধু সঙ্গতিহীন নয়, বরং তাঁর সময়ের বাংলায় কোম্পানীর বাণিজ্যের তর্কাতীত প্রসারের সাথেও সঙ্গতিহীন। যখন শায়েস্তা খান বাংলার সুবাদারী লাভ করেন, তখন বাংলায় কোম্পানীর বাণিজ্যের কোন উজ্জল সম্ভাবনা না দেখে তারা "সেখানকার কুঠিগুলি বন্ধ করে দেয়ার ও চিন্তা করেছিল।"[৩৫৭] তথাপি বাংলার কুঠিগুলো বন্ধ তো করাই হয়নি, মাত্র অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলায় কোম্পানীর বাণিজ্য উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসার লাভ করে। ১৬৬৮ সালে শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম জয়ের মাত্র ২ বৎসরের মধ্যে ভাটি বাংলায় জলদস্যুদের সম্পূর্ণ দমনের কারণে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ঢাকাতে শায়েস্তা খানের রাজধানীতেই একটি নূতন কুঠি স্থাপন করে। ইউরোপে বাংলার পন্য সামগ্রী বিক্রি, বিশেষ করে মসলিন বিক্রি এত বেশি লাভ জনক হয়ে

---

৩৫৭. ফস্টার, ডব্লিউ, সম্পাদিত, ইংলিস ফ্যাক্টরীজ ইন ইন্ডিয়া (এখন থেকে ই.এফ. আই বলে উল্লেখ করা হবে), ১৬৬৫-১৬৬৭, পৃঃ ১৩৫

উঠে যে, কোম্পানীর পুঁজি বিপুল পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়।[৩৫৮] বাংলায় কোম্পানীর বিনিয়োগ বৃদ্ধির দিকে এক নজর তাকালেই এই সময়ে বাংলায় কোম্পানীর ব্যবসা প্রসারের প্রমাণ পাওয়া যাবে। যেমন, ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় কোম্পানীর বিনিয়োগ ছিল £১০,০০০ এবং ১৬৭৪ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় £৮৫,০০০, ১৬৭৭ সালে £১,০০,০০০ এবং ১৬৮১ সালে £১,৫০,০০০।[৩৫৯] এই বাণিজ্য বৃদ্ধি কোম্পানীকে ১৬৮২ সালে বাংলার কুঠি সমূহকে মাদ্রাজ কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণ থেকে আলাদা করে দিতে উদ্বুদ্ধ করে এবং তাদেরকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ করে দেয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে কোম্পানী উইলিয়াম হেজেসকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে কোম্পানীর এজেন্ট এবং বঙ্গোপসাগর এলাকার জন্য গভর্ণর হিসেবে নিয়োগ দেয়। হেজেস ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি বাংলায় এসে পৌঁছেন। এই সময় কোম্পানী বাংলায় তার বিনিয়োগ £১,৫০,০০০ থেকে £২,৩০,০০০ এ উন্নীত করে। এই পরিমানের মধ্যে কাশিমবাজার কুঠির জন্য £১,৪০,০০০, পাটনার জন্য £১৪,৫০০, বালাশোরের জন্য £৩২,০০০, মালদহের জন্য £১৫,০০০, ঢাকার জন্য £১৬,৫০০ এবং হুগলীর জন্য £১২,০০০ বরাদ্দ দেয়ার জন্য হেজেসকে নির্দেশ দেয়া হয়।[৩৬০]

বাংলায় কোম্পানীর অব্যাহতভাবে বাণিজ্য বৃদ্ধির এই তথ্য নওয়াবের বিরুদ্ধে "অত্যাচার" ও "অর্থ গৃধ্নুতা" অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। অথচ এসব অভিযোগই বাংলায় কোম্পানীর দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিরা তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপন করেছেন এবং এসব বর্ণনার উপর ভিত্তি করেই সরকার এবং অন্যান্য লেখকগণ কোম্পানীর প্রতি শায়েস্তা খানের মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রচুর লিখেছেন। নিম্নের ঘটনাবলী থেকে এই ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে যে, কেন কুঠিয়ালগণ যা বলেছেন, তাকেই হুবহু গ্রহণ করা যাবে না।

শায়েস্তা খানের সুবাদারীর সময় ১৬৬৯, ১৬৭০, ১৬৭৭, ১৬৮২ এবং ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যথাক্রমে উইলিয়াম ব্লেক, শ্যেম ব্রীজেস, ওয়ালটার ক্যাভেল, ম্যাথিয়াস ভিনসেন্ট এবং উইলিয়াম হেজেস বাংলায় কোম্পানীর প্রধান ছিলেন। এই সকল লোক তাদের অধীনস্থদেরসহ সকলেই ব্যাপকভাবে তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে জড়িয়ে পড়েন। ফলে তাতে বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে শুধু

---

৩৫৮. ব্রাডলি-বার্ট, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫০

৩৫৯. ই.এফ.আই, ১০ম খন্ড, পৃঃ ২৭৫; জন ব্রুস, এনালস অব দ্যা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী (৩য় খন্ড, লন্ডন, ১৮১০) ২য় খন্ড, পৃঃ ২২৮-৩৬১

৩৬০. ব্রুস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৯২

মোগল সরকারের নিয়ম নীতিই নয়, কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসার অধিকার ও লঙ্ঘিত হয়।[৩৬১] এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই যে, তারা কোম্পানীর পুঁজিকে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করতেন এবং ব্যক্তিগত ঋণকে কোম্পানীর খাতে দেখিয়ে দিতেন। এইভাবে ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে ব্লেক তার নিজের ঋণ ৭০০০.০০ টাকা কোম্পানীর হিসেবে স্থানান্তর করে দেন এবং ৫০০০.০০ টাকা নওয়াবের কর্মকর্তাদেরকে উপঢৌকন দেয়ার কথা বলে অনিয়মিত খরচ দেখান, যা আসলে কাউকে আদৌ দেয়া হয়নি।[৩৬২] ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোগল কর্মকর্তাদেরকে উপঢৌকন দেয়ার কথা বলে হিসাবের খাতায় যে সকল মিথ্যা ও অনিয়মিত খরচ দেখানো হয়েছে, তার পরিমাণ হচ্ছে ১,৬৪,৬৮৬ টাকা।[৩৬৩] ১৬৬৭ থেকে ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় কোম্পানীর প্রধান ম্যাথিয়াস ভিনসেন্ট নিজেই কুখ্যাত 'স্বার্থান্বেষী' ও 'জলদস্যু' পিটের সহযোগী ছিলেন এবং পিট ভিন্সেন্টের ভ্রাতুস্পুত্রীকে বিয়ে করেছিলেন। এই কারণে কোম্পানীর পরিচালকগণ ভিন্সেন্টের উপর বিরক্ত ছিলেন এবং "স্বার্থান্বেষীদের মোকাবেলায় তার জঘন্য বিশ্বাস ঘাতকতার" ফলে ১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার কুঠিগুলোর জন্য যখন স্বাধীনভাবে কাজ করার বন্দোবস্ত করা হয়, তখন তার স্থলে উইলিয়াম হেজেসকে নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু হেজেসও একইভাবে ব্যক্তিগত ব্যবসার দিকে প্রলুব্ধ হন এবং মাত্র ২ বৎসর পরেই প্রকাশ্যভাবে স্বার্থান্বেষীদের কোম্পানীর কর্মচারী নয়, বরং কোম্পানীর বাহিরে স্বতন্ত্র ইংরেজ বনিকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। অতএব, এটা বোঝা এখন আর কষ্টকর নয় যে, কেন কোম্পানীর এজেন্টরা কোন স্বার্থে নওয়াব এবং তাঁর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে "অত্যাচার" এবং "বলপূর্বক অর্থ আদায়ের অতিরঞ্জিত" বিবরণ দিত। তবে কুঠির দলিল পত্র সতর্কভাবে পাঠ করলে সহজেই বুঝা যায় যে, কুঠিয়ালগণ প্রায় নওয়াব বা তাঁর কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে "অত্যাচার" এবং "বলপূর্বক অর্থ আদায়ের" যে সাধারণ অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, তার স্বপক্ষে কোন তথ্য প্রমাণ উল্লেখ বা কোন উপলক্ষ্যে কত টাকা এইভাবে দিয়েছে তাও উল্লেখ করেননি। অপর পক্ষে কুঠিয়ালগণ এই সময়ের মধ্যে একাধিকবার উল্লেখ করেছেন যে, নওয়াবকে দেয়া তাদের অর্থের পরিমাণ ছিল বাৎসরিক হারে ধার্যকৃত্ব একটি নির্ধারিত অংকের টাকা এবং তাও ছিল অন্যান্য বিদেশী

৩৬১ ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত ব্যবসার বিবরণের জন্য দেখুন বি.পি.পি.-তে স্যার রিচার্ড টেম্পলসের প্রবন্ধ, সপ্তদশ খন্ড পৃঃ ১২১-২২, এবং ইন্ডিয়ান এন্টি কোয়ারীতে মিস এন্সিটির প্রবন্ধ, ১৯০৫ এবং ১৯১৫

৩৬২ ই.এফ.আই. ১৬৬৫-১৬৬৭, পৃঃ ২৬২

৩৬৩ বেঙ্গল এন্ড মদ্রাজ পেপারস, ইম্পেরিয়াল রেকর্ড বিভাগ, কলিকাতা, ১৯২৮, ১ম খন্ড, পৃঃ ১-১২।

কোম্পানী, বিশেষ করে ওলন্দাজরা নিয়মিতভাবে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করত, তার থেকে অনেক কম।[৩৬৪]

অতএব, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে শায়েস্তা খানের সঠিক সম্পর্কের ব্যাপারে যথাযথ ধারণা লাভের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে কুঠিয়ালদের সাধারণ বিবরণ এবং তথ্য প্রমাণবিহীন অধিকাংশ প্রতিবেদনের উপর পুরোপুরি নির্ভর না করা, বরং উচিত এই সময়ে বাংলায় কোম্পানীর সামগ্রিক বাণিজ্যকে বিবেচনা করা এবং একই সঙ্গে তাদের অন্যান্য দলিল পত্র থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য আহরণ করা। এইরূপ অনুসন্ধানের জন্য শায়েস্তা খানের সুবাদারীকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথা- ১৬৬৪-১৬৬৯, ১৬৭০-১৬৭৭ এবং ১৬৭৯-১৬৮৮ এবং এখানে সে সময়ের প্রধান প্রধান বৈশিষ্টগুলো উল্লেখ করা হল। এর প্রথম মেয়াদটি শুরু হয় স্পষ্টতই শায়েস্তা খানের বাংলার সুবাদারী লাভ করার পর থেকে। নবাগত হিসেবে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে স্বাভাবিকভাবেই নওয়াবের কিছু সময়ের প্রয়োজন ছিল। অতএব, তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া শুধু এটাই ছিল যে, কোম্পানীর আগের থেকেই যেসব সুযোগ সুবিধা ভোগ করার কথা, তাই অব্যাহত রাখা।[৩৬৫]

তবে শায়েস্তা খানের সুবাদারীর প্রাথমিক বৎসরগুলোতে তাদের প্রকৃত সমস্যা ছিল ১৬৬৫-১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দের ইঙ্গো-ওলান্দাজ যুদ্ধ। নওয়াব তাঁর রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধরত জাতিগুলোকে কোন রকম শক্রুতায় লিপ্ত হওয়া থেকে কঠোরভাবে বিরত রাখেন।[৩৬৬] এতে অধিক শক্তিশালী ওলন্দাজদের নৌ-আক্রমণ থেকে বাংলার উপকূল অঞ্চলের ইংরেজদের কুঠিগুলো রেহাই পায়। যুদ্ধ চলাকালে কোম্পানীর বাণিজ্য পুরোপুরি বন্ধ ছিল। অপরদিকে চট্টগ্রাম জয় (১৬৬৬) এবং সেখানে মোগলদের কর্তৃত্ব সংহত করার জন্যই প্রধানতঃ নওয়াবের শক্তি ব্যয়িত হয়। অতএব, ১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দে ইঙ্গো-ওলন্দাজ যুদ্ধের অবসান এবং বাংলায় কোম্পানীর বাণিজ্যিক কার্যক্রম পুনরায় শুরু হলে সেদিকে নওয়াবের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ফলে কিছু আলাপ আলোচনার পর ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাদেরকে এক পরওয়ানা মঞ্জুর করেন। তাতে নওয়াবকে বৎসরে ৩০০০.০০ টাকা প্রদানের বিনিময়ে তাদের বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি দান করা হয়।[৩৬৭]

৩৬৪. দেখুন, বাংলা থেকে সুরাটে লিখিত পত্র, ২০শে অক্টোবর, ১৬৬৮, ই.এফ.আই. ১৬৬৮-৬৯, পৃঃ ১৬৭।

৩৬৫. হুগলী থেকে সুরাটে লেখা পত্র, ২১ শে জুন, ১৬৬৪, ই.এফ.আই. ১৬৬১-১৬৬৪, পৃঃ ৩৯৫

৩৬৬. বালাসোরে ব্লেকের লেখা পত্র, ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৬৬৫, ই.এফ. আই, ১৬৬৫-১৬৬৭, পৃঃ ১৪১

৩৬৭ হেগ থেকে অনূদিত, সিরিজ ১, উনিশতম খন্ড, সংখ্যা, ৭৫৪, ই.এফ.আই-তে উদ্ধৃত, ১৬৬৮-৬৯ পৃঃ ৩১৬, আরো দেখুন, উইলসন, "আর্লি এনালস " অব দ্যা ইংলিস ইন বেঙ্গল, ২য় খন্ড, প্রথম অংশ পৃঃ ১৮৪, ১৮৫ এবং ১৮৭

কোম্পানীর সঙ্গে নওয়াবের সম্পর্কের দ্বিতীয় মেয়াদ ছিল ১৬৭০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এবং এই সময় ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দের পরওয়ানা কার্যকরী করা হয়। আবার এই সময়ে বাংলায় ওলান্দাজদের প্রতিযোগিতা তীব্রতম আকার ধারণ করে। কিন্তু যে কারণে ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দের পরওয়ানা বাস্তবায়নে কিছুটা সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল, তা হচ্ছে কোম্পানী কর্তৃক বাংলায় ইংরেজদের পণ্য সামগ্রী আমদানী বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি।[৩৬৮] হুগলীর ফৌজদার মালিক কাশিমের[৩৬৯] ধারণা ছিল যে, ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দের পরওয়ানা পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; তাই কোম্পানীকে আমদানীর উপর শুল্ক দিতে হবে। এর ফলে মালিক কাশিম এবং ইংরেজ কুঠিয়ালদের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়।[৩৭০] বিষয়টি শেষ পর্যন্ত নওয়াবের নিকট পেশ করা হয়, তখন তিনি ১৬৭২ খ্রিস্টাব্দের আরেকটি পরোয়ানা দ্বারা কোম্পানীর পক্ষে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।[৩৭১] অবশ্য, ১৬৭২-১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আরেকটি ইঙ্গো-ওলন্দাজ যুদ্ধের কারণে তাদের বাণিজ্য আবারও বাধাগ্রস্থ হয়। এই সময়ে কুঠিয়ালদের তীব্র অর্থ সংকট দেখা দেয়।[৩৭২] এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কুঠিয়ালদের নিজেদের মধ্যকার তুমুল ঝগড়া-বিবাদ।[৩৭৩] এই অবস্থার প্রেক্ষিতে ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানী বাংলার কুঠিগুলি পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় সংস্কার করার জন্য প্রথমে মেজর পিউকল এবং পরে ষ্ট্রেনশ্যাম মাষ্টারকে প্রেরণ করেন। এই দ্বিতীয় মেয়াদের শেষের দিকে ইংরেজদের সকল পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য করার জন্য সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রেরিত আদেশে কিছুটা সমস্যা সৃষ্টি হয়।[৩৭৪] অবশ্য শায়েস্তা খান এই আদেশ কার্যকরী করেননি, বরং ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দের পরওয়ানা অনুযায়ীই কোম্পানীকে বাণিজ্য করার অনুমতি দান করেন।[৩৭৫] ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে সম্রাট কর্তৃক তাকে বাংলা থেকে দরবারে ডেকে নেয়া হয়।

তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে শায়েস্তা খানের সুবাদারীর দ্বিতীয় মেয়াদ, ১৬৭৯ থেকে ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই পর্যায়ে কোম্পানীর সঙ্গে নওয়াবের সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে অবনতির দিকে যেতে থাকে। এর পিছনে ছিল দুটি বড় কারণ।

---

৩৬৮ হুগলীর কুঠিয়ালদের নিকট কোম্পানীর পত্র, ২৪ শে জানুয়ারী, ১৬৬৮, ই.এফ.আই., ১৬৬৮-৬৯ পৃষ্ঠা ১৭০

৩৬৯ মালিক কাশিম ছিলেন আসলে ফৌজদার। কিন্তু ইংরেজদের নথিপত্রে তাকে সর্বদাই গবর্ণর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে

৩৭০ - দেখুন হলের নিকট ব্রিজের পত্র, ৭ই মে, ১৬৬৯, ই.এফ.আই.. পৃঃ ২৯৭ এবং ক্লাভেলের নিকট বাগনালের পত্র, ৯ই জানুয়ারী, ১৬৭২, ফ্যাক্টরীর নথিপত্র, হুগলী, ৭ম খন্ড, পৃঃ ২৪-২৯

৩৭১ ফ্যাক্টরী নথিপত্র, হুগলী, ৭ম খন্ড, পৃঃ ৭৪ আরো দেখুন, ই.এফ.আই., ১৬৭০ থেকে ৭৭, পৃঃ ৩৪৯-৫০ ষ্ট্রেনশ্যাম মাষ্টারের ডায়েরী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ২২-২৪

৩৭২ ই.এফ.আই., ১৬৭০-৭৭, পৃঃ ৪৭৫

৩৭৩ ই.এফ.আই., পৃঃ ৩৩৩, ৩৭০-৭২

৩৭৪. ই.এফ.আই., ১৬৭০-১৬৭৭, পৃঃ ৪০৯-৪১০

৩৭৫. ই.এফ.আই., ১৬৭০-১৬৭৭, পৃঃ ৪১৭

প্রথমত, মনে হয়, নওয়াব কোম্পানীর প্রতি একটি পরিবর্তিত মনোভাব নিয়ে বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন। কারণ, সম্ভবত এই যে, তিনি সম্রাটের দরবার থেকে জেনে এসেছেন যে, ইংরেজরা শুল্ক-মুক্ত বাণিজ্য করার যে সুবিধা দাবী করে আসছে, তা ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দের ফরমানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং পরবর্তী সকল মঞ্জুরীও এই ফরমানের উপর ভিত্তি করেই দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই সময়ে সুযোগ সন্ধানী বহু সংখ্যক ইংরেজ স্বতন্ত্র-বণিক বাংলায় আসে। তারা স্বাভাবিক শুল্ক দিতেও প্রস্তুত ছিল। নওয়াব স্বাভাবিকভাবেই এক জাতিভুক্ত দুটি বণিক শ্রেণির মধ্যে বৈষম্য করা যুক্তিযুক্ত মনে করেননি। যাহোক, ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানী সম্রাটের নিকট থেকে একটি ফরমান লাভে সক্ষম হয়। এই ফরমান দ্বারা ইংরেজদের সকল পণ্যের উপর ৩.৫% শুল্ক নির্ধারণ করে দেয়া হয়। কিন্তু, ইংরেজরা অযৌক্তিকভাবে দাবী করতে থাকে যে, এই হার বাংলায় প্রযোজ্য নয়।[৩৭৬] ইংরেজদের পণ্যের উপর শুল্ক ধার্যের জন্য নওয়াবের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং ন্যায়-সঙ্গত হলেও এতে ইংরেজরা দারুনভাবে ক্ষুব্ধ হয়। এটাই কিন্তু তাদের উপর নওয়াবের সে তথাকথিত "অত্যাচার" নয়, যে জন্য ১৬৮৬-৮৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাঁর ও কোম্পানীর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে ইংরেজরা এই সময় একটি "অগ্রবর্তী নীতি" অনুসরণ করতে থাকে।[৩৭৭] ওলন্দাজদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ থেকে কোম্পানী উপলব্ধি করে যে, ওলন্দাজদের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ায় প্রতিযোগিতায় পেরে উঠা দূরাশা মাত্র। কারণ ঐদিকে ১৬৮২সালে শান্তির সময়ও ওলন্দাজরা ইংরেজদেরকে তাদের বান্টাম কুঠি থেকে বহিস্কার করে দেয়। তারপর থেকেই ইংরেজরা দক্ষিণ এশিয়ার এই উপমহাদেশের দিকে তাদের সমস্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ ও শক্তি প্রয়োগ করে। এই সময় থেকে তারা যে কোন উপায়ে এই এলাকার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়। ভারতীয় জলসীমায় ইংরেজ সুযোগ সন্ধানীদের উপস্থিতি শুধু মাত্র কোম্পানীর নিজস্ব শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই প্রতিহত করা সম্ভব ছিল। এ দিক থেকে তাদের জন্য একটি আগ্রাসী নীতি গ্রহণ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। মারাঠাদের লুন্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞ এই অনুভূতিকে আরো তীব্র করে তোলে। কারণ, শিবাজীর নেতৃত্বে তারা ১৬৬৪, ১৬৭০ এবং ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে তিনবার সুরাটের ইংরেজ কুঠির জন্য হুমকি সৃষ্টি করে। এসব ঘটনাবলীর সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে

---

৩৭৬. ষ্টুয়ার্ট, পূর্বোক্ত, পরিশিষ্ট, ৪ঃ আরো দেখুন, হেজেসের ডায়েরী, প্রথম খন্ড, পৃঃ ৩৩-৬২, ৯১-১০১, ই.এফ.আই., ১৬৭৮-৮৪ পৃঃ ২৯৪

৩৭৭. জি.এন.ক্লার্ক, দ্যা লেটার ষ্টুয়ার্টস্ , অক্সফোর্ড, ১৯৪৯, পৃঃ ৩৩৬-৩৭

কোম্পানী এই সময় থেকে তাদের কুঠিসমূহের নিরাপত্তা বিধানের জন্য আর মোগল সরকারের অনুগ্রহের উপর নির্ভর না করে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য কৃতসংকল্প হয়। এই মনোভাব ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানীকে দেয়া চার্টারে প্রতিফলিত হয়। এই চার্টার কোম্পানীকে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ভারতীয় শাসকদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন, যুদ্ধ ঘোষণা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষমতা প্রদান করে।[৩৭৮] ১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় জেমসের দেয়া চার্টার ছিল আরো ব্যাপক। কোম্পানীর পরিচালকদের মতে এই চার্টার অনুযায়ী কোম্পানীর "অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় ভারতে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের মত।"[৩৭৯] এই মনোভাবই ১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানীকে মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে প্ররোচিত করে। কোম্পানীর পরিচালকবৃন্দ ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দের এক পত্রে কোম্পানীর সুরাটের এজেন্টকে যা লিখে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, তা প্রায়ই উদ্ধৃত করা হয়। তারা লিখেছিলেন– "এমন একটি বেসামরিক প্রশাসন চালু এবং সামরিক ক্ষমতা অর্জন করতে হবে, এত বিরাট এক রাজস্ব ব্যবস্থা প্রচলন এবং রাজস্ব সংগ্রহ করতে হবে, যেন ভারতে একটি বিশাল নিশ্চিত ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, যা হবে সুদৃঢ় এবং অনন্তকাল পর্যন্ত স্থায়ী।"

অতএব, সময় এসেছে ইংরেজদের উপর নওয়াবের কথিত "অত্যাচারকে" কোম্পানী কর্তৃক ১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দে মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কারণ বলে ব্যাখ্যা দেয়ার মতবাদকে বর্জন করার। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে শায়েস্তা খানের সম্পর্কের নির্ভুল মূল্যায়ন শুধু মাত্র উপরে বর্ণিত ৩টি পর্যায়ে বাংলায় কোম্পানীর বাণিজ্যের বিস্তারিত বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সম্ভব।

(খ) প্রথম পর্যায়, ১৬৬৪ থেকে ১৬৬৯ সাল

পূর্বেই উল্লেখ করা[৩৮০] হয়েছে যে, শায়েস্তা খান যখন বাংলার সুবাদারী লাভ করেন, তখন ইংরেজ বণিকরা ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দের সম্রাট শাহ জাহানের ফরমানকে অপব্যাখ্যা করে নিজেদের জন্য একটি সন্দেহজনক অবস্থান সৃষ্টি করেছিল। এটাও দেখানো হয়েছে যে, বিষয়টি সম্পর্কে তারা নিজেরাও অবগত ছিল। তাই তারা প্রতি বৎসর সুবাদার শাহ শুজা, তাঁর উত্তরাধিকারী মীর জুমলাকে বৎসরে ৩০০০.০০ টাকা উপঢৌকন দেয়া অব্যাহত রেখেছিল এবং সমস্যা সৃষ্টিকারী যে

৩৭৮. হান্টার, পূর্বোক্ত, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৮৫, ২৮৮
৩৭৯. হান্টার, পূর্বোক্ত, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩০৪
৩৮০. পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা নং ৬৩-৬৫

কোন স্থানীয় অফিসারকে ঘুষ দিয়ে তার মুখ চাপা দিয়ে রাখতো।[৩৮১] এরূপ করার পিছনে তাদের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, কালক্রমে তারা তাদের শুল্ক-মুক্ত বাণিজ্যের দাবীকে ১৬৫০ সালের ফরমান বা ১৬৫১ সালের শুজার নিশানের উপর ভিত্তি না করে বরং প্রচলিত প্রথা এবং তাদের ভোগকৃত সুবিধার উপর ভিত্তি করবে। কারণ তারাও জানতো যে, ১৬৫০ সালের ফরমানে তাদেরকে শুল্ক মুক্ত বাণিজ্যের সুবিধা দেয়া হয়নি এবং ১৬৫১ সালের নিশান স্বীকৃতভাবেই অপব্যাখ্যা এবং কৌশল প্রয়োগে আদায় করা হয়েছিল। বাস্তবিকই, অল্পদিন পরেই তারা এই দাবীর উপর জোর দিতে শুরু করে যে, তারা চায় "প্রচলিত প্রথাগত সুবিধাদি"।[৩৮২]

যখন শায়েস্তা খান বাংলার সুবাদার হয়ে আসেন, তখন মনে হয় যে, কোম্পানীর কুঠিয়ালরা এই বলে নিজদেরকে আশ্বস্ত করত যে, তাদের শুল্ক-মুক্ত বাণিজ্যিক সুবিধার দাবিটি এক দশক যাবৎ চালু থাকায় তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। অতএব, এখন আর নওয়াবকে বৎসরে ৩০০০.০০ টাকা পরিশোধ করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। নতুন নওয়াব ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চের প্রথম দিকে বাংলায় এসে পৌঁছেন। বাংলায় কোম্পানীর প্রধান উইলিয়াম ব্লেক, তৎক্ষণাৎ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত এবং হুগলীর গবর্ণর (ফৌজদার) কে ভবিষ্যতে ৩০০০.০০ টাকা দাবী না করার জন্য তাঁর থেকে একটি আদেশ সংগ্রহ এবং তাঁর পূর্বসূরীরা যেমন তাঁদেরকে শুল্ক-মুক্ত বাণিজ্য সুবিধা দিয়েছেন, তেমনি তাঁর নিকট থেকে একটি সাধারণ পরওয়ানা সংগ্রহের জন্য দ্রুত রাজমহলে চলে যান।"[৩৮৩] স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, শায়েস্তা খান কিছুটা ত্বরা করেছিলেন এবং মনে হয় তিনি সাময়িকভাবে কোম্পানীকে সে সব সুযোগ সুবিধা ভোগ করার অনুমতি দিয়ে থাকবেন, যে সব সুযোগ সুবিধা তার পূর্ববর্তী নওয়াবগণ দিয়েছিলেন।[৩৮৪] এটা ছিল একটি সাধারণ আদেশ এবং এর দ্বারা কোনভাবেই কোম্পানীর আইনগত অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। তবে শীঘ্রই নওয়াব পরিস্থিতি উপলব্ধি এবং দেশের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করার মত সুযোগ পেয়ে যান। তিনি কোম্পানীর পণ্যের উপর স্বাভাবিক শুল্ক আরোপ করার সিদ্ধান্ত নেন (আসলে ১৬৫০ সালের ফরমানের উদ্দেশ্যও ছিল তাই)। এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে যুগপতভাবে বিপুল পরিমাণ সোরা (বারুদ তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হয়) সংগ্রহের জন্য রাজকীয়

---

৩৮১. আরো দেখুন মাষ্টারের ডায়রী, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৯১

৩৮২. ই.এফ.আই., ১৬৭০ থেকে ১৬৭৭, পৃঃ ৪১৬

৩৮৩. ই.এফ.আই., ১৬৬১-১৬৬৪, পৃঃ ৩৯৪

৩৮৪. সুরাটে লেখা হুগলীর পত্র, ২১শে জুন, ১৬৬৪, ঐ, পৃঃ ৩৯৫

চাহিদা ঘোষিত হয়। তদানুযায়ী ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে শায়েস্তা খান রাজকীয় চাহিদা পূরণের জন্য (২০,০০০ মন) সোরা কেনার পূর্বে ওলন্দাজ ও ইংরেজদের ক্রয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে সোরা তৈরীর প্রধান কেন্দ্র পাটনায় তাঁর দারোগা প্রেরণ করেন।[৩৮৫] তাঁর এই পদক্ষেপটি ইংরেজসহ বিদেশী বণিকদের নিকট ছিল অপছন্দনীয়। যেহেতু তারা সোরা তৈরীকারকদেরকে অগ্রিম প্রদান করতেন এবং এইভাবে অত্যন্ত কম দামে সোরা সংগ্রহ করতেন।[৩৮৬] কোম্পানীর পাটনার কুঠিয়াল জব-চার্ণক নওয়াবের আদেশের ভুল ব্যাখ্যা করে অভিযোগ তোলেন যে, "তাঁর (নওয়াবের) আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে সোরা ব্যবসার পুরোটাই তাঁর হাতে নেয়া, তারপর তাঁর নির্ধারিত দরে তিনি আমাদের (ইংরেজদের) এবং ওলন্দাজদের নিকট বিক্রি করবেন, যেহেতু তিনি জানেন যে, বোম্বে থেকে কোন খালি জাহাজ ছেড়ে যাবে না।"[৩৮৭] এটা অবশ্য জানা যায়নি যে, সম্রাটের জন্য চাহিদানুযায়ী ২০,০০০ মন সোরা কেনা হয়েছিল কিনা? তবে নওয়াবের বিরুদ্ধে চার্ণকের অভিযোগ ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেননা নওয়াব কখনো সোরার একচেটিয়া ব্যবসায় জড়িত হননি, এমন কি এই ব্যবসায়ে বিদেশীদের বিনিয়োগও কখনো সাধারণভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, চার্ণক নিজেই এই বলে তার আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন যে, তাকে প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করা হলে তিনি বৎসরে ২৫০০০ থেকে ৩০০০০ মণ সোরা সংগ্রহ করতে সক্ষম, "অথচ এ পর্যন্ত ক্রয় সীমা ছিল মাত্র ১৮০০০ মন।"[৩৮৮] পরবর্তী সময়ের একটি পত্র থেকে জানা যায় যে, সে বৎসরই তিনি জাহাজে প্রেরণের জন্য বাংলা থেকে প্রচুর পরিমাণ সোরা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৩৮৯] তবে শায়েস্তা খান যা করেছিলেন, তা হচ্ছে, এই প্রেরিত মালের উপর স্বাভাবিক শুল্ক ধার্য করে মাত্র ২৬০০.০০ টাকা আদায় করেছিলেন।[৩৯০] এই পরিমাণটি ছিল ইংরেজদের কর্তৃক তাঁর পূর্বসুরীদেরকে দেয়া বৎসরে ৩০০০.০০ টাকা থেকেও স্পষ্টতই কম।

নিয়মিত শুল্ক আদায়ের সম্ভাবনায় ইংরেজ কুঠিয়ালরা এত বেশি বিরক্ত হয় যে, তারা এই একটি মাত্র বিষয়কে বার বার নওয়াবের পক্ষ হতে "অন্যায়" ব্যবহার পাওয়ার কথা উল্লেখ করতে থাকে। এর সঙ্গে আরেকটি বিরক্তির কারণ সৃষ্টি হয়, যখন কাশিম বাজারের গভর্ণর সেখানকার কুঠিয়ালদের নিকট হতে

---

৩৮৫. ই.এফ.আই., ১৬৬১-৬৪, পৃঃ ৩৯৫
৩৮৬. ই.এফ.আই., ১৬৬১-৬৪, পৃঃ ৩৯৫
৩৮৭. ঐ, উপরে উল্লেখিত চিঠির সঙ্গে চার্ণকের এই মন্তব্যও যোগ করা আছে। পৃঃ ৩৯৫-৯৬
৩৮৮. ই.এফ.আই., পৃঃ ৩৯৬
৩৮৯. ই.এফ.আই., পৃঃ ৩৯৭
৩৯০. বাংলা থেকে সুরাটে প্রেরিত পত্র, ৪ঠা অক্টোবর., ঐ, পৃঃ ৩৯৯

পরলোকগত নওয়াব মীর জুমলার নিকট থেকে নেয়া ঋণের ৫৬৭২.০০ টাকা আদায় করে।[৩৯১] বাংলায় কোম্পানীর বাণিজ্যিক কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য গৃহীত এইসব পদক্ষেপ হতে ইংরেজ কুঠিয়ালরা উপলব্ধি করে যে, শুল্ক-মুক্তভাবে বাণিজ্য করার জন্য তারা যে আশা করছিল, তা বৃথা এবং ভিত্তিহীন। এই উপলব্ধি তাদের মধ্যে দুটি মনোভাব সৃষ্টি করে। একদিকে তারা সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট হতে একটি নতুন ফরমান লাভে আগ্রহী হয়ে উঠে।[৩৯২] উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এরূপ ফরমান তাদের আরো অনেক আগেই অর্থাৎ আওরঙ্গজেবের সিংহাসনারোহণের পর পরই (১৬৫৮) নেয় উচিত ছিল। কারণ এই সকল রাজকীয় মঞ্জুরীর বৈশিষ্ট্যই ছিল এই যে, এইগুলো একজনের জীবনকাল পর্যন্ত স্থায়ী, অর্থাৎ এইগুলো যে জারী করে তার শাসনকাল পর্যন্তই কার্যকরী থাকে এবং একজন নূতন শাসক ক্ষমতারোহন করলে, তা পুনরায় নবায়ন করা প্রয়োজন হতো।[৩৯৩] অপরদিকে, প্রত্যাখ্যাত হয়ে যাওয়ার মত অসঙ্গত ভাবনা থেকে তারা শক্তি প্রয়োগের বিষয়ও চিন্ত করে। তাই, কুঠিয়ালগণ ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারীর এক পত্রে বার বার নওয়াবের "অন্যায়" ব্যবহার এবং "জোর পূর্বক অর্থ আদায়" (যদিও তারা কোন নিদিষ্ট দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেনি) সম্পর্কে অভিযোগ করে কোম্পানীর নিকট লিখে যে, "মহাত্মনদের একটি বিষয় অবশ্য বিবেচনায় নিতে হবে যে, এই সকল লোক এখন আগের থেকে বেশি শক্তিশালী এবং তারা আমাদের প্রতি আর ততটা বশ্য হবে না, যতটা আগে ছিল, যদি না তাদেরকে একটু মার দেয়া হয়, যেন তারা বুঝতে পারে যে, যদি তারা আমাদেরকে স্থলে বাধা দেয়, তাহলে সমুদ্রে তাদের থেকে প্রতিশোধ নেয়ার মত ক্ষমতা আমাদের আছে।"[৩৯৪]

শক্তি প্রয়োগের জন্য এই সুপারিশে কোম্পানীর পরিচালকদের উপর কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তা অবশ্য জানা যায়নি। এই প্রস্তাব ছিল অযাচিত এবং ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার ভুল ধারণা থেকেই এই মনোভাব জন্ম নিয়েছিল। বাংলায় কোম্পানীর বাণিজ্যের ব্যাপারে যে কোন অসঙ্গত বা অবৈধ হস্তক্ষেপ করা হয়নি, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে পাটনায় তাদের সোরার ব্যবসায়ে

---

৩৯১. ই.এফ.আই. ১৬৬১-১৬৬৪. পৃঃ ৩৯৭

৩৯২. ই.এফ.আই. ১৬৬১-১৬৬৪. পৃঃ ৩৯৩-৩৯৬

৩৯৩. রাজকীয় ফরমানকে একটি বাণিজ্যিক চুক্তি বলে গণ্য করা যায় না; তাই সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এটি অকার্যকরও হয় না। (দেখুন হান্টার: এ হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া, লন্ডন, ১৯০০, ২য় খন্ড, পৃঃ ৫১. টীকা-১)। ফরমানের বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, একজনের জীবনকাল পর্যন্ত কার্যকরী, তা যে কুঠিয়ালগণ অবহিত ছিলেন, তা তাদের পরবর্তী পত্র যোগাযোগ থেকে বুঝা যায়। দেখুন ই.এফ.আই. , ১৬৬১-৬৪. পৃঃ ১৭৮

৩৯৪. কোম্পানীর নিকট মদ্রাজের পত্র, ১২ই জানুয়ারী. ১৬৬৫. ই.এফ.আই. ১৬৬১-৬৪. পৃঃ ৪০১

বিনিয়োগ বৃদ্ধির দ্বারা।[৩৯৫] বাংলার কুঠিয়ালগণ লিখেছেন, "এখন যদি আমাদের অর্থ থাকত, তাহলে সহজেই বৎসরে ১০০০ টন সংগ্রহ করা যেত।"[৩৯৬] অনুরূপভাবে, কাশিম বাজারের তাফাতীর (কাপড়) মানও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেখানে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি বাংলার কুঠিয়ালগণ ইংল্যান্ড থেকে জাহাজ এসে পৌঁছার আশা করছিলেন। গত বৎসর শায়েস্তা খান কর্তৃক শুল্ক আদায়ের কথা স্মরণ করে তারা পূর্বেই তাকে সন্তুষ্ট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাই জুন মাসে বেঙ্গল কাউন্সিলের প্রধান ব্লেক এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি এলউইস, দুই হাজার টাকার চেয়েও কিছু বেশি মূল্যের উপঢৌকন সংগ্রহ করেন এবং তা ঢাকায় নওয়াবের নিকট প্রেরণ করেন।[৩৯৭] বলা হয়েছে যে, উপঢৌকন পেয়ে নওয়াব অত্যন্ত খুশী হন এবং কোম্পানীকে আশ্বাস দেন যে, তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার মধ্যে কোথাও তাদেরকে হয়রানী করা হবে না। তিনি তাঁর সকল গবর্ণরদের নির্দেশ দেন যেন, ইংরেজদের নিজস্ব বা ভাড়া করা কোন নৌযানকেই শুল্কের জন্য যাতায়াতের পথে বাধা সৃষ্টি করা না হয়।[৩৯৮] অতএব, ১৭ই আগস্ট যখন দ্যা গ্রে হাউণ্ড এবং দ্যা এ্যামেরিকান নামক জাহাজ দুটি বালাশোরে পৌঁছে, তখন বাংলার কুঠিয়ালগণ আনন্দের সঙ্গে পরিচালকদেরকে জানান যে, "জাহাজ দুটি পূর্ণভাবে বোঝাই করার জন্য তাদের হাতে এখনই প্রচুর পরিমাণ সোরা মজুদ রয়েছে।" তারা অত্যন্ত আত্মতুষ্টির সঙ্গে তাদের মনিবদেরকে আরো জানান যে, এই বৎসর তাদের পণ্য সামগ্রী খালাস করার জন্য দুই হাজার টাকার চেয়ে সামান্য কিছু বেশি ব্যয় হয়েছে। অথচ, গত বৎসর এজন্য তাদের ব্যয় হয়েছিল প্রায় তিন হাজার টাকা।"[৩৯৯] অতএব দেখা যাচ্ছে যে, যদিও তারা অস্পষ্টভাবে পুনঃ পুনঃ নওয়াবের "অত্যাচার" এবং "বল পূর্বক অর্থ আদায়ের" কথা বলেছেন; কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দের প্রচলিত ও স্বাভাবিক শুল্কের চেয়ে অতিরিক্ত কিছুই দেননি, আর প্রদত্ত পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ৩০০০.০০ টাকা (২৬০০ টাকা) এবং ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে দুই হাজার টাকার চেয়ে একটু বেশি মূল্যের উপঢৌকন দিয়ে তারা উভয় বৎসরেই পণ্য খালাস করে নেন। এ থেকে আরো দেখা যায় যে, তারা পূর্ববর্তী নওয়াবদের যে বাৎসরিক ৩০০০.০০ টাকার

---

৩৯৫. মাদ্রাজের নিকট বাংলার পত্র, ২৪ শে এপ্রিল, ১৬৬৫, ই.এফ.আই. ১৬৬৫-১৬৬৭, পৃঃ ১৩৪

৩৯৬. বাংলা থেকে কোম্পানীর নিকট পত্র, ১লা সেপ্টেম্বর , ১৬৬৫, ঐ. পৃঃ ১৩৯

৩৯৭ বাংলা থেকে কোম্পানীকে লেখা পত্র, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৬৬৫, ঐ, পৃঃ ১৩৮-৪০

৩৯৮ ঐ, পৃঃ ১৪০

৩৯৯ বাংলা থেকে কোম্পানীর লেখা পত্র, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৬৬৫, ঐ, পৃঃ ১৩৮

উপঢৌকন দিতেন, শায়েস্তা খান ক্ষমতা গ্রহণ করার পর তারা তাও বন্ধ করে দেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্যাপারটি এই ছিল না যে, শায়েস্তা খান কোম্পানীর কুঠিয়ালদের নিকট হতে বলপূর্বক অতিরিক্ত অর্থ আদায় করেছেন। বরং যে ব্যাপারটি তাদের মধ্যে অত্যধিক বিরক্তি সৃষ্টি করে, তা হচ্ছে এই যে, এখন থেকে তাদের সামনে নিয়মিতভাবে শুল্ক দেয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল এবং এই জন্যই তারা তাদের মনিবদের নিকট লিখিত সকল পত্রে নওয়াবের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে লিখেছেন।

তবে কুঠিয়ালদের জন্য সত্যিকার সমস্যা সৃষ্টি হয় ওলন্দাজদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বেধে যাওয়ায় (৪ঠা মার্চ, ১৬৬৫)। জাহাজগুলো বাংলা থেকে ছেড়ে যাওয়ার পূর্বেই অবশ্য ওলন্দাজদের তিনটি যুদ্ধ জাহাজ দাক্ষিণাত্যের পূর্ব উপকূলে মসলিপট্টমের নিকট এসে উপস্থিত হয় এবং ইংরেজদের একটি পোত আটক করে। মসলিপট্টমের কুঠিয়ালগণ এই ঘটনাটি সম্পর্কে অনতিবিলম্বে বাংলার কুঠিয়ালদেরকে জানিয়ে দেন এবং তাদেরকে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য পরামর্শ দেন, কেননা শীঘ্রই ওলন্দাজদের জাহাজগুলো বাংলার জলসীমায় প্রবেশ করার সম্ভবনা রয়েছে।[৪০০] উইলিয়াম ব্লেক অবিলম্বে হুগলীর গবর্ণর (ফৌজদার) মীর্যা মালিক বেগের সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং ওলন্দাজদের পক্ষ হতে আশংকাজনক শত্রুতামূলক আচরণ থেকে তার নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। একটি প্রকাশ্য সভায় "সকল লোককে সাক্ষী রেখে" তিনি সম্রাট এবং শায়েস্তা খানের পক্ষ হতে প্রতিশ্রুতি দেন যে, পর্তুগীজরা যদি শায়েস্তা খানের আঞ্চলিক এবং উপকূলীয় জল সীমার মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমে ইংরেজদের জান মালের কোন ক্ষতি সাধন করে, তাহলে তিনিই ইংরেজদেরকে সেজন্য ক্ষতিপূরণ দিবেন।[৪০১] গবর্ণর আবার ওলান্দাজ কুঠিয়ালদের নিকট থেকে এই মর্মে এক লিখিত অঙ্গীকারনামা আদায় করেন যে, তারা কোনরূপ যুদ্ধে জড়িত হবেন না এবং "তাদের দ্বারা ইংরেজদের কোন ক্ষতি হলে তারা তার দ্বিগুণ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিবেন।"[৪০২] মির্যা মালিক বেগ তাদেরকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখার জন্য তার গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে নওয়াবকে অবহিত করেন। এসব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে তিনি এত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বালাশোরে

৪০০ মসলিপট্টম থেকে বাংলায় লিখা পত্র, ১২ই আগস্ট, ১৬৬৫, ই.এফ.আই., পৃঃ ১৪০

৪০১ বালাশোরে লেখা ব্লেকের পত্র, ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৬৬৫, ই.এফ.আই., পৃঃ ১৪১। তবে মোগল সুবাদারের বর্ণিত উপকূলীয় জলসীমা দ্বারা ঠিক কি পরিমাণ এলাকা এই জলসীমার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তা অবশ্য জানা যায়নি।

৪০২ ঐ

লিখেছিলেন: "তিনি (মির্যা মালিক বেগ) এবং অন্য সকলেই ঘোষণা করেছেন যে, দেশের নিয়ম অনুযায়ী যদি ওলন্দাজরা উল্লেখিত বিষয়ে আমাদের কোন ক্ষতিসাধন করে, তাহলে রাজা আমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে বাধ্য থাকবেন।"[৪০৩] উপরোক্ত ব্যবস্থাপত্র সম্পর্কে জানার পূর্বেই বাংলার উপকূলে ওলন্দাজদের দ্বারা একটি মাত্র শত্রুতামূলক ঘটনা ঘটানো ছাড়া যুদ্ধ চলাকালীন সময়ব্যাপী তারা বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাদের প্রতিশ্রুতি মেনে চলেছিল এবং ইংরেজ কুঠিয়ালরা তাদের সোরা এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক পণ্য বালাশোর পর্যন্ত পৌঁছাতে মোটেই সমস্যার সম্মূখীন হননি।[৪০৪]

যদিও নওয়াবের রাজ্য এবং উপকূলীয় জল সীমার মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হওয়া থেকে ইংরেজ এবং ওলন্দাজদের বিরত রাখার জন্য কঠোর নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল, কিন্তু মহাসমুদ্রে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়ার বাধ্য-বাধকতা থেকে ওলন্দাজরা মুক্ত ছিল। অতএব, যুদ্ধ চলা অবস্থায় 'দ্যা গ্রেহাউন্ড এবং দ্যা এ্যামেরিকান' মহাসমুদ্রে[৪০৫] থাকা অবস্থায় ওলন্দাজদের দ্বারা ধৃত হওয়ার ভয়ে বালাসোর ত্যাগ করেনি। এমনকি কোম্পানী কর্তৃক ইতিপূর্বে ভারতে প্রেরিত হয়নি এরূপ একটি অতি ছোট জাহাজ[৪০৬] ব্যতীত আর কোন জাহাজও ইংল্যান্ড থেকে এসে পৌঁছেনি এবং এই জাহাজটি ইংল্যান্ড থেকে যাত্রা করে সরাসরি বাংলায় এসে পৌঁছে ১৬৬৬ সালের মে মাসে (মাদ্রাজ উপকূলে কোথাও ভিড়েনি)।[৪০৭] এই জাহাজটি এমন সব পণ্য দ্বারা ভর্তি ছিল, যা আগে থেকেই বালাসোরে ছিল। তাই অক্টোবরে জাহাজটি বাংলা ছেড়ে চলে যায়।[৪০৮] তাদের কোন জাহাজ এসে না পৌঁছায় তাদের অর্থের তীব্র ঘাটতি পড়ে। যদিও এই সময় কোম্পানীর ব্যবসা প্রায় সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েছিল। তবু পাটনার সোরা-ব্যবসায়ী এবং কাশিম বাজারে রেশম উৎপাদনকারীদেরকে অগ্রিম প্রদান করে ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখার জন্যও কুঠিয়ালদের অর্থের প্রয়োজন দেখা দেয়। বাস্তবে একজন ওলন্দাজ ব্যবসায়ীর নিকট থেকে কোম্পানীর উপর ২৫০০০.০০ টাকার

---

৪০৩ ঐ

৪০৪ দ্যা গ্রেহাউন্ড এবং দ্যা এ্যামেরিকানের কমান্ডারদের বিরুদ্ধে ব্রিজের প্রতিবেদন দেখুন, ১২ এবং ১৩ ই ডিসেম্বর, ১৬৬৫, ঐ, পৃঃ ১৪৫

৪০৫ ই.এফ.আই. ১৬৬৫-১৬৬৭, পৃঃ-১৪৬

৪০৬ এর ক্যাপাসিটি পরিবহন ক্ষমতা ছিল ৭৫ টন মাত্র

৪০৭ হুগলী থেকে সুরাটে লেখা পত্র, ২৬ সেপ্টেম্বও, ১৬৬৬, ই.এফ.আই., ১৬৬৫-১৬৬৭, পৃঃ ২৬৯

৪০৮ হুগলী থেকে সুরাটে লেখা পত্র, ২৬ শে সেপ্টেম্বর, ১৬৬৬, ই.এফ.আই., ১৬৬৫-১৬৬৭, পৃঃ ২৬৯। এই জাহাজটি ইংল্যান্ডে গিয়ে পৌঁছেনি। কারণ সিসিলির নিকট একজন ওলান্দাজ বেসরকারী জাহাজ হামলা কারী কর্তৃক জাহাটি ধৃত হয়েছিল।

হুন্ডি কেটে ঋণ নিয়ে কুঠিয়ালরা সেরা সোরা ব্যবসায়ীদেরকে পক্ষ ত্যাগ করে ওলান্দাজদের সঙ্গে যোগ দেয়া থেকে বিরত রাখতে সমর্থ হয়।[৪০৯] কুঠিয়ালদের কর্তৃক পণ্য সংগ্রহ এবং জাহাজে কোন পণ্য বোঝাই না করার কারণে ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে শায়েস্তা খানের পক্ষে শুল্ক আদায়ের কোন সুযোগ ছিল না। এমন কি কুঠিয়ালরাও এই সময়ে নওয়াবকে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান সম্পর্কেও কিছু উল্লেখ করেননি। যদিও তারা তাদের স্বভাবসুলভভাবে নওয়াবের বিরুদ্ধে কথিত "অর্থগৃধ্নুতা" "দুস্কৃতি" এবং অত্যাচারের কথা বলতেই থাকে। নওয়াবের বিরুদ্ধে তাদের এ ধরণের মনোভাব সত্যিই অত্যন্ত অদ্ভুত মনে হয়, যদিও ওলন্দাজদের হামলা থেকে ইংরেজদের কুঠিগুলোর নিরাপত্তা বিধানের জন্য তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। ইঙ্গো-ওলন্দাজ যুদ্ধের সময়ই শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম অধিকার ও জয় করার প্রতি সর্বাধিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ কাজে তিনি ওলান্দাজদের সহযোগিতা কামনা করেছিলেন। তিনি ইংরেজদের নিকট থেকে সাহায্য চেয়েছিলেন কিনা, তা পরিস্কার নয়। বাংলার কুঠিয়ালগণ দাক্ষিণাত্যে তাদের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের নিকট লিখেছিলেন যে, নওয়াবকে সাহায্য করলে বাংলায় তাদের নিজেদের ব্যবসাও সম্প্রসারিত হবে।[৪১০]

দক্ষিণ ভারতের কোম্পানীর এজেন্টগণ নওয়াবকে সাহায্য করার বিষয়ে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন। কারণ তাঁরা চিন্তা করেন যে, শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম জয় করলে আরাকানের সঙ্গে কোম্পানীর বাণিজ্যের উপর একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে এবং নওয়াবকে এইরূপ সামরিক সাহায্য করলে তার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় করতে হবে।[৪১১] অতএব, তারা বাংলার কুঠিয়ালদেরকে লিখেন যে, যদি তারা নওয়াবকে সাহায্য করাটা অত্যাবশ্যকই মনে করেন, তাহলে তারা এই শর্তে সাহায্য করতে পারেন যে, এই সামরিক অভিযানে সহায়তা করতে ইংরেজদের যে আর্থিক ব্যয় হবে, তা তিনি পরে পরিশোধ করে দিবেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে আরাকানীরা যদি ইংরেজদের পাওনা পরিশোধ করতে অস্বীকার করেন, তাহলে তাদের যে ক্ষতি হবে, তাও পূরণ করে দিতে হবে।[৪১২] তবে ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি ইঙ্গো-ওলন্দাজ যুদ্ধ শুরু হলে পুরো পরিস্থিতিই পাল্টে যায়।

---

৪০৯ বাংলা থেকে মসলিপট্টমে লেখা চিঠি ২০ শে এপ্রিল, ১৬৬৬, ই.এফ.আই., ১৬৬৫-১৬৬৭, পৃঃ ২৫৮

৪১০ মসলিপট্টম থেকে হুগলীতে লেখা পত্র, ৮ই অক্টোবর, ১৬৬৪, ঐ - পৃঃ ৩৯৯

৪১১ মসলিপট্টম থেকে হুগলীতে লিখা পত্র, ৮ই অক্টোবর, ১৬৬৪, ঐ পৃঃ ৩৯৯

৪১২ মসলিপট্টম থেকে হুগলীতে লিখা পত্র, ৮ই অক্টোবর, ১৬৬৪, ঐ পৃঃ ৩৯৯

নওয়াবের অভিযানে অংশ নেয়ার বিষয়ে ইংরেজরা প্রথম থেকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিল, এখন সে চিন্তা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করে। অপরদিকে ওলন্দাজরা নওয়াবকে সাহায্য করতে রাজী হয়[৪১৩] এবং আরাকান থেকে তাদের ব্যবসা এবং লোকজনকে নিয়ে আসে, "উল্লেখিত দেশটি জয় করার জন্য নওয়াবকে দেয়া সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি থেকেই তা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়।"[৪১৪] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত ওলান্দাজদের সাহায্যও শায়েস্তা খানের প্রয়োজন হয়নি।

চট্টগ্রাম জয়ের পরপরই নওয়াব আংশিকভাবে দক্ষিণ বাংলা থেকে জল দস্যুতা নির্মুল করা[৪১৫] এবং আংশিকভাবে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যকে আরো কার্যকরীভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বালাসোর এবং পিপলীকে তার (শায়েস্তা খানের) নিয়ন্ত্রণে দেয়ার জন্য তিনি সম্রাটকে রাজী করান।[৪১৬] কুঠিয়ালরা সন্দেহ করে যে, তাদের বাণিজ্যের বিরুদ্ধে আরো কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার জন্য এটা হচ্ছে প্রাথমিক পদক্ষেপ। সম্ভবত: ঐ সকল বন্দরে, বিশেষ করে ইংরেজদের বাণিজ্যের জন্য বৎসরে ৩০০০.০০ হাজার টাকার দাবী আদায় করার জন্যই এটা করা হচ্ছে।[৪১৭] তাদের আশংকা ছিল অমূলক, কারণ ঐ সকল বন্দরে বাণিজ্যিক কার্যক্রমের জন্য নওয়াব ইংরেজদের উপর কোন অতিরিক্ত কর আরোপ করেননি এবং কুঠিয়ালদের পরবর্তী যোগাযোগে এই বিষয়ে আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

নওয়াব এবং কুঠিয়ালদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির প্রকৃত কারণ অবশ্য ছিল তাদের ঢাকার এজেন্ট টমাস প্রাটের পলায়ন। মীর জুমলার সময় থেকেই এই লোকটি নওয়াবের দরবারে কোম্পানীর বিষয়াদি দেখাশোনা করত। চট্টগ্রাম জয়ের পরে মনে হয় যে, শায়েস্তা খান তাকে ৩০০ সৈন্যের মনসবদার হিসেবে রাজকীয় চাকুরীতে নিয়োগ দান করেন।[৪১৮] ১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দে তাকে ১০০০০.০০ টাকা দিয়ে সম্রাটের দরবারে যাওয়ার জন্য নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু হঠাৎ তিনি নওয়াবের পক্ষ ত্যাগ করেন এবং দুই বা তিন জন ইংরেজ এবং কয়েকজন পর্তুগীজকে নিয়ে পালিয়ে আরাকান রাজ্যের একটি সীমান্তবর্তী দূর্গে আশ্রয় নেন। যাওয়ার পথে তিনি নওয়াবের "কয়েকটি জাহাজ কাজে লাগান এবং আরো কিছু

৪১৩ বালাসোর থেকে মাদ্রাজে লিখা পত্র, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৬৬৫, ই.এফ.আই., ১৬৬৫-১৬৬৭, পৃঃ ১৪৪

৪১৪ বালাসোর থেকে মসলিপট্টমে লিখা পত্র, ১৯ শে জানুয়ারী, ১৬৬৬, ঐ, পৃঃ ২৫৮

৪১৫ পরবর্তী সময়ে শায়েস্তা খান ওলান্দাজদের সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করেন এবং বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে তাদের লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞের অবসান ঘটান

৪১৬ বাংলা থেকে মসলিপট্টমে লেখা পত্র, ২০ শে এপ্রিল, ১৬৬৬, ই.এফ.আই., ১৬৬৫-১৬৬৭, পৃঃ ২৫৮-৫৯

৪১৭ ঐ

৪১৮ বাংলা থেকে সুরাটে লিখিত পত্র, ২০ শে অক্টোবর, ১৬৬৮, ই.এফ.আই., ১৬৬৮-১৬৬৯, পৃঃ-১৬৭

অপকর্ম করেন এবং তার দু'টি জাহাজ নিয়ে চলে যান।"[৪১৯] হঠাৎ প্রাটের এই ডিগবাজী খাওয়ার কারণ দেখানো হয়েছে যে, তিনি কোন সূত্রে জানতে পারেন যে, নওয়াব তাকে আরাকানের শাসকের সঙ্গে গোপন যোগাযোগের দায়ে সন্দেহ করছেন এবং এই বিষয়টি সম্রাটকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।[৪২০] এটা জানা যায়নি যে, ব্যাপারটি আসলে এ রকম কিছু ছিল কিনা; তবে প্রাটের পরবর্তী আচরণ নওয়াবের কথিত সন্দেহকেই নিশ্চিত করেছিল। কারণ, প্রাট যে শাস্তির আশংকা করছিল, যদি তা এড়াতে চাইত, তাহলে সে সহজেই বাংলা ত্যাগ করে দক্ষিণ ভারতে ইংরেজদের যে কোন কুঠিতেই আশ্রয় নিতে পারত। সে তো শুধু তাই করেনি বরং পালিয়ে যাওয়ার পর আরাকানীদের এক বাহিনী নিয়ে এসে একটি সীমান্তবর্তী দূর্গ দখল করে, যা পূর্বে শায়েস্তা খানের অধিকারে ছিল।[৪২১] এরূপ একটি পদক্ষেপ দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনা এবং অনেক বিষয় বিবেচনা না করে নেয়া হয়নি। যাহোক প্রাটের আচরণে শায়েস্তা খান স্বাভাবিকভাবেই রাগান্বিত হন এবং অক্টোবরের মাঝামাঝি কুঠিয়ালদের নিকট লেখা কড়া এক চিঠিতে প্রাটকে ফিরিয়ে আনতে বলেন এবং একথা পালন না করলে সারা প্রদেশে তাদের বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দেন।[৪২২]

পত্রের উত্তরে কুঠিয়ালগণ জানান যে, প্রাট কোম্পানীর কোন চাকুরে নন, এমনকি "আমাদের কোন সুপারিশেও তাকে নিয়োগ দেয়া হয়নি" এবং তার জন্য যদি কেহ দায়ী থাকে, তাহলে অবশ্যই তার জামিনদারই দায়ী থাকবে।[৪২৩] এভাবে প্রাট সম্পর্কে তাদের দায়িত্ব অস্বীকার করে কুঠিয়ালরা রাজকীয় চাকুরীতে তার নিয়োগের উপরই স্পষ্টভাবে জোর দিচ্ছিলেন। এভাবে বিষয়টি উপেক্ষা করে তারা আসলে প্রাট যে ঠিক ঐ বিশেষ মুহূর্তে কোম্পানীর এজেন্ট না হলেও তিনি যে কোম্পানীর একজন এজেন্টের অবস্থানে ছিলেন অথবা অন্ততঃ আধা এজেন্ট, এই বিষয়টিই উপেক্ষা করেছিলেন। কারণ তার পলায়নের ঠিক পূর্বে ওলন্দাজরা ইংরেজ কোম্পানীর যে ক্ষতি করেছিল তার জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়ের লক্ষ্যে সে চেষ্টা করেছিল।[৪২৪] শায়েস্তা খান অবশ্য সম্পূর্ণ আত্মসংযম বজায় রেখে কাজ

৪১৯ বাংলা থেকে মাদ্রাজে লিখিত পত্র (ফক্সক্রাফ্‌ট) ২৩ শে ডিসেম্বর, ১৬৬৭, ই.এফ.আই., ১৬৬৫-৬৭, পৃঃ ৩৩০

৪২০ বাংলা থেকে সুরাটে লিখিত পত্র পূর্বোক্ত

৪২১ বাংলা থেকে মাদ্রাজে লেখা পত্র পূর্বোক্ত।

৪২২ ঐ

৪২৩ ঐ, ই.এফ.আই., ১৬৬৫-১৬৬৭ পৃঃ ৩৩০-৩১

৪২৪ ঐ, পৃঃ ৩৩০। গত ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে কুঠিয়ালরা তাদের মনিবকে লিখেছেন যে, প্র্যাটকে এজেন্ট হিসেবে ঢাকায় রাখা হয়েছে, কারণ "সেখানে তার থেকে উপযুক্ত আর কেউ নেই; যে, আমাদের অভিযোগসমূহ দরবারে তুলে ধরতে পারবে---।" (বাংলা থেকে মাদ্রাজে লেখা পত্র, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৬৬৫, ই.এফ.আই., ১৬৬৫-১৬৬৭ পৃঃ ৩৪০)

করেন। তিনি কুঠিয়ালদের উপর কোন প্রতিশোধ নেননি, বরং তার জামিনদার ২ জন মুসলমানের নিকট হতে ১২০০০.০০ টাকা আদায় করেন যে টাকা প্রাট এবং তার সহযোগীরা নওয়াবের নিকট থেকে নিয়েছিল।[৪২৫] সে বিশ্বাসঘাতক এবং পলাতক, তার সহযোগীরা শেষ পর্যন্ত কিছু সংখ্যক আরাকানীর হাতে নিহত হয়। "যারা তাদের আনুগত্যের ব্যাপারে সন্দিহান ছিল।"[৪২৬]

ইঙ্গো-ওলন্দাজ যুদ্ধের সমাপ্তির পরে (১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ব্রেডা চুক্তির মাধ্যমে) পুনরায় বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হওয়ায় শায়েস্তা খান ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে ইংরেজদের নিকট স্বাভাবিক শুল্কের জন্য তাঁর দাবী পুনরায় উত্থাপন করেন। অতএব, যখন "পাটনা থেকে সোরার একটি ক্ষুদ্র চালান" হুগলীতে প্রেরণ করা হয়, তখন ইংরেজদেরকে বলা হয় যে, ভবিষ্যতে তাদের পণ্যের জন্য শুল্ক দিতে হবে, যদি না তারা শায়েস্তা খানের নিকট থেকে একটি নতুন পরওয়ানা সংগ্রহ করতে পারেন।

তাঁর ক্ষমতা গ্রহণের সময়কালীন যে পরওয়ানা ছিল "এখন আর তার কোন মূল্য নেই"।[৪২৭] কুঠিয়ালরা চিন্তা করে যে, নওয়াবের এই সিদ্ধান্তের পিছনের কারণের মধ্যে আংশিক কারণ ছিল প্রাটের পলায়ন এবং আংশিক কারণ ছিল ওলন্দাজদের নিয়মিত শুল্ক পরিশোধ ছাড়াও নওয়াবকে প্রদত্ত বড় এবং মূল্যবান উপঢৌকন।[৪২৮] আসলে এই দাবীটি আদৌ নতুন কিছু ছিল না; কারণ শায়েস্তা খানের সুবাদারীর প্রথম এবং দ্বিতীয় বৎসরে তিনি ইংরেজদের নিকট থেকে শুল্ক কর দাবী এবং আদায় করেছেন। তবে ইঙ্গো-ওলন্দাজ যুদ্ধের সময় এই বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই স্থগিত ছিল। যেহেতু তখন ইংরেজদের বাণিজ্য বাস্তবে প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। যাহোক, ইংরেজ কুঠিয়ালরা আশাবাদী ছিলেন যে, শায়েস্তা খান হয়ত শেষ পর্যন্ত শুল্ক আদায়ের জন্য তাঁর এই সিদ্ধান্ত বলবৎ করবেন না। যেহেতু, "এর বিপরীতে তারা দীর্ঘ দিন যাবত সুবিধা ভোগ করে আসছে, যা শাহ শুজা কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে এবং তারপর থেকে কয়েকজন নবাবও তা অনুমোদন করেছেন---; তিনি এই সব বিষয় বিবেচনা করবেন।"[৪২৯] প্রকৃতপক্ষে, পুঁজির

---

৪২৫ বাংলা থেকে মাদ্রাজ লেখা পত্র, ২০ শে অক্টোবর, ১৬৬৮। ই.এফ.আই., ১৬৬৮-১৬৬৯, পৃঃ ১৬৭

৪২৬ ঐ, ম্যানুক্কীর মতে (২য় খন্ড, পৃঃ ১০২-১০৪) নওয়াব একটি কৌশল করে প্র্যাটকে শেষ করেন। তার কাছে একটি পত্র লিখে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আরাকান রাজের মাথা নিয়ে ঢাকায় ফিরে আসতে বলা হয়। এমন কৌশল করে চিঠিটা প্রেরণ করা হয় যে, তা আরাকান রাজের হাতেই পড়ে। তিনি চিন্তা করলেন যে, তার নতুন মিত্র বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, তাই তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ম্যানুক্কী দাউদ খানকে নওয়াব বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উইলিয়াম ফস্টার তাকে শায়েস্তা খান বলেই মত প্রকাশ করেছেন

৪২৭ বাংলা থেকে সুরাটে লেখা পত্র, ২০ শে অক্টোবর, ১৬৬৮ ই.এফ.আই., ১৬৬৮-১৬৬৯, পৃঃ ১৬৬

৪২৮ ঐ . পৃঃ ১৬৬-১৬৭

৪২৯. ঐ . পৃঃ ১৬৬

তীব্র ঘাটতির কারণে কুঠিয়ালরা এখনো উল্লেখযোগ্যভাবে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পুনরায় শুরুই করতে পারেননি এবং জাহাজের আগমণের জন্য আগ্রহভরে অপেক্ষা করছিলেন।[৪৩০]

১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত জাহাজ বালাসোরে এসে পৌঁছে। এগুলো ছিল দ্যা এন্টিলোপ, দ্যা জন এবং মার্থা। এ জাহাজগুলো বাংলার কুঠিয়ালদের জন্য £২০০০০ (৮ রিয়ালের মুদ্রায়) রূপার মুদ্রা এবং £৯২৭০ এর পণ্যসমগ্রী নিয়ে আসে।[৪৩১] জাহাজ আসার পূর্বেই ইংরেজ কুঠিয়ালদের প্রধান হিসেবে ব্লেকের উত্তরাধিকারী শেম ব্রিজেস শায়েস্তা খানের নিকট কাশিম বাজার কুঠির দ্বিতীয় প্রধান জন মার্চের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন; উদ্দেশ্য ছিল নওয়াবের অনুগ্রহ লাভ এবং তার আদেশে ইংরেজদের বাণিজ্যিক কার্যক্রমে সৃষ্ট "বাধা" (তাদের ভাষায়) অপসারণ।[৪৩২] প্রথম সাক্ষাতকালে নওয়াবকে ৭টি ২০ শিলিং এর স্বর্ণের মোহর এবং ৯.০০ টাকা এবং অন্যান্য সভাসদদেরকে উপঢৌকন দেয়ার জন্য মার্চকে নির্দেশ দেয়া হয় এবং গত যুদ্ধে ওলন্দাজদের দ্বারা ইংরেজদের জাহাজ আক্রান্ত হওয়ার প্রতিকার চাওয়ার জন্যও বলা হয়।[৪৩৩]

মার্চ যখন ঢাকায় ছিলেন তখন হুগলীর গভর্ণর মালিক কাশিম শুল্ক ধার্য করার জন্য তার প্রতি যে নির্দেশ ছিল, সে অনুযায়ী ইংরেজদের আমদানী করা পণ্য শুল্কমুক্তভাবে ছেড়ে দিতে অস্বীকার করেন।[৪৩৪] কুঠিয়ালরা চিন্তা করে যে, আমদানী বাণিজ্যের উপর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই গভর্ণর এইরূপ কর আরোপ করেছেন এবং তারা আরো চিন্তা করে যে, এই উদ্দেশ্যে তিনি নওয়াবের নিকট হতে ৩,০০,০০০ টাকা বৎসরে ২৫% সুদে ঋণ নিয়েছেন।[৪৩৫] ইংরেজদের সন্দেহ ছিল ভিত্তিহীন এবং সম্পূর্ণ অনুমান নির্ভর। পরে দেখা যাবে যে, ইংরেজদের আমদানী করা পণ্যের তেমন একটা চাহিদা ছিল না যে, ঐ গুলো কোনো বণিককে একচেটিয়া ব্যবসা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারে।[৪৩৬] আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইংরেজদের জাহাজে যে পণ্য আনা হয়েছিল, তার মোট মূল্য ছিল £ ৯২৭০ মাত্র (১,০০,০০০ টাকার চেয়েও কম)।

---

৪৩০. বাংলা থেকে সুরাটে লেখা পত্র, ২০ শে অক্টোবর, ১৬৬৮ ই.এফ.আই., ১৬৬৮-১৬৬৯, পৃঃ ১৬৭
৪৩১. ঐ , পৃঃ ৩০০ টীকা-১
৪৩২. ঐ , পৃঃ ২৯৫-৯৬
৪৩৩. ও .সি. ৩২৬৫, উপরোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ৩১৫
৪৩৪. ব্রিজেস হলকে লিখেছেন, ৭ই মে, ১৬৬৯, ই এফ আই ১৬৬৮-১৬৬৯ পৃঃ ২৭৯
৪৩৫. ঐ, আরো দেখুন বাগনালকে লেখা ব্রিজের পত্র, ২৮ শে মে, ১৬৬৯, ঐ, পৃঃ২৯৯
৪৩৬. পরবর্তী পৃষ্ঠা ১৭৭

অতএব, এটা একেবারেই অসম্ভব যে, কোন বণিক কোন পণ্য ক্রয়ের জন্য ঐ পণ্যের মূল্যের তিনগুণ অর্থ (৩,০০,০০০ টাকা) বৎসরে ২৫% সুদে ঋণ করবে। তদুপরি ব্যক্তি জীবন ও রাষ্ট্রীয় কাজে শরিয়তের আইন কঠোরভাবে অনুসারী শায়েস্তা খান কর্তৃক (সম্রাট আওরঙ্গবের এরূপ স্পষ্ট নির্দেশ ছিল) তাঁর অধীনস্থ একজন কর্মকর্তার নিকট ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ সুদে টাকা ধার দেওয়ার কথা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। তাঁর গভর্ণরকে টাকা ঋণ দেয়া দূরে থাকুক, শীঘ্রই দেখা যাবে যে, শায়েস্তা খান তাঁর (গভর্ণর) নিকট থেকে ইংরেজরা কিছু নেয়ার পরে টাকা আদায়ের জন্য যখন তিনি (গভর্ণর) চেষ্টা করলেন, তখন তিনি (শায়েস্তা খান) তাকে নিবৃত করেন। যা হোক, যদি হুগলীর গভর্ণর পণ্যদ্রব্যগুলো ছাড় দেয়ার ব্যাপারে তাঁর বিরোধিতা অব্যাহত রাখেন, তাহলে ব্রিজেস এই বিষয়টি ঢাকা এসে নওয়াবের নিকট উত্থাপন করার ইচ্ছা করা সত্ত্বেও এই সম্পর্কে আর কিছু শুনা যায়নি।[৪৩৭] তাই ধরে নেয়া যায় যে, বিষয়টি হুগলীতেই পারস্পারিক শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করা হয়েছিল।

ঢাকাতে মার্চের আলোচনাকালীন সময়েই এমন আরেকটা ঘটনা ঘটে, যা থেকে ব্রিজেস ন্যায়সঙ্গতভাবে শায়েস্তা খানের অসন্তোষের আশংকা করেছিলেন। গত কয়েক মাস যাবত প্রধান ইংরেজ কুঠিয়াল উইলিয়াম ব্লেক এবং তার উত্তরাধিকারী শেম ব্রিজেসের মধ্যে একটি প্রচন্ড বিবাদ চলছিল। ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য, কোম্পানীর হিসাব সংরক্ষণ এবং বাংলায় কোম্পানীর সার্বিক ব্যবসা পরিচালনাকে কেন্দ্র করে এই বিবাদ চলে আসছিল।[৪৩৮] এই মতভেদের এক পর্যায়ে এসে "মীর জুমলার বাক্সের" বিষয়টি প্রকাশ পেয়ে যায়। এইগুলো ছিল ২'টি সিলমোহর করা বাক্স, এর মধ্যে ছিল সম্ভবতঃ রত্ন এবং মসলিপট্টমের জনৈক তাবতাবাই কর্তৃক, ব্লেক এবং ব্রিজেস যখন ১৬৬২-৬৩ খ্রিস্টাব্দে সে বন্দর পরিদর্শন করেন, তখন তাদের মাধ্যমে মীর জুমলার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। ব্লেক এবং ব্রিজেস যখন বাংলায় আসেন তার পরেই মীর জুমলা মারা যান। পরবর্তী দুই বৎসর পর্যন্ত বালাশোরের কুঠিতে বাক্স দুটি পড়ে ছিল, কেউ ধরেনি। এগুলো খুলে ব্লেক দেখেন এবং তারপরেও ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে ব্লেক যখন দেশে ফেরার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখনও সেগুলো কুঠিতেই পড়েছিল।[৪৩৯] যেহেতু এই বিষয়টি কুঠির বাহিরে কেউ জানত না, তাই এই বিষয়টি দীর্ঘ দিন পর্যন্ত মীর

৪৩৭. হলকে লেখা ব্রিজেসের পত্র, ৭ই মে, এবং রাগনালকে লেখা পত্র ২৮শে মে, ১৬৬৯, পূর্বোক্ত
৪৩৮. ব্লেক এবং ব্রিজেসের মধ্যকার বিবাদের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণের জন্য দেখুন, ই.এফ.আই. ১৬৬৮-৬৯, পৃঃ ২৯৭-৩০৩
৪৩৯. কোম্পানীকে লেখা ব্রিজেসের পত্র, ই.এফ.আই., ১৬৬৮-৬৯, পৃঃ ১৭৪

জুমলার উত্তরাধিকারী এবং নওয়াব শায়েস্তা খানের নিকট থেকে গোপন রাখা এবং এর ভিতরের জিনিষ-পত্রগুলো দেখা এবং নাড়াচাড়া করার পরিণতি সম্পর্কে ব্রিজেস শংকিত হয়ে পড়েন। অতএব, ব্রিজেস বিষয়টি নওয়াবকে দ্রুত অবহিত করার জন্য মার্চকে নির্দেশ দেন এবং আরো বলেন যে, বাক্সগুলো বে-খেয়ালে পড়ে ছিল এবং সবেমাত্র পাওয়া গেছে।[৪৪০] এই খবর জানতে পেরে নওয়াব বালাসোরের গভর্ণরকে বাক্সগুলোসহ ব্লেককে ঢাকা পাঠিয়ে দিতে নির্দেশ দেন।[৪৪১] এই কাজকে ব্লেক ব্রিজেসের কারসাজি বলে মনে করেন এবং এই আদেশ প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্রিজেসের নিকট দাবী জানান। তা যদি না করা হয়, তাহলে তিনি ব্রিজেসকেসহ তাকে ডাকার জন্য শায়েস্তা খানকে অনুরোধ করবেন বলে হুমকি দেন। এই হুমকি পেয়ে নওয়াবের আদেশ অবিলম্বে বাস্তবায়ন না করার জন্য বালাসোরের গভর্ণরকে অনুরোধ করার জন্য ব্রিজেস আগ্রহী হন।[৪৪২] পরবর্তী সময়ে দ্যা জন এন্ড মার্থার কমান্ডার ক্যাপ্টেন গফের সহায়তায় ব্লেক বাংলা থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।[৪৪৩] জাহাজ আটক এড়ানো এবং অন্য কথায়, বালাশোরের গভর্ণরের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ব্রিজেস তাকে এই অঙ্গীকারপত্র দেন যে, বাক্স থেকে যদি কিছু হারিয়ে থাকে, তাহলে সে ক্ষতি তিনি পূরণ করে দিবেন।[৪৪৪]

বাক্সের বিষয়টি শায়েস্তা খানকে বেশি একটা উত্তেজিত করেনি; কারণ ঢাকাতে মার্চের আলাপ-আলোচনা নির্বিঘ্নে চলছিল। যদিও ইংরেজ কুঠিয়ালরা এই ব্যাপারে তাদের দুর্বল অবস্থান সম্পকে সচেতন ছিলেন।[৪৪৫] নওয়াব তাদেরকে একটি পরওয়ানা দেন এবং ৪% শুল্ক আরোপ করার ইচ্ছাও ত্যাগ করেন। ইংরেজদেরকে তার জন্য বৎসরে ৩০০০.০০ টাকা দিতে হবে এবং এর বিনিময়ে তাদেরকে রাজ্যব্যাপী বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি দেয়া হয়। তিনি

---

৪৪০. ই.এফ.আই., ১৬৬৮-৬৯, পৃঃ ২৯৯
৪৪১. ই.এফ.আই., ১৬৬৮-৬৯, পৃঃ ৩০২
৪৪২. ই.এফ.আই., ১৬৬৮-৬৯, পৃঃ ৩০২-৩০৩
৪৪৩. ই.এফ.আই., ১৬৬৮-৬৯, পৃঃ ৩০৯। ব্লেকের পলায়নের ব্যাপারে তার ভূমিকার জন্য গফকে কোম্পানীর চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়। ব্লেক শেষ পর্যন্ত কোম্পানীর সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ে। তাতে বিভিন্ন কোর্ট তার বিরুদ্ধে রায় দেয়
৪৪৪. ঐ, পৃঃ ৩১৭, ১৬৭০ সালের ২৮শে মে তারিখের এক আলোচনা থেকে বাক্সের বিষয়ে সর্বশেষ খবর জানা যায় যে, (হুগলীর কুঠির নথির বিবরণ ২য় খন্ড, পৃঃ ৪১, বালাশোরের গত অগ্নিকান্ডে মীর জুমলার পার্সেলসহ শহরের বেশির ভাগ, এমনকি ব্লেকের বসত বাড়ী ও ভস্মিভূত হয়ে যায়।" ই.এফ.আই., ১৬৬৮-৬৯, পৃঃ ৩১৪, টীকা-১) কেহ হয়ত এই সন্দেহ করতে পারে যে, বাক্সের ব্যাপারটা ধামাচাপা দেয়ার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে অগ্নিকাণ্ড ঘটানো হয়েছিল।
৪৪৫. দেখুন, ব্রিজেসকে লেখা হলের পত্র এবং হলকে লেখা ব্রিজেসের পত্র, ১২ই মে, ১৬৬৯, ই.এফ.আই., ১৬৬৮-৬৯, পৃঃ ২৯৮

ওলন্দাজদেরকেও এই আদেশ দেন যে, তারা গত ইঙ্গো-ওলন্দাজ যুদ্ধের সময় ইংরেজদের যে ক্ষতি করেছে, তাও পূরণ করে দিতে হবে।[৪৪৬]

এইভাবে নওয়াবের নিকট তাঁর প্রতিনিধিত্ব শেষ করে মার্চ, ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরের প্রথম দিকে কাশিম বাজারে ফিরে যান।[৪৪৭] যাহোক ১৬৬৫ সাল থেকে যে সকল পণ্য মজুদ ছিল, আংশিকভাবে সেগুলো দিয়ে এবং আংশিকভাবে গত কয়েক মাসে কেনা পণ্য সামগ্রী দিয়ে ইতিমধ্যে জাহাজগুলো ভর্তি করা হয়। সেগুলো ডিসেম্বরের প্রথম দিকে (১৬৬৯ খ্রিঃ) বালাশোর থেকে ছেড়ে যায়। কোন শুল্ক বা ঐ বৎসরের জন্য নির্ধারিত ৩০০০.০০ টাকার কোন কিছু দেয়ার কোন ইচ্ছা তাদের ছিল না। বাংলায় কোম্পানীর অবস্থান পরিস্কার করতেই ১৬৬৯ সাল শেষ হয়ে যায়।

শায়েস্তা খানের ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে ইংরেজরা তাঁর পূর্ববর্তী নবাবদেরকে প্রদত্ত বৎসরে ৩০০০.০০ টাকা প্রদানও এই ভিত্তিহীন অজুহাতে বন্ধ করে দেয় যে, তারা প্রথাগতভাবে বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। নওয়াব তাদের এই দাবীর স্বীকৃতি দেননি এবং তাদের পণ্যের উপর স্বাভাবিক শুল্ক আরোপ করার সিদ্ধান্ত নেন, আর তা ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দের শাহী ফরমানের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলা থেকে সে বৎসর ইংরেজদের দ্বারা রপ্তানীকৃত পণ্যের উপর থেকে শুল্ক হিসেবে ৩০০০.০০ টাকা আদায় করেন এবং তার পরবর্তী বৎসর তিনি শুল্ক হিসেবে কিছুই আদায় করেননি, বরং শুল্কের পরিবর্তে ২০০.০০ টাকার চেয়ে কিছু বেশি মূল্যের উপঢৌকন গ্রহণ করেছিলেন মাত্র। ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্য ভাগ থেকে ১৬৬৮ এর শেষ পর্যন্ত কোন পণ্য দ্রব্য রপ্তানী করা হয়নি। নওয়াবের পক্ষ হতে শুল্ক দাবী করার কোন কারণই ঘটেনি। এমন কি এ সময়ে কুঠিয়ালরা নওয়াবকে কোন অর্থ দেয়ার উল্লেখও করেননি। অতঃপর ইঙ্গ-ওলন্দাজ যুদ্ধের সময় নওয়াব কঠোরভবে নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করেন এবং যুদ্ধমান উভয় জাতিকে তাঁর রাজ্য সীমা এবং উপকূলীয় জলসীমার মধ্যে কোনরূপ শত্রুতামূলক আচরণ করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করেন। এতে ইংরেজরা উপকৃত হয়, কারণ বাংলার উপকূলে তারা ওলন্দাজদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিল। তথাপি এই সময়ের পত্রাবলীতে তারা শায়েস্তা খানের "অর্থ গৃধ্নুতা, দুস্কর্ম এবং

৪৪৬. হেগের অনূদিত সিরিজ-১, ২৯শ খন্ড, নং-৭৫৪, ই.এফ.আই.-তে উদ্ধৃত, ১৬৬৮-৬৯, পৃঃ ৩১৬।আরো দেখুন উইলসন, আর্লি এনালস ইন বেঙ্গল, ২য় খন্ড, অংশ-১, পৃঃ ১৮৪-৮৫, ১৮৭।

৪৪৭. ই.এফ.আই., ১৬৬৮-৬৯, পৃঃ ৩.৬

অত্যাচারী" ইত্যাদি কথা প্রসঙ্গে প্রায়ই উল্লেখ করেছেন। এসব অভিযোগের সত্যিকারের কোন ভিত্তি ছিল না, খুব সম্ভব তাদের প্রথাগত শুল্ক-মুক্ত বাণিজ্য করার বৃথা ও ভিত্তিহীন দাবী শায়েস্তা খান স্বীকৃতি না দেয়ায় হতাশ বোধ দ্বারা তাড়িত হয়েই তারা এসব লিখতেন। তাদের এই অকৃতজ্ঞ মনোভাবের আরেকটি সম্ভাব্য কারণ হয়ত কুঠিয়ালদের মধ্য থেকে দেশের অভ্যন্তরে যারা ব্যাপকভাবে ব্যক্তিগতভাবে বাণিজ্য করতেন, তাদের নিকট থেকে নওয়াব কর্তৃক মালামাল স্থানান্তর (Transit) শুল্ক এবং কর আদায় করা। অন্যদিকে, নওয়াবের দিক থেকে তাঁর সুবাদারীর প্রথম তিন বৎসর পর্যন্ত তিনি চট্টগ্রাম জয় এবং অধিকার করা নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। নওয়াবের চট্টগ্রাম অভিযানের প্রতিও ইংরেজদের মনোভাব অনুকূল ছিল না। প্রাটের পক্ষত্যাগে তাদের জন্য কিছু পরিমাণে হলেও সুনাম ক্ষুন্ন হয়। তথাপি, এই সকল বিষয় বা মীর জুমলার বাক্সের ঘটনাটি ইংরেজদের প্রতি শায়েস্তা খানের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করেনি। যদিও ওলন্দাজরা তাদের পণ্যদ্রব্যের জন্য নওয়াবকে ৪% হারে শুল্ক প্রদান করতো; আর ইংরেজরা যখন তাঁর আনুকূল্য লাভের জন্য তাঁর দ্বারস্থ হয়, তখন তিনি খুশির সঙ্গে শুল্ক আদায়ের জন্য তাঁর দাবী ত্যাগ করেন এবং মীর জুমলার সুবাদারীর সময় তারা যে সুবিধা ভোগ করতো, সে সুবিধা দিয়ে তাদেরকেও সন্তুষ্ট করেন, এই দিক থেকে ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে শায়েস্তা খানের পরওয়ানার তাৎপর্য দু'রকম। প্রথমত, বাংলায় এটা কুঠিয়ালদের প্রথাগতভাবে শুল্ক-মুক্ত বাণিজ্য করার দাবী নাকচ করে দেয়। দ্বিতীয়ত, এটা একটা বৈধ মূলনীতি, যা কুঠিয়ালরাও স্বীকার করে যে, তারা পূর্ববর্তী সম্রাট বা সুবাদার, যার নিকট থেকেই যে সকল সুযোগ সুবিধা অর্জন করেছে, তা পরবর্তী রাজা বা সুবাদারের দ্বারা অনুমোদন বা নবায়ন প্রয়োজন।

(গ) ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দের পরওয়ানার প্রয়োগ

এ্যাংলো-ওলন্দাজ যুদ্ধ সমাপ্তি এবং ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে শায়েস্তা খান কর্তৃক পরওয়ানা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি শান্তিপূর্ণ বাণিজ্যিক কার্যক্রমের যুগ শুরু হয়। ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে জাহাজে করে যে অর্থ আনা হয়েছিল, তা ১৬৭০ খ্রিস্টাব্দের বিনিয়োগের জন্য যথেষ্টই ছিল। ১৬৭১ খ্রিস্টাব্দের জন্য প্রাপ্ত অর্থ এত বেশি ছিল যে, হুণ্ডির মাধ্যমে £১০০০০.০০ সংগ্রহের জন্য তাদেরকে ক্ষমতা দেয়া থাকলেও তারা এই ক্ষমতা প্রয়োগ করার প্রয়োজন বোধ করেননি।[৪৪৮] অনুরূপভাবে ১৬৭২ সালের মজুদের পরিমাণও সন্তোষজনক ছিল। কারণ ১৬৭১ সালে

৪৪৮. Misc ১৪০ ই.এফ.আই., ১৬৭০-১৬৭৭

সঙ্গোপসাগরে যে তিনটি জাহাজ এসে ভিড়েছিল,[৪৪৯] সেগুলো £১১,৫০০ এর পণ্য সামগ্রী এবং বুলিয়নে £৩০,০০০ নিয়ে এসেছিল। তাছাড়া, প্রয়োজন হলে কুঠিয়ালদেরকে হুণ্ডির মাধ্যমে £১০,০০০ থেকে £১২,০০০ সংগ্রহ করতে ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল।[৪৫০] এইসব অনুকূল পরিস্থিতিতে ইংরেজ বণিকেরা কাশিমবাজার এবং পাটনায় ব্যাপকভাবে তাদের বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে। অন্যান্য স্থানেও আনুপাতিক হারে বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। প্রকৃতপক্ষে, কোম্পানীর বাণিজ্য এত বেশি প্রসার লাভ করে যে, ঢাকা এবং কাশিম বাজার উভয় জায়গায় তারা তাদের সংগৃহীত পণ্য দ্রব্যের জন্য স্থান সংকুলান করতে সমস্যায় পড়ে যায়।[৪৫১]

নতুন পরওয়ানা কার্যকরী করার প্রথম বৎসরে ১৬৭০ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানীর ৪টি জাহাজ যথা, দ্যা ফন্টে, দ্যা হ্যাপি এন্ট্রান্স, দ্যা রেইনবো এবং দ্যা কোষ্ট ফ্রিগেট বালাশোরে এসে পৌঁছে। এসব জাহাজ বাংলায় সংগৃহীত পণ্য সমাগ্রী দ্বারা বোঝাই করা হয় এবং বৎসরের শেষের দিকে বাংলা ত্যাগ করে।[৪৫২] এসব পণ্য সংগ্রহ এবং প্রেরণের বিরুদ্ধে নওয়াবের কর্মচারীরা কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি, এমন কি পরওয়ানায় উল্লেখিত ৩০০০.০০ টাকার অতিরিক্ত কোন শুল্কও ধার্য করা হয়নি। বণিকরা যে একটি মাত্র সমস্যায় পড়েছিল তা হল পাটনা, কাশিম বাজার, ঢাকা এবং অন্যান্য স্থান থেকে হুগলিতে আনা বিপুল পরিমাণ পণ্য সামগ্রী বালাশোরে স্থানান্তর করা। সেখানে এসেই জাহাজগুলো নোঙর করেছিল আর পণ্য সামগ্রী হুগলী থেকে বালাশোরে স্থানান্তর করার সমস্যা পরবর্তী বৎসরেও দেখা দেয়, যখন স্বদেশগামী তিনটি জাহাজ বোঝাই করতে আগষ্ট থেকে নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত পুরো চারটি মাস লেগে যায়। এই তিনটি জাহাজ হচ্ছে - দ্যা ইষ্ট ইন্ডিয়া মার্চেন্ট, দ্যা স্যাম্পসন এবং দ্যা বোম্বে মার্চেন্ট।[৪৫৩] এই সকল জাহাজে যে সব পন্য সামগ্রী পরিবহন করা হত, তা হচ্ছে সোরা, তাফাতিজ, কাঁচা রেশম, সালুস।

৪৪৯. এগুলো ছিল দ্যা ইস্ট ইন্ডিয়া মার্চেন্ট, দ্যা স্যাম্পসন এবং দ্যা বোম্বে মার্চেন্ট। পরে আরো দেখুন

৪৫০. ফোর্টের নিকট প্রেরিত পত্র, ২৯ শে নভেম্বর, ১৬৭০, ৪. এল.বি. ৩৯১, ই.এফ.আই., ১৬৭০-৭৭, পৃঃ ৩৩৩,

৪৫১. কাশিম বাজারের পত্র, ১লা নভেম্বর, ১৬৭১ এবং ঢাকার পত্র, ২২ শে ডিসেম্বর, ১৬৭১, হুগ, ১২, ২২: ই.এফ.আই., ১৬৭০-৭৭, পৃঃ ৩৩৬, ৩৩৭

৪৫২. ই.এফ.আই., ১৬৭০-৭৭, পৃঃ ৩২৯

৪৫৩. হুগলী থেকে বালাশোরে পণ্যসামগ্রী স্থানান্তর করার জন্য বড় জাহাজের সঙ্গেই থাকে যে ক্ষুদ্র নৌকা, সেরকম দুটি, দ্যা মদ্রাজ এবং দ্যা ডিলিজেন্স, দু'টি পাল তোলা ১ মাস্তুলের জাহাজ, দ্যা গুড হোপ এবং দ্যা জন এবং এছাড়াও ভাড়া করা কিছু সংখ্যক দেশী পণ্যবাহী জাহাজ

তুলার সুতা, হলুদ, তিস্ফল এবং "দুসূতী" নামক এক ধরণের মোটা পালের কাপড়। এসব পণ্যের মধ্যে সোরাই ছিল সর্বাধিক পরিমানে এবং ১৬৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলা থেকে এই সোরার মত একটি মাত্র পণ্যেরই ১১০০০ ব্যাগ রপ্তানী করা হয়।[৪৫৪]

ওলন্দাজদের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকেই ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যত বেশি সম্ভব ইংরেজদের পণ্য বাংলায় বিক্রির জন্য চেষ্টা করে। প্রকৃতপক্ষে, তারা বাংলায় যে পরিমাণ পণ্য রপ্তানী করত, তার একটি বড় অংশই ছিল ইংরেজদের উৎপাদিত পণ্য। কোম্পানী আশা করত যে, ইংল্যাণ্ড থেকে বাংলায় আমদানী করা সকল পণ্যকেও শুল্ক প্রদান থেকে অব্যাহতি দেয়া হোক। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দের শাহী ফরমান এবং পরবর্তী পরওয়ানাসমূহ শুধু রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। এমন কি ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে শায়েস্তা খানের যে পরওয়ানার মাধ্যমে ইংরেজদেরকে বৎসরে ৩০০০.০০ টাকা প্রদানের বিনিময়ে শুল্কমুক্তভাবে বাণিজ্য করার অনুমতি দেয়া হয়, সে পরওয়ানায়ও কোম্পানীর বাণিজ্যের এই দিকটি সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কিছুই বলা হয়নি। কারণ সম্ভবত: তখনও এই আমদানি বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল খুবই সামান্য। ইংরেজরা দাবী করত যে, তাদের শুল্ক সুবিধার মধ্যে আমদানীকৃত পণ্যও অন্তর্ভুক্ত। হুগলীর গভর্ণর মালিক কাশিমের মত ছিল এই যে, শাহী ফরমান বা পরবর্তী পরওয়ানা সমূহে কোম্পানীর বাণিজ্যের এই দিকটি সম্পর্কে কোন উল্লেখই নেই। অতএব, বাহির থেকে আমদানী করা পণ্য এই সুবিধার অন্তর্ভুক্ত হবে না।[৪৫৫] ১৬৭২ সালের জানুয়ারীর প্রথম দিকে জাহাজে করে আনা আমদানী পণ্যকে তিনি ছাড়পত্র দিতে অস্বীকার করেন এবং এইগুলো তখন কোম্পানীর নৌকায় করে বালাশোর থেকে হুগলীতে আনা হয়। এমনকি তিনি আমদানীকৃত মালের একটি বিবরণ চান এবং এ উদ্দেশ্যে তার একজন কর্মকর্তা একটি নৌকাকে তীরে ভিড়াতে বাধ্য করেন।[৪৫৬] বণিকরা বাধা দেয় এবং শক্তি প্রয়োগ করে, এমন কি এই কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাকে প্রহার পর্যন্ত করে এবং প্রহৃত কর্মকর্তাকে নৌকা ছেড়ে দিতে বাধ্য করেন।[৪৫৭] বিদেশী বণিকদের এ ধরণের ঔদ্ধত্যমূলক আচরণ স্বাভাবিকভাবেই গভর্ণরের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করে:

---

৪৫৪. বাংলার পত্র, ১৯, ২৪ ও ৩০ শে অক্টোবর, ২, ৭, ১১, ১২, ২৪ ও ২৮ শে নভেম্বর, ১৬৭১, ৭ হুগ, ৫-৭,,১০,১৩,১৫-২১: ই.এফ.আই., ১৬৭০-৭৭, পৃঃ ৩৩৪, ৩৩৫

৪৫৫. মালিক কাশিম ছিলেন বালাশোরের সাবেক গভর্ণর মালিক বেগের পুত্র এবং তিনি ১৬৬৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন

৪৫৬. ক্ল্যাবেলকে লেখা বেগন্যালের পত্র, ৯ই জানুয়ারী, ১৬৭২, ৭হুগ, ২৪-২৫, ই.এফ.আই., ১৬৭০-১৬৭৭, পৃঃ ৩৪৮

৪৫৭. ঐ

তাই তিনি তাদেরকে শুধু পণ্যের বিবরণ দিতে বলেন, নতুবা ১০ দিনের মধ্যে বিনা শুল্কে আমদানী সুবিধার জন্য তাদের দাবীর সমর্থনে হয় শাহী ফরমান, না হয় শায়েস্তখানের পূর্ববর্তীদের পরওয়ানা পেশ করতে বলেন।[৪৫৮] উত্তরে বণিকরা জানায় যে, ফরমান রয়েছে সুরাটে এবং পরওয়ানা রয়েছে বাংলার কোন এক কুঠিতে। কাজেই ১০ দিনের মধ্যে এ ধরণের কোনটি পেশ করার ব্যাপারে তারা নিশ্চয়তা দিতে পারছেন না।[৪৫৯] শাহী ফরমান সুরাটে থাকায় তা পেশ করতে না পারার বিষয়ে বণিকদের বক্তব্য সঠিক বলে মনে হয় না; কারণ ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে তারা এর একটি অনুলিপি সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু তারা এ জন্য তা নওয়াবকে দেখানো থেকে বিরত থাকে যে, তাতে শুল্ক দেয়ার কথা উল্লেখ ছিল[৪৬০]।

মোটকথা, তাদের আগের দলিল পত্র এবং বর্তমান অবস্থার, এ উভয় ক্ষেত্রেই তাদের যে দুর্বলতা, সে সম্পর্কে সচেতন থেকেই তারা দলিল পত্র উপস্থাপন না করে বিষয়টি এড়িয়ে যাবার জন্যই এভাবে জওয়াব দেয় এবং পরওয়ানাকে আরও ব্যাপক অর্থে গ্রহণের জন্য জোর দেয়। যাহোক বেঙ্গল কাউন্সিলের একজন সদস্য জোসেফ হলের শুভ বুদ্ধির কারণে সাময়িকভাবে এই সমস্যার সমাধান হয়; তিনি "সামান্য কিছু উপঢৌকন" নিয়ে মাসের শেষের দিকে গভর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং ঢাকা বা অন্য যে কোন জায়গায় পণ্য সামগ্রী প্রেরণের লক্ষ্যে তার অনুমতি লাভ করেন।[৪৬১]

কিছু দিন নিরুপদ্রবে কেটে যায়। কিন্তু, শীঘ্রই গভর্ণর আমদানীকৃত পণ্যের উপর নতুনভাবে শুল্ক দাবী করেন।[৪৬২] বণিকগণ তাদের স্বদেশের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ পত্রে উল্লেখ করেছেন যে, তার এটা করার কারণ হচ্ছে এই যে, তিনি চান পণ্যগুলো তার নির্ধারিত দরে তার নিকটই বিক্রি করা হোক। তারা আরো সন্দেহ করে যে, তার কর্মকর্তাদেরকে ইংরেজদের "দেয় বৎসরে ৩,০০০.০০ টাকা উপঢৌকনের বিপরীতে ওলন্দাজরা শুল্ক হিসেবে বৎসরে ৩০,০০০.০০ থেকে ৪০,০০০.০০ টাকা দিয়েই সমস্যা উস্কিয়ে দিয়েছে।"[৪৬৩]

---

৪৫৮. ঐ
৪৫৯. ঐ
৪৬০. সুরাটে বাংলার পত্র, ২০ অক্টোবর, ১৬৬৮, ই.এফ.আই., ১৬৬৮-৬৯, পৃঃ ১৬৬
৪৬১ ৭ হুগলী, ২৭-২৯, ই.এফ.আই. ১৬৭০-৭৭, পৃঃ ৩৪৮
৪৬২ চার্লস ফসেট গভর্ণরের শুল্ক দাবী সম্পর্কে সাধারণভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আমদানী রপ্তানী উভয় ক্ষেত্রেই হস্তক্ষেপ করেছেন (ই.এফ.আই. ১৬৭০-৭৭, পৃঃ ৩৪৬)। কিন্তু তিনি যে সকল দলিল পত্রের সার-সংক্ষেপ তৈরী করেছেন, বিশেষ করে গ্রন্থের ৩৪৮-৩৪৯ পৃষ্ঠার যে তুলনা পেশ করেছেন, সেদিকে একটু সতর্কভাবে দৃষ্টি দিলে এ কথা বুঝতে বাকি থাকে না যে, এ বিবাদটা হয়েছিল শুধু আমদানী বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে
৪৬৩ হুগলী ৫-৬, ই.এফ.আই. ১৬৭০-৭৭, পৃঃ ৩৪৬

ভযোগটি ভিত্তিহীন বলে মনে হয়। এজন্য তার কোন উৎসাহ বা আকর্ষণ ছিল । কারণ তখনও ইংরেজদের পণ্যের জন্য বাংলায় তেমন কোন চাহিদা সৃষ্টি নি। তাদের পত্রে বনিকরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে, ইংরেজদের পণ্য শোরে বিক্রি করতে না পারায় তাদের প্রচুর পরিমাণ বিলেতী সিসা এবং দ্বিগুণ ড়া উন্নত মানের পশমী কাপড়কে দেশী রেশমী কাপড় এবং বিছানার চাদরের ঙ্গ ২০% হ্রাসকৃত মূল্যে বিনিময় (বাণিজ্য) করতে হয়েছে। তারা আরো উল্লেখ রেছেন যে, আগ্রা হয়ে যে সকল পশমী কাপড় পাটনা এবং বাংলার অন্যান্য স্থানে ছেছে, বাজার মন্দার জন্য সেগুলোর তেমন বিক্রি নেই। ফলে, বণিকরা াম্পানীকে অনুরোধ করে যে, আগামী দু'বৎসরের মধ্যে যেন আর কোন পশমী পড় প্রেরণ করা না হয়।[৪৬৪] কোম্পানীর আমদানীকৃত পণ্যের ব্যাপারে হুগলীর র্ণরের হস্তক্ষেপের সত্যিকার কারণ হচ্ছে ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রদত্ত শায়েস্তা খানের ওয়ানা এবং পূর্ববর্তী পরওয়ানা সমূহ সম্পর্কে তাঁর কড়াকড়ি ব্যাখ্যা এবং তাঁর ত আমাদানীকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে এগুলো প্রযোজ্য নয়। তাছাড়া, তাঁর এই ক্ষেপ গ্রহণের পিছনে সম্ভবতঃ আরো একটি কারণ ছিল। আমাদের জানা আছে , স্থানীয় রাজা ও জমিদারদের সঙ্গে সম্রাট এবং নওয়াবের সম্পর্ক ছিল ত্রুতামূলক এবং এজন্য বিদেশী বণিকদের দ্বারা আমদানীকৃত সিসা এবং অন্যান্য মরিক সরঞ্জাম যথা গন্ধক এবং লোহার বন্ধুক ইত্যাদি তাদের নিকট অথবা দের অনুমতি ব্যতীত অন্য কারও নিকট বিক্রি করতে নিষেধ করা হয়েছিল।[৪৬৫] লিক কাশিম কর্তৃক ইংরেজদের দ্বারা আমদানীকৃত পণ্যের বিবরণ জানার চেষ্টার ছনে এই নির্দেশের ভূমিকা থাকতে পারে।

ওলন্দাজদের দ্বারা উপঢৌকন দেয়ার অভিযোগটিরও কোন ভিত্তি নেই; রণ এই সময়ে একটি অনর্থক লেনদেনকে কেন্দ্র করে মালিক কাশিম এবং ন্দাজদের মধ্যে বিবাদ চলছিল। বিবাদের বিষয়টি ছিল এই যে, হুগলীতে ন্দাজদের প্রধান ব্রাক্ষ্মন বাবুরাম ওলন্দাজদের কর্মচারী হিসেবে মালিক শিমের নিকট থেকে ৩০,০০০.০০ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। ওলন্দাজরা মৃত বুরামের স্ত্রীকে ধরে নিয়ে যায় এবং বলপূর্বক তাঁর নিকট থেকে ১৩০০০.০০ কা আদায় করেন। এর দুই দিন পরে ভীষণ লজ্জার কারণে, না হয় ন্দাজদের মারের চোটে আহত হয়ে দূর্ভাগা মহিলাও মারা যান। মালিক শিম এবার হস্তক্ষেপ করেন এবং মৃত ব্রাক্ষ্মণ তার নিকট থেকে যে ঋণ

---

৪ হুগলী, ৪, ই.এফ.আই. ১৬৭০-৭৭, পৃঃ ৩৪৫
৫ ঐ

নিয়েছিল, তার অংশ হিসেবে ২৮,০০০.০০ টাকা প্রদান করার জন্য ওলন্দাজদেরকে বাধ্য করেন।[৪৬৬] মালিক কাশিমের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ওলন্দাজরা নওয়াবের নিকট আবেদন করেন। সুযোগ বুঝে ইংরেজরাও মালিক কাশিমকে তাঁর পদ থেকে হটানোর জন্য ওলন্দাজদের সঙ্গে যোগ দেয়। তাদের ধারনানুযায়ী মালিক কাশিম ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে তাদের বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করায় তারা এ বিষয়ে তার বিরুদ্ধে নওয়াবের নিকট অভিযোগ উত্থাপন করাকে সময়োপযোগী বলে মনে করে। সে অনুযায়ী তারা মালিক কাশিমের বিরুদ্ধে নালিশও পেশ করে।[৪৬৭] এসব অভিযোগ পেয়ে শায়েস্তা খান মালিক কাশিমকে ঢাকায় তলব করায় তিনি এপ্রিলে (১৬৭২ খ্রিঃ) ঢাকায় আসেন। নওয়াব মামলা দুটি আলাদা আলাদাভাবে দেখেন এবং ইংরেজদের সম্পর্কে তিনি ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে দেয়া পরওয়ানা অনুযায়ী বৎসরে ৩০০০.০০ টাকা প্রদানের বিনিময়ে তাদেরকে শুল্কমুক্তভাবে বাণিজ্য করার অনুমতি দেয়ার ব্যাপারে তাঁর দেয়া অঙ্গীকার বহাল রাখার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেন। তিনি অবশ্য উপলব্ধি করেন যে, পরওয়ানা দ্ব্যর্থবোধক এবং সেখানে একাধিক ব্যাখ্যা দেয়ার সুযোগ রয়েছে। তাই ১৬৭২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইংরেজদেরকে আরো দু'টি পরওয়ানা দেন, একটি "মুক্ত বাণিজ্য" করার জন্য, অন্যটি "বন্ধুত্ব স্বরূপ।" প্রথম পরওয়ানাটিতে ইংরেজদের সকল রপ্তানী বা আমদানীকৃত মালকে সুস্পষ্টভাবে শুল্ক-মুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়। তাদের ঋণ আদায়ে সাহায্য এবং তাদের নিজস্ব বা ভাড়া করা নৌকাকে মুক্তভাবে চলাচল করতে সহযোগিতা করার নির্দেশ দেয়া হয় এবং তাদের বাণিজ্যের পথে সকল বাধা দূর বা কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে নিষেধ করা হয়।[৪৬৮] মালিক কাশিম এই খাতে ইংরেজদের নিকট হতে যে টাকা আদায় করেছিলেন, তা ফেরত দিতে সম্মত হন।[৪৬৯] ওলন্দাজদের আবেদন সম্পর্কে শায়েস্তা খান তাদের পক্ষে রায় দেন, মালিক কাশিমের গৃহীত পদক্ষেপকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাকে সেখান থেকে অপসারণের নির্দেশ দেন।[৪৭০] এভাবে দেখা যায় যে, বিদেশী বণিকদের প্রতি শায়েস্তা খানের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ন্যায়সঙ্গত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই ঘটনা থেকে আরো বুঝা যায় যে, তিনি ওলন্দাজদের সঙ্গে মালিক কাশিমের আর্থিক লেন-দেনের বিষয়টি পছন্দ করেননি।

---

৪৬৬ ই.এফ.আই. ১৬৭০-৭৭. পৃঃ ৩৪৭

৪৬৭ ই.এফ.আই. ১৬৭০-৭৭. পৃঃ ৩৪৭

৪৬৮ হুগলী ৭৪. ই.এফ.আই. ১৬৭০-৭৭. পৃঃ ৩৪৯

৪৬৯ ঢাকার পত্র. ২৪ শে জুন. এবং ১১ জুলাই. ১৬৭২. ৭ হুগলী. ৭৭. ৭৯ বিবিধ ৩. ১৭০: ই.এফ.আই. ১৬৭০-৭৭. পৃঃ ৩৫১

৪৭০ ঐ

আমরা দেখেছি যে, বাংলায় আমদানীকৃত পণ্যের প্রশ্নে মালিক কাশিমের সঙ্গে কোম্পানীর বিরোধ সৃষ্টি হয়। কোম্পানীর বিনিয়োগ এবং পণ্য সংগ্রহের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না এবং এই কাজ স্বাভাবিকভাবেই অগ্রসর হয়েছে। হুগলীর নতুন গভর্ণর আজিজ বেগ "অত্যন্ত শান্ত এবং ভদ্র" বলে জানানো হয়েছে এবং তিনি ইংরেজদেরকে বাংলায় তাদের বাণিজ্যের ব্যাপারে সহায়তা করার আশ্বাস দেন।[৪৭১] আমাদেরকে আরো জানানো হয়েছে যে, মুহাম্মদ মুরাদ নামক একজন বন্ধু ভাবাপন্ন গভর্ণরের সহায়তায় কাশিম বাজারের ব্যবসা "ভালভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে।"[৪৭২] হুগলী থেকে প্রেরিত এবং বরাদ্দকৃত অর্থ বণিকরা যথাযথভাবে পেয়ে থাকেন।[৪৭৩] তারা আবার সূদের ভিত্তিতে এবং হুণ্ডির মাধ্যমে "প্রচূর অর্থ" সংগ্রহ করতেন এবং ঢাকা এবং পাটনাতেও প্রেরণ করতেন।[৪৭৪] প্রথম স্থানে বণিকরা প্রায় ৫০,০০০.০০ টাকা বিনিয়োগ করে প্রধানতঃ কাপড় এবং সে বৎসর জাহাজে প্রেরণের জন্য বিভিন্ন পণ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে।[৪৭৫]

শায়েস্তা খানের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত এলাকা, পাটনায় কোম্পানীর জন্য মুক্তভাবে পণ্য সংগ্রহে কিছুটা বাধা ছিল। সেখানে নওয়াব ইব্রাহিম খান ওলন্দাজ এবং ইংরেজ উভয় জাতির বণিকদেরকে কিছু পরিমাণ প্রায় বিনষ্ট জাফরান তাঁর নিকট থেকে প্রায় "দ্বিগুণ মূল্যে ক্রয় করার" জন্য চাপ প্রয়োগ করেছিলেন বলে বর্ণিত আছে। ইংরেজ বণিকরা তাদের মাল হুগলীতে প্রেরণ করার অনুমতি পাওয়ার পূর্বেই ঐ মাল ক্রয় করতে বাধ্য হয়েছিলেন।[৪৭৬] ভবিষ্যতে এ ধরণের হস্তক্ষেপ এড়ানোর লক্ষ্যে কোম্পানীর পাটনার কুঠির প্রধান জব চার্ণক সম্রাটের নিকট থেকে এই পরিস্থিতির প্রতিকার পাওয়ার আশায় একজন যোগ্য উকিল মোগল দরবারে প্রেরণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন।[৪৭৭] বেঙ্গল কাউন্সিল তার এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল।[৪৭৮] তবে ঐ সময় সম্রাটের নিকট এ ধরণের কোন আবেদন প্রেরণ করা হয়েছিল বলে জানা যায় না।

---

৪৭১ ঢাকার পত্র, ২৪ শে জুলাই, ১৬৭২, ৭ হুগলী, ৮১-৮২, ঐ
৪৭২ ই.এফ.আই., ১৬৭০-৭৭ পৃঃ ৩৫২
৪৭৩ কাশিম বাজারের পত্র, ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৪ই মার্চ, ১৭ মে এবং ৯ই অক্টোবর, ১৬৭২, ৭ হুগলী, ৩৩, ৩৮,৬০, ৯৩: ই.এফ.আই., ১৬৭০-৭৭ পৃঃ ৩৫৩
৪৭৪ কাশিম বাজারের পত্র, ১০ই এপ্রিল, ১৭ মে, ৬ এবং ২৯ শে আগষ্ট, ১৬৭২, হুগলী ৫৮-৬০, ৮৩, ৮৭
৪৭৫ ৪ হুগলী, ৪ ই.এফ.আই., পৃঃ ৩৫২
৪৭৬ পাটনার পত্র, ৩রা এবং ১৪ ই জুন এবং সেপ্টেম্বর ১৬৭২। ৭ হুগলী, ৬৬, ৯১-৯২: ৪ হুগলী ৮.৯ ঐ, পৃঃ ৩৫৩
৪৭৭ ৭ হুগলী, ৯৩, ঐ, পৃঃ ৩৫৪
৪৭৮ ৪ হুগলী, ৯: ৪ হুগলী ঐ

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং পাটনার নওয়াব কর্তৃক কিছুটা বিরক্তি সৃষ্টি করা সত্ত্বেও এই বৎসর (১৬৭২) বাংলায় কোম্পানীর ভাল ব্যবসা হয়। জুলাই এবং সেপ্টেম্বরের মধ্যে বাংলায় ইংরেজদের বাণিজ্য শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত আসা জাহাজের মধ্যে সর্বাধিক ছয়টি জাহাজ বালাশোর আসে।[৪৭৯] জাহাজের সংখ্যা থেকেও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, দ্যা রেবেকা নামক ২০০ টনী একটি জাহাজ প্রথমবারের মত হুগলী পর্যন্ত আসে এবং মালপত্র নিয়ে নিরাপদে বালাশোরে ফিরে যায়।[৪৮০] হুগলী পর্যন্ত নিয়মিত চলাচল ঠিক মনে হয়নি এবং বালাশোর থেকে হুগলী পর্যন্ত চলাচলের জন্য এক মাস্তুলের কিছু সংখ্যক পাল তোলা জাহাজ মসলিপট্টম থেকে সংগ্রহ করা হয়।[৪৮১] বণিকগণ একসঙ্গে এতগুলো জাহাজের জন্য মালামাল সংগ্রহে সমস্যার সম্মুখীন হন, বিশেষ করে ওলন্দাজদের সঙ্গে আরেকটি যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রেক্ষপটে (১৭ই মার্চ, ১৬৭২) এবং এগুলোর পারস্পারিক সাহায্য সহযোগিতার জন্য সবগুলো জাহাজকে একসঙ্গে পাঠানো সুবিধাজনক মনে করছিলেন। জাহাজগুলো ৫৪,৭৭,২১৮.০০ টাকার পণ্য নিয়ে ২০ শে ডিসেম্বর বালাশোর ত্যাগ করে।[৪৮২]

তৃতীয় এংলো-ওলন্দাজ যুদ্ধ ১৭ই মার্চ, ১৬৭২ থেকে ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৬৭৪ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এই দুই জাতির গত যুদ্ধের মত এবারও নওয়াব তাঁর রাজ্যের মধ্যে কঠোরভাবে তাদেরকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত করে রাখেন। ফলে, ওলন্দাজদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কোম্পানীর কোন ক্ষতি হয়নি। কারণ ইংরেজ বণিকরা সারাদেশ থেকে যে সকল মালামালই সংগ্রহ করেছিল, তারা তা হুগলীতে গুদামজাত করে রাখে।[৪৮৩] তবে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কোন জাহাজ না আসার ফলে তারা পুঁজির সংকটে পড়ে এবং তাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রমে দারুণ ব্যাঘাত ঘটে। এই পরিস্থিতিতে ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকে ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি পর্যন্ত সর্বশেষ জাহাজে আনা পণ্য সামগ্রী বিক্রি, এই বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং স্থানীয়ভাবে তারা যে পুঁজি সংগ্রহ করতে পারত, তা দ্বারা স্থানীয়ভাবে পণ্য সংগ্রহ, বিশেষ করে যদি অপ্রত্যাশিতভাবে কোন জাহাজ এসে পড়ে, তবে তার জন্য সোরা সংগ্রহের মধ্যেই তাদের বাণিজ্য সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

তবে এই সমস্যা-সঙ্কুল সময়েও বণিকরা হুগলীর সাবেক গভর্ণর মালিক কাশিমের সঙ্গে এক অনৈতিক শত্রুতায় লিপ্ত হয়। হুগলী থেকে অপসারণের পরে

৪৭৯ এইগুলোর মধ্যে ছিল দ্যা রেবেকা.দ্যা জোহান্না. দ্যা লয়াল মার্চেন্ট. দ্যা বার্কেলী ক্যাসল. দ্যা এনি. বার্ণাদিস্তন

৪৮০ ই.এফ.আই.. ১৬৭০-১৬৭৭. পৃঃ ৩৪২

৪৮১ ৭ হুগলী-৫৩. ঐ. পৃঃ ৩৪৩

৪৮২ ৪ হুগলী-১৪. ১৬. ১৮ এবং ২০ ঐ

৪৮৩ হুগলীর পত্র, ৩১ শে মার্চ এবং বালাশোরের পত্র. ২৮শে ডিসেম্বর ১৬৭৪. ৪ পুগমী ১৭৭ এবং ২৩ পূর্বোক্ত ৩৭৯

যখন বালাশোরের গভর্ণরের পদ খালি হয়, তখন তিনি সে পদ লাভের জন্য চেষ্টা করেন। যদিও শায়েস্তা খানের ১৬৭২ খ্রিস্টাব্দের পরওয়ানা ইংরেজ বণিক এবং মালিক কাশিমের মধ্যকার বিবাদের বিষয়টি মিমাংসা করে দেয়। তথাপি তারা তার সম্পর্কে তাদের অবিশ্বাস কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাই তারা ওলন্দাজদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বালাশোরের গভর্ণর হিসেবে তার আসাকে বাধা দিতে চেষ্টা করে।[৪৮৪] মালিক কাশিম অবশ্য তাদের বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম হন এবং ১৬৭২ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে নিয়োগ পেলেও ওলান্দাজদের বাধার কারণে ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ শেষ হওয়ার পূর্বে তাঁর নতুন পদে যোগদান করতে পারেননি।[৪৮৫] এই প্রেক্ষাপটে ইংরেজ বণিক এবং বাংলার উপকূলের প্রধান বন্দরের প্রশাসকের মধ্যে সুসম্পর্কের আশা করা যাচ্ছিল না। মালিক কাশিম অবশ্য এখানে যোগদান করে তাদের প্রতি বন্ধুত্বের ঘোষণা দেন।

অপরদিকে ইংরেজ বণিকরা তাকে সেখান থেকে বহিস্কার করে দেয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করেনি। এই ব্যাপারে তাদের মনোভাব ও কৌশল তাদের মনিব ও অন্যান্যদের নিকট তাদের লেখা পত্র থেকে প্রকাশ পায় এবং এসব পত্রে তারা তাঁর বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। কোন কোন সময় এসব পত্রকে বিদেশী বণিকদের প্রতি নওয়াবের আচরণের প্রতিফলন বলে ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[৪৮৬] মালিক কাশিম খান অবশ্য সাফল্যের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেন এবং তিনি বিরোধীদের কৌশল ব্যর্থ করে দেন। অল্পকাল পরে তাদেরকে এই বলে অনুতাপ করতে হয়েছে যে, "তিনি আমাদের উপদেশের জন্য ভাল। তার উপর রাজার যে আস্থা, তাতে কোন কিছু আদায়ে আমাদের অর্ধেক সময় লাগে এবং আরো সুবিধা এই যে, তিনি তার নিজ কলমে নওয়াবের নিকট যে কোন জিনিষ তার ইচ্ছানুযায়ী পেশ করতে পারেন।"[৪৮৭] আসলে এই দ্বন্দে মালিক কাশিম আগের থেকে আরো শক্তিশালী হয়ে আবির্ভূত হন। ইংরেজদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে তিনি শুধু বালাশোরেই তাঁর অবস্থান অক্ষুন্ন রাখেননি, বরং ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে তাঁর পুত্র মালিক যিন্দিকে হুগলীর গভর্ণরের পদে আসীন করে সেখানেও তাঁর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।[৪৮৮]

---

৪৮৪ ঢাকার পত্র, ২৪ শে জুলাই, ১৬৭২, ৭ হুগলী-৮১-৮২ এবং বালাশোরের পত্র ৩রা এপ্রিল, ১৬৭১,৪ঠা হুগলী, ৪৯: ই.এফ.অই. ১৬৭০-৭৭, পৃঃ ৩৫১ এবং ৩৬১

৪৮৫ বালাশোরের পত্র, ৩১ শে মার্চ, ১৬৭৩, ৪ঠা হুগলী, ৪৪: পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬০

৪৮৬ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, জে.ই.পি. এইচ.এ. ১ম খন্ড, সংখ্যা-১, মার্চ, ১৯৬৮, পৃঃ ২২-২৪

৪৮৭ বালাশোরের পত্র, ১লা এবং ২৭ শে আগস্ট, ১৬৭৩, ৪ হুগলী, ৭৫, ৮২: ই.এফ.আই., ১৬৭০-১৬৭৭, পৃঃ ৩৬২

৪৮৮ বালাশোরের পত্র, ৭ অক্টোবর, এবং ২৮শে ডিসেম্বর, ১৬৭৪, ৪ হুগলী, ৮, ২৩ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৭৭

১৬৭২ সালে জাহাজে করে আমদানীকৃত পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রেও বণিকদের প্রচেষ্টা তেমন ফলপ্রসু হয়নি। এর কারণ ছিল এই যে, ইংরেজদের তৈরী পণ্যের জন্য বাস্তবে তেমন কোন চাহিদা ছিল না। বিশেষ করে বাংলা এবং অন্যান্য স্থানে তাদের চওড়া পশমী কাপড়ের চাহিদা না থাকার কারণে ১৬৭৩ এবং ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে বণিকরা লিখেছে যে, ইউরোপ থেকে আসা কাপড়ে তাদের গোডাউন (গুদাম) ভর্তি; তাছাড়া দেশী বণিকদের হাতে এত বেশী কাপড় অবিক্রিত আছে যে, তারা আর কাপড় গ্রহণ করবে না।[৪৮৯] বালাশোরে ক্ষেমচাঁদ নামক একজন হিন্দু বণিকের নিকটই ছিল ৩০০০.০০ টাকা মূল্যের সম পরিমাণ কাপড়। কিছু পরিমান কাপড়, সীসা এবং পিতলের পাত রঘুনাথ নামক আরেকজন বণিকের সঙ্গে ঢাকায় হস্তান্তরযোগ্য মসলিনের সঙ্গে বিনিময় করা হয়।[৪৯০] হুগলীতে "কয়েক বৎসর যাবৎ কাপড় পড়ে আছে এবং নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।" এজন্য সেখানকার ইংরেজ কুঠিয়ালকে সোরার সঙ্গে বিনিময় করা বা যে মূল্যে সম্ভব সে মূল্যেই ঐ কাপড় বিক্রি করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।[৪৯১] কাশিম বাজারের কুঠিয়ালকে খরচ মিটাতে হ্রাসকৃত মূল্যে মালামাল বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহের জন্য ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল।[৪৯২] আর ঢাকার কুঠিয়ালকে বলা হয়েছিল যে, বিভিন্ন লোকের কাছে বিক্রির জন্য যে সমস্ত মালামাল দেয়া হয়েছিল, কিন্তু বিক্রি হয়নি, অবিক্রিত রয়ে গেছে, সেগুলো সংগ্রহ করে এনে হুগলীতে পাঠিয়ে দিতে। কারণ সেখানে গুদামজাত করে রাখার জন্য অধিকতর সুবিধা ছিল।[৪৯৩] এই বিষয়গুলো কুঠিয়ালদের অভিযোগ যে বিশ্বাসযোগ্য নয়, তাই প্রকাশ করে; ইংরেজ কোম্পানী কর্তৃক আমদানীকৃত পণ্যের উপর মালিক কাশিমের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সত্যিই কোন আকর্ষণ ছিলনা। এমনকি কোন স্থানীয় বণিককে বিদেশী বণিকদের সঙ্গে ব্যবসা করা থেকেও বিরত রাখা হয়নি। ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে ওলন্দাজদের দ্বারা ধৃত পণ্য দিয়ে বাজার সয়লাব করে দেয়া হয়। তারা এ সকল পণ্য শুধু খুব কম দামেই বিক্রি করেনি, বরং ইংরেজদের জন্য অপমানজনক এবং নিজেদের বিজয়ের স্মারক হিসেবে প্রদর্শনও করে।[৪৯৪] এমন কি বাজারের এই মন্দাভাবের জন্যও তারা তাদের স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী নওয়াবের সরকারের ত্রুটি দেখতে পায় এবং ইংরেজদের পণ্যের জন্য এই

---

৪৮৯ ই.এফ.আই., পৃঃ ৩৫৮, ৩৭২ এবং ৩৭৩

৪৯০ বালাশোরের পত্র, ৩রা মার্চ এবং ১১ই এপ্রিল, ১৬৭৩, ৪ হুগলী, ৪২, ৪৯: উপরোক্ত পৃঃ ৩৫৮

৪৯১ বালাশোরের পত্র, ২৭ শে জুন এবং ২৮ শে জুলাই, ১৬৭৩, ৪ হুগলী, ৬৬, ৭৩ পূর্বোক্ত

৪৯২ হুগলীর পত্র, ২২ শে নভেম্বর, ১৬৭৩, ৪ হুগলী, ৯৩-৯৪ পূর্বোক্ত।

৪৯৩ ঐ

৪৯৪ বালাশোরের পত্র, ৪ঠা জুলাই এবং ২৮শে ডিসেম্বর ১৬৭৪, ৪ হুগলী, ১৩১, ই.এফ.আই, ১৬৭০-১৬৭৭, পৃঃ ৩৭২

চাহিদার অভাবকে তারা মোগল কর্মকর্তাদের "কৃপণ স্বভাবের" প্রতি দোষারোপ করে এবং তারা তাদের মনিবদের নিকট লিখে যে, "যদি কোন যুবক নবাব হয়ে না আসে বা কোন রাজার পুত্র ঢাকার বর্তমান নওয়াবের উত্তরাধিকারী না হয়"[৪৯৫] তাহলে তাদের চওড়া পশমী কাপড় বিক্রির কোন আশা নেই।

ইংরেজদের মালামাল বিক্রির অভাব এবং কোন জাহাজ না আসার কারণে কুঠিয়ালদের তীব্রভাবে অর্থের ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে কাশিম বাজার এবং ঢাকায় বিনিয়োগ বন্ধ করে দেয়া হয়।[৪৯৬] কিন্তু পুঁজি যাই ছিল, তা পাটনায় স্থানান্তর করে সোরার জন্য বিনিয়োগ করা হয়। ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দের প্রাথমিক মাসগুলোতে কোম্পানীর আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়, যখন ১৬৭২ সালে জাহাজে করে আনা চওড়া পশমী কাপড়ের আধা-আধি হয় বিক্রি হয়ে যায়, নতুবা অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে বিনিময় করা হয় এবং ১৭০ টন সিসাও বিক্রি সম্পন্ন হয়।[৪৯৭] কুঠিয়ালরা হুণ্ডির মাধ্যমে আরও ৬০,০০০.০০ টাকা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়।[৪৯৮] ইতিমধ্যে ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী ওলন্দাজদের সঙ্গে যুদ্ধের অবসান হয় এবং আগস্ট ও সেপ্টেম্বরের মধ্যে কোম্পানীর ৩টি জাহাজ যথা দ্যা এডভাইস, দ্যা ল্যাংকাষ্টার এবং দ্যা ফিনিক্স বালাশোরে এসে পৌঁছে। তারা নগদ এবং পণ্য মিলিয়ে ২,৭৯,৭৮০.০০ টাকা (£২৭,৯৭৮) নিয়ে আসে। তাছাড়া হুণ্ডির মাধ্যমে তাদেরকে ২,০০,০০০.০০ টাকা (£২০,০০০) সংগ্রহ করার অনুমতি দেয়া হয়।[৪৯৯] এই জাহাজগুলো আসার পরে ঢাকা এবং কাশিম বাজারের কুঠিয়ালদেরকে তাদের বিনিয়োগ পুনরায় শুরু করার নির্দেশ দেয়া হয়। কাশিম বাজারের ভিনসেন্টকে যথেষ্ট পরিমাণ কাঁচা রেশম, বুটি তুলার সূতা এবং কালো তাফাতি প্রেরণের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। আর ঢাকার এলউইসকে বলা হয় ১৫,০০০.০০ টাকা মূল্যের সরু কোসাফস প্রেরণ করতে। যেহেতু মানের দিক দিয়ে নিম্ন হওয়ার কারণে কোম্পানী দক্ষিণ ভারতীয় সোরা দেশে প্রেরণ করতে নিষেধ করে দিয়েছিল। অন্যদিকে, পাটনার জব চার্ণককে যত বেশি সম্ভব সোরা সংগ্রহের জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছিল।[৫০০]

---

৪৯৫ ৪ হুগলী ১২১: ঐ. পৃঃ ৩৭৩
৪৯৬ বালাশোরের পত্র. ১৬ মার্চ. ১৬৭৩. এবং হুগলীর পত্র ২২ শে নভেম্বর. ১৬৭৩. ৪ হুগলী. ৩৫ এবং ৯৪ পূর্বোক্ত পৃঃ ৩৫৮
৪৯৭ ই.এফ.আই.. ১৬৭০-১৬৭৭. পৃঃ ৩৭৩
৪৯৮ হুগলীর পত্র. ৩১ শে মার্চ. ১৬৭৪. ৪ হুগলী. ১১৪: পূর্বোক্ত. পৃঃ ৩৮২
৪৯৯ ই.এফ.আই.. ১৬৭০-১৬৭৭. পৃঃ ৩৮২
৫০০ ই.এফ.আই.. ১৬৭০-১৬৭৭. পৃঃ ৩৭৪

এই সময়ের কোন নথিপত্রে ঢাকা এবং কাশিম বাজারের কুঠিয়ালদের কোন নিয়োগ বা পণ্য সংগ্রহে কোন রকম হস্তক্ষেপ দেখা যায় না। ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দের প্রথমার্ধে ঢাকা থেকে হুম্মুম (একটি পুরু ও মজবুত কাপড়) এবং সরু মসলিন, কাশিম বাজার থেকে তাফাতী এবং সিল্ক, পাটনা থেকে সোরা এবং বোরাক্স বালাশোরে আনা হয়।[৫০১] শুধুমাত্র পাটনায় কুঠিয়ালদের কিছুটা সমস্যার সম্মুখীণ হতে হয়েছিল। সেখানে ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে একজন নতুন নওয়াব ইব্রাহীম খানের স্থলাভিষিক্ত হন। নতুন সুবাদার সম্রাটের নিকট লিখেন যে, ইংরেজরা ব্যাপকভাবে বাণিজ্য করে যাচ্ছে। কিন্তু তারা কোন শুল্ক দেয় না। জওয়াবে সম্রাট তাকে রাষ্ট্রের স্বার্থ যেন কোনভাবে ক্ষতি না হয়, তা দেখার জন্য নির্দেশ দেন। এরপর সুবাদার তারা যে হুগলীতে শুল্ক দেয় তার প্রমাণ পেশ করার জন্য ইংরেজ এবং ওলন্দাজদেরকে আহবান জানান।[৫০২] ইংরেজ কুঠিয়ালরা চিন্তা করে যে, শুল্ক পরিশোধ সনদ সংগ্রহের জন্য শায়েস্তা খানের বরাত দিলে বিষয়টি জটিল হয়ে উঠতে পারে। তাই তারা "বৎসরে যে ৩০০০.০০ টাকা প্রদান করত, তার সমর্থনে বহু বৎসরের পূরনো একটি রশিদ অতি কষ্টে হুগলীর গভর্ণরের নিকট থেকে সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দেয়ার মধ্যেই নিজেদের প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ করে রাখে।"[৫০৩] অন্যদিকে ওলন্দাজরা নওয়াব শায়েস্তা খানের নিকট থেকে এই মর্মে একটি সনদ গ্রহণ করে যে, তারা বৎসরে নিয়মিতভাবে ৩০,০০০.০০ টাকা থেকে ৪০,০০০.০০ টাকা প্রদান করে থাকে।[৫০৪] সম্ভবত: সনদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে ইংরেজ এবং ওলন্দাজদের মধ্যে এই পার্থক্য হেতু ইংরেজদেরকে এই অঙ্গীকারের ভিত্তিতে হুগলীতে সোরার চালান প্রেরণ করার অনুমতি দেয়া হয় যে, তাদেরকে চার মাসের মধ্যে তাদের পণের উপর শুল্ক প্রদান করার স্বপক্ষে নওয়াব শায়েস্তা খানের নিকট হতে একটি পরওয়ানা সংগ্রহ করতে হবে।[৫০৫] অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসব্যাপী কোম্পানীর ৫টি ছোট জাহাজ ঢাকা, কাশিম বাজার এবং পাটনা থেকে মালামাল নিয়ে বোঝাই করার কাজে ব্যস্ত থাকে।[৫০৬] ১৬৭৪ সালের ডিসেম্বরের ১৭ তারিখে জাহাজগুলো ২,৪৬,২৪৮.০০ টাকার পণ্য সামগ্রী নিয়ে বালাশোর ত্যাগ করে।[৫০৭]

---

৫০১ হুগলীর পত্র, ৩১ শে মার্চ, ১৬৭৪, ৪ হুগলী ,১২০: পূর্বোক্ত , পৃঃ ৩৭৩
৫০২ ঐ পৃঃ ৩৭৪-৩৭৫
৫০৩ ই.এফ.আই.. পৃঃ ৩৭৫
৫০৪ ঐ
৫০৫ ঐ
৫০৬ ঐ ৩৬৮
৫০৭ ঐ. পৃঃ ৩৬৯

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৬৭২ খ্রিস্টাব্দে পাটনায় যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল, তা চার্ণককে সম্রাটের নিকট থেকে একটি প্রয়োজনীয় ফরমান সংগ্রহের জন্য বেঙ্গল কাউন্সিলকে আহবান জানাতে উদ্বুদ্ধ করে। ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে পাটনার নতুন গভর্ণরের চাহিদা জেনে চার্ণকের অনুরোধের প্রতি আরো অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। তাই মদ্রাজ কাউন্সিলের সম্মতি পাওয়া না গেলেও ক্লাবেল এবং তার বাংলার কাউন্সিল সম্রাটের দরবারে একজন উকিল প্রেরণ করার জন্য চার্ণককে ক্ষমতা দান করে।[৫০৮] ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে উকিলের মৃত্যুতে এই বিষয়ে আলোচনার অগ্রগতি এখানেই থেমে যায়।[৫০৯] ইতিমধ্যে নওয়াব শায়েস্তা খানের নিকট থেকে শুল্ক পরিশোধ সম্পর্কে একটি সনদ সংগ্রহ করার জন্য প্রচেষ্টা শুরু হয় এবং ১৬৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি তা প্রদান করেন।[৫১০] ইতিমধ্যে বাংলা এবং পাটনায় ১৬৭৫ সালের জন্য স্বাভাবিক বিনিয়োগ কার্যক্রম এগিয়ে চলে। জুলাই এবং আগস্ট মাসে ৫টি জাহাজ যথা- দ্যা এ্যানি, দ্যা লয়্যাল সাবজেক্ট, দ্যা সাকসেস, দ্যা ইউনিটি এবং দ্যা সামুয়েল এন্ড হেনরি বালাশোরে এসে পৌঁছে।[৫১১] সেপ্টেম্বর মাসে শুল্ক পরিশোধ সংক্রান্ত শায়েস্তা খানের প্রদত্ত সনদ পাটনার সমস্যা দূর করে। কারণ তার পরে সেখান থেকে মাল প্রেরণ সংক্রান্ত আর কোন হস্তক্ষেপের উল্লেখ নেই।[৫১২]আগস্টের শেষের দিকে সোরা বোঝাই ১৫টি নৌকা পাটনা থেকে হুগলী এসে পৌঁছে।[৫১৩] ২০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ১৪০০০ মন পাটনার সোরা হুগলীতে গ্রহণ করা হয় এবং আরও ৫৫০০ মন পাটনায় প্রস্তুত ছিল।[৫১৪] নভেম্বরের শেষে চার্ণক কর্তৃক প্রেরিত সকল মাল বালাশোরে গ্রহণ করা হয়।[৫১৫] একই সময়ে কাশিম বাজার থেকে প্রেরিত ৮৭,৪১৮.০০ টাকা মূল্যের মালও এসে পৌঁছে।[৫১৬] এই সকল মাল নিয়ে ১৬৭৫ সালের ডিসেম্বরের কোন এক তারিখে জাহাজগুলো বালাশোর ত্যাগ করে।

---

৫০৮ ই.এফ.আই., ১৬৭০-১৬৭৭, পৃঃ ৩৭৫। ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই মার্চ কোম্পানী এক পত্রে মোগল দরবারে কোন উকিল প্রেরণের প্রস্তাব নাকচ করে দেয়।

৫০৯ ঐ, ই.এফ.আই., ১৬৭০-১৬৭৭, পৃঃ ৩৯৫)

৫১০ বালাশোরের পত্র, ২৯ শে সেপ্টেম্বর, ১৬৭৫, ৪ হুগলী, ৭৩

৫১১ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৯৫

৫১২ চার্লস ফসেট অবশ্য মোগল কর্মকর্তাদের দ্বারা কোম্পানীর বাণিজ্য বাধাগ্রস্থ হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন (ই.এফ.আই., ১৬৭০-১৬৭৭, পৃঃ ৩৯৫)। তার গ্রন্থের একই পৃষ্ঠার ১ম ও ৩য় অনুচ্ছেদ তুলনা করলে অবশ্য বুঝা যায় যে, এই বাধাগ্রস্থ হওয়া বলতে বুঝায় নৌকা প্রতি ২.০০টাকা হারে ঘাট ভাড়া না দেয়া

৫১৩ ই.এফ.আই., ১৬৭০-১৬৭৭, পৃঃ ৩৯০

৫১৪ ঐ

৫১৫ ঐ, পৃঃ ৩৯৩

৫১৬ ঐ, পৃঃ ৩৯২

১৬৭৫ সালে জাহাজে করে যে মূলধন আনা হয়, তা থেকে কোম্পানী বাংলার কুঠিগুলোর জন্য যে পরিমাণ বরাদ্দের ইচ্ছা করেছিল, তার চেয়ে £২০০০ কম দেয়া হয়েছে।[৫১৭] স্পষ্টতই মাদ্রাজের কাউন্সিল এবং এজেন্টরা সেখানকার জন্য বরাদ্দের চেয়ে বেশি রেখে দিয়েছিল। তা সম্ভবতঃ ১৬৭৬ সালের বিনিয়োগের জন্য যথেষ্ঠ ছিল, কারণ সে বৎসর পুঁজির সংকট সম্পর্কে আর কিছু শোনা যায়নি। সে বৎসরের প্রধান আগ্রহ কেন্দ্রীভূত ছিল ষ্ট্রেনশ্যাম মাষ্টারের কার্যবিবরণী নিয়ে। বাংলার কুঠিগুলোতে যে সকল অনিয়ম ছিল, বিশেষ করে ক্ল্যাভেল, হল এবং ভিনসেন্টের মধ্যে যে ঝগড়া-বিবাদ ছিল, সে সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য কোম্পানী তাকে নিয়োগ দিয়েছিল। কারণ গত কিছু দিন যাবত বাংলায় নিযুক্ত কোম্পানীর এই কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা পরিচালনা, কোম্পানীর হিসাব রক্ষা, তাদের জ্যেষ্ঠতা, বেঙ্গল কাউন্সিলে তাদের অগ্রাধিকার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তীব্র মতভেদ ও বিবাদে লিপ্ত ছিল। মাষ্টার কোম্পানীর জাহাজ দ্যা ঈগল, দ্যা ফ্যালকন এবং দ্যা সুরাট মার্চেন্ট নামক জাহাজ তিনটির কোন একটিতে চড়ে ১৬৭৬ সালের ২৩শে আগস্ট বাংলায় এসে পৌছেন।[৫১৮] মাষ্টার নিজে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন,[৫১৯] তা থেকে দু'ধরণের তথ্য প্রকাশ পায়। বাংলার কুঠিয়ালদের কার্যকলাপ এবং একই সঙ্গে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের বিষয়ও জানা যায়। এক শ্রেণীর তথ্য থেকে কোম্পানীর ব্যবসা সম্পর্কে জানা যায় এবং তাতে একথা লিপিবদ্ধ আছে যে, স্থানীয় ব্যবসায়ীরা কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবসা করতে ছিল অনিচ্ছুক। কারণ সীসা এবং চওড়া পশমী কাপড় আংশিক মূল্য পরিশোধ করে নিতে তাদের বাধ্য করা হত। যদিও তারা তাদের হাতে বিপুল পরিমাণ অবিক্রিত থাকার অভিযোগ পেশ করতো।"[৫২০] এই বিষয়টি আবারও নিশ্চিত করছে যে, বাংলায় ইংরেজদের তৈরী পণ্যের তেমন একটা চাহিদা ছিল না এবং তাদের পণ্যের এই ধীর কাটতির জন্য আসলেই মোগল কর্মকর্তাদের বা মালিক কাশিমের বাধা দায়ী ছিল না। ইংরেজদের আমদানীকৃত পণ্যের উপর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কোন কর্মকর্তার অভিলাষের কারণে কোন স্থানীয় বণিককেই ইংরেজদের পণ্যের ব্যবসা করতে বিরত রাখা হয়নি এবং বিপরীতে বরং ইংরেজ কুঠিয়ালরাই স্থানীয়

---

৫১৭ বালাশোরের পত্র, ২৯ শে সেপ্টেম্বর, ১৬৭৫, ৪হুগলী, ৭৩: পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৯১

৫১৮ ই.এফ.আই., ১৬৭০-১৬৭৭, পৃঃ ৪০০। এর আগে ৩১ জুলাই দ্যা জোহান্না নামের আরেকটি জাহাজ বালাশোরে এসে পৌছে

৫১৯ স্ট্রেনশ্যাম মাষ্টারের ডায়রী, ২য় খন্ড, লন্ডন, ১৯১১

৫২০ মাষ্টারের ডায়রী, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩০৩-৩০৪

ব্যবসায়ীদেরকে আংশিক মূল্য পরিশোধ করে তাদেরকে ইংরেজদের পণ্য গ্রহণ করতে "বাধ্য করত"। অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় যে, ইংরেজ কুঠিয়ালদের ঔদ্ধত্য এবং অনিয়মিত আচরণ এত বেশি ছিল যে, তাদের নিজেদের মধ্যে পারস্পারিক কোন্দল না থাকলে তা সম্ভবতঃ কখনোই প্রকাশ পেত না। এসব টুকরো টুকরো তথ্য থেকে জানা যায় যে, কোন কোন কুঠির প্রধান মাঝে মাঝে স্থানীয় লোকজনকে প্রদত্ত ঋণ বা অগ্রিমের টাকা আদায়ের জন্য বা পণ্য সরবরাহের চুক্তি পূর্ণ করার জন্য তাদের ধরে এনে আটক করে রাখত আবার কখনো কখনো মারধরও করত।[৫২১] এইসব নির্যাতন মাঝে মাঝে সীমা ছাড়িয়ে যেত এবং নির্যাতিত ব্যক্তি আহত হয়ে মারাও যেত। মাস্টার নিজেও এইরূপ একটি বড় ধরণের ঘটনা পর্যালোচনা করেছিলেন। ঘটনাটি ছিল এই যে, কাশিম বাজার কুঠির প্রধান ভিন্সেন্টের নির্দেশে বা সম্মতিতে রঘুনাথ পোদ্দার নামক একজন নির্যাতিত ব্যক্তি অত্যাধিক পিটুনির কারণে মারা যায়। মারটা দিয়েছিল কুঠির দালাল অনন্তরাম। মাষ্টারের মতে চুক্তি বলবৎ করার জন্য এই ধরণের দৈহিক শক্তি প্রয়োগ দেশটির প্রথানুযায়ী ন্যায়সঙ্গত। যদিও এই মতের সমর্থনে কদাচিতই কোন প্রমাণ মিলে। এই ধরণের দুষ্কর্মে ভিন্সেন্টের সহযোগিতা করার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়ায় তিনি তাকে নির্দোষ ঘোষণা করেন।[৫২২] কিন্তু এর চেয়ে বেশি লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে হৈ যে, মাষ্টার এ বিষয়ে বিচারের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট অনন্ত রামকে হস্তান্তর না করার পক্ষে ভিন্সেন্টের কাজকে অনুমোদন করেছেন এবং অন্য কথায় ১৩,০০০.০০ টাকার বিনিময়ে বিষয়টি ধামা-চাপা দেয়ার কাজকে সমর্থন জানান।

যেহেতু ভিন্সেন্ট যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট বিষয়টি উত্থাপন করলে কুঠিয়ালদের আরো বেশি অর্থব্যয় করতে বা সমস্যায় জড়িয়ে পড়তে হতে পারে।[৫২৩] যে সমস্ত বিষয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব রয়েছে, সে সমস্ত বিষয়ে তাদেরকে এড়িয়ে চলার এই যে মানষিকতা, এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে একই বৎসর কুঠিয়ালদের দ্বারা "ডি সয়ইটো কেস" নামের আরেকটি মামলা পরিচালনার ইঙ্গিত।[৫২৪] এই মামলাটির উৎপত্তি হয় ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে। সে বৎসর গোমেজ ডি সয়ইটো নামের একজন পর্তুগীজ বণিক 'মে ফ্লাওফার' নামের কোম্পানীর এক জাহাজে দারুচিনির একটি চালান পারস্যে প্রেরণ

৫২১ মাষ্টারের ডায়রি ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৮, ৩৫০-৫১, ৩৫৩, ৩৫৮ এবং ৩৭১

৫২২ ঐ, পৃঃ ১৫৩-৫৪, দেখুন ই.এফ.আই., ১৬৭০-৭৭, এই মামলার একটি সুন্দর সারাংশ আছে, পৃঃ ৪০২-৪০৪

৫২৩ মাষ্টারের ডায়রী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬-৪৭, ৩৫০-৫১, ৩৫৩-৫৪, ৩৫৮-৫৯ এবং ৩৬৭

৫২৪ ঐ, ই.এফ.আই., ১৬৭০-৭৭, পৃঃ ৪১৩-১৪

করেন। পর্তুগীজ বনিকটি অল্প কিছু দিন পরেই মারা যান। তার পুত্র পাসকল অভিযোগ করে যে, ঐ মাল ৬০০০.০০ টাকা বিক্রয় করা হয়েছে। কিন্তু ইংরেজ কুঠিয়ালরা তাকে সে টাকা দেয়নি, বরং ১৬৫৭ সালে মাত্র ৫০০.০০ টাকা দেয়। তার প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য বার বার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর অবশেষে ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে তিনি টাকার দাবীতে নওয়াব শায়েস্তা খানের নিকট আবেদন করেন। যে কাজীর নিকট মামলাটি বিচারের জন্য প্রেরণ করা হয়, তিনি ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে পাসকলের পক্ষে ফায়সালা করেন এবং তাকে "৫৩০০.০০" টাকা প্রদানের জন্য রায় দেন।

ফউসেট উল্লেখ করেছেন যে, "এই ফায়সালা খুবই ন্যায় সঙ্গত।"[৫২৫] তথাপি ঢাকার কুঠিয়াল হার্ভে হুগলীর প্রধানের নিকট এই মত ব্যক্ত করেন যে, যদি কাজীর এই ফায়সালা কার্যকরী করতে দেয়া হয়, তাহলে এর পর বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে যে, কোম্পানীর বিরুদ্ধে এই ধরণের আরো বহু দাবী উত্থাপন করা হবে।"[৫২৬] সে অনুযায়ী মামলাটি মিমাংসা করার জন্য হার্ভে যা ভাল মনে করেন, সে মোতাবেক অর্থ ব্যয় ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য হার্ভেকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়।[৫২৭] নওয়াবের কর্মচারীদেরকে প্রচূর ঘুষ দিয়ে প্রায় ৯০০০.০০ টাকা (পাসকলের অনুকূলে কাজীর দেয়া রায়ের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ বেশি অর্থ) ব্যয় করে হার্ভে ১৬৭৬ সালের জুনে মামলাটি বালাশোরে পুনর্বিবেচনা করার জন্য নওয়াবের নিকট থেকে একটি আদেশ বের করতে সক্ষম হয়।" ঢাকা থেকে বালাশোরে কোম্পানীর প্রভাব অনেক বেশি ছিল।[৫২৮] পরবর্তীতে দেখা যায় যে, পাসকলকে মাত্র ১০০০.০০ টাকা পরিশোধ করে মামলাটি নিষ্পত্তি করা হয়।[৫২৯] রঘু পোদ্দার এবং ডি সয়ইটোর মামলা দুটি থেকে দেখা যায় যে, ইংরেজ কুঠিয়ালদের কার্যকলাপ সর্বদা নিয়ম মাফিক ছিল না। কাজেই তাদের নিয়ম বহির্ভূত কার্যকলাপের বিষয়ে তদন্তের ভয়ে তারা স্থানীয় প্রশাসনের আইন সঙ্গত কর্তৃত্ব এড়িয়ে যেতে আগ্রহী ছিল এবং এই শেষোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা কোন অপরাধকে গোপন করা বা বিচারের ধারাকে প্রভাবিত করতে মোটেই দ্বিধা করেনি। ঘটনাচক্রে জানা যায় যে, ডি সয়ইটোর মামলাটি মীমাংসার জন্য ঢাকা থেকে বালাশোরকে অগ্রাধিকার দেয়ায় বালাশোরে মালিক কাশিমের প্রশাসন সেখানে ইংরেজদের অবস্থানকে আদৌ ক্ষতিগ্রস্থ করেনি।

---

৫২৫ ই.এফ.আই., ১৬৭০-১৬৭৭, পৃঃ ৪১৩-১৪

৫২৬ ঐ

৫২৭ ঐ

৫২৮ ঐ

৫২৯ ই.এফ.আই., পৃঃ ৪২২-২৩। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন রিচার্ড টেম্পলের "ষ্টোরি অব মে ফ্লাওয়ার এন্ড হার কারগো" মাষ্টারের ডায়রী, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৭-৮৬

যদিও মাষ্টারের তদন্ত কুঠিয়ালদের ব্যতিব্যস্ত করে রাখে, তথাপি জাহাজের জন্য যথারীতি পণ্য সংগ্রহ সম্পন্ন করা হয়েছে। নভেম্বরের শুরুতেই বিভিন্ন কুঠির মালামাল পাটনা থেকে সোরা, কাশিম বাজার থেকে তাফাতিজ, হলুদ এবং ঢাকা থেকে কাপড় বালাশোরে প্রেরণের উদ্দেশ্যে হুগলীতে আনা হয়। এই পর্যায়ে এসে দেখা যায় যে, মাষ্টারের তদন্ত প্রক্রিয়ায় যে সময় ব্যয় হয়, তা পুষিয়ে নিতে তাড়াহুড়া করে কুঠিয়ালরা যথাযথ বৈধ ছাড়পত্র ছাড়াই নৌকা বালাশোরে প্রেরণ করে। বাস্তবে জন বৈয়্যাম নামে কোম্পানীর হুগলী কুঠির একজন বড় কর্মচারী বৈধ ছাড়পত্র ছাড়াই বল প্রয়োগ করে একটি নৌকাকে ছেড়ে দিতে চেষ্টা করে।[৫৩০] এতে হুগলীর গভর্ণর মালিক যিন্দী কোম্পানীর নৌকা চলাচল বন্ধ করে দেন এবং কুঠিরের কয়েকজন কর্মচারীকেও বন্দী করেন। তিনি সম্ভবত: জরিমানা হিসেবে বৎসরে প্রদেয় তিন হাজার টাকার উপঢৌকনের অতিরিক্ত ৫০০.০০ টাকা দাবী করেন।[৫৩১] এই বিপদের সম্মুখীন হয়ে বেঙ্গল কাউন্সিল গভর্ণরকে শান্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা তাঁকে ৫টি আধা-টুকরার চওড়া পশমী কাপড়ের একটি ক্ষুদ্র উপঢৌকন প্রেরণ করেন এবং তারা সময় মত নৌকা চলাচলের আটকাদেশ প্রত্যাহার এবং যাদেরকে বন্দী করা হয়েছিল, তাদেরকে মুক্ত করে নিতে সক্ষম হন।[৫৩২] কাউন্সিল বৈয়্যামের আশোভন আচরণের জন্য তাকে ১০০.০০ টাকা জরিমানা করে।[৫৩৩] যদিও মালিক যিন্দী অতিরিক্ত ৫০০.০০ টাকার দাবী পরিত্যাগ করেন এবং কোম্পানীর নৌকা চলাচল উন্মুক্ত করে দেন। কিন্তু কিছু দিন পরেই তিনি অনতিবিলম্বে বৎসরে প্রদেয় ৩০০০.০০ টাকা উপঢৌকন পরিশোধ করার দাবী জানান। তিনি কুঠির উকিলকে বন্দী এবং আবার নৌকা চলাচল বন্ধ করার পূর্বে কুঠিয়ালরা নতি স্বীকার করেননি এবং শেষ পর্যন্ত ২রা ডিসেম্বর অর্থ পরিশোধ করেন।[৫৩৪]

কুঠিয়ালদের আসল সমস্যা সৃষ্টি হয় তখন, যখন শায়েস্তা খান সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট থেকে কোম্পানীর সকল মালামালের উপর ২% হারে শুল্ক ধার্য করার নির্দেশ লাভ করেন।[৫৩৫] বৎসরে তিন হাজার টাকা প্রদানের বিনিময়ে

---

৫৩০ ই.এফ.আই., ১৬৭০-১৬৭৭, পৃঃ ৪০৮। আরো দেখা যায় মাষ্টারের ডায়রী, ২য় খন্ড, পৃ: ৪৩-৪৪

৫৩১ মাষ্টারের ডায়রী, ২য় খন্ড, পৃ: ৪৩-৪৪। মাষ্টার অবশ্য বিষয়টি অস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন এবং মালিক যিন্দীর এই পদক্ষেপের পিছনে কোন সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখ না করে তিনি লিখেছেন যে, আমাদেরকে হেয় করা, নৌকা থামিয়ে কোম্পানীর ব্যবসা বন্ধ করা, আমাদের মালামাল ও কর্মচারীদেরকে আটক করার জন্য তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে

৫৩২ ঐ

৫৩৩ ঐ

৫৩৪ মাষ্টারের ডায়রী, এবং ই.এফ.আই., ১৬৭০-১৬৭৭, পৃঃ ৪০৯

৫৩৫ ঐ, ২য় খন্ড, পৃঃ ৬৮-৬৯

বাংলায় শুল্ক মুক্তভাবে ব্যবসা করার যে প্রথা ছিল, তা হচ্ছে নওয়াব এবং কুঠিয়ালদের মধ্যে স্থিরিকৃত একটি ব্যবস্থা মাত্র। স্পষ্টত সম্রাট এ বিষয়টি অবহিত ছিলেন না। কাজেই, শুল্ক ধার্য করার জন্য তাঁর নির্দেশ অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, এই বিষয়টির সূত্রপাত ঘটে সাম্রাজ্যের ঐ অংশে কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে পাটনার সুবাদারের একটি প্রতিবেদন থেকে এবং পরে নূতন করে একটি ফরমান সংগ্রহের জন্য সম্রাটের দরবারে একজন উকিল প্রেরণ থেকে। সে যাই হোক, সম্রাটের এই ফরমান পাওয়ার পরে শায়েস্তা খান একটু বিচলিত হয়ে পড়েন। কারণ এ যাবতকাল পর্যন্ত তিনি কোম্পানীর সঙ্গে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দের পরওয়ানাকেই কঠোরভাবে অনুসরণ করতেন। তবে তিনি শাহী আদেশকে কার্যকরী করার জন্য অবিলম্বে হুগলী এবং বালাশোরের গভর্ণরদ্বয়ের নিকট নির্দেশ পাঠান।[৫৩৬] সে সময়ে ঢাকা কুঠির দায়িত্বে নিযুক্ত কুঠিয়াল ফিটস নেধাম নওয়াবের কর্মচারীদের ঘুষ দিয়ে শুল্ক ধার্য করার নির্দেশ প্রেরণ করতে ৭দিন বিলম্ব ঘটাতে সক্ষম হন। ফলে মালিক যিন্দী এই নির্দেশ পান ১৫ ডিসেম্বর। যদিও ৩রা ডিসেম্বর তা প্রেরণের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল।[৫৩৭] অপর দিকে মাষ্টার এবং বেঙ্গল কাউন্সিল ১১ ডিসেম্বর, নওয়াবের জন্য ৩টি উত্তম পারস্যের ঘোড়া উপঢৌকন হিসেবে প্রেরণ করে। তারা ধারণা করেছিল যে, সমস্যাটা সম্ভবত নওয়াবকে অনেক আগের থেকে প্রতিশ্রুত উপঢৌকন দিতে ব্যর্থতার জন্যই এটা হয়েছে।[৫৩৮] কোম্পানী বাংলায় যে সুবিধা ভোগ করে ব্যবসা করে আসছিল, তা নিশ্চিত করে জরুরী ভিত্তিতে একটি শাহী ফরমান লাভের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মাষ্টার কোম্পানীকে লিখে।[৫৩৯] নেধামের পদক্ষেপের কারণে যে অবকাশ পাওয়া গিয়েছিল, সে সুযোগে হুগলীর কুঠিয়ালরা প্রচুর পরিমাণ পণ্য বালাশোরে প্রেরণ করতে সক্ষম হয়; এবং এই মালামাল দিয়ে ৪টি জাহাজ বোঝাই করা হয় এবং জাহাজগুলো ২১ ও ৩১ শে ডিসেম্বর বালাশোর ত্যাগ করে চলে যায়।[৫৪০]

অতএব, ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দের মালামাল প্রেরণের পথে শুল্ক আরোপের জন্য শাহী ফরমান কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। বলা হয়েছে যে, শুল্ক আরোপ করার নির্দেশ পাওয়ার পরে মালিক যিন্দী বালাশোরে মালামাল স্থানান্তরের জন্য অনুমতি

৫৩৬ মাষ্টারের ডায়রী, ২য় খন্ড, পৃঃ ৬৮-৬৯
৫৩৭ ১ হুগলী, ২: ই.এফ.আই., ১৬৭০-১৬৭৭, পৃঃ ৪০৯
৫৩৮ মাষ্টারের ডায়রী, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৯৯ এবং ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৫, ৬৮, ৭৩, ৭৮
৫৩৯ ঐ, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৯০-৯৫
৫৪০ ঐ, ২য় খন্ড, পৃঃ ৭০, ৯০-৯২,৯৩, ১০৯

দিতে অস্বীকৃতি জানান। ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দের প্রাথমিক কয়েক মাস পর্যন্ত শুল্ক পরিশোধ করার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। পণ্য আটক করা ছাড়াও কুঠিয়ালদের উপর বিভিন্ন রকম চাপ প্রয়োগ করেন।[৫৪১] যেহেতু এ সময়টা ছিল বৎসরের শুরু এবং এই সময়ে কুঠিয়ালরা মূলতঃ বিনিয়োগ কার্যক্রমেই ব্যস্ত থাকতো, পণ্য সংগ্রহ এবং বালাশোরে প্রেরণ করত না। তাই মালিক যিন্দী যে পণ্য আটক করেছে বলা হয়, তা আসলে ছিল ঐ সকল পণ্য, যা গত বৎসরের শেষের দিকে জাহাজগুলো বালাশোর ত্যাগ করার সময় হুগলিতেই রয়ে গিয়েছিল। বাংলায় কোম্পানী যে বাণিজ্যিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তা, বিবেচনা করে ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দের ফ্রেব্রুয়ারীতে মাদ্রাজ কাউন্সিল সম্রাটের নিকট থেকে একটি নতুন ফরমান সংগ্রহের জন্য মাষ্টারের পরামর্শকে অনুমোদন করে এবং এই ফরমান সংগ্রহের জন্য যা করা প্রয়োজন, তা করার জন্য ক্ল্যাভেল এবং তার বঙ্গীয় কাউন্সিলকে ক্ষমতার্পণ করে।[৫৪২] ইতিমধ্যে বাংলার কাউন্সিল ও শায়েস্তা খানের নিকট একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। এতে অনুকূল সাড়া পাওয়া যায়। তিনি এ বিষয়ে সম্রাটকে পুনরায় লিখে জানান, সম্ভবত বাংলায় কোম্পানীর ব্যবসার অবস্থা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন এবং এই ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ই মে, তাঁর সকল কর্মকর্তার নিকট এ বিষয়ে সম্রাটের অন্য কোন নির্দেশ না আসা পর্যন্ত শুল্ক সংগ্রহ বন্ধ রাখার জন্য আদেশ জারী করেন।[৫৪৩]

শাহী ফরমান দ্বারা যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল, নওয়াবের আদেশে তা দূর হয়। গত বৎসরের বিনিয়োগের বিপরীতে কাশিম বাজারে যে বিপুল পরিমাণ মালামাল সংগৃহীত হয়েছিল, তা ইতিমধ্যেই হুগলীতে প্রেরণ করা হয়েছিল। তাই ২৮০ বেল রেশমী পণ্য ১৬৭৭ সালের মধ্যে সরবরাহের জন্য নতুন করে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়।[৫৪৪] টাকশালে যে স্বর্ণ প্রেরণ করা হয়েছিল, "তা প্রচুর টাকা এবং সোনার মোহরে রূপান্তর করার পর বিনা হস্তক্ষেপেই" গৃহীত হয়েছিল, ফলে কুঠিয়ালগণ সূদের ভিত্তিতে যে অর্থ ঋণ করেছিলেন, তা ফেরত প্রদান করতে সক্ষম হন।[৫৪৫] অনুরূপভাবে পাটনায় সোরার জন্য বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও অগ্রগতি সাধিত হয়। তাছাড়া চার্ণককে কাশিম বাজার থেকে ১০০০.০০ টাকা নগদে এবং তার

---

৫৪১ ই.এফ.আই., ১৬৭০-১৬৭৭, পৃঃ ৪১৭
৫৪২ ই.এফ.আই., ১৬৭০-১৬৭৭, পৃঃ ৪১৬
৫৪৩ ঐ, পৃঃ ৪১৭
৫৪৪ ১ কাশিম বাজার ১২, ১৩, ১৬, ১৮; ৮ ও ১২ এপ্রিল, ৫ই মে এবং ৭ই জুনের এন্ট্রি; ই.এফ.আই., ১৬৭০-১৬৭৭
৫৪৫ ১ কাসিম, ৭-৮, ঐ

প্রয়োজনীয় অবশিষ্ট অর্থের জন্য একটি ঋণ পত্র (LC) দেয়া হয়।[৫৪৬] পরে তিনি ১৮৫০.০০ টাকার একটি বিল হুগলীতে প্রেরণ করেন, যা জুনে গৃহীত হয়।[৫৪৭] ঢাকার কুঠি বিনিয়োগ কাজের জন্য স্থানীয়ভাবে ১০,০০০.০০ টাকা ঋণ করে।[৫৪৮]

২৭শে জুলাই থেকে ৩রা সেপ্টেম্বরের মধ্যে তিনটি জাহাজ যথা- দ্যা বেঙ্গল মার্চেন্ট, দ্যা সিজার এবং দ্যা লন্ডন বালেশ্বরে পৌঁছে।[৫৪৯] কোম্পানী বাংলার কুঠিগুলোর জন্য £৫৫,০০০.০০ এর স্বর্ণ পিণ্ড এবং £১৭,০৩৪.০০ এর পণ্য-সামগ্রী প্রেরণ করে।[৫৫০] অধিকাংশ স্বর্ণ এবং মালামাল হুগলীতে প্রেরণ করা হয় এবং সেখান থেকে কাশিম বাজার, পাটনা এবং ঢাকায় বিক্রি এবং বিনিয়োগের জন্য প্রেরণ করা হয়।[৫৫১] গত বৎসরের মত এবারও মালিক যিন্দী বাৎসরিক প্রদেয় উপঢৌকন ৩০০০.০০ টাকা বৎসরের শুরুতেই দাবী করেন। কুঠিয়ালগণ তাদের নৌকা চলাচলের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি এড়ানোর জন্য অর্থ পরিশোধ করে দেন।[৫৫২]

কাশিম বাজারে প্রেরিত স্বর্ণের বৃহদাংশই ছিল পাটনা কুঠিতে বিনিয়োগের জন্য। কারণ কোম্পানী তাদের সোরার চাহিদা ৬০০ টন থেকে ১০০০ টনে উন্নীত করেছিল।[৫৫৩] স্বর্ণ বিক্রি করতে বেগ পেতে হওয়ায় বিভিন্ন কুঠিতে বিনিয়োগ কার্যক্রম কিছুটা বাধাগ্রস্থ হয়। এর কারণ ছিল এই যে, সম্রাট ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে সকল বেসরকারী লোকদের স্বর্ণকে শাহী টাকশালে মুদ্রায় রূপান্তর করতে ৫% হারে করারোপ করেন।[৫৫৪] এই নতুন কর ধার্য করায় বণিকরা স্বর্ণ ক্রয় করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। তারা ক্রুযাদোজ (Cruzados, পর্তুগীজদের এক ধরণের মুদ্রা) গ্রহণ করতেও অস্বীকার করে। কারণ তা স্থানীয় মুদ্রার সঙ্গে বিনিময় করা খুব কঠিন ছিল। যদিও ১৬৭৭ সালে জাহাজে আসা অর্থের বেশির ভাগই ছিল ক্রুযাদোজ।[৫৫৫] কুঠিয়ালগণ কোম্পানীকে মুদ্রা ছাপানোর জন্য ধার্যকৃত কর থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য নওয়াব এবং সম্রাটের দীওয়ানদ্বয়ের (যথা রায় নন্দলাল এবং হাজী শফি খান) নিকট আবেদন করেন। কিন্তু সম্রাট কর্তৃক অব্যাহতি

---

৫৪৬ ১কাশিম, ১২,১৩, ১৬, ১৮ ঐ

৫৪৭ ১ হুগলি ২০ ঐ পৃ ৪২৩

৫৪৮ ঢাকার পত্র, ২৪ শে আগস্ট, ১৬৭৭, ৭হুগলী, ১৩, ঐ পৃঃ ৪২১

৫৪৯ জাহাজ তিনটি বালেশ্বরে পৌঁছে যথাক্রমে ২৭ শে জুলাই, ১৯ শে আগস্ট এবং ৩র সেপ্টেম্বরে

৫৫০ ই.এফ.আই., ১৬৭০-১৬৭৭, পৃঃ ৪২৪, ৪২৫ এবং ৪২৭

৫৫১ ই.এফ.আই., ১৬৭০-১৬৭৭, পৃঃ ৪২৪

৫৫২ ১ হুগলী, ৩৪: ৭ ও ৯ই অক্টোবরের এন্টি, ই.এফ.আই পৃঃ ৪২৮

৫৫৩ ই.এফ.আই., ১৬৭০-১৬৭৭, পৃঃ ৪২৪

৫৫৪ ১কাশিম, ১০ ঐ পৃঃ ৪২১

৫৫৫ ঐ, পৃঃ ৪৩৫, ৪৩৬, বেঙ্গল এবং মদ্রাজ পেপাস, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৯, ৩২

দেয়া না হলে তারা তাদের অপারগতা প্রকাশ করেন।[৫৫৬] তথাপি কুঠিয়ালগণ কাশিম বাজার থেকে রাজমহলে নিয়ে সকল স্বর্ণ-রৌপ্যকে সোনার মোহর এবং টাকায় রূপান্তর করতে সক্ষম হন।[৫৫৭] টাকশালের জন্য নির্ধারিত কর দেয়া হয়েছিল কিনা, তা অবশ্য জানা যায়নি। সময়ে সময়ে স্বর্ণ বিক্রির কাজ চলে।[৫৫৮]

মুদ্রা ছাপানো করের বিষয়টি ছাড়াও ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে আরও দুটি প্রশাসনিক পরিবর্তন বাংলায় কোম্পানীর কারবারে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। এর একটি ছিল সম্রাটের তৃতীয় পুত্র সুলতান মুহাম্মদ আযমকে বিহারের সুবাদার নিয়োগ এবং পাটনায় তাঁর সদর দপ্তর স্থাপন এবং অপরটি ছিল শায়েস্তা খানকে বাংলা থেকে প্রত্যাহার করে নেয়া। শাহজাদা আযম আগষ্টের কোন এক সময়ে পাটনায় এসে সাবেক প্রশাসকের স্থলাভিষিক্ত হন।[৫৫৯] তিনি সম্ভবত: ইংরেজদের পণ্যের উপর শুল্ক আরোপ করার বিষয়ে সম্রাটের আদেশের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল হয়েই পাটনায় এসেছিলেন। পাটনায় পৌঁছার পরে অবিলম্বে তিনি ঐ আদেশ কার্যকরী করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর দীওয়ান শুল্ক পরিশোধ না করা পর্যন্ত সোরার নৌকা হুগলীর উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিতে বা সেখান থেকে পাটনায় স্বর্ণ আমদানী করতে অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন।[৫৬০] সম্রাটের নিকট শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত পূনর্বিবেচনা করার যে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে, তার জওয়াব আসার বিষয়টি অমিমাংসিত রেখেই ৩% হারে শুল্ক ধার্য করে মোট ১২০০.০০ টাকা দীওয়ান এবং তাঁর সহকারীর নিকট জমা দেয়ার পরই শুধু সোরার নৌকা হুগলীর উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে একটি আপোষরফা হয়।[৫৬১] অনুরূপভাবে, বাংলায় শুল্ক প্রদান করা হয়েছে মর্মে রশিদ প্রদর্শন করার পরেই পাটনায় স্বর্ণ আসতে অনুমতি দেয়া হয়। ডিসেম্বর মাসে হুগলীর গভর্ণরকে গত বৎসরের উপঢৌকন হিসেবে যে ৩০০০.০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে, সে রশিদ দেখিয়ে বাংলায় শুল্ক প্রদানের শর্ত পূরণ করা হয়।[৫৬২]

কুঠিয়ালগণ সেপ্টেম্বর মাসে শায়েস্তা খানকে প্রত্যাহারের খবর পান এবং পরবর্তী সুবাদার তাদের বাণিজ্যিক সুবিধার প্রতি কি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন, তা চিন্তা করে একটু শংকিত হয়ে পড়েন। তারা কাশিম বাজারের তাঁতীদের নিকট

---

৫৫৬ ঢাকার পত্র, ২৪ শে আগস্ট, ১১, ২২ এবং ২৭ শে অক্টোবর এবং ১৬ নভেম্বর, ১৬৭৭, ৭হুগলী, ১১, ১৩, ৩০, ৩৪, বালাশোরের পত্র ৪ঠা জানুয়ারী,১৬৭৮ বি.এম.পি. প্রথম খন্ড পৃঃ ৪০

৫৫৭ ই.এফ.আই., ১৬৭০-১৬৭৭, পৃঃ ৪৩৫

৫৫৮ ই.এফ.আই., ১৬৭০-১৬৭৭, পৃঃ ৪৩৬

৫৫৯ ই.এফ.আই., ১৬৭০-১৬৭৭, পৃঃ ৪২৩

৫৬০ ই.এফ.আই., ১৬৭০-১৬৭৭, পৃঃ ৪৩০-৪৩৫

৫৬১ বি.এম.পি., ১ম খন্ড, পৃঃ ১৩-১৫: ৭ হুগলী ২৬-২৭: ই.এফ.আই., ১৬৭০-১৬৭৭, পৃঃ ৪৩১

৫৬২ ই.এফ.আই., ১৬৭০-১৬৭৭, পৃঃ ৪৩৬-৩৭

নতুন করে অগ্রিম প্রদান সীমিত করে দেন[৫৬৩] এবং ইতিমধ্যে তারা তাদের মুক্ত বাণিজ্যের অনুকূলে শায়েস্তা খানের নিকট থেকে আরেকটি পরওয়ানা লাভের চেষ্টা করেন।[৫৬৪] শায়েস্তা খান সে সময় অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন এবং তিনি আর কোন নতুন পরওয়ানা প্রদান করেননি। তিনি ডিসেম্বর মাসে ঢাকা ত্যাগ করেন।

এইসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বিভিন্ন কুঠি থেকে প্রেরিত মালামালের পরিমান ছিল সন্তোষজনক। চার্ণক পাটনা থেকে ৮,৫৪৮ ব্যাগে মোট ১৫,৪৬৮ মণ সোরা প্রেরণ করেন।[৫৬৫] আর কাশিম বাজার কুঠি থেকে প্রায় ৪০০ বেল রেশম এবং আনুপাতিক পরিমাণ তাফাতি প্রেরণ করা হয়। অনুরূপভাবে হুগলী কুঠি চুক্তি মোতাবেক প্রায় পুরো মলমল এবং রুমাল সরবরাহ করে এবং বালেশ্বর কুটি চাহিদা মত ক্যালিকো (বিছানার চাদর বা পোশাকের জন্য সাদা বা রঙ্গিন নকশা করা বস্ত্র বিশেষ) সরবরাহ করে।[৫৬৬] শুধু মাত্র ঢাকা কুঠির কুঠিয়াল সর্বাধিক সময় নওয়াবের দরবারে আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত থাকায় কোম্পানীর চাহিদা ১৩০০০টি মলমল ও কোসায়েরের মধ্যে মাত্র ৩০০০টি সরবরাহ করেন।[৫৬৭] এই সকল মালামাল নিরাপদেই বালেশ্বরে এনে পৌঁছানো হয় এবং এইসব পণ্য নিয়ে ২৫শে এবং ২৯শে ডিসেম্বর তিনটি জাহাজ বন্দর ত্যাগ করে।

নওয়াব শায়েস্তা খানের বাংলা ত্যাগ এবং ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দ সমাপ্তির সঙ্গে বাংলায় কোম্পানীর শান্তিপূর্ণ এবং বর্ধিষ্ণু বাণিজ্যেরও সমাপ্তি ঘটে। নওয়াব শায়েস্তা খান ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ক্ষেত্রে ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দের পরওয়ানাকেই দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করতেন। যখন হুগলীর গভর্ণর মালিক কাশিম এই প্রশ্ন তোলেন যে, ইংরেজদের আমদানীকৃত পণ্য পরওয়ানার অন্তর্ভুক্ত নয়, তখন শায়েস্তা খান ইংরেজদের অনুকূলে ফায়সালা প্রদান করেন এবং সকল সংশয় অবসানের জন্য এই বিষয়ে নূতন করে ইংরেজদের আমদানী ও রপ্তানীকৃত সকল পণ্য অন্তর্ভূক্ত করে আরেকটি পরওয়ানা জারী করেন এবং বৎসরে মাত্র ৩০০০.০০ টাকা উপঢৌকন প্রদানের শর্ত বহাল রেখে তাদেরকে শুল্ক প্রদান থেকে অব্যাহতি দেন। এমনকি এরপরও ইংরেজ কুঠিয়ালগণ অযৌক্তিকভাবে মালিক কাশিমের সঙ্গে তাদের শত্রুতা চালিয়ে যেতে থাকেন এবং তাকে বালেশ্বরের গভর্ণরের নতুন পদ থেকে হটিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। কোম্পানীর আমদানীকৃত পণ্য নিয়ে মালিক কাশিম একচেটিয়াভাবে ব্যবসা করতে চায় বলে

---

৫৬৩ বি.এম.পি., ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৪: কাশিম বাজারের পত্র ২৪ শে নভেম্বর, ১৬৭৭, ৭ হুগলী, ৫১ হুগলীল পত্র, ২৮ শে নভেম্বও, ১৬৭৭, ৪ হুগলী, ৪০: ঐ, পৃঃ ৪৩৮

৫৬৪ বি.এম.পি., ১ম খন্ড, পৃঃ ২৬: ঐ, পৃঃ ৪৪১

৫৬৫ বি.এম.পি., ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৮

৫৬৬ বি.এম.পি., ১ম খন্ড, পৃঃ ১১, ১৭ এবং ৩৬

৫৬৭ বি.এম.পি., ১ম খন্ড, পৃঃ ১২

তাদের যে অভিযোগ, তা সত্য নয়। কারণ কুঠিয়ালদের বক্তব্য থেকেই তর্কাতীতভাবে জানা যায় যে, ইংরেজদের পণ্যের জন্য তখন বাংলা বা অন্য কোন স্থানে তেমন কোন চাহিদা সৃষ্টি হয়নি। কাজেই মালিক কাশিম বা অন্য কোন কর্মকর্তার ঐসব পণ্য নিয়ে একচেটিয়া ব্যবসা করার জন্য উৎসাহ জন্মাতে পারেনা। বিপরীতক্রমে, কুঠিয়ালরা কখনো কখনো তাদেরকে সরবরাহকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করত এবং বলপূর্বক তার আংশিক মূল্য স্থানীয় বণিকদের থেকে আদায় করে তাদের নিকট ইংরেজদের ঐ পণ্য গছিয়ে দিত।

এই সময়ে কুঠিয়ালদের মধ্যে সৃষ্ট অন্তর্ঘাতমূলক কলহ-বিবাদ এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, কোম্পানী তাদের বিষয়ে তদন্ত করার জন্য ষ্ট্রেনশ্যাম মাষ্টারকে প্রেরণ করে। মাষ্টারের তদন্তের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, যারা তাদের সঙ্গে বাণিজ্য করত, কুঠিয়ালরা তাদের সঙ্গে সর্বদা ন্যায় সঙ্গত এবং নিয়মতান্ত্রিক আচরণ করত না। কুঠিয়ালরা পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় বণিক এবং সরবরাহকারীদের উপর দৈহিক নির্যাতনও করত এবং অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে নির্যাতিতের মৃত্যু ঘটে। কুঠিয়ালরা তাদের বিরুদ্ধে কোন দাবীর ব্যাপারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিচার ব্যবস্থাকে প্রতিহত করত এবং বিচার এড়িয়ে চলত। এই উদ্দেশ্যে তারা বিচার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতেও চেষ্টা করত।

এই সময়ের শেষের দিকে পাটনায় তাদের সম্প্রসারণশীল ব্যবসা সেখানকার নূতন সুবাদারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি তাদের প্রতি শুল্ক প্রদানের প্রশ্ন তোলেন। ঠিক এই সময়েই ইংরেজ কুঠিয়ালরা নতুনভাবে একটি ফরমান নেয়ার জন্য ভালভাবে চিন্তা ভাবনা শুরু করে। অথচ আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণের পরেই তাদের উচিত ছিল এই ফরমান নেয়া। সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে ইংরেজদের ব্যাপক ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে পাটনার গভর্ণরের নিকট থেকে অবহিত হয়ে ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট তাদের উপর শুল্ক আরোপ করার জন্য শাহী ফরমান জারী করেন। শায়েস্তা খান এক সময় শাহী ফরমান কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু ইংরেজদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে তিনি এই বিষয়ে সম্রাটের নিকট থেকে আবার সিদ্ধান্ত চেয়ে পাঠান এবং ইত্যবসরে তিনি ইংরেজদের বাংলায় ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দের পরওয়ানা অনুযায়ী বাণিজ্য করার অনুমতি প্রদান করেন। ইংরেজরা বাংলায় যে বাণিজ্যিক সুবিধা ভোগ করে আসছিল, তার নিশ্চয়তাসহ সম্রাটের নিকট হতে একটি ফরমান লাভের জন্য এই সময়েই একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করার জন্য তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এইভাবে ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দ শেষ হওয়ার সঙ্গে বাংলায় ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্যিক ইতিহাসে একটি নতুন যুগের সুচনা হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়[৫৬৮]

বাংলায় ইংরেজদের প্রথম যুদ্ধ

১. বাংলায় শায়েস্তা খানের অনুপস্থিতি এবং অন্তবর্তী সময়

শায়েস্তা খান ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর ঢাকা ত্যাগ করেন। ঐ সময় থেকে ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রত্যাবর্তনকালীন সময় পর্যন্ত পর পর দু'জন সুবাদার বাংলা শাসন করেন। প্রথম জন ছিলেন আওরঙ্গজেবের দরবারের একজন প্রভাবশালী আমীর, ফিদাই খান। তিনি নওয়াব আযম খান উপাধি ধারণ করে ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে প্রদেশের সুবাদার হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[৫৬৯] মাত্র চার মাস পরে ২৪শে মে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী হন শাহজাদা সুলতান মুহাম্মদ আযম, যিনি ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দের ৬ই অক্টোবর পর্যন্ত বাংলায় অবস্থান করেছিলেন।

আমরা দেখেছি যে, সম্রাট ২% হারে শুল্ক এবং ৫% হারে মুদ্রা ছাপানো কর আরোপের জন্য আদেশ দিয়েছিলেন।[৫৭০] এই বিষয়ে শায়েস্তা খান ইংরেজদের পক্ষ হয়ে সম্রাটের নিকট লিখেছিলেন এবং ইত্যাবসরে আগের সুবিধাজনক শর্তেই তিনি ইংরেজদেরকে বাংলায় বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়েছিলেন। অবশ্য এই পর্যন্ত সম্রাটের জওয়াব এসে পৌঁছেনি; কুঠিয়ালগণ সম্রাটের নিকট হতে ফরমান লাভের জন্য বাস্তবে কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করেননি। যদিও তাদের তখন এরূপ একটি ফরমানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছিল।[৫৭১]

তবে তারা আশু পদক্ষেপ হিসেবে শুল্ক-মুক্তভাবে বাণিজ্য করার সুবিধা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে সম্রাটের নিকট প্রেরিত প্রস্তাবের কোন জওয়াব না আসা পর্যন্ত শুল্ক-মুক্তভাবে বাণিজ্য করার লক্ষ্যে একটি পরওয়ানার জন্য নওয়াবের

---

৫৬৮ মূল বইয়ের একবিংশ অধ্যায়

৫৬৯ চার্নকের নিকট ভিসেন্ট এবং অন্যান্যরা হুগলী, ১৬ই নভেম্বর, ১৬৭৭ বি,এম,পি, ১ম খন্ড, পৃঃ ৫৮। স্যার যদুনাথ সরকার আযম খানের সুবাদারীর বিষয়টি উল্লেখ থেকে বিরত থেকেছেন এবং বলেছেন যে, শায়েস্তা খানের পরে সুবাদার হন শাহজাদা মুহাম্মদ আযম। হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ২য় খন্ড, ডি ২৫, ১৯৪৮ পৃঃ ৩৮১

৫৭০ পূর্ববর্তী পৃঃ লিটল টনের নিকট ভিন্সেন্ট এবং অন্যান্যরা ১৭ই নভেম্বর, ১৬৭৮ বি.এম.পি ১ম খন্ড পৃঃ ৬০

৫৭১ ঐ, পৃঃ ৫৬, ৬০

নিকট আবেদন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ ধরণের একটি পরওয়ানা পাওয়ার আশা যখন হ্রাস পায় এবং সম্রাটের জওয়াব আসতে বিলম্ব ঘটে, তখন তারা একটি শাহী ফরমান লাভের জন্য জরুরী প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে তারা তাদের ঢাকা, কাশিমবাজার এবং পাটনার কুঠিয়ালদেরকে বিনিয়োগের ব্যাপারে সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দেন।[৫৭২] এভাবে বিনিয়োগ হ্রাস বা স্থগিত রাখাকে কুঠিয়ালরা তাদের এই সময়ের পত্রে প্রায়ই কোম্পানীর বাণিজ্য 'বন্ধ' অথবা কোম্পানীর বাণিজ্যের উপর "নিষেধাজ্ঞা" আরোপ বলে উল্লেখ করেছেন। তবে এখানে অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, স্থানীয় সরকার দ্বারা তাদের কোন বাণিজ্য বন্ধ বা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি। শাহী ফরমান দ্বারা যা বুঝানো হয়েছিল তা হচ্ছে, ইংরেজরা সর্বাধিক ২% ভাগ হারে শুল্ক দিয়ে স্বাধীনভাবে মালামাল ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে। যেমন করে থাকে ওলন্দাজ এবং অন্যান্যরা। ইংরেজদের দ্বারা আমদানীকৃত পণ্য বিক্রি বন্ধের কোন ঘটনা কখনই ঘটেনি, কারণ ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি জাহাজে করে যে সকল মালামাল এবং স্বর্ণ আনা হয়েছিল, তা শায়েস্তা খান ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে চলে যাওয়ার আগেই বিভিন্ন কুঠিতে বিতরণ করে দেয়া হয়েছিল এবং আরেকবার জাহাজে করে ইউরোপে মাল চালান দেয়ার লক্ষ্যে পণ্য সামগ্রী সংগ্রহ এবং এই উদ্দেশ্যে তা হুগলী ও বালেশ্বরে প্রেরণের জন্য তখনও সময় হয়নি।

১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে বাংলায় কোম্পানীর প্রধান ম্যাথুস ভিন্সেন্ট এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ বালেশ্বরে ছিলেন, কারণ গত ডিসেম্বরে জাহাজে মালামাল চালান দেয়ার লক্ষ্যেই তারা এখানে চলে এসেছিলেন। যাহোক, নতুন নওয়াব ইতিমধ্যেই হয়ত ঢাকায় চলে এসেছেন, এইরূপ ধরে নিয়ে তারা ঢাকার কুঠিয়াল ফিটস নেধামকে লিখেন যে,"৭ থেকে ৯টি মোহর এবং ১৫টি টাকা" নিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাত করুন, যদি এর মধ্যে তার সঙ্গে সাক্ষাত না করে থাকেন এবং তাকে আরো নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন "আমাদের বাণিজ্যের প্রতি তাঁর সরকারের আনুকূল্য" কামনা করেন; যেমন আনুকূল্য তাঁর পূর্বে প্রদান করেছেন শাহজাদা শুজা এবং অন্যান্য উমরাহগণ.. ..[৫৭৩]" যদি নওয়াব নথিপত্র দেখতে চান যে, কুঠিয়ালদের এই সুবিধার ভিত্তি কিসের উপর। তাহলে নেধাম যেন সম্রাট কর্তৃক শুল্ক নির্ধারণ করে দেয়ার পূর্বে শায়েস্তা খান কর্তৃক ইস্যুকৃত পরওয়ানা তাকে দেখান।

---

[৫৭২] লিটলটনের প্রতি ভিসেন্ট এবং অন্যান্যরা হুগলী, ১৭ নভেম্বর, ১৬৭৭, ঐ, পৃঃ৬০। আরো দেখুন পৃঃ ৭৬, ৮৯, ৯৩

[৫৭৩] ভিন্সেন্ট এবং অন্যান্যগণ লিখেছেন নেধামকে ৪ঠা জানুয়ারী, ১৬৭৮, বি, এম, পি, ১ম খন্ড পৃঃ ৭১

এটা অবশ্য জানা যায়নি যে, নির্দেশ মত নেধাম ৭ থেকে ৯টি মোহর নওয়াবকে দিয়েছিলেন কিনা? যা হোক, বাংলার প্রধান ও অন্যান্য কুঠিয়ালগণ জানুয়ারীর শেষে হুগলীতে ফিরে আসেন এবং ১১ই ফেব্রুয়ারী নওয়াব এবং তাঁর দীওয়ানের জন্য উপঢৌকনসহ স্যামুয়েল হার্ভেকে[৫৭৪] ঢাকায় প্রেরণ করেন। তার সঙ্গে বিক্রির জন্য ৩৬,৫৩২ টাকা, ৪ আনা এবং ২ পয়সার পণ্য-সম্ভার প্রেরণ করেন; এর মধ্যে স্বর্ণও অন্তর্ভূক্ত ছিল।[৫৭৫] উপঢৌকন এবং বিক্রির জন্যে প্রদত্ত মালামালের সঙ্গে হার্ভেকে যে সকল দলিলপত্র দেয়া হয়েছিল, তা হচ্ছে শাহ শুজার নিশান (অনুমতিপত্র) এবং শায়েস্তা খানের প্রদত্ত ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দের পরওয়ানা। ১৬৭২ খ্রিস্টাব্দের পরওয়ানাসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র ছিল পাটনায় এবং সেখান থেকে এনে হার্ভের নিকট পাঠানো হবে। তবে তাকে

---

৫৭৪ স্যামুয়েল হার্ভে ছিলেন ঢাকার প্রধান কুঠিয়াল। তিনি জাহাজে মালামাল প্রেরণের জন্য বালেশ্বর গিয়েছিলেন।

৫৭৫ হার্ভের প্রতি ভিন্সেন্ট এবং অন্যান্যগণ, হুগলী, ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৬৭৮, বি.এম.পি, ১ম খন্ড, পৃঃ ৭৭। নওয়াবকে যে উপহার দিতে হার্ভেকে বলা হয়েছিল, তা হচ্ছে "উৎকৃষ্ট লাল বস্ত্র (স্কারলেট) ২টি, মোটা লাল বস্ত্র (স্কারলেট) ৯টি

"উৎকৃষ্ট মিহি সবুজ কাপড়	-	১টি
বেগুনি কাপড়	-	১টি
আসমানী রঙের কাপড়	-	১টি
চওড়া পুরু পশমী কাপড়	-	১৩টি
সবুজ চওড়া পুরু কাপড়	-	৭টি
৪০.০৫´´ আয়না	-	২টি
বাঁধাই করা আয়না ২৯´´	-	১টি
বিলেতি ঘড়ি	-	১টি
আবরী ঘোড়া	-	১টি
১১ কভেট লম্বা এবং ৪ কভেট চওড়া ইরানী রেশমী কার্পেট		১ জোড়া
৬ কভেট লম্বা এবং ৩ কভেট চওড়া দামী এমব্রয়ডারী করা ইরানী রেশমী কার্পেট		এক জোড়া
গাড় লাল মখমল	-	১০ গজ
গ্রীণ মখমল	-	১০ গজ
রূপালী ও সোনালী ফিতা এবং আরো কয়েক প্রকারের জিনিষ আপনার পছন্দমত দিয়ে তার একটি বিবরণ আমাদের নিকট পাঠিয়ে দিবেন।" নওয়াবের দীওয়ানের জন্য উপঢৌকন হিসেবে হার্ভেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল,		
"উৎকৃষ্ট লাল বস্ত্র	-	১টি
চওড়া পুরু পমশী বস্ত্র	-	৩টি
চওড়া পুরু পমশী সবুজ বস্ত্র		২টি
২৮´´ আয়না	-	১টি
প্রায় ২০/২৫ গজ সোনালী এবং রূপালী ফিতা এবং অন্যান্য কিছু বস্ত্র তাকে এবং তার কয়েকজন কর্মকর্তাকে, যাদেরকে উপঢৌকন দেয়া আপনি প্রয়োজন মনে করেন এবং উক্ত বর্ণিত বিষয়ে আমাদের দ্রুত ও সময়মত পরামর্শ দেবেন।"		

নতুনভাবে পরওয়ানা নেয়ার জন্য ১৬৭২ খ্রিস্টাব্দের দলিলটি দেখিয়েই চেষ্টা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, যেহেতু অন্যান্য দলিল-পত্রগুলো আরো "কঠোরভাবে লেখা" ছিল।[৫৭৬] এই প্রসঙ্গে বুঝা যায় যে, হুগলী প্রধান (কোম্পানীর বাংলার প্রধান) এবং কাউন্সিল প্রথম দিকের দলিল দস্তাবেজগুলোর ত্রুটি সম্পর্কে অধিক মনোযোগী ছিলেন। বিশেষ করে শাহ শুজার ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দের নিশান, যে সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এটি নেয়া হয়েছিল ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দের শাহী ফরমানের অর্থের ভুল ব্যাখ্যা করে। এই ফরমান স্থলপথে পশ্চিম উপকূলের পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল এবং সে জন্য শুল্ক প্রদানও আবশ্যক ছিল।[৫৭৭] শাহ শুজার নিশান এবং পরবর্তীকালে ইংরেজদেরকে বিশেষ বাণিজ্য সুবিধা দেয়ার সময় সুবাদারদের দেয়া পরওয়ানাগুলোতে লেখা থাকতো যে, "শাহী ফরমান অনুযায়ী।" ইংরেজদের অবস্থানের এই দূর্বলতা সম্পর্কে উপলব্ধি থেকেই হুগলী কুঠির প্রধান এবং কাউন্সিল কর্তৃক নতুন নওয়াবের জন্য পরওয়ানা লেখার দায়িত্ব প্রাপ্ত অফিসারের পিছনে ৩০০.০০ টাকা থেকে ৪০০.০০ টাকা ব্যয় করার নির্দেশ দিয়ে বলা হয় যে, পরওয়ানা যেন "শাহী ফরমান অনুযায়ী" কথা পরিবর্তন করে লেখা হয় "ইংরেজদের জন্য বাংলায় প্রচলিত ব্যবস্থা" অনুযায়ী। হার্ভেকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় যে, যদি এইরূপ করা সম্ভব হয়, তাহলে এসব দেশে আমাদের মনিবের ভোগকৃত সুবিধা সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে। বিশেষ করে (আল্লাহ না করুন) আমরা যদি এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটি শাহী ফরমান লাভ করতে ব্যর্থ হওয়ার মত দুর্ভাগ্যের শিকার না হতে চাই।"[৫৭৮]

অপরদিকে নওয়াব আযম খান শুল্ক আরোপের বিষয়ে শাহী আদেশ কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত নেন এবং ঢাকা পৌঁছার অল্প কিছু দিন পরেই তিনি এই ব্যাপারে আদেশ জারী করেন। এই আদেশ হুগলী পৌঁছে ১২ ফেব্রুয়ারি হার্ভে উপঢৌকন ও পণ্য-সামগ্রী নিয়ে ঢাকা রওয়ানা হওয়ার মাত্র ১ দিন পরে।[৫৭৯] এই ঘটনা ইংরেজদেরকে নিজেদের অনুকূলে একটি শাহী ফরমান লাভের ব্যাপারে আরো আগ্রহী করে তোলে। ইতিমধ্যে ৯ই ফেব্রুয়ারী হুগলীর প্রধান এবং কাউন্সিল পাটনার কুঠিয়াল জব চার্নকের নিকট এই বিষয়ে শায়েস্তা খানের সঙ্গে দিল্লীতে একজন উকিল পাঠানোর জন্য লিখেন।

---

[৫৭৬] বি.এম.পি. ১ম খন্ড পৃঃ ৭৮

[৫৭৭] ঐ-

[৫৭৮] বি.এম.পি. ১ম খন্ড পৃঃ ৭৮

[৫৭৯] ঐ-

যেহেতু. শায়েস্তাখান তখন ঐ পথেই দিল্লী যাচ্ছিলেন।[৫৮০] এখন শুল্ক ধার্য করার জন্য আযম খানের আদেশ পেয়ে তারা চার্নকের নিকট আরো দুটি পত্র লিখেন. ফেব্রুয়ারীর ১৩ তারিখে একটি এবং ১৬ তারিখে আরেকটি।[৫৮১] বাংলার পরিস্থিতি তাকে জানানো হয় এবং দিল্লীতে একজন উকিল প্রেরণের ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার কথা বলে এর উদ্দেশ্যে হুগলী কাউন্সিল হুণ্ডির মাধ্যমে তার নিকট ২০,০০০.০০ (বিশ হাজার) টাকা প্রেরণ করে।[৫৮২] ঢাকার কুঠিয়ালদেরকে প্রদত্ত নির্দেশের মতই হুগলী কাউন্সিল ১৩ই মার্চ ইংরেজদের ভোগকৃত সুবিধাদি সম্পর্কে সকল বিতর্ক অবসান করে আরো ভাল ভাষায় একটি ফরমান সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করতে চার্ণককে পত্র লিখে।" বিশেষ করে সেখানে শাহী ফরমান অনুযায়ী লেখা রয়েছে, তা পরিবর্তন করে সেখানে "ইংরেজদের জন্য এই অঞ্চলে প্রচলিত সুবিধানুযায়ী" কথা লিখতে হবে।[৫৮৩] এইভাবে কাজ করে দ্রুত ফরমান লাভ এবং এই জন্য শায়েস্তাখান বা দরবারের অন্য কোন ক্ষমতাশালী উমরার সঙ্গে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে একটি রফা করার জন্যও চার্ণককে নির্দেশ দেয়া হয়।[৫৮৪] চার্ণক অবশ্য কোন উকিলকে শায়েস্তা খানের সঙ্গে পাঠাতে পারেননি, কারণ এই উদ্দেশ্যে প্রেরিত ২০,০০০.০০ (বিশ হাজার) টাকা এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের পূর্বে তার নিকট পৌঁছেনি।[৫৮৫]

চার্ণক টাকা পাওয়া মাত্র একজন উকিল নিয়োগ করেন এবং মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তাকে দিল্লী প্রেরণ করেন। ১৮ই মে হুগলীর কাউন্সিল ফরমানের ভাষা সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্ক থাকার জন্য পুনরায় চার্ণককে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং উপরে নির্দেশিত ধারায় ফরমান লেখানোর জন্য উকিলকে পরামর্শ দিতে বলা হয়; এতে যদি অসম্ভব রকমের কিছু খরচও হয়, তাও করতে হবে। কারণ "ভবিষ্যতের সকল ফরমানও পরবর্তী সম্রাটদের নিকট থেকে আমাদেরকে একই ভাষায় নিতে হবে।"[৫৮৬]

---

৫৮০ চার্ণকের নিকট ভিন্সেন্ট স্মিথ এবং অন্যান্যরা হুগলী ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৬৭৮. ঐ পৃঃ ৭০

৫৮১ চার্ণকের নিকট ভিন্সেন্ট স্মিথ এবং অন্যান্যরা হুগলী ১৩ এবং ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৬৭৮. ঐ পৃঃ ৭৯-৮০

৫৮২ চার্ণকের নিকট ভিন্সেন্ট স্মিথ এবং অন্যান্যরা -ঐ পৃঃ ৮০

৫৮৩ চার্ণকের নিকট ভিন্সেন্ট স্মিথ এবং অন্যান্যরা হুগলী ১৩ই মার্চ. ১৬৭৮. ঐ পৃঃ ৮৩

৫৮৪ ঐ পৃঃ ৮০

৫৮৫ লিটনটনের নিকট ভিন্সেন্ট এবং অন্যদের লেখা. হুগলী. ১লা মে. ১৬৭৮ পূর্বোক্ত পৃঃ ৮৮

৫৮৬ চার্ণকের নিকট লেখা ভিন্সেন্ট এবং অন্যাদের লেখা পত্র ১৮ই মে ১৬৭৮. পূর্বোক্ত পৃঃ ৯১ আরও দেখুন. চার্ণকের নিকট লেখা ভিন্সেন্ট ও অন্যান্যদের পত্র. ঢাকা ৩রা আগস্ট. ১৬৭৮ পূর্বোক্ত পৃঃ ১০৮

দিল্লীতে উকিলের কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। তবে শাহী ফরমান লাভের চেষ্টার পাশাপাশি ঢাকার নওয়াব আযম খানের নিকট থেকেও অনুরূপ একটি পরওয়ানা সংগ্রহের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়। এই সকল প্রচেষ্টাই ওলন্দাজদের কারসাজিতে ব্যর্থ হয়। কারণ তারা তাদের উকিল গঙ্গারামের মাধ্যমে নওয়াবকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে।

ভিন্সেন্ট লিখেছেন যে, "বিশ্বাসঘাতক, দুষ্ট গঙ্গারাম মিথ্যা কথা বলে ঢাকায় অনেক ক্ষতি করেছে। সে তাদের (ওলন্দাজদের) ঘটনা বলতে গিয়ে আমাদের বাণিজ্য সম্পর্কেও সব কাহিনী প্রকাশ করে দিয়েছে এবং (নওয়াবকে) আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলায় পরওয়ানা লাভের আর কোন আশা নেই।[৫৮৭]

যেহেতু ইংল্যাণ্ড থেকে জাহাজ এসে পৌঁছার সময় ঘনিয়ে এসেছিল, তাই হুগলীর কাউন্সিল ২২শে মে শুল্ক প্রদানের জন্য নিম্নলিখিত শর্তাবলী পেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে–

ক) এই ব্যবস্থা হবে সম্পূর্ণ অস্থায়ী, শাহী ফরমান এসে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত বলবৎ থাকবে;

খ) পণ্য আমদানী বা রপ্তানী সংক্রান্ত তাদের প্রদত্ত তালিকাকেই গ্রহণ করতে হবে এবং

গ) এই শুল্ক শুধু বিশেষ বন্দর হুগলী এবং বালেশ্বরে ধার্য করতে হবে।[৫৮৮]

নওয়াবের অসুস্থতার জন্য এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরুই করা যায়নি এবং এর ২দিন পরে ২৪শে মে, ১৬৭৮, নওয়াব মারা যাওয়ায় ইংরেজরা অনেকটা হাফ ছেড়ে বাঁচে।[৫৮৯]

নওয়াব আযম খানের (ফিদাই খান) মৃত্যুর পর সম্রাট কর্তৃক একজন স্থায়ী সুবাদার নিয়োগ না দেয়া পর্যন্ত সম্রাটের দীওয়ান হাজী শফী খান অস্থায়ী সুবাদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৫৯০] তিনি ইংরেজদের প্রতি সদয় ছিলেন বলে জানা যায়। সে অনুযায়ী হুগলীর কাউন্সিল হার্ভেকে "৭ মাসের মধ্যে তাদের অনুকূলে একটি শাহী ফরমান" এনে পেশ করার অঙ্গীকার দিয়ে তার নিকট থেকে একটি পরওয়ানা নেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয় এবং ব্যর্থ হলে দেশে আমদানী করা বা দেশ থেকে রপ্তানী করা সংক্রান্ত তাদের পেশকৃত তালিকার ভিত্তিতে তারা

---

৫৮৭ চার্ণকের নিকট ভিন্সেন্ট এবং অন্যান্যদের লেখা হুগলী ১৮মে. ১৬৭৮. ঐ পূর্বোক্ত পৃঃ ৯১

৫৮৮ হার্ভেকে ভিন্সেন্ট এবং অন্যদের লেখা. হুগলী ২২ শে মে. ১৬৭৮. বি.এম.পি. ১ম খন্ড. পৃঃ ৯২

৫৮৯ চার্ণককে ভিন্সেন্ট এবং অন্যদের লেখা. হুগলী ৩১ শে মে . ১৬৭৮. পূর্বোক্ত পৃঃ ৯৪ ।

৫৯০ হার্ভেকে ভিন্সেন্ট এবং অন্যদের লেখা. হুগলী ১লা জুন. পূর্বোক্ত পৃ ৯৫

শুল্ক পরিশোধ করতে রাজী বলে জানায়।[৫৯১] তারা ঢাকা এবং কাশিম বাজারের কুঠিয়ালদেরকে এই দুই জায়গায় কাপড় এবং রেশমের জন্য বিনিয়োগের ব্যাপারে "সাবধানতা এবং সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হওয়ার"ও নির্দেশ দেয়। বুঝা যাচ্ছে যে, ইংরেজরা সময় বাড়ানোর জন্য যে আবেদন করেছিলেন, দীওয়ান তা মঞ্জুর করেছিলেন। সে যাই হোক, তিনি মাত্র দু'মাস প্রশাসনের দায়িত্বে ছিলেন।

১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দের ২৯ শে জুলাই আওরঙ্গজেবের পুত্র শাহজাদা মুহাম্মদ আযম নতুন সুবাদার হিসেবে ঢাকায় আগমন করেন। তাঁর দায়িত্বকালও ছিল খুবই স্বল্প; পরের বৎসরের অক্টোবরের প্রথম দিকে তিনি বাংলা ত্যাগ করেন।[৫৯২] পরবর্তী কালে শ্রুত কাহিনী অনুসারে শাহজাদা "শুধু ঘোড়ায় চড়ে শিকার করে বেড়াতেন[৫৯৩], আর ইংরেজরা তাদের নিজেদের কায়দায় লিখেছেন যে, তিনি "পুরোপুরিভাবে আমোদ-প্রমোদে আসক্ত ছিলেন, কোন কিছুতেই, অন্য কোন কিছুতেই তার মন ছিল না।"[৫৯৪] সত্য যাই হোক, এই এক বৎসরের মধ্যে ইউরোপীয় ব্যবসায়ী, বিশেষ করে ইংরেজদের অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এমনকি তারা কোন প্রকার শুল্ক পরিশোধ করেছে মর্মেও কোন উল্লেখ নেই। ধারণা করা যায় যে, তারা সম্রাটের নিকট থেকে ফরমান সংগ্রহ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েই তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল।

২. শায়েস্তা খানের দ্বিতীয় মেয়াদের সুবাদারী

বাংলায় ইংরেজদের প্রথম যুদ্ধ

আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্য শাহজাদা মুহাম্মদ আযমকে বাংলা থেকে ডেকে পাঠান এবং শায়েস্ত খান দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য বাংলায় আসেন এবং তাঁর এই দ্বিতীয় মেয়াদ ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর থেকে ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দের জুন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এ সময়ে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এজেন্টরা শুল্কমুক্তভাবে বাণিজ্য করার জন্য তাদের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়ে মোগলদের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। অবশ্য এই ব্যাপারে তারা মীর জুমলার সময় থেকেই চিন্তা-ভাবনা করে আসছিল।[৫৯৫]এই সময়ে তাদের

---

৫৯১ ঐ

৫৯২ মাষ্টারের ডায়েরী ২য় খন্ড , পৃঃ ২৬৮। মাষ্টারের মতে শাহজাদা "৬ তারিখে ঢাকা ত্যাগ করেন এবং ১২ তারিখে রাজ মহলের দিকে যাত্রা শুরু করেন "।

৫৯৩ যদুনাথ সরকার কর্তৃক উদ্ধৃত, এইচ. বি. ২য় খন্ড পৃঃ ৩৮২

৫৯৪ মাষ্টরের ডায়েরী, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৮২

৫৯৫ পূর্ববর্তী পৃষ্ঠ ৮৫

ক্রমবর্ধমান আগ্রাসী ভাবের প্রধান প্রধান কারণ এই অধ্যায়েই একটু আগে আলোচনা করা হয়েছে।[৫৯৬] এখানে সংক্ষিপ্তভাবে ঘটনাবলীর ধারাবাহিক বিবরণ দেয়া যেতে পারে। ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে যখন শায়েস্তাখান বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন, তখনও আওরঙ্গজেবের নিকট প্রেরিত উকিল সম্রাটের নিকট হতে কোন ফরমান নিতে সক্ষম হননি, যদিও তাকে এ উদ্দেশ্যে আগের বৎসর মে মাসে সম্রাটের দরবারে প্রেরণ করা হয়েছিল।

এ ব্যাপারে শায়েস্তাখান অবশ্য পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনিই ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ত্যাগ করার পূর্বে শুল্ক ধার্য করার জন্য সম্রাটের আদেশকে স্থগিত করেছিলেন এবং এ বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য সম্রাটের নিকট প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। সম্রাটের দরবারে উকিল প্রেরণ ছিল এ ধারাবাহিক প্রচেষ্টার শেষ পর্যায়। কাজেই, শায়েস্তা খান তাঁর পূর্বের নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ১৬৮০ সালের জন্য শুল্ক-মুক্তভাবে বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়ে একটি অস্থায়ী পরওয়ানা মঞ্জুর করেন এবং আশা করা হচ্ছিল যে, বহুল কাঙ্খিত শাহী ফরমান এই সময়ের মধ্যেই পাওয়া যাবে। ফলে, ইংরেজরা সে বৎসর পণ্য সামগ্রী সংগ্রহ এবং চালান দিতেও কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়নি। কিন্তু তারা যা আশা করেছিল, তাদের সে কাঙ্খিত চাহিদামত তারা ফরমান পায়নি। ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে উকিল একটি ফরমান লাভ করেন বটে, কিন্তু তা ইংরেজদেরকে শুল্ক প্রদান করা হতে অব্যাহতি দেয়নি।[৫৯৭] সম্ভবত: সম্রাট ইংরেজদের এবং অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি যথা ওলন্দাজ ও পতুর্গীজদের মধ্যে কোন বৈষম্য করার কারণ খুঁজে পাননি; যেহেতু শেষোক্ত জাতিদ্বয় কোন রকম বাড়াবাড়ি বা আপত্তি না করেই নিয়মিতভাবে স্বাভাবিক শুল্ক পরিশোধ করে আসছিল।

তিনি হয়তো আরো উপলব্ধি করে থাকবেন যে, তাঁর পিতা সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রদত্ত ফরমান, যার উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী কালে বাংলার সুবাদারগণ (শাহ শুজা, মীর জুমলা এবং শায়েস্তা খান) আদেশ জারী করতেন, সেই ফরমান অনুসারেই ইংরেজদেরকে বন্দরে বন্দরে শুল্ক-কর প্রদান আবশ্যক ছিল। ইতোপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইংরেজরা এই ব্যাপারে তাদের দূর্বলতা সম্পর্কে ভালভাবেই অবহিত ছিল। তারা জানতো যে, ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দের ফরমানে তাদের জন্য শুল্ক প্রদান করার বিধান ছিল; তারা এ বিষয়টিও সমভাবে অবগত ছিল যে, ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দের শাহ শুজার নিশান বিশেষ "কৌশল অবলম্বন

---

[৫৯৬] পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা ১৯৩-১৯৭

[৫৯৭] ই.এফ.আই. ১৬৭৮-৮৪ পৃষ্ঠা- ২৩০ । ফরমান ইংরেজদের জন্য ৩.৫% শুল্ক ধার্য করে দেয়

করে” নেয়া হয়েছিল। তদানুযায়ী তারা তাদের দাবীর স্বপক্ষে উপরোক্ত দু'টি মূল দলিলের আর উল্লেখ করেনি। কিন্তু তারা যা উল্লেখ করত, তা হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগকৃত ধারাবাহিক রীতি। তাই তারা উকিলকে বিশেষভাবে পরামর্শ দিয়েছিল যে, কাঙ্খিত ফরমানে যেন “শাহী ফরমান অনুসারে” লেখার পরিবর্তে “বাংলায় ইংরেজদের জন্য প্রচলিত ব্যবস্থা” লেখা হয়।[৫৯৮] এমনকি প্রচলিত সুবিধার দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের এই যে প্রচেষ্টা, তার ভিত্তিও সুদৃঢ় ছিল না।

ইংরেজদের আইন এবং অন্যান্য আইনী ব্যবস্থার এমন একটি নিয়ম রয়েছে যে, দীর্ঘকল যাবত অব্যাহত এবং বিতর্কহীনভাবে চলে আসা কোন রীতি বা ব্যবস্থা, ঐ রীতি বা ব্যবস্থার প্রতি একটি পরম্পরাগত দাবী সৃষ্টি করে। কিন্তু, বাংলায় ইংরেজদের অবস্থান সে রকম ছিল না। ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে শাহ শুজার নিকট থেকে তারা কায়দা করে যা নিয়েছিল, তাকে পরবর্তী সুবাদারগণ বৎসরে সর্বসাকূল্যে ৩০০০.০০ (তিন হাজার) টাকার শুল্ক প্রদান করার একটি অঙ্গীকার বলেই ব্যাখ্যা করেছেন এবং মীর জুমলার শাসনামল এবং শায়েস্তাখানের সুবাদারীর প্রথম মেয়াদ পর্যন্ত মোটামুটি নিয়মিতভাবেই তারা তা দিয়ে আসছিল। উভয় সুবাদারই ইংরেজদেরকে এই কথা বলেছেন যে, শাহ জাহানের রাজত্বকালে তারা যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছে, পরবর্তী সম্রাট আওরঙ্গজেবের দ্বারা তা পুনরায় অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। ইংরেজরা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের সময় বা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার সময়ও তা স্বীকার করতো। কাজেই ইংরেজদের জন্য শুল্কমুক্তভাবে বাণিজ্য করার কোন রীতি বা ব্যবস্থা কোন সময়ের জন্যই প্রচলিত ছিল না। তাদের দেশের অন্যান্য বণিক, যাদেরকে তারা অনধিকার প্রবেশকারী বলতো, তাদের আচরণ থেকে এইরূপ দাবীর পক্ষে কোন সমর্থন পাওয়া যায় না, অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের কথা না হয় বাদই দিলাম। স্পষ্টভাবেই বুঝা যায় যে, ইংরেজ কোম্পানীর এজেন্টরাও ইংরেজদের এই দূর্বলতার দিকটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাই সরাসরি প্রচলিত সুবিধার কথা না বলে তারা বরং চুপিসারে ফরমানের মধ্যে একটি অর্থযুক্ত বাক্যাংশ জুড়ে দিতে চেয়েছিলেন, যা ছিল সম্রাটের নিকট তাদের চাহিদা এবং যে জন্য তারা তাদের উকিলকে দরবারের কোন ক্ষমতাশালী আমিরের সঙ্গে “সরাসরি আলোচনা করে একটি রফা করার” জন্যও নির্দেশ দিয়েছিলেন।

---

[৫৯৮] পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা ১৯৬

ইংরেজরা সঙ্গতিপূর্ণভাবে দাবী করতে পারতো যে, বৎসরে সর্বসাকূল্যে ৩০০০.০০ টাকা দেয়াটাই বরং রীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। কাজেই স্বাভাবিক হারে শুল্ক দাবী করাটাই হচ্ছে প্রচলিত রীতি থেকে বিচ্যুতি। কিন্তু তখন যে কোন ভাবেই হোক, শুল্ক না দেয়ার জন্য তাদের যে প্রচেষ্টা, তা এই নতুন দাবীর প্রতি কোন প্রতিক্রিয়া হিসেবে ছিল না। বাংলায় ইংরেজ কোম্পানী তাদের বাণিজ্যের একেবারে শুরু থেকে কোন রকম শুল্ক দিতেই ইচ্ছুক ছিল না।

তাদের এই মনোভাবই তাদেরকে অন্যান্য ইউরোপীয় বণিক, এমনকি স্বতন্ত্র ইংরেজ বণিকদের থেকেও আলাদা করে তুলেছে। ঠিক এই মনোভাব থেকেই ইংরেজ কোম্পানীর এজেন্টরা প্রথম ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহানের ফরমানের অর্থকে বিকৃত করে শঠতার মাধ্যমে শাহ শুজার নিকট থেকে ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে নিশান আদায় করে এবং পরে তারাই বৎসরের পর বৎসর ৩০০০.০০ টাকা করে প্রদান করার পরে আবার তারা নিজেরাই বলে যে, তারা বাংলায় শুল্ক মুক্ত বাণিজ্যের একটি রেওয়াজ প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে। পুনরায় সেই একই মনোভাবের কারণেই ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দের ফরমানের প্রতিও তাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। কারণ, এখন যেহেতু ফরমানে ইংরেজদের উপর একটি নির্দিষ্ট হারে শুল্ক আরোপ করার বিধান করা হয়, তখনই তারা আরেকটা অদ্ভুত দাবী উত্থাপন করে যে, এই ফরমান বাংলার জন্য প্রযোজ্য নয়[৫৯৯], যদিও উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খাস করে বাংলার জন্য ফরমান সংগ্রহের জন্যই তারা তাদের সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল।

অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, ইংরেজ কোম্পানীর এজেন্টদের লক্ষ্যের প্রতি বরাবরই একটি সঙ্গতি ছিল, যদিও কথায় তা ছিলনা এবং তারা ভালভাবেই জানতো যে, কি তারা পেতে চায়। কাজেই ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দের ফরমান তাদের প্রতি অনুকূল না হওয়া সত্ত্বেও তারা হতাশ হয়নি এবং সত্তুরের দশকে বাংলার বাণিজ্যে ক্রমবর্ধমান হারে মুনাফা হওয়ায় কোম্পানী ১৬৮১ সালে তাদের বিনিয়োগ শুধু £১,০০,০০০.০০ থেকে £১,৫০,০০০.০০ এ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেনি বরং বাংলার কুঠিয়ালগণকে মাদ্রাজের কর্তৃপক্ষের আধিপত্য থেকে স্বাধীন করে দিয়ে তাদের একজন "এজেন্ট" নিয়োগ ও একটি "কাউন্সিল" গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই পদক্ষেপের কিছুটা প্রয়োজন ছিল অনধিকার প্রবেশকারী স্বতন্ত্র ইংরেজ বণিকদের কার্যকলাপকে দমন করা, যারা সত্তুরের

---

[৫৯৯] ই এফ আই, ১৬৭৮-১৬৮৪, হেজের ডায়েরী, ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৩-৬২, ৯১-১০১

দশকে বেশি বেশি সংখ্যায় বাংলার উপকূলে এসে ভীড় করতে শুরু করে, আবার কিছুটা প্রয়োজন ছিল কুঠিয়ালদের নিজেদের বিপুল পরিমাণ ব্যক্তিগত ব্যবসা বন্ধ করার জন্য, যারা প্রায়ই অনধিকার প্রবেশকারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এ কাজ করত। প্রকৃতপক্ষে, ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় কোম্পানীর প্রধান কুঠিয়াল ম্যাথিয়াস ভিন্সেন্ট নিজেই জলদস্যু পিটের সঙ্গে মিলে কোম্পানীর স্বার্থের বিরুদ্ধে হলেও ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে,[৬০০] ব্যক্তিগত ব্যবসা এবং অনুরূপ অন্যান্য অনিয়মকে ধামা-চাপা দেয়ার জন্য কুঠিয়ালরা প্রায়ই তাদের ভাষায় নওয়াব এবং তাঁর কর্মকর্তাদের "বলপূর্বক অর্থ আদায় এবং নির্যাতন" সম্পর্কে অতিরঞ্জিত, এমনকি মিথ্যা বিবরণ প্রেরণ করতেন। উল্লেখ্য যে, ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ইংরেজ কুঠিয়ালরা বৎসরে যে ৩০০০.০০ টাকা প্রদেয় ছিল, তা এই যুক্তিতে পরিশোধ করা বন্ধ করে দেয় যে, সম্রাটের নিকট হতে একটা সুবিধাজনক 'ফরমান' আনা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং ১৬৭৭ সাল থেকে ১৬৮০ সাল পর্যন্ত তাদের নথিপত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে নিয়মিত বা অনিয়মিত কোন প্রকার অর্থ প্রদানের উল্লেখ নেই। শেষের বছরগুলোতে ভিন্সেন্ট কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবসায় নিয়োজিত বলে স্থানীয় বণিকদেরকে এবং কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসার ক্ষেত্রেও তাদের পণ্যের উপর থেকে শুল্ক প্রদান এড়ানোর জন্য তাদেরকে বহুল পরিমাণে দস্তক পত্র বা পাস (pass) প্রদান করে। তার এই আচরণ মুর্শিদাবাদের ফৌজদার রায় বলচাঁদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে। তথাপি দেখা যায় যে, ভিন্সেন্ট এবং তার সহকর্মীরা ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দের ফরমানকে কার্যকরী না করা এবং তা সংশোধনের জন্য সম্রাটের নিকট দ্বিতীয়বার প্রস্তাব প্রেরণ করতে শায়েস্তা খানকে রাজী করাতে সক্ষম হন। এমনকি ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দের জন্যও কোন প্রকার শুল্ক বা ৩০০০.০০ টাকা প্রদানের কোন উল্লেখ নেই।

১৬৮২ খ্রিস্টাব্দ হচ্ছে বাংলায় ইংরেজদের বাণিজ্যের জন্য একটি যুগান্তকারী বছর। ঐ বৎসর বাংলার কুঠিগুলি স্বাধীন মর্যাদা লাভ করে এবং কোম্পানীর অন্যতম পরিচালক উইলিয়াম হেজেস বাংলায় আসেন। তিনি বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে কোম্পানীর 'এজেন্ট' বা "গভর্ণর" হিসেবে ভিন্সেন্টের স্থলাভিষিক্ত হন। তার বাসস্থান নির্ধারণ করা হয় হুগলীতে এবং স্টুয়ার্ট লিখেছেন যে, "তার পদ মর্যাদা বাড়ানো এবং তার নিরাপত্তার জন্য সেন্ট জর্জ দূর্গ থেকে একজন নায়েক ও ২০

---

৬০০ পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা ১৫৮

জন ইউরোপীয় সৈন্যের একটি দলও নিয়োগ দেয়া হয়।"[৬০১] সৈন্যদের আগমন সম্পর্কে স্টুয়ার্টের ব্যাখ্যা দ্ব্যর্থবোধক। কারণ, তিনি তার বক্তব্যের শুরুতে বলেছেন যে, সৈন্য প্রেরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে তার পদ মর্যাদা বাড়ানো এবং শেষে বলেছেন, তার "নিরাপত্তার" জন্য। নব নিযুক্ত প্রধানের জন্য ইউরোপীয় সৈন্যদের দ্বারা "নিরাপত্তা" বিধানের প্রয়োজনীয়তা বোধগম্য নয় কিন্তু এই পদক্ষেপের তাৎপর্য নিয়ে অস্পষ্টতা নেই। আবার ষ্টুয়ার্টের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায় যে, "এটা ছিল বাংলায় কোম্পানীর প্রথম সামরিক স্থাপনা এবং সে দেশে ইংরেজ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তি।"[৬০২] বাংলায় হেজেসের আগমন কোম্পানীর বিনিয়োগ পূর্ববর্তী বৎসরের £১,৫০,০০০.০০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে £ ২,৩০,০০০.০ এ উন্নীত হয়।[৬০৩]

কোম্পানীর প্রদেয় শুল্ক পুনর্বিবেচনা করার জন্য সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট প্রেরিত প্রস্তাবের জওয়াব ঢাকায় আসে একই বৎসরের এপ্রিল মাসে এবং তাতে ইংরেজদের সকল পণ্যের উপর ৩.৫% শুল্ক নির্ধারণ করে দেয়া হয়। এ প্রেক্ষিতে শায়েস্তা খানের কর্মকর্তাগণ তাঁর নির্দেশে শুল্ক প্রদান ব্যতীত ইংরেজদের পণ্যের জন্য পাশ দিতে অস্বীকার করে। ঘটনার এই মোড় পরিবর্তন এবং বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বেই জাহাজ বোঝাই করা এবং ছেড়ে যাওয়ার প্রয়োজনীতা চিন্তা করে হেজেস ঢাকায় আসেন এবং শায়েস্তাখানকে উপঢৌকন দিয়ে সাত মাসের জন্য শুল্ক প্রদান স্থগিত ঘোষণা করে ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে আরেকটা পরওয়ানা বের করতে সমর্থ হন। এ জন্য অবশ্য ঢাকার ব্যবসায়ী গুলাব্রাই জামিন হন এবং এই অঙ্গীকার দেন যে, এই সময়সীমার মধ্যে সম্রাটের নিকট থেকে আরেকটি অনুকূল ফরমান আনা হবে। এই ব্যবস্থাধীনে কোন শুল্ক না দিয়ে ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে এবং ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে ইংরেজদের জাহাজগুলো মালামাল বোঝাই করে বন্দর ত্যাগ করে। তবে প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে ফরমান সংগ্রহের জন্য হেজেস কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। পরবর্তীকালে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল যে, হেজেস শায়েস্তাখানের সঙ্গে একটি ব্যবস্থা করে তাকে ৪০,০০০.০০ টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, "যদি তিনি তাদেরকে শুল্কমুক্ত একটি ফরমান এনে দিতে পারেন এবং এই অংকের অর্ধেক অর্থ অগ্রিম প্রদান করা হয়েছিল।"[৬০৪] একথা একেবারেই অসম্ভব

---

৬০১ স্টুয়ার্ট, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৩৯

৬০২ ষ্টুয়ার্ট, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩৯

৬০৩ পূর্বোক্ত পৃঃ ১৪৯

৬০৪ ১০ হুগলী, ২৫৫; হেজেসের ডায়েরী, ১ম খন্ড পৃঃ ৬১-৬২, ৯২-৯৩; ই.এফ, আই, পৃঃ ৩৬১-৬২

মনে হয়, কারণ সুস্পষ্ট নির্দেশ এবং ইংরেজদের পক্ষ হতে তার আগের যোগাযোগ অকার্যকর প্রমাণিত হওয়ায় শায়েস্তা খানের পক্ষে হেজেসের সঙ্গে এ ধরণের কোন চুক্তি করাটা অবাস্তব ছিল। অপরপক্ষে শেষোক্ত জনের ব্যক্তিগত বাণিজ্য এবং অন্যান্য অনিয়মের কারণে তাকে মাত্র দু'বছর পরে বরখাস্ত করা হয়; এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তার অনিয়মগুলো চাপা দেয়ার জন্যই পরে ঐ গল্প ফাঁদা হয়েছিল। শায়েস্তা খান যদি তাদের সঙ্গে ঐরূপ কোন চুক্তি করতেন, তাহলে ইংরেজ কোম্পানীর জন্য গুলাব্রাইকে জামিন হতে হত না। তাছাড়া ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে হেজেসের বরখাস্ত হওয়ার পরে ঢাকায় ইংরেজ কুঠিয়াল পাউসেট, যিনি বরাবরই এ সকল আলোচনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন, তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, "নওয়াব বাংলায় প্রত্যাবর্তনের পরে তাঁকে মাত্র দু'বার উপঢৌকন দেয়া হয়েছে, একবার ১৬৮০ এবং পরবর্তীতে ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দে হেজেসের দেয়া।"[৬০৫] শায়েস্তা খানকে অন্য কিছু প্রদান করার বিষয়ে উল্লেখ করেননি। সে যাই হোক, ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দের জুনে নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও ফরমান পাওয়া যায়নি।

অতএব, ঐ বৎসরের জন্য যখন জাহাজ এসে পৌঁছে, হেজেস পুনরায় বিষয়টি মিটমাট করতে চেষ্টা করেন। তিনি গুলাব্রাইর নিকট ২০০০০.০০ (বিশ হাজার) টাকা জমা দেন এবং হুগলীর শুল্ক তত্ত্বধায়ক রায় বলচাঁদের সঙ্গে এইরূপ এক চুক্তিতে উপনীত হন যে, জাহাজ ছাড়ার সময়ের মধ্যে যদি ফরমান পাওয়া না যায় অর্থাৎ ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকেও যদি পাওয়া না যায়, তাহলে শুল্ক পরিশোধ করা হবে।[৬০৬] যেহেতু ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চের মধ্যেও কোন ফরমান পাওয়া যায়নি, তাই "হেজেসের পূর্ববর্তী ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে স্বাক্ষরিত তালিকায় ২,৪২,৪১৯.০০ টাকার পণ্যের উপর শুল্ক হিসেবে ৮,৪৮৫.০০ টাকা পরিশোধ করেন। পরে জুনের শেষের দিকে ২৯,৯৩০.০০ টাকার পণ্য জাহাজীকরণের তালিকার উপর আরো ১,০৪৭.০০ টাকা গুলাব্রাই পরিশোধ করেন।"[৬০৭] এইভাবে দেখা যায় যে, ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে শুল্ক দাবী করা এবং ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাটের ফরমানে তার পুনরুল্লেখ করা এবং ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দে আবার আদেশ দেয়া সত্ত্বেও মাত্র ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দে মোট ৯৫৩২.০০ টাকা (৮৪৮৫.০০+১০৪৭.০০) সত্যিকারভাবে শুল্ক হিসাবে প্রদান করা হয়।

---

[৬০৫] ই.এফ. আই. ১৬৭৮-১৬৮৪, পৃঃ ৩৫১

[৬০৬] ই.এফ. আই. ১৬৭৮-১৬৮৪, পৃঃ ৩১৯

[৬০৭] ঐ পৃঃ ৩৪০

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জাহাজীকরণের মালামালের ধরন ও পরিমাণ পরীক্ষা করার জন্য দাবী করলেও শেষ পর্যন্ত হেজেসের দেয়া তালিকার ভিত্তিতেই শুল্ক পরিশোধ করা হত।

এই সময়ে হেজেস এবং তার মনিবদের মনোভাবে বিরাট পরিবর্তন ঘটে। প্রথমজন উপলব্ধি করেন যে, বাংলায় কোম্পানীর এজেন্সী থেকে তার ব্যক্তিগত ব্যবসা এবং অনধিকার প্রবেশকারীদের[৬০৮] সঙ্গে সহযোগিতা অনেক বেশি লাভজনক। অপরদিকে, কোম্পানীর পরিচালকগণ একাধিক কারণে একটি "অগ্রবর্তী" বা আগ্রাসনবাদী নীতি গ্রহণ করে।

প্রথমত, আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দে ইন্দোনেশিয়ার বান্টামের কুঠি থেকে ওলন্দাজদের দ্বারা বহিস্কৃত হওয়ার পরে ইংরেজ কোম্পানী নিজেদেরকে দক্ষিণ এশিয়ান উপমহাদেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে।

দ্বিতীয়ত, বাংলায় সাম্প্রতিক কালে তাদের ব্যবসা এত বেশি লাভজনক হয়ে উঠে যে, তারা যে কোন ভাবেই হোক, তাদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়।

তৃতীয়ত, তারা তাদের এজেন্টদের প্রেরিত বিভ্রান্তিকর এবং অসত্য প্রতিবেদন, যেমন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের "বলপূর্বক অর্থ আদায়" "অবিচার" এবং নির্যাতন" ইত্যাদি কথা নিঃসন্দেহে তাদেরকে উত্তেজিত করে তোলে।

অতএব, এই বিষয়ে তাদেরকে এতবেশি ভুলতথ্য দেয়া হয়েছিল যে, তারা আসলেই বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে, ইংরেজদেরকে শুল্ক প্রদান হতে অব্যাহতি দিয়ে মোগল সম্রাট প্রথম যে ফরমান জারী করেছিলেন, শায়েস্তা খান কর্তৃক শুল্ক দাবী ছিল সে ফরমানের লঙ্ঘন; তাদের এই ধারণা যে ভুল ছিল, তা উপরের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে যায়।

চতুর্থত, ইংরেজ স্বতন্ত্র-বণিক এবং অনধিকার প্রবেশাধিকারীরা ক্রমান্বয়ে অধিক সংখ্যায় বাংলায় আগমন করে এবং স্বাভাবিক শুল্ক প্রদানের জন্য তাদের ইচ্ছা ও কোম্পানীর জন্য কম বিরক্তির কারণ ছিলনা। এটা কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যিক স্বার্থের প্রতি এবং শুল্ক প্রদান পরিহার করার জন্য তাদের পরিকল্পনার প্রতি ছিল একটি বিরাট হুমকি। বাংলায়

---

৬০৮ ই.এফ. আই. ১৬৭৮-১৬৮৪, পৃঃ ৩৩৫, ৩৪৭

কোম্পানীর সাবেক প্রধান ভিন্সেন্টের বিশ্বাসঘাতকতা এবং হেজেসের দ্বারা অনধিকার প্রবেশকারীদেরকে সাহায্য প্রদান পরিচালকদের মধ্যে দরুণভাবে বিরক্তি উৎপাদন করে। তাই তারা এই অনধিকার প্রবেশকারীদেরকে বল প্রয়োগ করে তাদের নিজ দেশে, সাগর, মহাসাগর এবং যে সব দেশের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করে, সে সব দেশ থেকে তাদেরকে উৎখাত করার জন্য কৃত সংকল্প হয়।

পঞ্চমত, ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও কোম্পানীর নীতির উপর প্রভাব ফেলে। আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘ-মেয়াদী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া এবং ফলশ্রুতিতে বাংলাসহ উত্তরাঞ্চলের প্রতি তাঁর মনোযোগ দিতে না পারা ইত্যাদি বহুদূর থেকে বিপদ সঙ্কুল সাগর-মহাসাগর পাড়ি দিয়ে প্রাচ্যে আগত সে অভিযান-বিলাসী "দোকানদার জাতির" দৃষ্টি এড়ায়নি। এছাড়া তারা ইউরোপের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে বাণিজ্য এবং উপনিবেশের জন্য বাঁচা-মরার সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। অতএব, ইংরেজ কোম্পানীর শান্তিকামী বণিকদের ভূমিকা পালনের মনোভাব ছিল না। ভারতে তারা প্রথম রাজনৈতিকভাবে জড়িয়ে পড়ে কর্ণাটকে, যখন তারা মীর জুমলার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে হিন্দু বিদ্রোহীদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা দান করে[৬০৯] এবং এখন যেহেতু আওরঙ্গজেব নিজেই দাক্ষিণাত্যে ছিলেন, আর সেখানকার মারাঠারা মোগল এবং ইংরেজ উভয়ের প্রতি শত্রুতা ভাবাপন্ন ছিল, তাই কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ পূর্বাঞ্চলের বাংলা প্রদেশকেই তাদের আগ্রাসনবাদী ও অগ্রবর্তী নীতির জন্য পরীক্ষা ক্ষেত্র বানানোর লক্ষ্যে পরিণত করে। সর্বশেষ, ইংল্যাণ্ডের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থান ও কোম্পানীর নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

রাজা দ্বিতীয় জেমস দ্রুত আসন্ন "গৌরবময় বিপ্লব" (GLORIOUS REVOLUTION) এর চাপে ছিলেন এবং কোম্পানীর একচেটিয়া স্বার্থ এবং আগ্রাসনবাদী নীতির প্রতি সমর্থন দানের জন্য সহজেই তাকে রাজী করানো সম্ভব হয়। ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানীর চার্টার নবায়ন করার সময় রাজা তাদেরকে ভারতীয় শাসকদের সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি এবং মৈত্রী চুক্তি করার জন্য পরিস্কারভাবে ক্ষমতা দান করেন।

---

৬০৯ দেখুন উপরের পৃঃ ৮০

১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরের পত্রে কোম্পানীর এই পরিবর্তিত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। পত্রে এজেন্টদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, "মোগল গভর্ণরদের ঔদ্ধত্যকে ছুড়ে ফেলতে হবে এবং সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, আওরঙ্গজেবের ফরমান অনুযায়ী কোম্পানীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং কোম্পানী কখনো শুল্ক প্রদান করে নতি স্বীকার করবে না।"[৬১০] মাদ্রাজ কাউন্সিলের সভাপতিকে "নওয়াবের নিকট কোম্পানীর সকল অসুবিধার বিস্তারিত বিবরণ পেশ এবং তার কোন প্রতিকার করা না হলে সে দেশ ত্যাগ করার হুমকি প্রদানের জন্যও বলা হয়"[৬১১] এবং অন্য কথায় "একটি দৃঢ় প্রতিবাদ জানানোর জন্য নির্দেশ দেয়া হয়"। আগেই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, আওরঙ্গজেবের ফরমান এবং সে অনুযায়ী পরবর্তী অন্যান্য মোগল ফরমান দ্বারা বাংলায় বা অন্য কোন স্থানে ইংরেজ কোম্পানীকে আলাদা করে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে বলে ধরে নেয়ায় কোম্পানী বিরাট ভুল ধারণায় নিপতিত ছিল। এছাড়া অন্যান্য যে সকল অসুবিধার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো ও অনুরূপভাবে ভিত্তিহীন, ভুল ধারণা প্রসূত এবং অস্পষ্ট; তথা সকল প্রকার খারাপ ব্যবহার (abuse) হচ্ছে মাঝে মাঝে এবং অস্থায়ীভাবে কোম্পানীর মাল পরিবহণকারী নৌকা থামানো, ঐগুলো দেখার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দাবী ইত্যাদি। আবার কুঠিয়ালদের দ্বারা কোন কিছু সুনির্ধারিতভাবে নয়, বরং অস্পষ্টভাবে উল্লেখ, যেমন "বল প্রয়োগ করে অর্থ আদায়, "ভীতি প্রদর্শন করে অর্থ আদায়" এবং "বিভিন্ন প্রকার দাবী" ইত্যাদি বলতে যদি স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে ঘুষ বা অবৈধভাবে অর্থ প্রদান বা গ্রহণ বুঝায়, তাহলে এ সবই হচ্ছে আসলে স্বাভাবিক শুল্ক এবং তা না দেয়ার জন্য প্রচেষ্টা সম্পর্কিত।

একই নীতি অনুসরণ এবং হেজেসের কর্মকাণ্ডে বিরক্ত হয়ে কোম্পানী তাকে পদচ্যুত করে এবং বাংলার কুঠিসমূহের স্বাধীন অবস্থান বিলুপ্ত করে এগুলোকে পুনরায় মাদ্রাজ কাউন্সিলের অধীনে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সকল আদেশ নিয়ে ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে আগস্ট মাদ্রাজ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট জোফোর্ড হুগলী এসে পৌঁছেন।[৬১২] জোফোর্ড "সেন্ট জর্জ দূর্গ থেকে পূর্ণ এক কোম্পানী সৈন্যসহ আরও বহুসংখ্যক সঙ্গী-সাথীসহ আসেন।"[৬১৩] তারা সেখানে এসে পৌঁছার পরপরই একটি গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। কুঠিয়ালরা তাকে হুলীতে

---

৬১০ ই, এফ, আই, ১৬৭৮-১৬৮৪ পৃঃ ৩৬২

৬১১ ঐ

৬১২ ই, এফ, আই, ১৬৭৮-১৬৮৪ পৃঃ ৩৪৮

৬১৩ ঐ

নোঙর করা জাহাজ 'এ্যান' থেকে ১১ বার তোপধ্বনি করে তাকে অভিবাদন জানানো হয়েছে বলে দাবী করে। কিন্তু হুগলীর গভর্ণর আজিজ বেগ দাবী করে যে, প্রেসিডেন্টের আনা সৈন্যরা গোলাগুলি করে। ফলে, একজন লোক মারা যায়।[৬১৪] কুঠির নথিপত্র থেকে দেখা যায় যে, অন্ততঃ "একটি কামান থেকে অবহেলা বশতঃ গোলা নিক্ষেপের কারণে কুঠির কাছাকাছি আঘাত হানে।"[৬১৫] একজন লোক হত্যা করার অভিযোগ অল্প পরেই বাদ দেয়া হয়। "কিন্তু এ্যানের নাবিক এবং আজিজ বেগের লোকজনদের মধ্যে অন্য একটি গোলাগুলির ঘটনায় উভয় পক্ষের কিছু লোক আহত হয় এবং এতে তাদের মধ্যে পুনরায় বিবাদ শুরু হয়ে যায়।" এই সকল ঘটনায় উভয় পক্ষের মধ্যে সম্পর্কের বেশ অবনতি ঘটে। যাহোক, শায়েস্তা খানের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয় এবং তিনি উভয় পক্ষকে সংযম অবলম্বন এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করার জন্য আহবান জানান।[৬১৬]

শীঘ্রই শুল্ক আরোপের বিষয়টি চলে আসে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী বৎসরের শেষের দিকে এবং ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে জাহাজে মালামাল প্রেরণের জন্য মোট ৯৫৩২.০০ টাকা শুল্ক হিসেবে পরিশোধ করা হয়েছে। জেফোর্ড এসে পৌঁছার অল্প আগেই হেজেস গুলাব্রাইর সঙ্গে হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে ফেলেন। কারণ, ইংরেজদের জন্য জামিন হিসেবে তিনি আর গ্রহণযোগ্য ছিলেন না।[৬১৭] কাজেই ইংরেজদের জন্য একজন নতুন জামিনদার চাওয়া হয়। এই সময়ে কুঠির নথি পত্রের সম্পাদক স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন যে, ইতিমধ্যে আওরঙ্গজেবের নিকট হতে শুল্ক মুক্ত ফরমান লাভের পথে যে বাধা ছিল অনধিকার প্রবেশকারী বণিকদের শুল্ক প্রদানের জন্য আগ্রহ সে বাধাকে আরও বাড়িয়ে তোলে।[৬১৮] আসলে স্বাধীন ইংরেজ বণিকদের মুখপাত্র টমাস ড্যাবিস এই সময় শায়েস্তা খানের সঙ্গে এক চুক্তি করেন এবং ৩.৫% ভাগ হারে শুল্ক প্রদানের শর্তে বাংলায় কুঠি নির্মাণ এবং বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ করেন।[৬১৯] জেফোর্ডের আগমন এবং এই সকল ঘটনাবলী একই সময়ে ঘটে। তিনি ঢাকার কুঠিয়াল পউনসেটকে "এই অসহনীয় বাধ্যবাধকতা" থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নওয়াব এবং দীওয়ানের সঙ্গে সাক্ষাত করার নির্দেশ দেন এবং

---

৬১৪ ঐ - পৃঃ ৩৪৯

৬১৫ ঐ

৬১৬ ঐ পৃঃ ৩৫০

৬১৭ ই. এফ. আই. ১৬৭৮-১৬৮৪ পৃঃ ৩৪১

৬১৮ ঐ

৬১৯ ঐ

বলেন যে, "কোম্পানী সুনির্দিষ্টভাবে আদেশ দান করেছে যে, শুল্ক প্রদানের দাবীর নিকট নতি স্বীকার করবে না এবং কোম্পানীর নির্দেশের বিপরীতে হেজেস কর্তৃক শুল্ক প্রদানই তাকে দেশে ডেকে নেয়ার অন্যতম কারণ।"[৬২০] যেহেতু জাহাজের আগমণ শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং শুল্ক প্রদানের প্রশ্নে হুগলীর গবর্ণর কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছেন। জেফোর্ড তার সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে এইভাবে শুল্ক প্রদান করতে রাজী হন, যেন বুঝা যায় যে, বাধ্য হয়েই তা দিতে হয়েছে। তিনি পউনসেটের নিকট প্রয়োজনীয় অর্থসহ এই নির্দেশ পাঠান যে, "কোন বণিকের মাধ্যমে জামানত না দিয়ে তিনি যেন নিজেই ২০,০০০.০০ টাকা সরাসরি দীওয়ানের হাতে দেন এবং তার যা ইচ্ছা তাই গ্রহণ করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন।"[৬২১] পউনসেট দীওয়ানকে একজন যুক্তিপরায়ণ ব্যক্তি হিসেবে দেখতে পান। তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, কোন বণিকের মাধ্যমে জামানত না দিয়ে পউনসেট কাজীর সামনে এই অঙ্গীকার করবেন যে, তাদের "এজেন্টের স্বাক্ষরিত মালের তালিকার ভিত্তিতে" তারা ৩.৫% ভাগ হারে শুল্ক প্রদান করবেন। এটা করা হলে অক্টোবরের শেষের দিকে (১৬৮৪ সালে) দীওয়ান এক পরওয়ানা জারী করে কুঠির প্রদত্ত পণ্য তালিকার উপর ভিত্তি করে প্রদেয় শুল্ক গ্রহণ এবং কোম্পানীর বাণিজ্যে বাধা সৃষ্টি না করার জন্য আজিজ বেগকে নির্দেশ দেন।[৬২২] এমন কি এ পরওয়ানা পৌঁছার পূর্বেই আজিজ বেগ যে সকল নৌকা আটক করে ছিলেন, সেগুলো ছেড়ে দিয়েছিলেন।[৬২৩]

শুল্কের প্রশ্নটি ছাড়া আরো দুটি বিষয় ইংরেজ কুঠিয়াল এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়েছিল। তার একটি ছিল মালের ওজন এবং মূল্য নির্ধারণ করা নিয়ে মালদহ এবং কাশিম বাজার উভয় জায়গায় কুঠিয়ালদের সঙ্গে উৎপাদনকারী এবং পাইকারদের (দালাল) মধ্যে সৃষ্ট বিবাদ। এই বিবাদ দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসছিল এবং উভয় জায়গার কাজীর দরবার এবং শালিসদের নিকটও পেশ করা হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত শায়েস্ত খানের গোচরে আনা হয়।[৬২৪] আসল সমস্যা দেখা দেয় কুঠিয়ালদের নিকট সরবরাহকৃত পণ্যের (কাপড়, রেশম) জন্য প্রচলিত বাজার দর থেকে অনেক কম দর নির্ধারণ করার

---

৬২০ ই. এফ. আই. ১৬৭৮-১৬৮৪ পৃঃ ৩৪৯

৬২১ ঐ পৃঃ ৩৫০

৬২২ ই. এফ. আই. ১৬৭৮-১৬৮৪ পৃঃ ৩৫১-৫০

৬২৩ ঐ পৃঃ ৩৫১-৩৫৪

৬২৪ বিস্তারিতের জন্য দেখুন ঐ পৃঃ ৩৩২-৩৩৩, ৩৩৬-৩৩৮,৩৪৪,৩৫২-৫৩, ৪৪৫-৪৫৬,৪৫৮

ব্যাপারে, কুঠিয়ালদের অভ্যাস এবং তাদের দ্বারা বল প্রয়োগ, যেমন তাঁতীদেরকে ধরে এনে তাদের সম্মতি আদায় করার জন্য কুঠিতে বন্দী করে রাখা নিয়ে। কুঠির নথি পত্রে দেখা যায় যে, "পাইকারদেরকে রাজী করানোর জন্য কাপড়ের দাম তিনবার পর্যন্ত বাড়াতে হয়েছে।"

এসব কাজ কারবার এবং কুঠিতে এনে তাঁতীদেরকে আটক করে রাখার বিরুদ্ধে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে মাঝে মাঝে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। নথিপত্রে আরো দেখা যায় যে, "আরেকটি কষ্টকর ব্যাপার ছিল মালদহতে তাঁতীদের নিকট অগ্রিকৃত টাকা (কাপড় তৈরীর জন্য প্রদত্ত দাদন) আদায় করা। সেখানে এই উদ্দেশ্যে কুঠিতে এনে তাদেরকে স্বাভাবিকভাবে বন্দী করে রাখার বিরুদ্ধে সেখানকার ফৌজদার তাদেরকে নিরাপত্তা দিতেন।"[৬২৫] মালদহতে অবস্থা এই পর্যায়ে গড়ায় যে, শায়েস্তা খান জানতে পারেন যে, সেখানকার কুঠিকে দুর্গে পরিণত করা হয়েছে। তাই তিনি ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে ১০ই ডিসেম্বর সেখানকার কুঠিয়াল চার্ণককে ঢাকায় ডেকে পাঠান এবং তা ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেন।[৬২৬] এই আদেশে কুঠিয়ালদের কোন সমস্যা হয়নি। কারণ কুঠিকে দুর্গে পরিণত করার তথ্য সঠিক ছিল না।[৬২৭]

অন্য বিষয়টি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে রাজমহলের গভর্ণর রফিউজ্জামান "সকল সোনার মোহর কিনে ফেলার জন্য শায়েস্তা খানের নিকট থেকে নির্দেশ লাভ করেন। তিনি কোম্পানীর নিকট থেকে পুরো স্বর্ণ কিনে নেয়ার প্রস্তাব দেন এবং তার প্রস্তাব গ্রহণ না করলে স্বর্ণ বহণকারী সকল নৌকা আটক রাখার হুমকি দেন।"[৬২৮] বর্তমানকালের মত অতীত কালেও মুদ্রা তৈরী এবং স্বর্ণ পিণ্ডের উপর রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার স্বীকৃত ছিল। বাস্তবিকপক্ষে পরবর্তীকালে এই অধিকারের প্রতি অবহেলা করার কারণেই বাংলায় মুসলমানদের রাজনৈতিক শক্তির ভিত্তি ধ্বংস হয়ে যায়। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে আওরঙ্গজেব ইংরেজদের নিকট হতে মুদ্রা তৈরীর জন্য ৫% ভাগ হারে কর দাবী করেছিলেন। তবে জোরালোভাবে এই দাবী উত্থাপন করা হয়নি এবং ১৬৮০ সালের পরে এ নিয়ে আর কোন কিছু শোনা যায়নি। ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে সোনার মোহর ক্রয়ের জন্য শায়েস্তা খানের প্রদত্ত

---

[৬২৫] ই. এফ. আই. ১৬৭৮-১৬৮৪ পৃঃ ৩৫৮

[৬২৬] ঐ পৃঃ ৩৫৫

[৬২৭] ঐ পৃঃ ৩৫৮

[৬২৮] ই. এফ. আই. ১৬৭৮-১৬৮৪ পৃঃ ৩৪২

নির্দেশ মনে হয় মুদ্রা তৈরী সংক্রান্ত করের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল না। কিন্তু স্পষ্টতঃ এই আদেশ ছিল স্বর্ণ-পিণ্ড (Bullion) আমদানীর উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এবং ইংরেজ কুঠিয়ালদের নিজেদের স্বীকৃতি অনুযায়ী এই আদেশ ছিল সাধারণ আদেশ, বিশেষ করে শুধুমাত্র ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত কোন আদেশ নয়। যাহোক, এই আদেশ ইংরেজদের জন্য তেমন কোন কঠিন সমস্যা সৃষ্টি করেনি। বিশেষ করে ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দের জন্য, কারণ তারাই লিখেছেন যে, রফিউজ্জামান যখন নওয়াবের উপরোক্ত আদেশ প্রাপ্ত হন, তখন "অধিকাংশ পিণ্ড দ্বারা মোহর তৈরী সম্পন্ন করা হয়েছে এবং আগস্টের শুরুতে সেগুলো পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।"[৬২৯] তদুপরি, সেপ্টেম্বরের পর থেকে আরো স্বর্ণ আনা হয় এবং স্বাভাবিক নিয়মে রাজমহল থেকে স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা মুদ্রা তৈরী করা হয়।[৬৩০]

অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে বাংলায় ইংরেজ কুঠিয়ালরা কঠিন কোন সংকটে পড়েন নি, নতুবা তাদেরকে কোন রকম বৈষম্যমূলক বা অসুবিধাজনক অবস্থায়ও নিক্ষেপ করা হয়নি। আবার শুল্ক প্রদান সম্পর্কে পউনসেট ঢাকায় যে বন্দোবস্ত করেছিলেন (যা অবশ্য সে সময় পর্যন্ত দেয়া হয়নি, সে মোতাবেক সকল কুঠি থেকেই পণ্য সামগ্রী পাঠানো হয়েছে এবং সে সব নিয়ে বিনা বাধায় জাহাজগুলো বন্দর ত্যাগ করেছে। তথাপি অন্যান্য ইউরোপীয়ান বণিক এমন কি তাদের স্বদেশীয় তথাকথিত অনধিকার প্রবেশকারীরাও যে শুল্ক নিয়মিত প্রদান করেছিল, সে শুল্ক প্রদান অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় কোম্পানীর ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে যায় এবং তারা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা এবং দুঃসাহসী অভিযান পরিচালনার নিমিত্তে উদ্দীপ্ত হয়ে শক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। এ উদ্দেশ্যে তারা তাদের সরকারের সাহায্য নিয়ে নিজস্ব শক্তি প্রয়োগ করে প্রথমে তাদের স্বদেশীয় "অনধিকার প্রবেশকারী" বণিকদের বাংলায় আসা বন্ধ করে দেয়।[৬৩১] পরে কোম্পানী রাজা দ্বিতীয় জেমসের নিকট থেকে নওয়াব শায়েস্তা খান এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার অনুমোদন গ্রহণ করে।[৬৩২] সে অনুযায়ী কোম্পানী ১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দে ভাইস এডমিরাল নিকলসনের নেতৃত্বে ১০টি যুদ্ধ জাহাজ, প্রতিটি জাহাজে ১০ থেকে ১২টি কামান এবং ৬০০ সৈন্যসহ এক অভিযান পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। মাদ্রাজ

---

[৬২৯] ই. এফ. আই. ১৬৭৮-১৬৮৪ পৃঃ ৩৪২

[৬৩০] ঐ পৃঃ ৩৫৪ এবং ৩৫৮

[৬৩১] ই. এফ. আই. ১৬৭৮-১৬৮৪ পৃঃ ৩৪২

[৬৩২] ষ্টুয়ার্ট, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪২

কাউন্সিলকে তাদের গ্যারিসন থেকে আরও ৪০০ সৈন্য সরবরাহ করার নির্দেশ দেয়া হয়।[৬৩৩] "সেখান থেকে কোম্পানীর এজেন্টদেরকে নিয়ে চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়ে তা দখল করে নেয়। সেখানে একটি দূর্গ ও টাকশাল নির্মাণ করা, পশ্চিম উপকূলের সেন্ট জর্জের মত সে স্থানকে বঙ্গোপসাগরের পূর্ব উপকূলে ইংরেজদের জন্য একটি অস্ত্রাগারে পরিণত করারও নির্দেশ দেয়া হয়।"[৬৩৪] নিকলসনকে বলা হয় চট্টগ্রাম থেকে ঢাকার দিকে অগ্রসর হতে এবং ইংরেজদের নিকট চট্টগ্রাম সমর্পণ, "সাবেক সম্রাটদের প্রদত্ত ফরমান অনুযায়ী ইংরেজদের প্রাপ্য সকল সুযোগ-সুবিধা পুনর্বহাল" ইত্যাদি শর্ত শায়েস্তা খানের উপর চাপিয়ে দিতে।[৬৩৫] এই সকল লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিকলসনকে আরাকানের রাজা এবং হিন্দু জমিদার ও প্রধানদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করতেও পরামর্শ দেয়া হয়।[৬৩৬]

ঝড়ো ও খারাপ আবহাওয়ার কারণে বাংলায় অভিযান প্রেরণে বিলম্ব ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত ১৬৮৬ সালের অক্টোবরে মাদ্রাজ থেকে প্রেরিত অতিরিক্ত সৈন্যসহ মাত্র তিনটি যুদ্ধ জাহাজ বাংলায় এসে পৌঁছে। চট্টগ্রাম যাওয়ার পরিবর্তে নিকলসন হুগলী যান। মাদ্রাজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হুগলীর কুঠি প্রধান চার্ণককে কোম্পানীর কর্মকর্তাদের কমাণ্ডে পর্তুগীজদের নিয়ে একটি পদাতিক বাহিনী গঠন করার জন্যও নির্দেশ দেয়া হয়। বিপুল সংখ্যক সৈন্যসহ ইংরেজদের যুদ্ধ জাহাজ এসে পৌঁছায়। স্বাভাবিকভাবেই হুগলীর গভর্ণর সতর্ক হন এবং শায়েস্তা খানের নির্দেশে ঐ স্থানের প্রতিরক্ষার জন্য প্রচুর সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করেন। ১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৮ শে অক্টোবর উভয় পক্ষের মধ্যে প্রথম বড় ধরণের সংঘর্ষ হয়। মোগল ফৌজদার আব্দুল গণি পরাজিত হয়ে সেখান থেকে পশ্চাদপসরণ করেন, আর নিকলসন কামান দাগিয়ে শহরের প্রায় পাঁচশত ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেন এবং লুটপাট করার জন্য স্থল বাহিনী নামিয়ে দেন। এই পরিস্থিতির খবর জানতে পেরে শায়েস্তা খান অন্যান্য স্থানের ইংরেজ কুঠি বাজেয়াপ্ত করেন এবং হুগলী থেকে ইংরেজদের বিতাড়ন করার জন্য বড় আকারের পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদল প্রেরণ করেন। তার এই সৈন্যদল পৌঁছার পূর্বেই ইংরেজরা ২০শে ডিসেম্বর, ১৬৮৬ নিজেদের মালপত্র নিয়ে আধুনিক কলিকাতায় অবস্থান, তৎকালীন সূতানটি গ্রামে চলে যায়। চার্ণক সেখান থেকে একটি মিমাংসার জন্য আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। তবে ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে আলাপ-আলোচনা ভেঙ্গে যায়

[৬৩৩] ঐ পৃঃ ৩৪৩
[৬৩৪] ষ্টুয়ার্ট এবং বি.এম.পি ১ম খন্ড
[৬৩৫] ঐ
[৬৩৬] ঐ

এবং ইংরেজরা আরো দক্ষিণে চলে গিয়ে মোগলদের থানা দূর্গ (কলিকাতার দক্ষিণে আধুনিক গার্ডেন রিচ) হিজলী দ্বীপ দখল এবং পরিখা খনন করে সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে। ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের মাঝামাঝি মোগল সেনাপতি আব্দুস সামাদ ১২০০০ সৈন্য নিয়ে হিজলী দ্বীপে পৌঁছেন এবং কিছু যুদ্ধের পরে ২৮ মে সে দ্বীপে অবতরণ করেন। ইংরেজরা দ্বীপ ত্যাগ করে চলে যায়।

তারপর আরেক দফা আলাপ-আলোচনা শুরু হয় এবং ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট শত্রুতা বন্ধ হয়। ইংরেজদেরকে সুতানটিতে ফিরে আসার অনুমতি দেয়া হয় এবং এক প্রাথমিক সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে ৩.৫% ভাগ হারে প্রদেয় শুল্ক রহিত করাসহ তাদেরকে আরো উল্লেখযোগ্য সুবিধা প্রদান করা হয়। কিন্তু, ইংরেজরা পশ্চিম উপকূলে আবার শত্রুতা শুরু করায় এই শান্তি প্রতিষ্ঠা ব্যর্থ হয়। ফলে শায়েস্তা খান তাদেরকে দেয়া সুবিধাসমূহ প্রত্যাহার করে নেন।

এরপর থেকে পশ্চিম উপকূল হয়ে দাঁড়ায় সংঘর্ষের প্রধান কেন্দ্র। ইতোমধ্যে কোম্পানীর পরিচালকরা চার্ণকের স্থলে ক্যাপ্টেন হিথকে বাংলায় এজেন্ট নিয়োগ করে এবং তাঁকে কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজ ও ১৬০ জন্য সৈন্যসহ এই নির্দেশ দিয়ে পাঠানো হয় যে, "হয় পূর্ণ শক্তি দিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে নতুবা কোম্পানীর সকল কর্মচারী" এবং মালপত্র বাংলা থেকে মাদ্রাজে স্থানান্তর করতে হবে।[৬৩৭] তবে, ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে তারা বাংলায় এসে পৌঁছার পূর্বেই জুন মাসে শায়েস্তা খান চিরদিনের জন্য বাংলা ত্যাগ করেন। তার চলে যাওয়ার পরেও ইংরেজদের সঙ্গে এই শত্রুতা আরও দুই বৎসর পর্যন্ত চলতে থাকে। এই পরিস্থিতি এবং ১৬৯০ সালে যে আপোষ মীমাংসা হয়, তা তাঁর পরবর্তী সুবাদার ইব্রাহীম খানের আমলেই হয়। এ জন্য পরবর্তী অধ্যায়ে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

পূর্ববর্তী পর্যালোচনা সমূহ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শায়েস্তা খান ইংরেজদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষার জন্য তাঁর সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রথম মেয়াদের সুবেদারীর সময় ইংরেজরা তাঁর সামনে যে সকল বিষয় পেশ করেছেন, তার মধ্যে সকল বিষয়েই তিনি তাদের প্রতি আনুকূল্য দেখিয়েছেন। এমনকি সম্রাট যখন ইংরেজদের নিকট থেকে স্বাভাবিক শুল্ক আদায় করার জন্য ফরমান জারী করেছেন, তিনি সে আদেশ কার্যকরী করা স্থগিত রেখেছেন এবং বার বার ইংরেজদের পক্ষে সম্রাটের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে ভয়-ভীতি

---

৬৩৭ স্টুয়ার্ট, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪৯-৫০

দেখিয়ে টাকা আদায় করার যে অভিযোগ, তা সম্পূর্ণ অসত্য এবং তা কোম্পানীর কুঠিয়ালদের কার্যকলাপ, অভ্যাস, বিশেষ করে তাদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য এবং কোম্পানীর অর্থ সংক্রান্ত অনিয়মসমূহকে বিবেচনায় নিয়ে বুঝতে হবে। এমন কি তাঁর কথিত নির্যাতন ও ইংরেজদের দ্বারা তাঁর ও মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট ব্যাখ্যা নয়। প্রথম ১৬৫১ সালে শাহ শুজার নিকট থেকে সন্দেহজনকভাবে নিশান লাভ এবং পরবর্তী পর্যায়ে দেশের প্রচলিত প্রথা ও ব্যবস্থার অলিক কাহিনী ফেঁদেও শুল্কমুক্তভাবে বাণিজ্য করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে না পেরে তারা স্বভাবতই ক্ষুব্ধ হয়। এরই সঙ্গে ঘটে যায় চারটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক ঘটনা: বাংলার বাণিজ্যে অত্যাধিক হারে মুনাফা তাদেরকে যে কোন উপায়ে এটি দখল করে নেয়ার জন্য সংকল্পবদ্ধ করে তোলে; ওলন্দাজরা তীব্র প্রতিযোগিতা করে তাদেরকে ইন্দোনেশিয়া থেকে পুরোপুরি বের করে দেয়। এর ফলে দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশে নিজেদের জন্য অনুরূপ একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থান গড়ে তোলার জন্য ইংরেজদের মনে অনুরূপ আকাঙ্খা সৃষ্টি হয়। কোম্পানীর এজেন্টরা বাণিজ্যিক-অধিকার এবং ইংরেজ জাতির আন্তর্জাতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য বল প্রয়োগ করে "অনধিকার প্রবেশকারী" বণিকদেরকে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা এবং সর্বশেষ, আওরঙ্গজেবের দীর্ঘকালব্যাপী দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ কয়েকটি বিরোধী শক্তিকে সামনে নিয়ে আসে এবং তাদের নিয়ে একটি মৈত্রী জোট গড়ে তোলার ব্যাপারে ইংরেজদেরকে উৎসাহিত করে। ইংরেজরা শুধু শুল্ক প্রদান এবং জোর করে অর্থ আদায়ের কথিত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি লাভের চেয়েও অনেক বড় কোন উদ্দেশ্যের জন্য একটি অভিযান প্রেরণের মত ঝুঁকি গ্রহণ করে। কারণ এসব কিছুর ব্যয় একত্রেও অভিযান পরিচালনার ব্যয় থেকে অনেক কম। তারা প্রথম প্রচেষ্টায় সফল হয়নি; কিন্তু একই নীতি ও কৌশল কিছুকাল পরেই তাদেরকে সফলতা এনে দেয়, যখন পরিস্থিতি আরও অনুকূল হয়। এজন্য শায়েস্তা খানকে বলির পাঠা বানানোর কোন প্রয়োজন নেই।

সপ্তম অধ্যায়[৬৩৮]

সমাপ্তির সূচনা

(১০৯৯-১১২৩হিঃ/১৬৮৮-১৭১২খ্রিঃ)

শায়েস্তা খানের সুবাদারী ছিল বাংলায় মোগল মুসলিম শাসনের সেরা যুগ। তাঁর পরবর্তী তিন সুবাদার যথা- খান-ই-জাহান বাহাদুর (১৬৮৮-১৬৮৯খ্রিঃ), ইব্রাহীম খান (১৬৮০-১৬৯৭খ্রিঃ) এবং শাহজাদা আজীমুদ্দীন (১৬৯৭-১৭১২খ্রিঃ) এর শাসনকালীন সময়ে (১৬৮৮-১৭১২খ্রিঃ) এমন সব ঘটনা ঘটে এবং প্রক্রিয়া শুরু হয়, যা শেষ পর্যন্ত বাংলায় মোগল শাসনের অবসান ঘটায়। ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের সঙ্গে শত্রুতা শেষ হয় এবং তাদেরকে বর্তমান কলিকাতায় এনে পুনরায় বসতি করার জন্য অনুমতি দেয়া হয়। এর আট বৎসর পরে তাদেরকে সুতানটি, কলিকাতা এবং গোবিন্দপুর গ্রাম তিনটির জমিদারী স্বত্ব ক্রয় করার অনুমতি দেয়া হয়।

প্রথমত: এই ছোট্ট একটু জায়গাকে ভিত্তি করেই তারা ক্রমান্বয়ে তাদের সামরিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা দৃঢ় করে এবং শেষ পর্যন্ত দেশের মালিক বনে যায়।

দ্বিতীয়ত: এই সময়ে দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার মেদিনীপুরের একজন হিন্দু ভাগ্যান্বেষী শোভা সিংয়ের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে উড়িষ্যার আফগান সর্দার রহিম খানের বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে মোঘল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ও ক্রমবর্ধমন দূর্বলতা প্রকাশ পেয়ে যায় (১৬৯৫-১৬৯৭খ্রিঃ)। যদিও বিদ্রোহ দমন করা হয়। কিন্তু, সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলের পর বাংলায় এটাই ছিল মোগল শক্তির প্রতি প্রথম মারাত্মক চ্যালেঞ্জ। এর চেয়েও যা বড়, তা হচ্ছে পশ্চিম বাংলার এই সাময়িক গোলযোগকে কেন্দ্র করে ইউরোপীয় কোম্পানীগুলো নিজেদের বসতিগুলোতে দূর্গ নির্মাণ করে নিজেদেরকে সামরিকভাবে শক্তিশালী করে তোলে।

তৃতীয়ত: সুবাদার শাহজাদা আজীমুদ্দীন এবং প্রাদেশিক দীওয়ান করতলব খান (মুর্শিদ কুলী খান) এর মধ্যকার অব্যাহত অন্তর্কলহ ও বিবাদ এই ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়াকে বিশেষ রূপ দান করে। এই সংঘাতের ফলে ঢাকা থেকে বাংলার রাজস্ব রাজধানী মুর্শিদাবাদে এবং সুবাদারের বাসস্থান পাটনায় স্থানান্তরিত হয়।

---

৬৩৮ মূল বইয়ের দ্বাবিংশতম অধ্যায়

ফলে, ঢাকা আর মুসলিম বাংলার রাজধানী রইল না। যদিও আরও কিছুদিন রাজধানী বলা হত এবং তখন থেকেই এর অবনতি শুরু হয়। অপরদিকে সুবাদারের অনুপস্থিতি, ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরবর্তী দিল্লীতে উত্তরাধিকার যুদ্ধ ইত্যাদির কারণে প্রদেশের উপর কেন্দ্রের কর্তৃত্ব হ্রাস পায় এবং যোগ্য ও বুদ্ধিমান দীওয়ান মুর্শিদ কুলী খান দীওয়ান এবং সুবাদার উভয়ের ক্ষমতা নিজ হাতে কেন্দ্রীভূত করতে সক্ষম হন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরবর্তী দুই দশক পর্যন্ত মুর্শিদকুলী খান বাংলায় এক প্রকার অল্পবিস্তর শান্তি বজায় রাখতে পেরেছিলেন; কিন্তু তিনি তা পেরেছিলেন একদিকে নিয়মিতভাবে সম্রাটের নিকট দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণ এবং নাম মাত্র তাঁর অনুগত্য স্বীকার করে; অন্যদিকে তিনি বাংলার মুসলমান আমীর উমরাহ এবং জায়গীরদারদেরকে তাদের পদ থেকে অপসারণ করে, যাদের প্রতি তাঁর আশংকা অযৌক্তিক ছিল না এবং একই সঙ্গে তাদের স্থলে হিন্দুদের সমর্থন ও সহযোগিতার উপর নির্ভর করায় তারা শীঘ্রই "গদীর পিছনের শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়।" এই নূতন শক্তিশালী চক্রের সঙ্গে ক্ষমতালিপ্সু ইংরেজ বণিকদের মৈত্রী মুর্শিদ কূলী খানের মৃত্যুর ঠিক ৩০ বৎসর পরে বাংলায় মুসলিম শাসনের অবসান ঘটায়।

১. খান-ই-জাহান বাহাদুরের সুবাদারী
বাংলায় ইংরেজদের দ্বিতীয় অভিযান

শায়েস্তা খান বাংলা ত্যাগ করার অব্যবহিত পরে খান-ই-জাহান এক বৎসর অস্থায়ীভাবে বাংলার সুবাদারীর দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সময়ে প্রধানতঃ পশ্চিম ভারতীয় উপকূলে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। ক্যাপ্টেন হীথ, যাকে ইংরেজ কোম্পানী ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে দ্বিতীয় অভিযান নিয়ে বাংলায় প্রেরণ করে,[৬৩৯] তিনি অক্টোবরের শেষের দিকে বাংলায় এসে পৌঁছেন। কোম্পানীর নির্দেশ মোতাবেক তিনি নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সূতানটী থেকে সকল ইংরেজকে সরিয়ে ফেলেন এবং ৮ই নভেম্বর উড়িষ্যা উপকূলের বালেশ্বরের দিকে যাত্রা করেন। তিনি বালেশ্বরের নিকটে পৌঁছলে সেখানকার মোগল ফৌজদার তার সঙ্গে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন এবং হীথের পক্ষ হতে কোন প্রকার শত্রুতামূলক আচরণ করা থেকে হীথকে বিরত রাখার জন্য কোম্পানীর দুই জন কুঠিয়ালকে যিম্মী হিসেবে আটক করে রাখেন। তিনি অবশ্য কিছু সংখ্যক পদাতিক এবং নৌ-সেনাসহ বন্দরে অবতরণ করেন, দূর্গ আক্রমণ করে ২৯শে

---

[৬৩৯] পূর্ববর্তী পৃঃ ২১৩

নভেম্বর নতুন বালেশ্বর শহর দখল করে নেন।[৬৪০] তিনি এক মাস পর্যন্ত নগরী দখলে রাখেন এবং নাগরিকদের উপর ভয়ানক নৃশংস অত্যাচার করেন। ২৩শে ডিসেম্বর তিনি সকল ইংরেজসহ তার নৌ-বহর নিয়ে অভিযানের মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী চট্টগ্রামকে ভবিষ্যৎ অভিযান পরিচালনার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহারের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম দখল করার জন্য যাত্রা করেন। হীথ অবশ্য দেখতে পান যে, মোগলদের মোতায়েন করা সেনাদল এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এত শক্তিশালী যে, তা দখল করা সম্ভব হবে না। সাগরের বুকে কয়েক দিন নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে তিনি বাংলা বিজয় অভিযান পরিত্যাগ করে ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৬৮৯ সালে মাদ্রাজের উদ্দেশ্যে ফেরত যাত্রা করেন।[৬৪১]

বাংলার বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান সমূহের ব্যর্থতা এবং কোম্পানীর বোম্বাইর প্রতিনিধি জশিয়া চাইল্ডের আগ্রহে পশ্চিম উপকূলে পরিচালিত সামরিক তৎপরতার একই পরিণতি দেখে ইংরেজ কোম্পানীর এই বিশ্বাস জন্মে যে, মোগলদের রাজনৈতিক কাঠামো এখনো এত মজবুত যে, বহু দূরবর্তী অঞ্চলে সামরিক আক্রমণ পরিচালনা করলেও তা ভেঙ্গে পড়ার মত নয়। তাই তারা শান্তি এবং তাদের লাভজনক বাণিজ্যিক কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠে। আওরঙ্গজেবও ইংরেজদের সঙ্গে শান্তি কামনা করতেন, যদিও তা দক্ষিণাত্যের যুদ্ধের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে। হীথের মাদ্রাজে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই শত্রুতা অবসানের জন্য আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছিল। আলোচনা চলাকালীন সময়ে বালেশ্বরে হীথের নৃশংতার কথা জানতে পেরে আওরঙ্গজেব অত্যন্ত বিরক্ত হন। যাহোক, "অত্যন্ত বিনীতভাবে দরখাস্ত করা এবং ১,৫০,০০০.০০ টাকা জরিমানা দেয়ার প্রতিশ্রুতি" দেয়ায় সম্রাট ইংরেজ বণিকদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা" ঘোষণা করেন এবং ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত হয়।[৬৪২] সম্রাট তাদের জন্য এই শর্তে ফরমান জারী করেন যে,

(১) ইংরেজরা বন্দরের জন্য আগের নীতিমালা মেনে চলবে এবং তারা আর "কখনো এইরূপ লজ্জাজনক আচরণ করবে না";

(২) তারা সম্রাটকে ১,৫০,০০০.০০ টাকা জরিমানা প্রদান করবে;

(৩) জশিয়া চাইল্ডকে ভারত থেকে প্রত্যাহার করে নিতে হবে;

---

৬৪০ ষ্টুয়ার্ট, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫১

৬৪১ ষ্টুয়ার্ট, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫১৩

৬৪২ ডব্লিউ, ডব্লিউ, হান্টার, এ হিস্ট্রি অব বৃটিশ ইন্ডিয়া, ২য় খন্ড, লন্ডন, ১৯০০, পৃঃ ২৬৫-২৬৬

(৪) মোগল প্রজাদের নিকট ইংরেজদের যে ঋণ আছে, তা সন্তোষজনকভাবে পরিশোধ করতে হবে এবং

(৫) তাদেরকে সকল ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।[৬৪৩]

২. সুবাদার ইব্রাহীম খান

বাংলায় ইংরেজদের পুনরায় বসতি স্থাপন

বাংলায় শান্তি প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের দায়িত্ব বর্তায় নতুন সুবাদার ইব্রাহীম খানের উপর। তিনি ১৬৮৯ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে খান-ই-জাহান বাহাদুরের নিকট হতে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইব্রাহীম খান ছিলেন জাহাঙ্গীরের সময়কালীন বিখ্যাত ইরানী সভাসদ আমীরুল উমরা আলী মর্দান খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর তাঁকে পদোন্নতি দিয়ে পাঁচ হাজারী মনসবদার করা হয় এবং তিনি দ্রুত একের পর এক, প্রথমে কাশ্মীরের গবর্ণর, তারপর লাহোর, তারপর বিহার এবং সর্বশেষে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। যখন তিনি বাংলায় আসেন, তখন তিনি বয়সে প্রবীণ এবং স্বাভাবিকভাবেই কোমল এবং শান্তিপূর্ণ মেজাজের লোক। তিনি কড়া নিরপেক্ষতার সঙ্গে বিচার কাজ পরিচালনা করতেন এবং কৃষি ও বাণিজ্যের প্রতি তাঁর উৎসাহের জন্য খ্যাত ছিলেন। রিয়াদে লেখা হয়েছে যে, "তিনি মজলুমের জন্য দয়া এবং ন্যায় বিচারের দ্বার উন্মোচন করেন এবং একটি পিপীলিকাকেও ক্ষতিগ্রস্থ হতে দেন না।"[৬৪৪]

বাংলায় এসে আওরঙ্গজেবের নির্দেশে তিনি যুদ্ধের কারণে ঢাকায় বন্দী করে রাখা ইংরেজ বণিকদেরকে মুক্তি দেন এবং তখন মাদ্রাজে অবস্থানকারী জব চার্ণকের নিকট পত্র লিখে তাঁকে বাংলায় ফিরে এসে পুনরায় বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করার জন্য আহবান জানান। মাদ্রাজ কাউন্সিল বাংলার জন্য একটি স্বতন্ত্র শাহী ফরমান প্রদানের দাবী জানায়। এর নিশ্চয়তা দেয়া হয় এবং জব চার্ণক তার কাউন্সিল এবং কুঠিয়ালদের নিয়ে ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ শে আগস্ট সুতানটিতে (কলিকাতায়) এসে পৌঁছেন।[৬৪৫] ইংরেজদেরকে বাংলায় শুল্ক প্রদানের পরিবর্তে বৎসরে মাত্র ৩০০০.০০ টাকা প্রদানের বিনিময়ে বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়ে ফেব্রুয়ারী মাসে ওয়াজিরের (আসাদ খানের) সীলমোহরে এক শাহী আদেশ জারী

---

৬৪৩ ঐ, এবং ষ্টুয়াট পূর্বোক্ত, পরিশিষ্ট ৪

৬৪৪ রিয়াদ, পৃঃ ২৩০২৩১

৬৪৫ ষ্টুয়ার্ট, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫৭

করা হয়। এইভাবে তত্ত্বগতভাবে ইংরেজদেরকে শাহ শুজার নিশান এবং মীর জুমলা ও শায়েস্তা খান উভয়ে ইংরেজদেরকে যে সুবিধা দিয়েছিলেন, তাদেরকে তার সকল সুবিধার নিশ্চয়তা দেয়া হয়। ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দের আপোষ-নিষ্পত্তির রাজনৈতিক ও সামরিক তাৎপর্য ছিল আরো ব্যাপক। ইংরেজরা বাংলায় বিদেশীদের মধ্যে সর্বাধিক আনুকূল্য প্রাপ্ত জাতির মর্যাদা লাভ করে এবং তা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে স্বীকার করে নেন। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধের সময়ে অস্থায়ীভাবে সুতানটিতে অবস্থানকালে ইংরেজরা আবিস্কার করে যে, এই জায়গাটি কৌশলগত, সামরিক, নৌ-চলাচল এবং বাণিজ্যিক দিক থেকে অধিকতর উপযোগী। কাজেই, তারা বাংলায় ফিরে এসে হুগলীর পরিবর্তে সেখানেই তাদের বসতি গড়ে তোলে। হুগলীর মোগল ফৌজদারের প্রকাশ্য দৃষ্টি থেকে দূরে থাকায় ইংরেজরা সুযোগ পেয়ে কলিকাতায় শীঘ্রই নিজেদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে। স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজরা নতুন সুবাদারের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল এবং তারা তাঁকে "ন্যায়পরায়ন হিসেবে সর্বাধিক খ্যাত এবং একজন ভাল নওয়াব" বলে অভিহিত করে।[৬৪৬]

একই সময়ে ফরাসীরাও বাংলায় একটি নিরাপদ অবস্থান লাভ করে। শায়েস্তা খানের সময়ে ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে ফরাসীরা হুগলীর চার মাইল দক্ষিণে চন্দর নগর নামক স্থানে প্রথমবারের মত এক টুকরা জমি ক্রয় করে। কিন্তু ওলন্দাজদের বিরোধিতার কারণে তারা সেখানে কোন বসতি গড়ে তোলার অনুমতি পায়নি। তবে ১৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসী এজেন্ট ডিল্যাণ্ডেজ "ঢাকায় নওয়াবের দরবারে উৎকোচ প্রদান করে" চন্দর নগরে বসতি নির্মাণের জন্য বহুল কাঙ্খিত অনুমতি লাভে সক্ষম হয়। আবার ১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দে ডিল্যাণ্ডেজ সম্রাটকে এ শর্তে ৪০,০০০.০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয় যে, এর এক চতুর্থাংশ নগদ এবং বাকী টাকা বৎসরে ৫০০০.০০ টাকা করে ছয় কিস্তিতে পরিশোধ করবে এবং বিনিময়ে তারা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করার জন্য শাহী আদেশ লাভ করবে ।[৬৪৭] তবে, তাদেরকে ৩.৫% হারে শুল্ক প্রদান করতে হবে এবং ওলন্দাজদের মত সুবিধা ভোগ করবে। ওলন্দাজরা ইতোপূর্বেই হুগলীর নিকটস্থ চিনসুরায় বসতি স্থাপন করেছিল। অতএব, ১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইংরেজ, ফরাসী এবং ওলন্দাজরা যথাক্রমে কলিকাতা, চন্দর নগর এবং চিনসুরায় ভালভাবেই তাদের বসতি গড়ে তুলেছিল।

---

৬৪৬ সি. আর উইলসন. আর্লি এ্যাথ্যালস অব দি ইংলেস ইন বেঙ্গল. ১ম খন্ড. পৃঃ ১২৪

৬৪৭ পি. ক্যাইপেলিন. লা কোম্পানী ইন্ডিস অরিয়েন্টলিস এট. এফ. মার্টিন. প্যারিস. ১৯০৮ পৃঃ ৩২১-৩২২. এইচ. বি.তে উদ্বৃত. ২য় খন্ড পৃঃ ৩৯২

৩. রহিম খান আফগান এবং শোভা সিংয়ের বিদ্রোহ

১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দের অল্পকাল পরেই রহিম খান এবং শোভা সিংহের বিদ্রোহ "শাহ জাহানের সিংহাসনারোহণের পর থেকে বাংলায় যে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজ করছিল," তা ভঙ্গ করে। রহিম খান ছিলেন উড়িষ্যায় বসবাসকারী আফগানদের সর্দার। শোভা সিংহ ছিলেন আধুনিক মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটাল-চন্দ্রকোনা মহকুমা, তৎকালীন বর্ধমান জেলার ছোট-বরদার লোক। তিনি দৃশ্যত "বর্ধমান জেলার রাজস্ব আদায়ের জন্য নিযুক্ত একজন পাঞ্জাবী ক্ষত্রিয় ঠিকাদার" কৃষ্ণ রামের অধীনস্থ জমিদার ছিলেন।[৬৪৮] রিয়াদে উল্লেখিত গোলযোগের প্রধান কারণ হচ্ছে দাক্ষিণাত্যে অভিযান নিয়ে " সম্রাটের দীর্ঘদিনব্যাপী রাজধানীতে অনুপস্থিতি,"[৬৪৯] মারাঠাদের অব্যাহত প্রতিরোধ এবং সাম্প্রতিককালে মোগলদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের যুদ্ধ মোগলদের সামরিক শক্তি সম্পর্কে তাদের ভয়-ভীতি হ্রাস করে দেয়। আফগানরা মোগলদের হাতে নিজেদের পরাজয়কে কখনো পুরোপুরি মেনে নিতে পারেনি। কাজেই সম্রাটের দাক্ষিণাত্যে ব্যস্ততার সঙ্গে বাংলার সুবাদার ইব্রাহিম খানের অসামরিক এবং কোমল মেজাজ রহিম খানকে অন্তত উড়িষ্যা এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় আফগান শক্তির পুনরুত্থান ঘটাতে উদ্বুদ্ধ করে থাকবে। পরিস্থিতি শোভা সিংহকেও উৎসাহিত করে, তবে তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাহাজানি এবং লুণ্ঠন করা। যাহোক, তিনি ছিলেন একজন চরিত্রহীন ব্যক্তি। মারাঠাদের মত কোন গোত্রীয়" বা "জাতীয়" আদর্শ তার ছিল না। রহিম খান এবং শোভা সিংহের মধ্যে কোন পূর্ব পরিচিতি ছিল কিনা, তা জানা যায়নি। তবে গোলযোগ শুরু হওয়ার প্রায় অব্যবহিত পরেই তারা তাদের সৈন্যদেরকে একত্রিত করে অগ্রসর হন। ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে শোভা সিংহ তার প্রতিবেশীদেরকে লুণ্ঠন করা শুরু করে। "বর্ধমানের জমিদার" কৃষ্ণরাম তাকে অবিলম্বে বাধা প্রদান করেন, ফলে তিনি পরাজিত এবং নিহত হন। তারপর শোভা সিংহ বর্ধমাণ শহর দখল এবং কৃষ্ণ রামের ধন সম্পদ ও স্বর্ণ রৌপ্য হস্তগত করেন এবং তার স্ত্রী ও কন্যাদেরকে বন্দী করে নিয়ে আসেন[৬৫০] এবং নিজে রাজা উপাধি ধারণ করেন। কৃষ্ণ রামের পুত্র জগৎ রায় ঢাকায় পালিয়ে

---

[৬৪৮] এইচ. বি. ২য় খন্ড. পৃঃ ৩৯৩

[৬৪৯] রিয়াদ পৃঃ ২৩১

[৬৫০] রিয়াদ পৃঃ ২৩১

এসে বিদ্রোহ সম্পর্কে সুবাদারকে অবহিত করেন। ইব্রাহীম খান এ বিদ্রোহ হালকা করে দেখেন এবং শোভা সিংহকে একজন লুণ্ঠনকারী বলেই মনে করেন। দৃশ্যত তিনি তখনও তার সঙ্গে রহিম খান আফগানের মৈত্রী সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন। এতএব, সুবাদার হুগলীর ফৌজদার নুরুল্লাহ খানকে শোভা সিংহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন এবং তিনি বিদ্রোহ দমনের জন্য আর কোন দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। ইতোমধ্যে আফগান সর্দার রহিম খানের সঙ্গে মৈত্রী করায় শোভা সিংহের ক্ষমতা যথেষ্ঠ বৃদ্ধি পায় এবং ১৬৯৬ সালের জুলাই মাসে রহিম খানের সমর্থনপুষ্ট হয়ে তিনি হুগলীর দিকে অগ্রসর হন। ফৌজদার নুরুল্লাহ খান ভীত হয়ে নিজে হুগলীর দূর্গে আশ্রয় নেন এবং বিদ্রাহী সৈন্যদের চাপে ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দের ২২ শে জুলাই রাত্রে দূর্গ থেকে পালিয়ে যান। শোভা সিংহের সৈন্যরা শহরে প্রবেশ করে লুট তরাজ শুরু করে। তখন ওলন্দাজদের নিকট আশ্রয় গ্রহণকারী শহরের গণ্যমাণ্য ব্যক্তি এবং ফৌজদারের অনুরোধে ওলন্দাজরা বিদ্রোহীদের অগ্রগতি রোধ করে এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে স্থল পথে ৩০০ সৈন্য এবং নৌ পথে দুটি যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করে। ওলন্দাজ সৈন্যদের আগমন এবং জাহাজ থেকে দূর্গের উপর গোলা নিক্ষেপ করায় শোভা সিংহের সৈন্যরা শহরের পশ্চাদভাগ দিয়ে পালিয়ে যায়।

হুগলী লুণ্ঠন শোভা সিংহের এক বৎসরের মত স্বল্পকালীন বিদ্রোহী জীবনের শীর্ষ ঘটনা। হুগলী থেকে তিনি বর্ধমানে ফিরে আসেন এবং সেখানে একই মাসের (জুলাই, ১৬৯৬) শেষের দিকে কৃষ্ণরামের কন্যার শ্লীলতা হানির চেষ্টা করায় সেই মহতী বালিকা ছুরিকাঘাতে তাকে হত্যা করে এবং পরে নিজে আত্মহত্যা করে।[৬৫১] শোভা সিংহের ভ্রাতা হিম্মত সিংহ তার উত্তরাকারী হন। কিন্তু তিনি ছিলেন অকর্মণ্য এবং ভোগ-বিলাসী, তাই বিদ্রোহী সৈন্যরা তার পরিবর্তে রহিম খানকে তাদের নেতা নির্বাচন করে। রহিম খান এবার রহিম শাহ এবং রাজা উপাধি ধারণ করেন। হিম্মত সিংহ অবশ্য রহিম শাহের অধীনে কাজ করতে থাকেন।

---

৬৫১ এইচ, বি, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৯৪। যদুনাথ সরকার যে মন্তব্য করেছেন (এইচ, বি, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৯৩-৩৯৪)"শোভা সিংহ গঙ্গা নদীর পাড় দিয়ে ১৮০ মাইল দীর্ঘ একটি রাজ্য স্থাপন করেছিলেন, হুগলী ছিল এর মধ্যস্থলে এবং তিনি নৌপথে কর ও শুল্ক ধার্য করেছিলেন" তা শোভা সিংহের বিদ্রোহ সম্পর্কে তার নিজের বর্ণনার সঙ্গেই খাপ খায়না। সরকার শোভা সিংহকে একজন "লুণ্ঠনকারী" হিসেবে চিত্রিত করেছেন। (পূর্বোক্ত পৃঃ ৩৯৩) । বলেছেন যে, হুগলী থেকে বহিস্কার হওয়ার মাত্র কয়েকদিন পরে চুরিকাঘাতে তার মৃত্যু হয়। বিদ্রোহী রাজ্যের যে বর্ণনা সরকার দিয়েছেন, তা রহিম খানের প্রতি অধিক প্রযোজ্য। কারণ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শোভা সিংহের মৃত্যুর পর তিনি ব্যাপকভাবে তার ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধি করেন।

রহিম শাহ পরে ১০,০০০ (দশ হাজার) অশ্বারোহী এবং ৬০,০০০(ষাট হাজার) পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ করে এক বিরাট বাহিনী গড়ে তোলেন। প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তার সফলতা এবং হুগলীতে মোগলদের ব্যর্থতা দেখে সকল শ্রেণীর লোকজন এবং সুযোগ সন্ধানীরা তার দল ভারী করে তোলে। এই বিরাট বাহিনী নিয়ে তিনি নদীয়া হয়ে মাকসুদাবাদের (মুর্শিবাদ) দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। মাকসুদাবাদের জায়গীরদার নিয়ামত খান এবং তার ভ্রাতুষ্পুত্র তাহাওয়ার খান বিদ্রোহী নেতাকে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা যুদ্ধে পরাজিত এবং নিহত হন। ১৬৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে রহিম শাহ সরকারের প্রেরিত ৫০০০ সৈন্যের একটি বাহিনীকে পরাজিত করে মাকসুদাবাদে প্রবেশ এবং লুন্ঠন করেন। মাকসুদাবাদ থেকে রহিম শাহ উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে রাজমহল দখল করেন। ১৬৯৭ সালে তিনি মালদহও অধিকার করেন। এইভাবে প্রায় সমগ্র পশ্চিম বাংলা রহিম শাহের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। বিদ্রোহী সৈন্যদের ছোট ছোট দল আশে পাশের লোকালয়ে হামলা চালিয়ে লুট-তরাজ করতে থাকে।

শোভা সিংহ এবং রহিম শাহের বিদ্রোহ বাংলায় মোগল শক্তির দুর্বলতা প্রকাশ করে দেয় এবং বিদেশী বাণিজ্যিক কোম্পানীর অধীনস্থ ইউরোপীয় সৈন্যদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করে। এর চেয়েও মারাত্মক হচ্ছে পশ্চিম বাংলায় ছড়িয়ে পড়া অরাজকতাকে উপলক্ষ্য করে বিদেশী কোম্পানীগুলো তাদের সামরিক স্থাপনাসমূহ আরও শক্তিশালী করে এবং তাদের কুঠিগুলোকে দূর্গ দ্বারা সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে সুবাদারের অনুমতি চাওয়ার জন্য একটি সুযোগ পেয়ে যায়। ইব্রাহিম খান তাদেরকে সাধারণভাবে আত্মরক্ষার জন্য বলে দেন। এই আদেশের সুযোগ গ্রহণ করে তারা তাদের বসতিগুলোকে সুরক্ষিত করে তোলে। এই সময় থেকেই কলিকাতায় ইংরেজদের দূর্গ "ফোর্ট উইলিয়াম" চন্দরনগরে ফরাসীদের ফোর্ট অরলিয়েন্স এবং চিনসুরায় ওলন্দাজদের 'ফোর্ট গুস্তাভাস' নির্মাণ শুরু হয়।[৬৫২] ইংরেজরা তাদের কলিকাতা কুঠির চতুষ্পার্শ্বে ওয়াল এবং বুরুজ নির্মাণ করে এবং কেল্লার উপর কামান বসায়। চন্দর নগরে ফরাসীরা নদীকে সামনে রেখে শক্ত ও তীক্ষ্ণ কাঠের বেড়া এবং বুরুজ নির্মাণ করে। অনুরূপভাবে চিনসুরায় ওলন্দাজরা দেয়াল নির্মাণ করে তাদের কুঠিকে সুরক্ষিত করে তোলে। এই তিন জাতিই তাদের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য রাজপুত এবং স্থানীয় অন্যান্য গোত্রীয় লোকদেরকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করতে থাকে।

---

[৬৫২] উইলসন, আর্লি এন্যালস, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৪৭

৪. শাহজাদা আজীমুশ্বানের সুবাদারী

রহিম খান আফগানীর বিদ্রোহ দমন

রহিম খান কর্তৃক মালদহ দখলের (মার্চ, ১৬৯৭) অল্পকাল পরেই সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর বিদ্রোহ এবং ইব্রাহীম খানের অবহেলা এবং নিষ্ক্রিতা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে পারেন। ইব্রাহীম খানকে অবিলম্বে বাংলা থেকে ডেকে পাঠান এবং তাঁর স্থলে আওরঙ্গজেবের পৌত্র, শাহজাদা সুলতান মুয়াজ্জম (পরবর্তীতে সম্রাট শাহ আলম বাহাদুর শাহ) এর পুত্র আজীমুদ্দীনকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। নতুন সুবাদারের আগমনের পূর্বেই সম্রাট ইব্রাহীম খানের পুত্র জবরদস্ত খানকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেন। জবরদস্ত খান অবিলম্বে এক সৈন্যদল নিয়ে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে রওয়ানা দেন এবং ১৬৯৭ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে গঙ্গানদীর তীরে ভগবান গোলা নামক স্থানে রহিম খান তাকে বাধা দেন। যাহোক, দু'দিন যুদ্ধের পর বিদ্রোহীদেরকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে জবরদস্ত খান তাদের শিবির দখল করে নেন। জবরদস্ত খান এর পরেই রাজমহল এবং মালদহের দিকে একদল অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করেন এবং রহিম খান ও তাঁর লোকজন সে অঞ্চলে পৌঁছার পূর্বেই তা পুনরুদ্ধার করেন। বর্ষাকাল শুরু হওয়ার আগেই জবরদস্ত খান বর্ধমান শহর দখল করে নেন। রহিম খান ও তাঁর মিত্ররা চন্দ্রকোনার জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। এত সহজে বিদ্রোহীদের দমন করা সম্ভব হওয়া থেকে বুঝা যায় যে, তাদের পূর্ববর্তী সফলতাগুলো ছিল প্রবীণ সুবাদার ইব্রাহীম খানের অবহেলার কারণে। যাহোক, বর্ষা মৌসুমে বিদ্রোহীদেরকে বন-জঙ্গলে তাড়া করা কঠিন হওয়ায় বর্ধমানে শিবির স্থাপন করে তিনি অবস্থান করতে থাকেন।

ইতিমধ্যে শাহজাদা আজীমুদ্দীন (যিনি তাঁর পরবর্তী উপাধি আজীমুশ্বান নামেই অধিক খ্যাত) বাংলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে বিহারে এসে পৌঁছেন এবং বর্ষার শেষে তিনি সেখান থেকে পুনঃ যাত্রা শুরু করেন। ১৬৯৭ সালের নভেম্বরে বর্ধমান এসে পৌঁছেন।[৬৫৩] সেখানে জবরদস্ত খান তাঁর নিকট পদত্যাগ করেন। কারণ বলা হয়েছে যে, শাহজাদা তাঁকে আন্তরিকতা বিহীনভাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি তাঁর (শাহজাদার) নিকট অভিযানের দায়িত্ব ন্যাস্ত করে ইব্রাহীম খানের সঙ্গে সম্রাটের সহিত দাক্ষিণাত্যের শিবিরে যোগদানের জন্য

---

[৬৫৩] ড. আব্দুল করিম স্পষ্টতই ভুল বক্তব্য দিয়েছেন যে, শাহজাদা ১৬৯৭ সালের নভেম্বরে বর্ধমান এসে পৌঁছান (মর্শিদ কুলী খান এন্ড হিজ টাইমস, ঢাকা ১৬৯৭ পৃঃ ২

বাংলা ত্যাগ করেন (জানুয়ারী, ১৬৯৮)। আজীমুশ্বান অবশ্য রহিম খানের বিরুদ্ধে সত্ত্বর কোন অভিযান প্রেরণ করেন নি এবং সেখানে আরো আটমাস অবস্থান করেন। শাহজাদার নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ গ্রহণ করে রহিম খান চন্দ্রকোনার জঙ্গলের আস্তানা থেকে বেরিয়ে আসেন এবং নদীয়া ও বর্ধমানের আসে পাশে পুনরায় তার হামলা ও লুট-তরাজ শুরু করেন। তারপর আজীমুশ্বান শান্তির জন্য রহিম খানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন, কিন্তু এই আলোচনার সুযোগ নিয়ে রহিম খান শাহজাদার মুখ্যমন্ত্রী খাজা আনওয়ারকে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে হত্যা করেন।

এবার শাহজাদা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তাঁর সেনাপতি হামিদ খান কোরেশীকে প্রেরণ করেন এবং ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট (অথবা সেপ্টেম্বর) মাসে চন্দ্রকোনার এক যুদ্ধে তিনি বিদ্রোহীদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। রহিম খান ধৃত হন এবং হামিদ খান তাঁকে শিরোচ্ছেদ করেন। তাঁর এই বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য হামিদ খান কোরেশীকে শামসীর খান বাহাদুর উপাধিসহ তাকে সিলেটের ফৌজদার নিয়োগ করা হয়। বিদ্রোহীদের নেতার পরাজয় এবং মৃত্যুর পরে অবশিষ্ট সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যার যার মত চলে যায় এবং কিছুসংখ্যককে মোগলদের অধীনে চাকুরীতে নিযুক্ত করা হয়।

শাহজাদা আজীমুশ্বানের সুবাদারী কাগজে কলমে ১৬৯৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বলবত ছিল। কিন্তু, বাস্তবে ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দেই এর সমাপ্তি ঘটে। কারণ সে সময় তিনি প্রদেশ ত্যাগ করে প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রদেশের শাসন কাজ পরিচালনা করেন। তার শেষের নয় বৎসর প্রদেশের শক্তিশালী দীওয়ান মুর্শিদ কুলী খান বাংলার ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনিই বাংলার নাযিম বা সুবাদার নিযুক্ত হন। আজীমুশ্বানের সুবাদারীর প্রথম ভাগ অর্থাৎ ১৬৯৭ থেকে ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে আবার ঠিক দুই সমান অংশে ভাগ করা যায়; ১৬৯৭ থেকে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর পর্যন্ত শাহজাদা বাংলায় নিয়ন্ত্রনহীন কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেন। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে মুর্শিদ কুলী খান (করতলব খান) নতুন দীওয়ান হিসেবে বাংলায় আসেন। এই সময় থেকে ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তার এবং শাহজাদার মধ্যে ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্বের সময় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

৫. শাহজাদার অর্থোপার্জন

ইংরেজরা সুতানটী, কলিকাতা এবং গোবিন্দপুর ক্রয় করে (১৬৯৮ সালে)

শাহজাদা আজীমুশ্বান ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং দৃঢ় উচ্ছাশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি; কিন্তু রহিম খানকে চূড়ান্তভাবে দমন করা ছাড়া তাঁর সুবাদারীর প্রাথমিক দিকের অন্যান্য কাজ তাঁর জন্য গৌরবজনক ছিলনা, এমন কি তার দায়িত্বে ন্যাস্ত দেশ বা জনগণের স্বার্থেরও অনুকূল ছিলনা। বুঝা যাচ্ছে যে, তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল যত বেশি সম্ভব ধন সম্পদ সঞ্চয় করা; সম্ভবত তাঁর সময়ের অন্যান্যের মত তিনিও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, তাঁর বর্ষীয়ান পিতামহ ইন্তিকাল করার পরে যে, উত্তরাধিকার যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াবে, তার জন্য প্রস্তুতি স্বরূপই ছিল তাঁর এই প্রচেষ্টা। অন্যান্য যে সকল লোক শাহজাদার, এই উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলেন, তারা তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য তাঁকে পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। ইংরেজ বণিকরা হচ্ছে তার অন্যতম। ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে তারা আজীমুশ্বানকে ১৬০০০.০০ টাকা উপঢৌকন দেয় এবং তাঁর নিকট হতে আধুনিক কলিকাতা শহরের উত্তর, মধ্য এবং দক্ষিণাঞ্চলব্যাপী বিস্তৃত তৎকালীন তিনটি গ্রাম যথা- সুতানটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের মালিকের নিকট থেকে গ্রাম তিনটির রাজস্ব আদায়ের অধিকার ক্রয় করে নেয়ার জন্য অনুমতি লাভ করে।[৬৫৪] ইংরেজরা ইতিপূর্বেই বাংলায় বিদেশী বণিকদের মধ্যে সর্বাধিক আনুকূল্য প্রাপ্ত জাতির মর্যাদা লাভ করেছিল এবং সুতানটীতে তাদের বসতিকে সুরক্ষিত করেও তুলেছিল। এরপর থেকে তারা দাবী করতে থাকে যে, দেশের ভূমির উপর তারা জমিদারীর অধিকার অর্জন করেছে।

শাহজাদার অর্থ সঞ্চয় করার ইচ্ছা তাকে আরেকটি প্রশ্ন সাপেক্ষ কাজ যথা সওদাই-খাস বা "জাঁহাপনার ব্যক্তিগত বাণিজ্য" শুরু করতে উদ্বুদ্ধ করে। বলা হয়েছে যে, তিনি অধিকাংশ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ এবং অন্যান্য পণ্যের উপরও একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং বর্ধিত মূল্যে সেগুলো গ্রহণ করতে খুচরা ব্যবসায়ীদেরকে বাধ্য করতেন। সৌভাগ্যের বিষয় হলো এই যে, তিনি এই কাজ বেশি দিন করতে পারেননি, মাত্র এক বৎসরের মধ্যেই তা সম্রাট জানতে পারেন। তিনি তাঁকে কঠিনভাবে তিরস্কার করেন এবং এ কাজ থেকে বিরত হতে নির্দেশ দেন। তিনি আরো বলেন, "এই সওদা-ই-খাসের কারবার তুমি কোত্থেকে শিখেছো? এটা হচ্ছে মস্তিষ্ক বিকৃতির আরেক নাম মাত্র। নিশ্চয়ই

---

৬৫৪ উইলসন, পূর্বোক্ত পৃঃ ১৫০ এবং ওল্ড ফোর্ট উইলিয়াম ইন বেঙ্গল, ১ম খন্ড, পৃ: ৩৯

তোমার পিতামহ বা পিতার নিকট থেকে নয়। তুমি বরং এই চিন্তা বাদ দাও।"[৬৫৫] শুধু তাই নয়, মনে হচ্ছে শাহজাদার এই নিপীড়ণমূলক আচরণের জন্য সম্রাট তাঁকে শাস্তিও প্রদান করেন। কারণ ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১লা জুলাই এক শাহী ফরমান জারী করে শাহজাদা আজীমুশ্বানের পদ মর্যাদা "দশ হাজার যাত (৬০০০ সৈন্যসহ) হতে হ্রাস করে নয় হাজার ধাত (Nine Thousand Dhat ৫০০০ সৈন্যসহ) করা হয়। "স্পষ্টতই সওদা-ই- খাসের জন্য এটা করা হয়েছিল।"[৬৫৬]

প্রদেশের রাজস্ব সংগ্রহ এবং তা সম্রাটের নিকট প্রেরণের ক্ষেত্রে শাহজাদা কি পরিমাণ হস্তক্ষেপ করেছিলেন, তা স্পষ্ট নয়। সম্রাট আকবরের আমল থেকেই প্রদেশের রাজস্ব প্রশাসন ছিল দীওয়ানের হাতে; তিনি সুবাদারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত ছিলেন। শাহজাদা আজীমুশ্বানের সুবাদারীর শুরুতে প্রদেশের দীওয়ান ছিলেন মুকাররমাত খান। তিনি আরো কয়েকজন রাজস্ব কর্মকর্তার সঙ্গে যোগ-সাজশে প্রদেশের রাজস্বের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আত্মসাত করেছিলেন বলে জানা গেছে।[৬৫৭] যাহোক, দাক্ষিণাত্যে কুড়ি বৎসর যাবত অভিযান নিয়ে ব্যস্ত সম্রাটের তখন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয় এবং তিনি বাংলা থেকে প্রেরিত রাজস্ব নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাই তিনি ১৭০০ সালের নভেম্বরে হায়দ্রাবাদের সৎ এবং দক্ষ দীওয়ান করতলব খানকে (পরবর্তী কালে মুর্শিদ কুলী খান) বাংলায় বদলী করেন। হায়দ্রাবাদে তখন তিনি একই সঙ্গে গোলকুণ্ডার ফৌজদার ছিলেন। বাংলায়ও তাকে মাকসুদাবাদের (মুর্শিদাবাদ) মত গুরুত্বপূর্ণ স্থানের ফৌজদার নিয়োগ করা হয়। বাংলায় এসেই তিনি রাজস্ব প্রশাসন ব্যবস্থাকে পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। **প্রথমত,** তিনি রাজস্ব কর্মকর্তাদের উপর তাঁর নিজ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাদেরকে শাহজাদার হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত করেন।[৬৫৮] **দ্বিতীয়ত,** তিনি যোগ্য ও দক্ষ কর্মকর্তাদের সাহায্যে খালিসা (রাজকীয়

---

৬৫৫ এইচ.বি.তে উদ্ধৃত. ২য় খন্ড. পৃঃ ৪০৩

৬৫৬ যদু নাথ সরকার পূর্বোক্ত টীকা। এই বিষয়ে সরকারের মন্তব্য. "এই অশুভ ব্যবস্থা বাংলায় শাহজাদা শুজার আমল থেকেই চলে আসছিল: মীর জুমলা ও শায়েস্তা খান উভয়ে এতে লিপ্ত ছিলেন"(পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৪০২ সত্য নয়। তারা সন্দেহাতীতভাবে বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু তারা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের উপর কোন একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন নি। এই বিষয়টি আওরঙ্গজেব কর্তৃক প্রবলভাবে অগ্রাহ্য করা হয়. এমনকি তার পৌত্রকেও এই কাজ থেকে নিবৃত্ত করাই প্রমাণ করে তার সূবাদারদ্বয় যথা মীর জুমলা ও শায়েস্তা খান একাজে লিপ্ত হতে সাহস পেতেন না।

৬৫৭ ইনায়েতুল্লাহ. আহকাম-ই-আলমগীরি. এইচ. বে. এ ২য় খন্ডে উদ্ধৃত. পৃঃ ৪০৯ টীকা-১

৬৫৮ রয়াদ পৃঃ ২৪৭. টি. বি. ২৬ এবং ২৬ বি. আব্দুল করিম কর্তৃক উদ্ধৃত. মুর্শিদকুলী খান এন্ড হিজ টাইমস. ঢাকা. ১৯৬৩. পৃঃ ১৮-১৯ এবং কালি প্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়. বাংলার ইতিহাস. নবাবী আমল. কলিকাতা. পৃঃ ৩৫

ভূমি) এবং জায়গীর ভূমি থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব এবং শুল্ক খাত থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের জন্য কয়েকটি পূর্ণ তালিকা প্রণয়ন করেন। তৃতীয়ত, পূর্ব বাংলার যে সকল উর্বর ও ফসলী ভূমি থেকে আরও অধিক পরিমাণে রাজস্ব আদায় সম্ভব, সেসব এলাকা জাগীর হিসেবে বরাদ্দ দেয়া আছে দেখতে পেয়ে তিনি তা রাজকীয় ভূমি হিসেবে পুনঃগ্রহণ করা এবং বিনিময়ে জায়গীরদারদেরকে উড়িষ্যায় জায়গীর দেয়ার জন্য সম্রাটের অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং অনুমতি লাভ করেন। সন্দেহ নেই যে, এই পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করতে কিছু সময় ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু করতলব খান আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা গ্রহণ করে শীঘ্রই রাজস্ব বৃদ্ধি করতে এবং প্রথম বৎসরের শেষেই সম্রাটের নিকট ১,০০,০০,০০০.০০ (এক কোটি) টাকা প্রেরণ করতে সক্ষম হন।[৬৫৯]

৬. শাহজাদা এবং করতলব খানের মধ্যে সংঘাত

তাঁর এই কাজ একদিকে যখন তাঁর উপর সম্রাটের আস্থা বৃদ্ধি করে, অন্যদিকে তখন তা বাংলায় তার শত্রুও সৃষ্টি করে এবং এদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে শাহজাদা নিজেই। বর্ণিত আছে যে, নতুন দীওয়ানের প্রতি ঈর্ষাণ্বিত হয়ে শাহজাদা একদল নগদী সৈন্য[৬৬০], যাদের বেতন বাকী পড়ে ছিল, তাদেরকে বেতনের দাবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং দীওয়ানকে হত্যা করার জন্য উস্কানী দেন। এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং করতলব খান প্রকাশ্য দরবারে সাহসিকতার সহিত শাহজাদাকে এই সমস্যা উস্কিয়ে দেয়ার জন্য সামনা সামনি অভিযুক্ত করেন এবং অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে তার মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে তাকে শাসিয়ে দেন।[৬৬১২] দীওয়ান এই ঘটনার একটি পূর্ণ অফিসিয়াল প্রতিবেদন সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেন আর অবাধ্য নগদী সৈন্যদলকে বেতন দিয়ে বিদায় করে দেন এবং সেনাবহিনী থেকে তাদের নাম কেটে দেন। শাহজাদা অবশ্য প্রতিবাদ জনিয়ে তার নির্দোষিতার কথা বলেন এবং বিদ্রোহাত্মক আচরণের জন্য নগদী সৈন্যদেরকে শাস্তি প্রদানের হুমকি দেন। করতলব খানের প্রতিবেদন পেয়ে সম্রাটও শাহজাদাকে কঠোরভাবে তিরস্কার করেন এবং দীওয়ানকে এই আশ্বাস দেন যে, এখন থেকে প্রদেশের সুবাদার ও তাঁর কর্মকর্তাগণ তাঁর (দীওয়ান) প্রতি "আরো ভদ্র ব্যবহার" করবেন।[৬৬২]

---

৬৫৯ রিয়াদ পৃঃ ২৪৭

৬৬০ এক শ্রেণীর সৈন্য যারা নগদ টাকায় বেতন পেতেন

৬৬১ রিয়াদ, পৃঃ ২৫০

৬৬২ রিয়াদ, পৃঃ ২৫২, আহকাম-ই-আলমগীরি, পৃঃ ১৫৫, এইচ, বি, ২য় খন্ডে উদ্ধৃত, পৃঃ ৪০৪

এই ঘটনাটি শাহজাদা এবং দীওয়ানের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করা ছাড়াও প্রদেশের প্রশাসন ব্যবস্থায় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার যে পদ্ধতি ছিল তার অন্তর্নিহিত দুর্বলতাও প্রকাশ করে দেয় এবং আরো দেখিয়ে দেয় যে, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ দূর্বল হয়ে গেলে তা ভ্রাতৃঘাতি দ্বন্ধ-সংঘাতের দ্বার খুলে দিতে পারে। এর চেয়েও মারাত্মক পরিণতি হচ্ছে এই যে, এই ঘটনাটি দেশের ইতিহাসের গতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। করতলব খান তাঁর জীবনের উপর আরো হামলার আশংকা করে[৬৬৩] রাজস্ব প্রশাসন বা দীওয়ানের সদর দপ্তর ঢাকা থেকে মাকসুদাবাদে (মুর্শিদাবাদে) স্থানান্তর করেন। তিনি এই বিষয়ে জমিদার ও কানুনগোদের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন এবং তারা মত প্রকাশ করেন যে, এই উদ্দেশ্যে এই জায়গাটির অবস্থান ছিল কেন্দ্রস্থলে।[৬৬৪] আসলে মুর্শিদাবাদকে মনোনীত করা ছিল একটি পূর্ব স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত, কারণ এই জায়গাটি রাজস্ব বিষয়ে ইতিপূর্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে টেভার্নিয়ের যখন পর্যটক হিসেবে বাংলায় আসেন তখন তিনি দেখতে পান যে কাসিমবাজার থেকে তিন ক্রোশ দূরে একটি বড় শহর হচ্ছে মাকসুদাবাদ এবং শায়েস্তা খানের প্রধান খাজাঞ্চি সেখানে বাস করেন।" বার্ণিয়ের নওয়াবের নিকট কিছু দুষ্প্রাপ্য জিনিষ বিক্রি করে দীওয়ানের নিকট তার হুণ্ডি পেশ করেছিলেন।[৬৬৫] উল্লেখ্য যে, সম্রাট করতলব খানকে কোন কারণ ব্যতীত এমনি এমনি মাকসুদাবাদের ফৌজদার নিয়োগ করেননি। যেহেতু তিনি ছিলেন সে জায়গার গভর্ণর, তাই স্বাভাবিকভাবেই সে জায়গাকে তিনি তাঁর বাসস্থান হিসেবে নির্বাচন করবেন। তিনি ঢাকা থেকে তাঁর রাজস্ব প্রশাসনের সদর দপ্তর স্থানান্তরের জন্য সিদ্ধান্ত করেছিলেন। তখন এটাই স্বাভাবিক যে, তিনি সে জায়গাকেই (মাকসুদাবাদকে) তাঁর বাসস্থান হিসেবে নির্বাচন করবেন। তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের দ্বিতীয় বৎসর ১৭০২ খ্রিস্টাব্দে করতলব খান তাঁর পুরো রাজস্ব ব্যবস্থাপনা এবং সকল কর্মকর্তাসহ মাকসুদাবাদে চলে আসেন। ঢাকা থেকে প্রদেশের রাজস্ব রাজধানী স্থানান্তর করায় ঢাকার গুরুত্ব কমে যায় এবং এর অল্পকাল পরেই সুবাদারও ঢাকা ত্যাগ করেন। এই সময় থেকেই ঢাকার অবনতি ঘটতে থাকে এবং ঢাকা পিছনে পড়ে যায়।

---

৬৬৩ পৃঃ ২৫২

৬৬৪ রিয়াদ, পৃঃ ২৫১, টি.বি. ৮৮, ২৮বি-২৯ এ, আব্দুল করিম কর্তৃক মুর্শিদকুলি খান এন্ড হিজ টাইমস্ গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ২১

৬৬৫ টেভার্নিসের, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪০৮, বার্ণিয়ের Receiver General বলে সুবাদারের দীওয়ান বা প্রাদেশিক দীওয়ানকে বুঝিয়েছেন

দ্বিতীয়ত, করতলব খান রাজস্বের ব্যাপারে হিন্দু কর্মকর্তা ও জামিদারদের উপর বেশি বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। তাঁর এই নীতির ফলেই দেশে নূতন এক প্রভাবশালী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়, যারা মুসলিম অভিজাত শ্রেণীকে ছাড়িয়ে যায়।

শাহজাদা ও দীওয়ানের মধ্যকার এই দ্বন্দ্ব আরেকটি বিষয়ের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। ১৭০২ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে উড়িষ্যার সুবাদার আসকার খান ইন্তিকাল করেন এবং সম্রাট শাহজাদা আজীমুশ্বানকে বাংলায় তার সুবাদার পদের অতিরিক্ত ঐ শূন্য পদটিও প্রদান করেন। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে করতলব খান আপত্তি তোলেন এবং তাঁর প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে নিয়োগের মাত্র এক পক্ষকাল পরেই তা বাতিল করা হয়। সম্রাট অবশ্য আপোষমূলক পদক্ষেপ হিসেবে ১৭০৩ সালের ২১শে জানুয়ারী শাহজাদা আজীমুদ্দীনকে বিহারের সুবাদারী এবং একই সময়ে করতলব খানকে উড়িষ্যার প্রশাসনের নির্বাহী দায়িত্ব প্রদান করেন এবং তাকে "নায়েব সুবাদার এবং উড়িষ্যার ফৌজদার (হারিস অর্থাৎ নিরাপত্তা রক্ষক) হিসাবে পদায়ন করেন।"[৬৬৬] এমনকি এই ব্যবস্থায়ও সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়নি। তাই ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুলাই মাত্র ছয় মাস পরেই সম্রাট তাঁর পুত্র ফাররুখ সিয়ারকে ঢাকায় তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে রেখে শাহজাদা আজীমুদ্দীনকে বিহারে তাঁর বাসস্থান স্থাপনের জন্য নির্দেশ দেন। একই সময়ে কতরতলব খানকে উড়িষ্যার সুবাদার পদে উন্নীত করা হয়। এটা ছিল তাঁর বাংলা ও বিহারের দীওয়ানের পদের অতিরিক্ত এবং যুবক শাহজাদা ফাররুখ সিয়ারকে "তার অভিভাবক হিসেবে দীওয়ানকে মেনে চলার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।"[৬৬৭]

---

৬৬৬ এইচ,বি. ২য় খন্ড, পৃঃ ৪০৪

৬৬৭ আহকাম-ই-আলমগীরী, এফ এফ. ৵১৬৬ বি, ১১৭.বি এবং ২২০ এ, এইচ. বি, ২য় খন্ডে উদ্ধৃত. ৪০৪, ৪০৫। ডঃ আব্দুল করিম (মুর্শিদ কুলী খান এন্ড হিজ টাইমস পৃঃ ২৩) যে মন্তব্য করেছেন, ফাররুখ সিয়ারের ঢাকায় অবস্থান ছিল "সম্রাটের যথাযথ অনুমোদন বিহীন একটি ব্যক্তিগত ব্যবস্থা মাত্র।" তা সঠিক বলে মনে হয় না। এর আগে (২২ পৃষ্ঠায়) ড. করিম অবশ্য বলেছেন যে, সম্রাট শাহজাদাকে বাংলা ত্যাগ করে বিহারে চলে যেতে বলেছিলেন। এরূপ মনে করা একেবারেই অযৌক্তিক যে, সম্রাট বাংলার প্রশাসনের জন্য কোন ব্যবস্থা না করেই শাহাজাদাকে এই আদেশ দিয়েছিলেন। ডঃ করিমের এই বিভ্রান্তি মনে হয় রিয়াদ এবং তারিখ-ই- বাঙ্গালার এই সাধারণ বর্ণনা থেকে সৃষ্টি হয়েছে যে, শাহজাদা আজীমুশ্বানের বাংলা ত্যাগ করার জন্য সম্রাটের নির্দেশের পিছনে নগদী সৈন্যদের ঘটনাটিই ছিল আশু কারণ, যদিও ডঃ করিম ইংরেজদের নথি পত্রের উপর ভিত্তি করে সঠিকভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, শাহাজাদা ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে অথবা ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে বাংলা ত্যাগ করেছিলেন। এর অর্থ হল নগদী সৈন্যদের ঘটনার দুই অথবা তিন বৎসর পর তিনি বাংলা ত্যাগ করেছিলেন। যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ডঃ করিমের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে , তা হচ্ছে উড়িষ্যার নিয়োগ নিয়ে দ্বন্দ্ব এবং এর জের হিসেবে আজীমুদ্দীনকে বিহারের সুবাদারী অতিরিক্ত দান এবং করতলব খানকে উড়িষ্যার সুবাদারের পদে উন্নীত করা।

১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে করতলব খান দাক্ষিণাত্যে সম্রাটের দরবারে যাওয়ার পূর্বে অথবা পরে এই বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। করতলব খান সেখানে বাংলা থেকে শুধু বেশি পরিমানে রাজস্বই জমা দেননি বরং সম্রাট এবং তাঁর মন্ত্রীদের জন্য বাংলা থেকে বিশাল অংকের অর্থ এবং অনেক দুষ্প্রাপ্য জিনিষ উপঢৌকন দিয়েছেন। তিনি বাংলার রাজস্বের হিসাব সম্পর্কে কেন্দ্রীয় দীওয়ান এবং প্রধান নিরীক্ষককে পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলেন। সম্ভবত, সম্রাট এই সময় করতলব খানকে উড়িষ্যার সুবাদারের পদে স্থায়ী করার অনুমোদন দান করেন এবং তাকে একটি সম্মানজনক খেলাত, একটি পতাকা এবং নাকাড়া উপহার দেন। তাছাড়া মাকসুদাবাদকে মুর্শিদাবাদ নামকরণ[৬৬৮] এবং সেখানে একটি টাকশাল স্থাপনেরও অনুমতি প্রদান করেন। তদুপরি ১৭০৪ সালের জানুয়ারীতে তাকে বিহারের দীওয়ানও নিযুক্ত করা হয়।[৬৬৯] এইসব সম্মান এবং পদোন্নতীসহ করতলব খান মুর্শিদ কুলী খান নামে ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন।[৬৭০]

মুর্শিদ কুলী খান বাংলায় প্রত্যাবর্তনের আগেই শাহজাদা আজীমুদ্দীন ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দের শেষে অথবা ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে ঢাকা ছেড়ে চলে যান।[৬৭১] তিনি পাটনাকে তাঁর বাসস্থান হিসেবে নির্ধারণ করেন এবং তাঁর নিজ নামানুসারে একে আজীমাবাদ হিসেবে পুন: নামকরণের জন্যও অনুমতি নেন। ঠিক যেমন মাকসুদাবাদকে মুর্শিদ কুলী খানের নামানুসারে মুর্শিদাবাদ হিসেবে পুন: নামকরণের অনুমতি নিয়েছিলেন।

শাহজাদার ঢাকা ত্যাগের সঙ্গে তাঁর বাংলার সুবাদারী বাস্তবে শেষ হয়ে যায়। কারণ তিনি আর কখনো বাংলায় ফিরে আসেননি এবং মুর্শিদ কুলী খান একই সঙ্গে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দীওয়ান, উড়িষ্যার সুবাদার এবং ঢাকার নায়েব সুবাদার শাহজাদা ফাররুখ সিয়ারের "অভিভাবক" হিসেবে তিনি বাংলার সত্যিকার শাসক

স্পষ্টতই শাহজাদা প্রকাশ্যে সম্রাটের অবাধ্যতা করা ছাড়া সম্রাটের অনুমতি ব্যতিত আরেকবার বিহারে যেতে পারেন না: আবার সম্রাট ও একজন স্বতন্ত্র সুবাদর শামশীর খানের শাসনাধীন একটি আলাদা প্রদেশ বিহারকে আইনগতভাবে আগে আজীমুদ্দীনের অধীনে না দিয়ে তাকে সেখানে যেতে বলতে পারেন না। এই সকল বিষয় ডঃ করিমের নজর এড়িয়ে যাওয়ায় তিনি ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দের শেষার্ধে করতলব খানের সম্রাটের দরবারে যাওয়া (পৃঃ ২২-২৩) এবং তাঁর মুর্শিদ কুলী খান উপাধি পাওয়ার যথাযথ কারণের ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

৬৬৮ রিয়াদ, পৃঃ ২৫৪; টি, বি, এফ, ৩০ বি

৬৬৯ আহকাম-ই-আলমগীরী, এফ ১০৫ বি

৬৭০ কনসাল্টেশন, ২০ মে এবং ৮ ই জুন, ১৭০৪, আব্দুল করিম কর্তৃক উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩, ১১১

৬৭১ কনসাল্টেশনস ২রা মার্চ, ১৭০৪, আরো দেখুন "কোস্ট" এবং "বে" থেকে প্রাপ্ত চিঠি পত্রের সার-সংক্ষেপ, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩: আব্দুল করিম কর্তৃক উদ্ধৃত পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২

হিসেবে আবির্ভূত হন। শাহাজদা আজীমুদ্দীন প্রায় আরো তিন বৎসর পাটনায় (আজীমাবাদ) অবস্থান করেন এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর প্রাককালে তাঁকে দরবারে ডেকে নেয়া হয়। ১৭০৭ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র এবং শাহজাদা আজীমুদ্দীনের পিতা প্রথম বাহাদুরশাহ সম্রাট হন এবং তাকে আজীমুশ্বান উপাধি দান করেন। বাংলা ও বিহারের সুবাদার হিসেবে তাঁর নিয়োগ বলবৎ রাখেন এবং শাহজাদা আজীমুশ্বান দরবারেই অবস্থান করতেন। তিনি তাঁর দুই পুত্র ফাররুখ সিয়ার এবং করীমুদ্দীনকে যথাক্রমে ঢাকা এবং পাটনায় নায়েব সুবাদার নিয়োগ দিয়ে তাদের মাধ্যমে নামে মাত্র বাংলা এবং বিহার শাসন করতেন । তিনি ১৭১২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর পিতার মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর উপদেষ্টা হিসেবে দরবারেই অবস্থান করতেন। প্রথম বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পরবর্তী উত্তরাধিকার যুদ্ধে পরের মাসেই শাহজাদা আজীমুশ্বান নিহত হন।

অষ্টম অধ্যায়[৬৭২]

মুর্শিদাবাদের নওয়াব মুর্শিদ কুলী খান

(১৭০৪খ্রিঃ-১৭২৭খ্রিঃ)

১. মুর্শিদ কুলী খান "আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তি"

১৭০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মুর্শিদ কুলী খানের অধীনে বাংলায় তুলনামূলকভাবে শান্তি বিরাজ করে। তবে সে শান্তি ছিল অস্বস্থিকর শান্তি, আর মোগল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে ঘন ঘন শাসক পরিবর্তন ও উত্তরাধিকার যুদ্ধে বার বার প্রকম্পন সৃষ্টি হত। বাংলার শাসন কার্যে আবির্ভূত হওয়ার পূর্বে মুর্শিদ কুলী খানের প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। মাসির-উল-উমারার মতে তিনি জন্মগতভাবে ছিলেন ব্রাহ্মণ। তবে তার বালক অবস্থায় মোগলদের অধীনে বিভিন্ন পদে ইস্পাহানের হাজী শফী নামে একজন দক্ষ কর্মকর্তা, যিনি দাক্ষিণাত্য এবং বাংলায় দীওয়ান হিসেবেও চাকুরী করেছেন, তিনি তাকে পুত্র স্নেহে লালন পালন করেন এবং তার নাম দিয়েছিলেন মুহাম্মদ হাদী। তিনি বালকটিকে কোন তারিখে এবং কোথায় ক্রয় করেছিলেন, তার কোন উল্লেখ নেই; তবে এ সম্পর্কে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি মোগলদের চাকুরী থেকে অবসর নেয়ার পরে তাঁকে সঙ্গে করে ইরানে নিয়ে যান এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। এর পর মুহাম্মদ হাদী বেরারের দীওয়ান হাজী আব্দুল্লাহ খোরাসানীর অধীনে চাকুরী নেন।[৬৭৩]

মুর্শিদ কুলী খানের প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে এই তথ্য সাধারণত পরবর্তীকালের লেখকগণ মেনে নিয়েছেন এবং যেহেতু দেখা যায় যে, হাজী শফী ইস্পাহানী ১৬৯০ সালের দিকে মোগলদের চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন এবং যেহেতু ১৭০০ সালে বাংলায় বদলী হওয়ার পূর্বে মুহাম্মদ হাদী দাক্ষিণাত্যের দীওয়ান হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন, সেহেতু আরো ধরে নেয়া যায় যে, তিনি ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে ইরান থেকে প্রত্যাবর্তন করে বেরারে চাকুরী নিয়েছিলেন।[৬৭৪] অবশ্য এ সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য আছে, যে কারণে এই

---

৬৭২ মূল বইয়ে ত্রয়বিংশ অধ্যায়

৬৭৩ মাহসির -উল-উলামা, ৩য় খন্ড; পৃঃ ৭৫১

৬৭৪ জে.এন. সরকার, এইচ. বি. পৃঃ ৪০০; আব্দুল করিম পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫

বিবরণীকে সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণ করা প্রয়োজন। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে করতলব খান নামে খ্যাত মুহাম্মদ হাদী যখন বাংলায় আসেন, তখন তার বয়স চল্লিশের উপরে এবং তুর্কী বংশোদ্ভুত একজন ইরানী আমীর শুজাউদ্দীনের সঙ্গে তার কন্যার ইতিপূর্বেই বিয়ে হয়েছিল। আরো জানা যায় যে, এ তারিখের পূর্বেই শুজাউদ্দীনের পুত্র মুহাম্মদ আসাদুল্লাহর (পরে সরফরাজ খান) জন্ম হয়েছিল। অতএব, করতলব খান সর্বশেষ আশির দশকের প্রথম দিকে বিবাহিত ছিলেন। যে কারণে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে তার শুধু একজন বিবাহযোগ্য কন্যাই ছিল না, বরং একজন দৌহিত্রও ছিল। কাজেই ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দের দিকে মুর্শিদ কুলী খান তাঁর মনিবের উপর নির্ভরশীল একজন যুবক হিসেবে ইরান গিয়েছিলেন বলে যে কাহিনী প্রচলিত আছে, তা অবাস্তব বলে মনে হয়। দ্বিতীয়ত, মুর্শিদ কুলী খান পারস্যের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিয়ে করেছিলেন এবং তাঁর স্ত্রীর বোনের বিয়ে হয়েছিল ইরানী আমীরের সঙ্গে, যিনি পরবর্তীকালে বাংলায় এসেছিলেন। যদি ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দের দিকে মুর্শিদ কুলী খান চাকুরীগত বা পারিবারিক দিক থেকে মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি না হতেন এবং সদ্য ধর্মান্তরিত ব্যক্তি হতেন, তাহলে কোন আমীরই তাঁর নিকট নিজ কন্যা বিবাহ দিতেন না। তৃতীয়ত, ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে তার ১৪ জন আত্মীয় ইরান থেকে ভারতে আসেন। এটা মনে করা অযৌক্তি হবে যে, তারা শুধু মাত্র হাজী শফীর মাধ্যমেই তার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েছিলেন।

তারা যে, মুর্শিদ কুলী খানের সঙ্গেই ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত ছিলেন এবং তারা যে, তাঁর সঙ্গেই যোগদানের জন্য এসেছিলেন, তা বুঝা যায় তাদের সবার জন্য বাংলায় একটি চাকুরী এবং একটি মনসব মঞ্জুর করার জন্য আওরঙ্গজেবকে রাজী করাতে তাঁর নিকট মুর্শিদ কুলী খানের যাওয়া থেকে।[৬৭৫] খুব সম্ভব উপরে উল্লেখিত বখশে আলী খান এবং তাঁর অন্যান্য আত্মীয় স্বজন যাদেরকে মুর্শিদ কুলী খান, তাঁর অধিনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়েছিলেন, তারা এই সময়েই বাংলায় এসেছিলেন। অতএব, জন্মগতভাবে তাঁর একজন ব্রাহ্মণ বালক হওয়ার যে কাহিনী প্রচলিত আছে,. তা সন্দেহ মুক্ত বলে মনে হয় না। সম্ভবত দীওয়ান হিসেবে তাঁর বিশেষ সফলতার জন্যই তাকে জন্মগতভাবে হিন্দু বলা হয়েছে, যেহেতু মোগল আমলে টোডরমলসহ অনেক হিন্দু কর্মকর্তাই রাজস্ব প্রশাসনে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

---

৬৭৫ আহকাম-ই-আলমগীরী, এফ, ১০৬ এ.এইচ.বি. ২য় খন্ড উদ্ধৃত, পৃঃ ৪০২ এবং আব্দুল করিম পূর্বোক্ত পৃঃ ২৪-২৫

সে যাই হোক, ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদ কুলী খান সম্রাটের দরবার থেকে বাংলায় ফিরে আসার পরে তিনি পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং সবচেয়ে ক্ষমতাশালী কর্মকর্তায় পরিণত হন। যেহেতু তখন তিনি একই সময়ে উড়িষ্যার দীওয়ান এবং নাযিম (সুবাদার), বাংলা এবং বিহারের দীওয়ান এবং বাংলার নায়েব সুবাদারের অভিভাবক নিযুক্ত হন। তাঁর পূর্বে বা পরে কোন মোগল কর্মকর্তাই একই সঙ্গে এতগুলো পদে নিযুক্তি পাননি। বিশেষ করে একই সঙ্গে একটি প্রদেশের দীওয়ান এবং সুবাদারের পদের সঙ্গে অন্য দুটি প্রদেশের দীওয়ানী অন্য কেহ লাভ করেননি। সম্রাট আওরঙ্গজেব এক ব্যক্তির হাতে এই ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। কারণ তিনি বাংলা ও বিহারের সুবাদার শাহজাদা আজীমুদ্দীনকে এই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন করার জন্য একই বৎসর এক পত্রে তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, এতসব সত্ত্বেও তিনি (শাহজাদা) মুর্শিদ কুলী খানের কর্মকান্ড তত্ত্বাবধান করার জন্য কর্তৃত্বের অধিকারী। আওরঙ্গজেব লিখেছিলেন, "একই ব্যক্তির বাংলা এবং বিহারের পূর্ণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন দীওয়ান, উড়িষ্যার নাযিম এবং দীওয়ান, আমার নিজেরও এত বেশি কাজ করার সামর্থ নেই; সম্ভবত, একমাত্র আল্লাহর মনোনীত কোন ব্যক্তি এই ধরণের প্রয়োজনীয় সামর্থের অধিকারী হতে পারে। তোমাকে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তির নিকট হতে কৌশলে রিপোর্ট (মুর্শিদ কুলী খানের প্রকৃত প্রশাসন সম্পর্কে) সংগ্রহ করতে হবে। কোন এক ব্যক্তির হাতে এত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে দেখেও কোন সুবাহর নাযিম শ্বাস (স্বস্তিতে) নিতে পারে না।"[৬৭৬]

মুর্শিদ কুলী খান সন্দেহাতীত আন্তরিকতা ও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে সম্রাটের যে প্রায় অসীম আস্থা ছিল, এই পত্র তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। কিন্তু এ থেকে আরো প্রকাশ পাচ্ছে যে, তখনো দীর্ঘ মেয়াদী দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে জড়িত প্রবল প্রতাপান্বিত বৃদ্ধ সম্রাটের বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মত দূরবর্তী প্রদেশসমূহে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোর জন্য দক্ষ ও বিশ্বস্ত লোকবলের একান্তই অভাব ছিল। মুর্শিদ কুলী খানের এই বিস্ময়কর উত্থানের পিছনে ওৎ পেতে ছিল তৎকালীন শাহজাদা ও আমীর-ওমরাদের চারিত্রিক দৈন্যতা, যা অল্প সময়ের মধ্যেই মোগল সাম্রাজ্যের কাঠামো ক্ষয় করে ফেলে এবং যার কারণে মুর্শিদ কুলী খান তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য অমুসলিম গুণী ব্যক্তিদের সমর্থনের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সম্রাটের আস্থা অবশ্য অপাত্রে ছিল না। মুর্শিদ কুলী খান আমৃত্যু এই আস্থার প্রমাণ দিয়েছেন। ১৭০৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্বল্প বিরতি ব্যতীত তিনি ১৭০৪ থেকে ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দ

---

৬৭৬ **আহকাম, এফ, ১৯৮ জে,এন, সরকার কর্তৃক অনূদিত এবং এইচ. বি. ২য় খন্ডে উদ্ধৃত, পৃঃ ৪০১-৪০২**

পর্যন্ত কর্ণধার হিসেবে বাংলার প্রশাসনের হাল ধরেছিলেন, প্রদেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং দিল্লীতে একের পর এক আসা সম্রাটদেরকে নিয়মিত রাজস্ব প্রেরণ, শুধু তাই নয়, বরং ক্রমাগত অধিক পরিমাণেও রাজস্ব প্রেরণ করেছেন।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আওরঙ্গজেবের শাসনকালের শেষের দিকে বিশেষ করে ১৭০৪ সাল থেকে ১৭০৭ সাল পর্যন্ত তিনটি প্রদেশে মুর্শিদ কুলী খানের অবস্থান সর্বোচ্চ এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁকে তাঁর নিজ সহকারী এবং প্রতিনিধি নিয়োগ করার জন্য অনুমতি দেয়া হয়েছিল এবং তাঁর সুপারিশের ভিত্তিতেই গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ দেয়া হত। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ১৪জন আত্মীয় ইরান থেকে দিল্লীতে এসে পৌঁছেন এবং তাঁর অনুরোধে সম্রাট প্রত্যেককে এক একটি মনসব মঞ্জুর করেন এবং বাংলার বিভিন্ন পদে তাদেরকে নিয়োগ দেন। সম্রাটের মৃত্যুর পূর্বে মুর্শিদ কুলী খানের প্রভাব ও ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পায়। তাঁর শেষ ঘনিয়ে আসছে বুঝতে পেরে আওরঙ্গজেব পাটনায় বসবাসকারী বাংলা ও বিহারের সুবাদার শাহজাদা আজীমুদ্দীনকে দরবারে ডেকে পাঠান এবং মুর্শিদ কুলী খানের উপর ঢাকা ও পাটনার নায়েব সুবাদার ও শাহজাদা আজীমুদ্দীনের পুত্র শাহজাদা ফাররুখ সিয়ার এবং শাহজাদা করীমুদ্দীন উভয়ের অভিভাকত্ব অর্পণ করেন।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর (৭ই মার্চ, ১৭০৭) পরে মুর্শিদ কুলী খানের জীবন সাময়িকভাবে বাধাগ্রস্থ হয়। পরলোকগত সম্রাটের জীবিত তিন পুত্রের মধ্যে সংঘটিত উত্তরাধিকার যুদ্ধে শাহজাদা আজীমুদ্দীনের পিতা এবং তিনজনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শাহজাদা মুহাম্মদ মুয়াজ্জম বিজয়ী হন এবং শাহ আলম বাহাদুর শাহ (প্রথম) উপাধি ধারণ করে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে সিংহাসনে আরোহন করেন। স্বভাবতই তিনি তাঁর অনুসারী এবং সমর্থকদের পুরস্কার এবং পদোন্নতি দান করেন এবং এদের মধ্যে তাঁর চার পুত্রও অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র আজিমুশশান উপাধি এবং বাংলা ও বিহারের সুবাদারের পদের নিশ্চয়তা লাভ করেন। অন্যান্য ভ্রাতাদের মত তিনিও পিতার একজন উপদেষ্টা হিসেবে দরবারে থাকতে স্থির করলেন এবং নায়েব সুবাদারের মাধ্যমে প্রদেশের শাসন কাজ পরিচালনা করতেন। সম্ভবত তার পরামর্শেই মুর্শিদ কুলী খানকে বাংলা ও বিহারের দীওয়ানের পদ থেকে অপসারিত করেন এবং তাঁর স্থলে যথাক্রমে প্রদেশ দুটির জন্য জিয়াউল্লাহ খান এবং শামশীর খানকে দীওয়ান নিযুক্ত করেন। আবার ১৭০৮ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী (৩০শে শাওয়াল, ১১১৯ হিজরী) শাহাজাদা আজীমুশশানকে উড়িষ্যার দীওয়ানী প্রদান করেন এবং মুর্শিদ কুলী খানকে দাক্ষিণাত্যের দীওয়ান হিসেবে সেখানে বদলী করেন।

১৭০৮ খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকে ১৭১০ খ্রিস্টাব্দের শেষ পর্যন্ত এই দুই বৎসরের অধিক কাল তিনি বাংলা থেকে দূরে ছিলেন। এই সময়ে শাহজাদা আজীমুশশানের নায়েবদের হাতে বাংলার শাসন ব্যবস্থা ভাল চলেনি। তারা পারস্পারিক ঝগড়া বিবাদ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত থাকতেন এবং এর চূড়ান্ত পরিণতিতে ১৭১০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মুর্শিদাবাদের রাস্তায় একদল নগদী সৈন্যের হাতে দীওয়ান জিয়াউল্লাহ খান নিহত হন। ইতিমধ্যে মুর্শিদ কুলী খান এবং শাহজাদা আজীমুশশানের মধ্যে মীমাংসা হয়ে যায়। প্রথমোক্ত ব্যক্তির সিংহাসনের পিছনের শক্তি কে তা উপলব্ধি করার মত জ্ঞান-বুদ্ধি ছিল, আর শেষোক্তজন দীওয়ানের সততা এবং সামর্থ সম্পর্কে ওয়াকেবহাল থাকায় দিল্লীর সিংহাসন লাভের প্রস্তুতি হিসেবে তাকে নিজ পক্ষে পেতে চেয়েছিলেন। সে অনুযায়ী মুর্শিদ কুলী খানকে পুনরায় বাংলায় বদলী করা হয় এবং তিনি ১৭১০ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে বাংলায় এসে পৌঁছেন। ইংরেজদের রেকর্ড অনুযায়ী তিনি শাহজাদা আজীমুশশানের "আজ্ঞাবহ" হিসেবে বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন।[৬৭৭]

২. শাহজাদা ফাররুখ সিয়ারের সঙ্গে জিয়াউদ্দীন খানের সংঘাত

মুর্শিদ কুলী খান বাংলায় ফিরে এসে বাংলাকে সে অবস্থায় পাননি, যে অবস্থায় তিনি বাংলাকে রেখে গিয়েছিলেন। বিশেষ করে তিনি দেখতে পান যে, বন্দর নগরী হুগলী এবং বালেশ্বরের প্রশাসন ব্যবস্থা এবং সেখানকার শুল্ক আদায়ের জন্য একটি স্বতন্ত্র বন্দোবস্থ করা হয়েছে। এগুলোকে প্রাদেশিক দীওয়ানের নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত করে জনৈক জিয়াউদ্দীন খানকে দিয়ে সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেয়া হয়েছে। তিনি ছিলেন শাহী দরবারের উঁচু মহলের সহিত সম্পর্কিত একজন আমির, আবার হুগলীর ফৌজদার (গভর্ণর) এবং মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত পূর্বাঞ্চলীয় সকল বন্দরের নিয়ন্ত্রক। এই ব্যবস্থা কেন করা হয়েছিল তা জানা যায়নি; তবে ইউরোপীয় বণিকরা এই ব্যবস্থাকে স্বাগত জানায়, বিশেষ করে ইংরেজরা। কারণ তাদের সঙ্গে জিয়াউদ্দীন খানের আগের থেকেই সুসম্পর্ক ছিল। যখন তিনি দাক্ষিণাত্যে চাকুরী করতেন, তখন থেকেই মুর্শিদ কুলী খান স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতার এই ভাগাভাগি পছন্দ করতে পারেননি; তিনি এই ব্যবস্থায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কারণ, একটু পরেই দেখা যাবে যে, ইংরেজরা বাংলায় তাঁর কর্তৃত্ব পাশ কাটিয়ে বাণিজ্যিক সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করেছিল এবং এর আরো কারণ হচ্ছে এই যে, জিয়াউদ্দীন এবং পেশকার কিংকর সেন "তাদের অফিসিয়াল পদ মর্যাদাকে ব্যবহার করে রাষ্ট্রকে রাজস্ব থেকে

---

[৬৭৭] কনসাল্টেশনস, ১২ মার্চ, ১৭১২

বঞ্চিত করছেন এবং শুল্ক ফাঁকি দিয়ে নিজেরা ব্যক্তিগত ব্যবসায় লিপ্ত হয়ে পড়েছেন"।[৬৭৮] যাহোক, এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপনের জন্য মুর্শিদ কুলী খানের যুক্তিসংগত কারণ ছিল। তাঁর প্রতিবাদের কারণে ১৭১১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে সম্রাট জিয়াউদ্দীনকে হুগলী থেকে বদলী করেন এবং সেখানকার ফৌজদার ও শুল্ক আদায়ের দায়িত্ব পুনরায় প্রাদেশিক দীওয়ানের নিয়ন্ত্রণে অর্পণ করেন।[৬৭৯] সে অনুযায়ী মুর্শিদ কুলী খান সে স্থানের দায়িত্ব গ্রহণ এবং জিয়াউদ্দীন ও তাঁর সহকারী কিংকর সেনের নিকট হতে হিসাব নিকাশ বুঝে নেয়ার জন্য ওয়ালী বেগকে হুগলীর নায়েব ফৌজদার হিসেবে প্রেরণ করেন। সম্রাটের আদেশের প্রতি শান্তিপূর্ণভাবে নতি স্বীকারের পরিবর্তে জিয়াউদ্দীন দায়িত্ব হস্তান্তর এবং তার সৈন্যদের দ্বারা আদায়কৃত শুল্কের হিসাব দিতে অস্বীকার করেন এবং বন্দরনগরের সামনে পরীখা খনন করে সেখানে আশ্রয় নেন। ওয়ালী বেগও জিয়াউদ্দীনের পরীখার অল্প দূরে তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে শিবির স্থাপন করেন। জিয়াউদ্দীন নিকটবর্তী ওলন্দাজ এবং ফরাসীদের বসতি থেকে লোকবল ও অস্ত্র সাহায্য পান। ইংরেজরা জিয়াউদ্দীনকে নিজেদের "বন্ধু"[৬৮০] হিসেবে গণ্য করলেও সংঘাতের প্রথম দিকে বুদ্ধি করে তারা দূরে সরে থাকে এবং পরবর্তী পর্যায়ে বিবাদমান দু'দলের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য ব্যর্থ উদ্যোগ নেয়। কয়েক মাস পর্যন্ত প্রায় দৈনিক বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ ও মাঝে মাঝে দুই সৈন্য দলের মধ্যে গোলাগুলি চলতে থাকে।

১৭১২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে সম্রাট বাহাদুর শাহের ইন্তিকাল এবং তাঁর জীবিত চার পুত্রের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে উত্তরাধিকার যুদ্ধ শুরু হওয়ায় মুর্শিদ কুলী খানের বিরুদ্ধে বিরোধিতা অব্যাহত রাখতে জিয়াউদ্দীন উৎসাহ পান। মুর্শিদ কুলী খান তাঁর জীবনে একবার মাত্র তাড়াহুড়া করে ভুল পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তিনি অবিলম্বে আজীমুশশানকে সম্রাট ঘোষণা করে, তাঁর নামে খোতবা পাঠ এবং তার নামে মুদ্রা ছাপেন।[৬৮১] তিনি অবশ্য এই উত্তরাধিকার যুদ্ধে মার্চ মাসে নিহত হন এবং বাহাদুর শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র যুদ্ধে বিজয়ী হন এবং মুইজুদ্দীন জাহান্দার শাহ উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুর্শিদ কুলী খান তাঁর ভুল পদক্ষেপ সংশোধনের লক্ষ্যে তখন নতুন সম্রাটের প্রতি তাঁর আনুগত্য ঘোষণা করেন এবং তাঁর নিকট বড় অংকের প্রাদেশিক রাজস্ব প্রেরণ করেন। তাঁর

---

[৬৭৮] আব্দুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৭-৩৮;

[৬৭৯] কন্সাল্টেশনস, ১৩ অক্টোবর, ১৭১১, রিয়াদেও আছে, পৃঃ ২৬২-২৬৭

[৬৮০] কন্সাল্টেশনস, ১৩ অক্টোবর, ১৭১১

[৬৮১] কন্সাল্টেশনস, ২৫ মার্চ, ১৭১২

পরবর্তী কর্মকাণ্ড থেকে দেখা যায় যে, মুর্শিদ কুলী খান সংকল্পবদ্ধ হন যে, এরপর ভবিষ্যতে সিংহাসন নিয়ে কোন দ্বন্দ্ব-কলহে তিনি নিজেকে দূরে রাখবেন এবং সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবেন। তাঁর এই নীতি ভবিষ্যতে ভাল কাজ দেয়। কিন্তু তাঁর এই নীতি সাময়িকভাবে তাঁকে সমস্যায় ফেলে দেয়। কারণ পরলোকগত শাহজাদা আজীমুশ্‌শানের পুত্র শাহজাদা ফাররুখ সিয়ার, যিনি তখন পাটনায় ছিলেন, তিনি তার চাচার সিংহাসনে আরোহনের বিরোধিতা করেন এবং নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন এবং জাহান্দার শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তিনি মুর্শিদ কুলী খানের নিকট হতে বাংলা এবং উড়িষ্যার রাজস্ব দাবী করেন। শেষোক্ত জন তাঁর এই চাহিদা পূরণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং বলেন যে, "দিল্লীর সিংহাসনে যিনি আসীন হবেন, তিনি তাঁরই অনুগত হবেন এবং ফাররুখ সিয়ার সিংহাসনের জন্য একজন প্রতিদ্বন্দ্বী মাত্র।" "যেহেতু আপনার চাচা মুইজুদ্দীন মুকুট ও সিংহাসনের অধিকারী" তিনি লিখেছিলেন, "সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব আপনাকে দেয়া যায় না।"[৬৮২] ফলশ্রুতিতে ফাররুখ সিয়ার এপ্রিল ও সেপ্টেম্বরের (১৭১২খ্রিঃ) মধ্যে মুর্শিদ কুলী খানের বিরুদ্ধে পর পর দুটি অভিযান প্রেরণ করেন।[৬৮৩] দ্বিতীয় অভিযানের সময় তিনি কলিকাতার শক্তিশালী ইংরেজদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, মুর্শিদ কুলী খান যদি সেখানে পালিয়ে যায়, তাহলে তারা যেন তাকে বন্দী করে।[৬৮৪]মুর্শিদ কুলী খান ফাররুখ সিয়ারের প্রেরিত সৈন্য দলকে শুধু পরাজিত এবং বিতাড়িত করতেই সক্ষম হননি এবং দ্বিতীয় অভিযানের সময় তিনি যুদ্ধে শেষোক্ত জনের মনোনীত বাংলা এবং উড়িষ্যার সুবাদার রশিদ খানকে হত্যা করতেও সক্ষম হন। ফাররুখ সিয়ার বাংলার বিরুদ্ধে তৃতীয় আরেকটি অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু রাজধানী দিল্লীর সর্বশেষ অবস্থা তাকে বাংলা থেকে সৈন্য ফিরিয়ে নিতে এবং পশ্চিম অভিমুখে রওয়ানা করতে বাধ্য করে।

ফাররুখ সিয়ারের দিক থেকে চাপ মুক্ত হয়ে মুর্শিদ কুলী খান এবার হুগলীর সমস্যার দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। তিনি ওয়ালী বেগকে ফিরিয়ে আনেন এবং জিয়াউদ্দীনকে অপসারণ করার জন্য ১৭১২ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে আরেক দল সৈন্যসহ মীর আবু তালিবকে হুগলীর ফৌজদার হিসেবে প্রেরণ করেন। মীর আবু

---

[৬৮২] রিয়াদ, পৃঃ ২৬৮

[৬৮৩] আব্দুল করিম, পূর্বোক্ত, ৪৪-৪৭

[৬৮৪] কন্সাল্টেশনস, ২রা মে, ১৭১২

তালিবও সুবিধা করতে পারেননি। কারণ ছিল তাঁর অধীনস্থ ভাড়াটে পর্তুগীজ সৈন্যদের আনুগত্যহীনতা এবং তাঁর নিজ সৈন্যদের মধ্য হতে একাংশের বিদ্রোহাত্মক আচরণ। ইতিমধ্যে দিল্লীর দৃশ্যপট বদলে যায়। ফাররুখ সিয়ার সায়িদ ভ্রাতৃদ্বয়, যথা- বিহারের নায়েব সুবাদার, সায়িদ হাসান আলী খান এবং এলাহাবাদের নায়েব সুবাদার আব্দুল্লাহ খানের সহায়তায় জাহান্দার শাহকে সিংহাসনচ্যুত করে ১২১৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারীতে সিংহাসনে আরোহন করতে সক্ষম হন। মুর্শিদ কুলী খান কোন সময় ক্ষেপন না করে তাঁর আনুগত্যের ঘোষণা দেন এবং তাঁর নিকট প্রচুর উপঢৌকনসহ বাংলা এবং উড়িষ্যার রাজস্ব প্রেরণ করেন। অন্যদিকে নিজের অবস্থান সংহত করতে আগ্রহী ফাররুখ সিয়ার মুর্শিদ কুলী খানের মত একজন ক্ষমতাবান এবং দক্ষ কর্মকর্তার আনুগত্য ও সমর্থন পেয়ে স্বভাবতই খুশী হন। তিনি তাঁকে ভালভাবেই জানার কারণে তাঁর সম্পর্কে আর কোন ভুল বোঝাবুঝির অবকাশও ছিলনা। তাছাড়া তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করাটাও সহজ কাজ ছিল না। তদুপরি, বাংলা এবং উড়িষ্যার রাজস্ব সময় মত পৌঁছায় এবং মুর্শিদ কুলী খানের অতীত কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতেও অনুরূপভাবে নিয়মিত রাজস্ব পাওয়ার সম্ভাবনায় নতুন সম্রাটের আহত অনুভূতির যন্ত্রণা উপশম হয়। তাঁর মনে হয়তো এটাও ছিল যে, মুর্শিদ কুলী খান তো প্রথম দিকে তাঁর (ফাররুখ সিয়ারের) পিতারই একজন সমর্থক ছিলেন। তবে দীওয়ানের পরবর্তী আচরণের পিছনে অবশ্যই দিল্লীর ঘটনাবলীর আকস্মিক মোড় পরিবর্তনই দায়ী, যে কারণে তাঁর পিতার পরাজয় এবং মৃত্যু ঘটে এবং জাহান্দার শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কাজেই ফাররুখ সিয়ার মুর্শিদ কুলী খানের অতীত আচরণকে এই কারণে উপেক্ষা করেন যে, তাঁর প্রতি আনুগত্য স্বীকার না করা এবং তাঁকে রাজস্ব প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন তেমন অনিয়মতান্ত্রিক ছিল না। তাই নতুন সম্রাট তাঁকে বাংলার দীওয়ান পদে অনুমোদন দান করেন এবং উড়িষ্যার দীওয়ানী এবং সুবাদারীও তাকে প্রদান করেন। তদুপরি ফাররুখ সিয়ার জাহান্দার শাহের স্বল্পকালীন রাজত্বের সময়ে নিযুক্ত বাংলার সুবাদার খান-ই-জাহানকে বরখাস্ত করেন এবং তাঁর নিজ শিশুপুত্র শাহজাদা ফারখুন্দ সিয়ারকে নামে মাত্র বাংলার সুবাদার নিয়োগ করেন এবং মুর্শিদ কুলী খানকে তাঁর নায়েব নিয়োগ করেন।[৬৮৫] এর কয়েক মাস পরে ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে তার শিশু

---

৬৮৫ মুর্শিদ কুলী খানের সঙ্গে ফাররুখ সিয়ারের মীমাংসা এবং মিত্রতা হওয়া সম্পর্কে(করিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৮-৪৯) দিল্লীর দরবারের আমির-ওমরাহদের দুটি বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে যাওয়া এবং সম্রাট কর্তৃক মুর্শিদ কুলী খানের মত একজন নির্দলীয় লোক পছন্দ করার কারণ দুটি উত্তরাধিকার যুদ্ধের সময় তিনি তাঁর "নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বহাল রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন"

পুত্র শাহজাদা ফারখুন্দ মারা যান, তখন দরবারের প্রভাবশালী আমির মীর জুমলাকে সুবাদার নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু তিনি দরবারে থাকতেন এবং মুর্শিদ কুলী খানকে বাংলায় তাঁর নায়েব নিয়োগ করা হয়। এইভাবে ফাররুখ সিয়ারের সিংহাসনে আরোহণের সাথে মুর্শিদ কুলী খানের জীবনের একটি জটিল সময়ের অবসান ঘটে এবং আওরঙ্গজেবের সময় তিনি যে অবস্থানে ছিলেন, বিহার ছাড়া এখন তার ভাগ্যে আরো বেশি প্রাপ্তি ঘটে। এখন উড়িষ্যার দীওয়ানী ও সুবাদারী এবং বাংলার দীওয়ানী এবং নায়েব সুবাদারী তাঁর একারই করায়ত্তে।

মুর্শিদ কুলী খানের সাবেক শত্রু জিয়াউদ্দীনের ভাগ্যেরও শুভ পরিবর্তন ঘটে। তাঁর বরখাস্তের আদেশ না মানার জন্য তার জিদ ফলপ্রসু প্রমাণিত হয়, কারণ ফাররুখ সিয়ার সিংহাসনে আরোহনের অল্পকাল পরেই ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে করমণ্ডল উপকূলে তাকে দীওয়ান নিয়োগ দেয়া হয়। তিনি জুনের শেষের দিকে তার নতুন দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য হুগলী ত্যাগ করেন। তার সহকারী কিংকর সেন তার পৃষ্টপোষকের সঙ্গী হয়েছিলেন বলে বর্ণিত আছে, কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি বাংলায় ফিরে এলে প্রথমে মুর্শিদ কুলী খান তাকে ক্ষমা করেন এবং হুগলীতে রাজস্ব সংগ্রহের কাজে তাকে নিয়োগ করেন বলে বর্ণিত আছে। কিন্তু এক বৎসর পরে, অর্থ আত্মসাতের দায়ে তাকে বন্দী এবং কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে তিনি পেটের পিড়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান এবং এক বিশেষ ধরণের জোলাপ জাতীয় জিনিষ তাকে খাওয়ানো হয় বলে তার এই পীড়া হয়েছিল বলে বর্ণিত আছে।[৬৮৬] কিংকর সেন সম্পর্কে এই প্রচলিত কাহিনী সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। যেমন ডঃ আব্দুল করিম উল্লেখ করেছেন[৬৮৭] যে, উপরে বর্ণিত কাহিনীতে তার মৃত্যু সম্পর্কে যে তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে, ইংরেজদের সংরক্ষিত দলিল পত্রের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। সেখানে দেখা যায় যে, ১৭২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জীবিত এবং মুর্শিদ কুলী খানের সুনজরেই আছেন।

বলে যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়, তা বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রতীয়মান হচ্ছে না। কারণ, দরবারের অফিসারদের দুটি বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার বিষয়টি ছিল আসলে একটি পরবর্তী ঘটনা এবং দুটি উত্তরাধিকার যুদ্ধের সময় মুর্শিদ কুলী খান কর্তৃক বাংলায় অনুমিত শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে ফাররুখ সিয়ারের খুশী হওয়ার কোন বিশেষ কারণ ঘটেনি; যেহেতু এ দুটি যুদ্ধের একটিতে তারা দুজনে ছিলেন পরস্পর বিরোধী পক্ষ। তদুপরি ঐ সময় আসলে কোন শান্তি শৃঙ্খলা ছিল না বরং ত্রিপক্ষীয় যুদ্ধ যথা, মুর্শিদ কুলী খান, জিয়াউদ্দীন এবং ফাররুখ সিয়ারের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় সংঘাতে শান্তি ব্যহত হয়েছিল এবং এ সবের পরিণামে সীতারামের বিদ্রোহ ঘটে(পরবর্তী অংশে দেখুন)।

৬৮৬ রিয়াদ, পৃঃ ২৬৪-২৬৫

৬৮৭ করিম পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪১-৪৩

৩. সীতারামের বিদ্রোহ

জিয়াউদ্দীন এবং শাহজাদা ফাররুখ সিয়ারের সঙ্গে বিবাদ মিটমাট হতে না হতেই ভুষণা-মাহমুদাবাদ রাজস্ব ও প্রশাসনিক বিভাগের অন্তর্গত যশোর জেলার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের জমিদার সীতারামের বিদ্রোহ দমনের প্রতি মুর্শিদ কুলী খানের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সীতারামের পিতা ভুষণার ফৌজদারের অধিনে একজন ছোট-খাট রাজস্ব সংগ্রহকারী হিসেবে চাকুরী করতেন। সীতারামের যোগ্যতা বিবেচনা করে তাকেও সেই পদে বহাল থাকতে অনুমতি দেয়া হয় এবং এক মতানুসারে, সেই এলাকায় বসবাসকারী অবাধ্য আফগানদের নিয়ন্ত্রণে রাখার সুবিধার্থে তাঁকে ঐ পদে রাখা হয়।[৬৮৮] তিনি সেখানে নিজকে একজন জমিদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বর্তমান মাগুরা শহরের ১৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত মুহাম্মদপুর নামক স্থানে তার বাস ভবনকে সুরক্ষিত করে গড়ে তোলেন। তার নির্মিত দুটি মন্দিরে পাওয়া খোদিত ফলকে ১৬২১ এবং ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দের তারিখ উল্লেখ আছে, যা ১৬৯৯ এবং ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।[৬৮৯] এ থেকে জানা যায় যে, তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং অষ্টদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নিজকে ঐ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিভিন্ন কারণে এই সময়টা ছিল অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ, যথা- ইব্রাহীম খানের ঢিলেঢালা সুবাদারী, শোভা সিংহ এবং রহিম খানের বিদ্রোহের পরবর্তী শাহাজাদা আজীমুশ্বান (আজীমুদ্দীন) এবং দীওয়ান করতলব খানের (মুর্শিদ কুলী খান) মধ্যে সংঘাত, রাজস্ব প্রশাসনের সদর দপ্তর ঢাকা হতে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর, সুবাদারের ঢাকা থেকে পাটনায় চলে যাওয়া, তারপর দুই বৎসরেরও অধিক সময় (১৭০৮-১৭০১০) প্রদেশ থেকে মুর্শিদ কুলী খানের অনুপস্থিতি, স্থানীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে বিরাজমান দ্বন্দ্ব-কলহের চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে জিয়াউল্লাহ খানের হত্যাকাণ্ড, সর্বশেষে মুর্শিদ কুলী খানের বাংলায় প্রত্যাবর্তন এবং জিয়াউদ্দীন খান ও শাহজাদা ফাররুখ সিয়ারের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব-সংঘাত ইত্যাদি এ সময়ে ঘটেছিল। অতএব, ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় চলছিল একটি অরাজকতা এবং অস্থিতিশীলতার কাল। যখন শাসকবৃন্দ ও কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ অবস্থান ও নিরাপত্তা নিয়েই চিন্তিত থাকতেন। সীতারাম স্পষ্টতই দেশের এই অস্থিতিশীল অবস্থারই সুযোগ

---

[৬৮৮] এইচ.বি., ২য় খন্ড, পৃঃ ৪১৬

[৬৮৯] ওয়েস্টল্যান্ড, এ রিপোর্ট অন দ্যা ডিস্ট্রিক্ট অব যশোর... দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৮৭৪, পৃঃ ২৫-৩৮

গ্রহণ করেছিলেন। মুর্শিদ কুলী খান যখন জিয়াউদ্দীন খান এবং শাহজাদা ফাররুখ সিয়ারের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত ছিলেন, তখন সীতারাম রাজস্ব প্রদান স্থগিত করে দিয়ে একদল স্বশস্ত্র লোক নিয়ে তার প্রতিবেশীদের এলাকায় লুট-তরাজ চালিয়ে ভুষণার ফৌজদারকে অমান্য করা শুরু করে দিয়েছিল। এটাই ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সম্রাট পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত ফৌজদার, আবু তোরাব যিনি একজন সাইয়িদ, কিছুদিন চেষ্টা করেও সীতারামের বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হন।[৬৯০] "বন-জঙ্গল এবং নদী নালায় আশ্রয়" নিয়ে সীতারাম ফৌজদারের সৈন্যদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ এড়িয়ে চলতেন এবং হঠাৎ হঠাৎ আক্রমণ এবং লুট-তরাজ চালিয়ে তাকে হয়রানি করতেন। প্রতীয়মান হচ্ছে যে, মুর্শিদ কুলী খান আবু তোরাবের জন্য অতিরিক্ত কোন সৈন্য প্রেরণ করেননি বা করতে পারেননি এবং আবু তোরাবকে তার সীমিত সংখ্যক সৈন্য নিয়েই থাকতে হত। এই সুযোগে সীতারামের লোকেরা একদিন সম্ভবতঃ ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে ওৎপেতে আবু তোরাবকে হত্যা করে।[৬৯১] এতে মুর্শিদ কুলী খান সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তিনি শ্যালক বখশে আলী খানকে ফৌজদার নিয়োগ করেন এবং সীতারামকে দমন করার জন্য তাঁর অধিনে এক সৈন্যদল প্রেরণ করেন। বখশ আলী খানকে সহযোগিতা করার জন্য এবং সীতারামের পালানোর সকল পথ বন্ধ করার জন্য অন্যান্য সকল আমিরদের প্রতি আদেশ জারী করা হয়; অন্যথায় তাদের জমিদারী বাজেয়াপ্ত করার হুমকি প্রদান করা হয়। তারা সঙ্গে সঙ্গেই ফৌজদারের সঙ্গে সহযোগিতা করেন এবং তিনি সহজেই সীতারামকে বন্দী এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করেন। সেখানে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বিদ্রোহীদের সতর্ক করার জন্য তার লাশ মুর্শিদাবাদ থেকে ঢাকা আসার মহাসড়কের পাশে একটি গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়।[৬৯২] তার দুই পুত্র এবং এক কন্যা এবং তার পরিবারের কিছু সংখ্যক সদস্য এবং পুরুষ চাকর-বাকররা কলিকাতার ইংরেজ বস্তি এলাকায় কোম্পানীর পাটওয়ারী রামনাথের বাসা বাড়ীতে আশ্রয় নেয়।[৬৯৩] মুর্শিদ কুলী খানের নির্দেশানুযায়ী ইংরেজরা তাদেরকে হস্তান্তর করে দেয় এবং তাদেরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সীতারামের যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং

---

৬৯০ রিয়াদর পৃঃ ১৬৫-১৬৬

৬৯১ ঐ, খুব সম্ভব আবু তোরাব মুর্শিদ কুলী খানের বিরোধী আমিরদের দলভুক্ত ছিলেন। কারণ রিয়াদে উল্লেখ আছে যে, আবু তোরাব তাঁকে হেয় গণ্য করতেন

৬৯২ রিয়াদ, পৃঃ ২৬৭

৬৯৩ কন্সাল্টেশনস, ১১ই ফেব্রুয়ারী, ৩,৪,৫ এবং ৭ই মার্চ, ১৭১৪; আব্দুল করিম কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃঃ ৫১

তার জমিদারী মুর্শিদ কুলী খানের টাকশালের কর্মকর্তা রঘুনন্দনের ভাই রামজীবনকে প্রদান করা হয়।[৬৯৪]

এটা স্পষ্ট যে, সে সময় প্রাদেশিক প্রশাসন যে সকল জটিলতা এবং সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছিল, সীতারামের বিদ্রোহ ছিল তারই একটি উপজাত এবং তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, মুর্শিদ কুলী খানের তখন একদিকে জিয়াউদ্দীন এবং অপরদিকে ফাররুখ সিয়ারের সঙ্গে বিরোধ চলছিল। তার এই বিদ্রোহও তখন একই সময়ে সংঘটিত হয়। মুর্শিদ কুলী খান যখন তার দিকে মনোযোগ দিলেন, তখন এত সহজেই যে তাকে দমন করা সম্ভব হল, তা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি তেমন শক্তিশালীও ছিলেন না। সকল সমসাময়িক এবং সমসাময়িকের কাছাকাছি বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন একজন ক্ষুদ্র জমিদার। এমন কি কলিকাতার ইংরেজদেরকে যখন তার (সীতারামের) পরিবারকে হস্তান্তর করতে বলা হয়, তখন তারাও "ভুষ্ণালয়ের প্রয়াত জমিদার" বলে উল্লেখ করে। কয়েকজন জাতীয়তাবাদী হিন্দু লেখক তাকে একজন জাতীয় বীর হিসেবে দেখে থাকেন এবং তার জমিদারী কখনো যশোর জেলার একাংশ থেকে বেশি বিস্তৃত ছিল না, সে সম্পর্কেও তারা বলেন যে, তার রাজ্য ছিল দক্ষিণ বাংলার অর্ধেক এলাকাব্যাপী এবং বাংলায় সর্বশেষ হিন্দু রাজ্য।[৬৯৫] কোন সূত্র থেকেই এই ধারনার কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। তবে তিনি সন্দেহাতীতভাবে একজন উচ্চাবিলাসী লোক ছিলেন এবং তার নিজ যোগ্যতা এবং প্রাদেশিক প্রশাসনের সমস্যা সম্পর্কেও তার ধারণা ছিল অতিরঞ্জিত। তাকে দমন করার জন্য প্রশাসনের সহিত তার সকল প্রতিবেশী জমিদারদের সহযোগিতা করার বিষয়টি সর্ম্পাকে একজন লেখক মত প্রকাশ করেছেন যে, তিনি তার নিজ সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী অংশের মধ্য হতে কারও কোন সহযোগিতা আদায় করতে পারেননি। "তার বিদ্রোহ ছিল ব্যাক্তিগত বিদ্রোহ, এটা কোন জাতীয় পর্যায়ের বিদ্রোহ ছিল না।"[৬৯৬]

---

৬৯৪ রিয়াদ, পৃঃ ২৬৭

৬৯৫ জে.এন. সরকার এইচ.বি., ২য় খন্ড, পৃঃ ৪১৬, অন্যদের অনুসরণ করেছেন যেমন- এস.সি. মিত্রের হিস্ট্রি অব যশোর-খুলনা, ২য় খন্ডের (বাংলা সংস্করণ) বিবরণ। সরকারের নিজস্ব বৈশিষ্ট হচ্ছে তার স্ববিরোধিতা। সীতারাম সম্পর্কে তার বর্ণনার শুরু হচ্ছে এইভাবে যে, "তিনি হচ্ছেন মুর্শিদ কুলী খান কর্তৃক ধ্বংস করা জমিদারদের একজন" এবং তার পতনে অনুতাপ করে এই বলে শেষ করেন যে, তার রাজ্য ছিল "বাংলার শেষ হিন্দু রাজ্য"। সরকার সীতারামকে প্রতাপাদিত্যের পাশে স্থান দিয়ে বলেন যে, তিনি হচ্ছেন, "ইতিহাসের সবচেয়ে করুন চরিত্র এবং এই ঘটনা এই প্রদেশের জনপ্রিয় ইতিকাহিনী।" মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যদিও সরকার একই বইয়ের প্রথম দিকে প্রতাপাদিত্যকে শুধু মাত্র একজন "পাকা জমিদার বলে নিন্দা করেছেন। সরকার আবু তোরাবকেও হুগলীর জমিদার বলেও ভুল করেছেন

৬৯৬ কে. পি. বন্দোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮১

৪. বাংলার সুবাদার হিসেবে মুর্শিদ কুলী খান

তাঁর প্রশাসনিক এবং রাজস্ব বিষয়ক পদক্ষেপসমূহ

১৭১৫-১৬ খ্রিস্টাব্দে (১১২০ হিজরী) বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত মুর্শিদ কুলী খান ছিলেন বাংলার নায়েব সুবাদার এবং দীওয়ান। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন উড়িষ্যার দীওয়ান এবং সুবাদার। এটা ঘটে দিল্লীর দরবারী রাজনীতির একটি নতুন মোড় নেওয়ার ফলশ্রুতিতে। সায়িদ ভ্রাতৃদ্বয়ের কুটচালে সম্রাট বাংলার নাম মাত্র সুবাদার মীর জুমলাকে দরবার ত্যাগ করে নিজ প্রদেশের দায়িত্বভার নেয়ার জন্য বলেন। মীর জুমলা দৃশ্যত এই আদেশের নিকট নতি স্বীকার করেন এবং পাটনা পর্যন্ত পৌঁছে দেখেন যে, বাংলার রাজস্ব দিল্লীতে প্রেরণ করা হচ্ছে। তিনি এই অর্থ দ্বারা তার সৈন্যদের বেতন পরিশোধ করে দিল্লীতে ফিরে যান।

এ প্রেক্ষিতে সম্রাট ফাররুখ সিয়ার তাকে বাংলার সুবাদারের পদ হতে বরখাস্ত করেন এবং মুর্শিদ কুলী খানকে সুবাদার নিয়োগ করেন। এই নিয়োগ দেয়া হয় ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে অথবা ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে, কোন সূত্রেই এই নিয়োগ সম্পর্কে সঠিক তারিখের উল্লেখ নেই।[৬৯৭] এতদিন পর্যন্ত মুর্শিদ কুলী খানই ছিলেন বাস্তবে বাংলার সুবাদার। এবার নামেও হলেন। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তিনি সম্রাটকে বড় অংকের অর্থ এবং অন্যান্য জিনিষ উপঢৌকন হিসেবে প্রেরণ করেন। সম্রাট নিজের পক্ষ থেকে তাঁকে "মুতামিন আল-মুল্‌ক আলা আল-দৌলত জাফর খান বাহাদুর নাসির জঙ্গ" উপাধিতে ভুষিত করেন এবং তার মর্যাদা "সাত হাজারী" মনসবে উন্নীত করেন।

এই ঘটনার অল্প পরে আধুনিক যশোর শহরের নিকটবর্তী মাহমুদাবাদ সরকারের অন্তর্গত টংকী সারাবপুরের দুজন পাঠান জমিদার, যথা: শুজায়াত খান এবং নাজাবাত খান স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে পরোয়া না করে পার্শ্ববর্তী জমিদারীগুলোতে লুটতরাজ শুরু করে।[৬৯৮] তাদের এই বিদ্রোহ ছিল স্পষ্টতই সীতারামের বিদ্রোহেরই অনুকরণ মাত্র। মুর্শিদ কুলী খান তখন অবশ্য আগের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। তার সেনাপতি ও হুগলীর ফৌজদার আহসানুল্লাহ খান সহজেই এই বিদ্রোহ দমন করেন এবং এই দুই পাঠান সর্দারকে বন্দী করেন এবং তাদেরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। তাদের জমিদারীও রামজীবনকে অর্পণ করা হয়।

---

৬৯৭ এই প্রসঙ্গে আব্দুল করিমের পূর্বোক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য পৃঃ ৫৪-৫৬

৬৯৮ রিয়াদ, পৃঃ ২৭৮-২৮০

ইত্যবসরে দিল্লীতে কয়েকটি প্রাসাদ বিপ্লব সংঘটিত হয়। ১৭১৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে সায়িদ ভ্রাতাগণ সম্রাট বাহাদুর শাহকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেন এবং তারা বাহাদুর শাহ প্রথমের পৌত্র (তার পুত্র রফিউশ্‌শানের পক্ষের) রফিউদ্দারাজাতকে সিংহাসনে বসান। মাত্র ২ মাস পরে ১৭১৯ খ্রিস্টাব্দের জুনে রফিউদ্দারাজাতকেও সিংহাসনচ্যুত করা হয় এবং তার বড় ভাই রফিউদৌলতকে সিংহাসনে বসানো হয়। অল্প কিছু দিন পরে অর্থাৎ একই বৎসর উভয় ভ্রাতাই ইনতিকাল করেন এবং বাহাদুর শাহের অপর এক পৌত্র শাহজাদা রৌশণ আক্তার সিংহাসন লাভ করেন। তিনি মুহাম্মদ শাহ উপাধি ধারণ করেন[৬৯৯] এবং পরের বৎসর চূড়ান্তভাবে সায়িদ ভ্রাতাগণকে অপসারণ করে দরবারের রাজনীতিতে স্থিতিশীলতা আনয়ন করতে সক্ষম হন. যা তাকে ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সিংহাসনে আসীন থাকার অবকাশ দেয়।

দিল্লীতে এসব পরিবর্তন ঘটার সময়ও মুর্শিদ কুলী খান একের পর এক সিংহাসনে আরোহণকারী সম্রাটকে নিয়মিতভাবে রাজস্ব ও কর প্রেরণ করতেন এবং বিনিময়ে তিনি নিজেও তাঁর পদের নিশ্চয়তা পেয়েছেন। তাই তিনি ১৭১৩ সাল থেকে ১৭২৭ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বিনা বিড়ম্বনায় বাংলা ও উড়িষ্যার শাসকের পদে বহাল ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এই সময়ে তাঁর প্রশাসনের প্রধান বৈশিষ্ট ছিল নিজ হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভুত করা। আওরঙ্গজেবের সময় থেকেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর দূর্বল উত্তরাধিকারীদের আমলে মুর্শিদ কুলী খান নিজেকে এই দুই প্রদেশের প্রকৃত শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। কেন তিনি এখনো মোগল সম্রাটদের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতেন, তা শুধু অনুমানের বিষয়। আওরঙ্গজেবের অধিনে তাঁর জীবনের বৃহদাংশ এবং সবচেয়ে গঠনমূলক সময়টি ব্যয় হওয়ায় মোগল সাম্রাজ্যের বিশালতা এবং এর প্রতি তাঁর সম্ভ্রমবোধ এমন গভীরভাবে তাঁর মনে রেখাপাত করে যে, তিনি তাদের প্রতি আনুগত্য ছুড়ে ফেলে দেয়ার বিষয়ে কোন চিন্তাই করেন নি। যদিও তিনি অন্যভাবে বাংলা ও উড়িষ্যার উপর শুধু তাঁর নিজের নিয়ন্ত্রণ মজবুত ও নিশ্চিত করার জন্যই নয় বরং তাঁর বংশধরদের উত্তরাধিকার নিশ্চিত করার জন্যও পুরোপুরি সতর্কতার সঙ্গে সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এই উদ্দেশ্যেই তাঁর প্রশাসনিক ব্যবস্থ বিন্যাস্ত করা হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর জামাতা শুজাউদ্দীন মুহাম্মদ খানকে উড়িষ্যার নায়েব

---

[৬৯৯] মুহাম্মদ শাহের সিংহাসনে আরোহণ করার পূর্ব পর্যন্ত আরো দু'জন ভৌতিক শাসক যথা- নিকুসিয়ার এবং ইব্রাহীমকে দ্রুত একের পর আরেকজনকে সিংহাসনে বসানো হয়

সুবাদার এবং তাঁর অন্য এক আত্মীয়কে ঢাকার নায়েব নিযুক্ত করেছিলেন।[৭০০] অনুরূপভাবে অন্যান্য সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থানের ফৌজদাররাও ছিল মুর্শিদ কুলী খানের আত্মীয় বা মনোনীত ব্যক্তি। আওরঙ্গজেবের শাসনামলে মুর্শিদ কুলী খানের সুপারিশের ভিত্তিতেই সায়িদ আকরাম খানকে বাংলার নায়েব দীওয়ান নিযুক্ত করা হয়েছিল। যখন তিনি বাংলার সুবাদার হন, তখন এই সায়িদ আকরাম খানকে বাংলার দীওয়ান নিযুক্ত করা হয়। সায়িদ আকরাম খানের মৃত্যুর পরে মুর্শিদ কুলী খানের দৌহিত্রীর স্বামী সায়িদ রাজী খানকে বাংলার দীওয়ান নিযুক্ত করা হয়। আবার ১৭২০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে মুর্শিদ কুলী খানের দৌহিত্র মীর্যা আসাদুল্লাহকে সরফরাজ খান উপাধি দিয়ে বাংলার দীওয়ান নিযুক্ত করা হয়। মুর্শিদ কুলী খানের কোন পুত্র সন্তান ছিল না; সরফরাজ খান ছিলেন তার একমাত্র কন্যা জিন্নাতুন্নেসার পুত্র। সরফরাজ খানের অবস্থান নিশ্চিত করার জন্য মুর্শিদ কুলী খান মৃত্যুর পূর্বে সরফরাজের নামে মুর্শিদাবাদের নিকটস্থ গুণাখালীর জমিদারী ক্রয় করেন এবং তাকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করার জন্য সম্রাটকে অনুরোধ করেন।

সম্ভাব্য সকল বিরোধীতা নির্মূল করে তাঁর অবস্থান নিশ্চিত করার এই নীতিই পূর্ব এবং মধ্য বাংলায় মুসলমান জাগীরদারদের প্রভাব বিনষ্ট করার জন্য অন্তত আংশিকভাবে দায়ী, যদিও বাহ্যিকভাবে রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তা করা হয়েছিল। তিনি তাদের জাগীরকে সরকারী খাস জমিতে পরিণত করেন এবং উড়িষ্যায় তাদের জন্য জাগীরের বিকল্প ব্যবস্থা করেন। কয়েকটি প্রধান প্রশাসনিক পদ ব্যতীত সকল অধিনস্থ পদ, বিশেষ করে রাজস্ব বিভাগের পদগুলোও হিন্দু কর্মচারীদের দ্বারা পূর্ণ করা হয়েছিল। এমনকি প্রশাসনিক বিভাগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদও হিন্দুদেরকে দেয়া হয়েছিল। তারিখ-ই-বাঙ্গালাহ অনুযায়ী এটা এজন্য করা হয়েছিল যে, তাদের নিকট থেকে পাওনা আদায় করা সহজ ছিল।[৭০১] রাজকোষের সচিব এবং তাঁর নিজ অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ক সচিবও ছিলেন যথাক্রমে ভুপাত রায় এবং কৃষ্ণ রায়, যাদেরকে তিনি ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে সম্রাটের দরবার থেকে ফেরার সময় সঙ্গে করে নিয়ে এসিছিলেন। দুই জন মহা নিরীক্ষক বা সদর কানুনগোও হিন্দু ছিলেন, যথা- দর্প নারায়ন এবং জয় নারায়ন। মুর্শিদ কুলী খান বাংলায় আসার পূর্বে প্রাদেশিক দীওয়ানের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করার জন্য সম্রাট আওরঙ্গজেব এই দুটি পদ এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য

---

৭০০ করিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৬

৭০১ করিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৭

পদসমূহ সৃষ্টি করেন। মুর্শিদ কুলী খান শুধু তাদেরকে তাদের দপ্তরে বহাল রেখেছেন তাই নয়, বরং একটি বর্ণনা মতে[৭০২] তিনি তাদের মধ্যে যে জ্যেষ্ঠ এবং অধিক দক্ষ যথা দর্প নারায়নকে রাজকোষের সেক্রেটারীর দায়িত্ব এবং ১৭১৪ সালে ভুপাত রায় মারা গেলে তার দায়িত্বও দর্প নারায়নকে অর্পন করে তাকে নিজ পক্ষে টেনে নেন। অনুরূপভাবে মুর্শিদ কুলী খানের টাকশালের তত্ত্বাবধায়কও ছিলেন রঘু নন্দন নামক একজন হিন্দু।

মুর্শিদ কুলী খানের রাজস্ব প্রশাসনের লক্ষ্য ছিল (ক) প্রজাদের উপর অতিরিক্ত কর চাপিয়ে না দিয়ে রাজস্ব আয় বাড়ানো, (খ) রাজস্ব নিয়মিত আদায় করা নিশ্চিতকরণ এবং (গ) আমিল এবং জমিদারদের মত রাজস্ব আদায়কারী এজেন্সীসমূহের দ্বারা নিপীড়নমূলকভাবে রাজস্ব দাবী থেকে প্রজাদেরকে রক্ষা করা। সম্রাট আওরঙ্গজেবের লক্ষ্যও ঠিক তাই ছিল এবং সুবাদার শায়েস্তা খানের পরবর্তী সকল সুবদারকেও তিনি বারবার একথাই স্মরণ করিয়ে দিতেন।

আসলে মুর্শিদ কুলী খানের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ তাঁর পূর্ববর্তীদের গৃহীত নীতিমালারই অনুবৃত্তি এবং তিনি তা সমাপ্ত করেন মাত্র। রাজস্ব প্রশাসনে তিনি কোন মৌলিক বা আমূল পরিবর্তন ঘটাননি। বিরাজমান কাঠামোর মধ্যেই তিনি উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য দক্ষতার সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ করে যথেষ্ঠ সাফল্য অর্জন করেন। এমনকি তাঁর সকল পদক্ষেপ একই সঙ্গে গৃহীতও হয়নি। এসব সংস্কারের কিছু কিছু তিনি তাঁর জীবনের প্রথম দিকে আওরঙ্গজেবের আমলে পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহের দীওয়ান থাকাকালীন সময়েই বাস্তবায়ন করেছিলেন। অন্যান্য সংস্কারসমূহ তিনি বরং তাঁর (মুর্শিদ কুলী খান) জীবনের শেষের দিকে বাংলার সুবাদার হিসেবে নামে মাত্র দীওয়ান রাজী খান এবং সরফরাজ খানের সহায়তা নিয়ে সম্পন্ন করেছিলেন।

ইব্রাহীম খানের সময় থেকেই প্রদেশের রাজস্ব প্রশাসনে অব্যবস্থা শুরু হয়, এমন কি দুজন যুগ্ম সদর কানুনগো নিয়োগ করা সত্ত্বেও রাজস্ব প্রেরণের পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকায় আওরঙ্গজেব মুর্শিদ কুলী খানকে দীওয়ান হিসেবে প্রেরণ করেন। অতএব, তাঁর গৃহীত প্রাথমিক পদক্ষেপসমূহের মধ্যে একটি ছিল বিরাজমান দলিল ও নথিপত্র অনুযায়ী এবং রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তাদের সহায়তায় ভূমির খাজনা এবং অন্যান্য করের (বাণিজ্য শুল্ক ও অন্যান্য কর)

---

৭০২ আব্দুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৮। ডঃ করিম দেখিয়েছেন যে, তাওয়ারিখ-ই-বাঙ্গালাহর বর্ণনা অনুযায়ী মুর্শিদ কুলী খান দীর্ঘ দিন পর্যন্ত দর্প নারায়নের প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করতেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে শাস্তি দিয়েছিলেন-এ বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

একটি বিস্তারিত তালিকা প্রণয়ন করা। এইভাবেই তিনি প্রদেশ থেকে সংগৃহীতব্য রাজস্বের যথাযথ পরিমাণ নির্ধারণ করতে পেরেছিলেন। তিনি অবশ্য খুবই দ্রুত একাজ সম্পন্ন করেছিলেন এবং পরে তিনি এই তালিকা অনুযায়ী ভূমি রাজস্ব আদায় এবং নির্ধারিত কয়েকটি কিস্তিতে রাজকোষে অর্থ জমা দেয়া বাধ্যতামূলক করে জমিদারদের নিকট হতে নতুন করে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। বুঝা যাচ্ছে যে, মুর্শিদ কুলী খান এসব প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে যে সকল জমিদারের স্বার্থ হানি ঘটেছিল, তারা এতে আপত্তি তুলেছিলেন এবং তাঁর অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিসমূহ সম্রাটের নিকট পর্যন্ত পৌঁছিয়েছিলেন। তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে ব্যাখ্যা চাওয়া হলে তিনি সন্তোষজনকভাবে এ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যে, ঢাকা পৌঁছার পর তিনি রাজস্ব আদায়কারী ঠিকাদারদের নিকট থেকে রাজস্ব পরিশোধের ব্যাপারে অঙ্গীকার পত্র নিয়েছিলেন এবং সাবেক দীওয়ান কিফায়েত খানের অনুসরণ করে এবং কৃষকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে রাজস্ব পরিশোধের জন্য কয়েকটি সাময়িক কিস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।"[৭০৩] এ থেকে দেখা যায় যে, সে সময়ে বিরাজমান এবং তাঁর পূর্ববর্তীগণ যে পদ্ধতি অনুসরণ করতেন, সে পদ্ধতিকেই মুর্শিদ কুলী খান শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছিলেন মাত্র এবং তাঁর এই ব্যবস্থা, যথা- রাজস্ব ঠিকাদারদের জন্য রাজস্ব পরিশোধের ব্যাপারে তাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার পত্র গ্রহণ এবং "কৃষকদের আবেদনের" প্রেক্ষিতেই তাদের (ঠিকাদার) জন্য কয়েকটি সাময়িক কিস্তি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল। এ থেকে আরো দেখা যায় যে, মুর্শিদ কুলী খান জমিদারদেরকে "রাজস্ব সংগ্রহের জন্য ঠিকাদার" হিসেবে গণ্য করতেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই সময় তিনি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং তা হচ্ছে বাংলার জাগীরসমূহকে খাস জমিতে পরিণত করা এবং জাগীরদারদের জন্য উড়িষ্যায় বিকল্প জাগীরের ব্যবস্থা করা। এই দুটি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে মুর্শিদ কুলী খান অবিলম্বে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তবে কৃষকদের নিকট থেকে অধিক কর আদায় করে নয়, বরং রাজস্ব আদায়কে প্রক্রিয়াবদ্ধ এবং নিয়মিতকরণ এবং জমিদারদের দ্বারা সময়মত রাজস্ব পরিশোধ নিশ্চিত করণের মাধ্যমে। এই দুটি পদক্ষেপ বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় মুর্শিদ কুলী খান তার জীবনের শেষ ভাগে এসে আরো একটি বিস্তৃত ভূমি জরিপ এবং

---

৭০৩ আহকাম, ২১৭ বি এবং ২২০ এ । জে. এন. সরকার কর্তৃক এইচ. বি. ২য় খন্ডে অনূদিত এবং উদ্ধৃত, পৃঃ ৪১১। এই প্রমাণকে সরকার "আমূল পরিবর্তন" বলে ব্যাখ্যা করে বলেন যে, এইভাবে মুর্শিদ কুলী খান পুরাতন জমিদারকে বেদখল করে দেন এবং একটি নতুন রাজস্ব ঠিকাদার শ্রেণী সৃষ্টি করেন।এই প্রেক্ষিতটি এই ধরণের ব্যাখ্যা সমর্থন করেনা। পুরাতন জমিদারদেরকে বেদখল এবং সম্পূর্ণ এক নূতন ঠিকাদার শ্রেণী সৃষ্টির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

রাজস্ব বন্দোবস্ত সম্পন্ন করেন, যা ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত হয় এবং এর মাধ্যমে বাংলাকে ১৩টি চাকলা বা রাজস্ব বিভাগে বিভক্ত করা হয়। সলিমুল্লাহর মতে মুর্শিদ কুলী খান প্রতিটি পরগণায় (রাজস্ব বিভাগ) দক্ষ জরিপকারী এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদেরকে প্রেরণ করেন। তারা "একটির পর একটি গ্রাম এবং প্রতিটি প্রজার প্রতিটি জোত জমা একটি একটি করে পরিমাপ করেন, এমনকি, আবাদী এবং পতিত জমিও পরিমাপ করা হয়। এইভাবে একটি ভূমি বন্দোবস্ত সমাপ্ত করেন। অতীত এবং বর্তমানের একটি তুলনামূলক বিবরণ প্রস্তত করা হয় এবং ভাগে ভাগে আয়ের খসড়া তালিকা তৈরী করে কার্যোপযুগী করা হয়।"[৭০৪] লেখক আরো বলেছেন যে, জমির এই বন্দোবস্ত এবং জরিপ করার সময় জমিদারকে নিয়ন্ত্রণে রাখা হত।[৭০৫] এটা স্পষ্ট যে, এই বাধা-নিষেধ শুধু তাদের জন্য ছিল, যারা পরিচালনায় সহযোগিতা করত না অথবা কারো নিজ এলাকায় তার উপস্থিতিকে এই কাজের জন্য প্রতিবন্ধক বলে গণ্য করা হত। এটা ছিল একটি নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ জরিপ এবং সুবা বাংলার প্রায় সকল অঞ্চলেই এ জরিপ কাজ পরিচালনা করা হয়েছিল, যদিও দেশের প্রাকৃতিক কারণেই কিছু এলাকা জরিপ থেকে বাদ রাখা প্রয়োজন ছিল। সলিমুল্লাহ বিশেষভাবে বীরভূম এবং বিষ্ণুপুরের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, প্রথমোক্ত জেলাটি এই জন্য জরিপ ও বন্দোবস্ত থেকে বাদ রাখা হয়েছিল যে, এর জমিদার আসাদুল্লাহ ছিলেন একজন ধার্মিক ব্যক্তি এবং তিনি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে অনেক জমি দান করেছেন; আর শেষোক্ত জেলাটি এই কারণে বাদ রাখা হয়েছিল যে, এটি ছিল দূর্গম এবং বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ।[৭০৬]

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মেদিনীপুর চাকলা (বিভাগ)-কে জরিপ থেকে আলাদা করে বাংলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এটা করে মুর্শিদ কুলী খান চেয়েছিলেন বাংলাকে একটি নিবিড় রাজস্ব প্রদেশে পরিণত করে সরাসরি তাঁর নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং রাজস্বের উদ্দেশ্যে উড়িষ্যাকে প্রধানত জাগীরদারদের হাতে ছেড়ে দিতে; অন্যথায় মেদিনীপুর চাকলাকে উড়িষ্যা থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য সত্যিকারভাবে অন্য কোন প্রয়োজন ছিলনা। কারণ মুর্শিদ কুলী খান নিজেই তো ঐ প্রদেশটির সুবাদার এবং দীওয়ান ছিলেন। এই অনুমানের সমর্থনে আরো যে বিষয় পাওয়া যায়, তা হচ্ছে তার রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে সেখানে কিছুই শুনা যায় না; এমনকি সেখানকার জন্য তিনি কোন স্বতন্ত্র

---

৭০৪ টি.বি. এফ ৩১ এ . করিম কর্তৃক উদ্ধৃত. পূর্বোক্ত. পৃঃ ৭৭ .

৭০৫ ঐ

৭০৬ ঐ. ৩২ এ

দীওয়ান ও নিযুক্ত করেননি, যেমন নিজে সুবাদার হওয়ার পরে তিনি বাংলার ক্ষেত্রে করেছিলেন। সে যাই হোক না কেন, উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে মুর্শিদ কুলী খান রাজস্বের পরিমাণ সত্যি বাড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। কাজেই, ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে শুজার বন্দোবস্তের ফলে যেখানে বাংলার রাজস্বেও পরিমাণ ছিল ৮ ১,৩১,১৫,৯০৭.০০ টাকা, সেখানে মুর্শিদ কুলী খানের সময় তা দাঁড়ায় মোট ৮ ১,৪১,৮৮,১৮৬.০০ টাকায়,[৭০৭] প্রায় ১১ লাখ টাকা বৃদ্ধি ঘটে। বাংলার অনেক জাগীর সরকারের খাস জমিতে পরিণত করা এবং উড়িষ্যার কয়েকটি জেলাও বাংলার সঙ্গে যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনায় নিলে এই রাজস্ব বৃদ্ধিকে অস্বাভাবিক বলে মনে হয়না। যুক্তিসঙ্গত ভাবেই এটা ধরে নেয়া যায় যে, রাজস্বের হার আগে যা ছিল, মুর্শিদ কুলী খানের সময়ও তা কম-বেশ প্রায় একই ছিল এবং তা ছিল ভূমি হতে উৎপাদিত পণ্যের এক তৃতীয়াংশ থেকে এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত।[৭০৮] এমন কি কোন বৎসরই এই পরিমাণ পুরোপুরি আদায় করা হয়নি, তা থেকে বুঝা যায় যে, এই পরিমাণটা ছিল খুব সম্ভব "মূল্যায়ন," দাবী নয়। যদি মুর্শিদ কুলী খান কোথাও কর বর্ধিত করে থাকেন, তাহলে খুব সম্ভবত আগে সে সব স্থানে কম করে কর নির্ধারণ করা হয়েছিল, যেগুলোতে কৃষি ঋণ বা তাকাবী মঞ্জুর করার কারণে ভূমির উন্নতি সাধিত হয়েছিল এবং উৎপাদনও বেড়ে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে সলিমুল্লাহ ভূমি জরিপ ও বন্দোবস্ত সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।[৭০৯] মুর্শিদ কুলী খান কর্তৃক অতিরিক্ত কর বা আবওয়াব আরোপের যে একটি মাত্র নজীর পাওয়া যায়, তা হচ্ছে আবওয়াব-ই-খাস নবীসী বা দীওয়ানী বিভাগের কর্মচারীদের জন্য কমিশন।[৭১০] দুঃখজনক হল যে, এর কোন পরিমাণ লিপিবদ্ধ নেই। অপরদিকে, তিনি সকল অবৈধ কর বিলোপ করেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুর্শিদ কুলী খানের অধিনে এই রাজস্ব বৃদ্ধির কারণ জাগীরদারদের উপর অতিরিক্ত কর আরোপ নয়, বরং নিয়মিত এবং পদ্ধতিগতভাবে কর আদায় করা। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর রাজস্ব প্রশাসনের মূল নীতি ছিল রাজস্ব সংগ্রহকারীদের অবৈধ এবং জবরদস্তিমূলক দাবী থেকে প্রজাদেরকে রক্ষা করা। এটা নিশ্চিত করার জন্য তিনি ছিলেন সদা সতর্ক এবং যারা নিয়ম

---

[৭০৭] জেমস গ্রান্ট, এনালাইসিস অব দ্যা ফাইন্যান্সেস অব বেঙ্গল, পঞ্চম প্রতিবেদনের ৪র্থ পরিশিষ্ট পৃঃ ১৮২-১৮৬, ১৮৯-১৯১। সলিমুল্লাহর উল্লেখিত অংক এবং এই অংক প্রায় সমান। টি.বি. পৃঃ ৩৮৬

[৭০৮] আলোচনার জন্য দেখুন আবদুল করিম, পূর্বোক্ত পৃঃ ৮৫-৯০

[৭০৯] টি.বি. এফ. ৩১ এ

[৭১০] টি.বি. এফ. ৩৮৬ বি.।

ভঙ্গ করে বাড়াবাড়ি করতো, তাদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন আপোষহীন। কর সংগ্রহের কাজটি করতেন এক শ্রেণীর এজেন্ট (নীলামে সর্বোচ্চ দরের ভিত্তিতে মনোনীত রাজস্বের ইজারাদার নয়), যারা জমিদার হিসেবে পরিচিত ছিলেন; আরেক শ্রেণীর কর্মচারী ছিলেন, যাদের প্রধান ছিলেন আমিল এবং কানুনগো ও মুতাসাদ্দী নামের অন্যান্যরাও তাদেরকে সহায়তা করতেন। চাকলা বা সরকার হিসেবে পরিচিত একটি রাজস্ব বিভাগের জন্য প্রধান কর সংগ্রাহক ছিলেন আমিল। সূত্র সমূহে আমিল এবং জমিদার শব্দ দুটি প্রায় সব সময়ই একই সঙ্গে উল্লেখ পাওয়া যায়, যদিও তাদের সম্পর্কের সঠিক প্রকৃতি সম্পর্কে কোথায়ও পরিস্কারভাবে বর্ণিত নেই। বুঝা যাচ্ছে যে, পরবর্তীকালে বৃটিশ "জেলা কালেক্টারদের" মত আমিলগণ জমিদারদের উপর তদারকির কাজ করতেন। যে সকল ভূমি প্রত্যক্ষভাবে সরকারের মালিকানাধিন ছিল এবং কোন জমিদারীর অন্তর্ভূক্ত ছিলনা, সে সকল জমির খাজনা আদায়কারী অধিনস্থ কর্মচারী যেমন, কানুনগো এবং আমীনদের কাজ আমিলগণ সমন্বয় এবং তদারকি করতেন। মুর্শিদ কুলী খান ব্যক্তিগতভাবে জমিদার ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি নিজে অর্থ আদায় ও প্রেরণ তদারকি করতেন এবং দৈনিক লেজার বই স্বাক্ষর করতেন। প্রতি মাসের শেষে অর্থ আদায়কারী বিভিন্ন সংস্থা, প্রধানত- জমিদার, আমিল, কানুনগোদেরকে হিসাব পেশ করতে হত। যদি কেহ খেলাপী বা অন্য কোন অনিয়মের জন্য অভিযুক্ত হতেন, তাহলে তাকে আটক করে রাখা হত এবং তাকে বিভিন্নভাবে শাস্তি দেয়া হত।[৭১১] কোন জমিদার অভ্যাসগতভাবে খেলাপী হলে, তাকে জমিদারী থেকে উৎখাত করা হত। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জমিদার এবং প্রজা উভয়ের সুবিধার্থে প্রদেয় অর্থ কয়েকটি সাময়িক কিস্তিতে প্রদানের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। আরো জানা যাচ্ছে যে, একই উদ্দেশ্য নিয়ে অর্থাৎ খাজনা নিয়মিত সংগ্রহ করে হাল নাগাদ রাখার জন্য মুর্শিদ কুলী খান বৎসর শেষে পূণ্যা নামে একটি অনুষ্ঠানের প্রচলন করেন এবং তা বাংলা সনের প্রথম মাসের প্রথম তারিখ অর্থাৎ ১লা বৈশাখে এই অনুষ্ঠান হত। এই অনুষ্ঠানে বাৎসরিক হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত করা হত। ব্যালান্স শীট তৈরী সম্পন্ন করে সম্রাটের পাওনা সম্রাটের নিকট প্রেরণ করা হত।[৭১২] এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পূণ্যা অনুষ্ঠানের তারিখ বাংলার প্রধান ফসল কাটার মৌসুমের সমাপ্তির সঙ্গে মিলে যায়।

---

[৭১১] টি.বি. এফ. ৩৬-৩৭

[৭১২] টি.বি. এফ. ৩৮ বি, এ

মুর্শিদ কুলী খান প্রজাদের স্বার্থ সম্পর্কে সদা সতর্ক ছিলেন। জমিদার এবং আমিলগণ রাজস্ব তালিকা মেনে চলতে বাধ্য ছিলেন এবং কারও জন্য প্রজাদের সঙ্গে ইচ্ছামত কাজ করার সুযোগ রাখা হয়নি। আমিল এবং অন্যান্য কর্মচারীগণ সরকার থেকে নিয়মিত বেতন পেতেন, আর জমিদারগণ পেতেন সংগৃহীত রাজস্ব থেকে নির্ধারিত একটি শতকরা হার বা তাদের পারিশ্রমিক বা জীবিকা ভাতা হিসেবে নানকর জমির বরাদ্দ। সলিমুল্লাহ স্পষ্ঠভাবে উল্লেখ করেছেন যে, "মুর্শিদ-কুলী খান রাজস্ব আদায় ও প্রেরণের ব্যাপারে জমিদারদের প্রভাব সংকুচিত করেন।" সলিমুল্লাহ এবং আহকাম উভয়ে পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে যে, জমিদারদেরকে একটি চূক্তিবদ্ধ হতে এবং বণ্ড দিতে হতো যে, তারা সরকারের তৈরী রাজস্ব তালিকা মেনে চলবে এবং প্রজাদের উপর কোন জুলুম করবে না। জমিদারদের মধ্যে যারা নতুন বন্দোবস্ত মেনে চলতে রাজী হত, তাদের জমিদারী বহাল রাখা হত। এটা ধরে নেয়া যেতে পারে যে, এইভাবে জমিদারদের ক্ষমতা হ্রাস করাও ছিল সীতারাম এবং অন্যান্য জমিদারদের বিদ্রোহের একটি কারণ। মুর্শিদ কুলী খান শুধু কিছু নিয়ম ও নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়ে এবং জমিদারদের নিকট হতে বণ্ড নিয়ে অলসের মত চুপচাপ বসে থাকেন নি, তিনি এটাও নিশ্চিত করতেন যে, প্রণীত এই নীতিমালা যেন যথাযথভাবে পালন করা হয়। যে এই সকল নিয়ম-কানুন লঙ্ঘন করত, তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হত। এই ধরণের অপরাধের ক্ষেত্রে নওয়াব কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তির ভয় এত বেশি ছিল যে, জমিদার এবং আমিলগণ মুর্শিদাবাদে তাদের প্রতিনিধি (উকিল) নিযুক্ত করে রাখতেন, যেন তারা এ ধরণের সম্ভাব্য কোন ফরিয়াদী সম্পর্কে সার্বক্ষণিক খোঁজ-খবর রাখতে পারে এবং যে কোন উপায়ে নালিশ রুজুর পূর্বেই যেন তাদেরকে সন্তুষ্ট করা যায়। কেননা যদি দৃঢ়-ভিত্তি সম্পন্ন কোন অভিযোগ মুর্শিদ কুলী খানের কানে পৌঁছে, তাহলে অপরাধীর জন্য কঠিন শাস্তি ছিল সুনিশ্চিত।[৭১৩]

মুর্শিদ কুলী খানের রাজস্ব প্রশাসনের এই দিকটির উপর জোর দিতে গিয়ে সলিমুল্লাহ এমন কিছু বক্তব্য রেখেছেন, যার উপর নির্ভর করে পরবর্তী লেখকগণ ধারণা করেছেন যে, মুর্শিদ কুলী খান ছিলেন জমিদার-পীড়ক, তাদেরকে তিনি বর্বরের মত শাস্তি প্রদান করতেন। কর-খেলাপীদের শাস্তি সম্পর্কে সলিমুল্লাহ লিখেছেন যে, জনশ্রুতি অনুযায়ী মুর্শিদ কুলী খানের দীওয়ান রাজী খান তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য এক অদ্ভুত পদ্ধতি আবিস্কার করেন। তিনি তাদেরকে নোংরা

---

[৭১৩] টি.বি. এফ. ৬৮ বি.

আবর্জনা ভর্তি গর্তে নিক্ষেপ করতেন এবং ব্যঙ্গ করে ওটাকে বলতেন বৈকুণ্ঠ, বেহেশতের জন্য ব্যবহৃত সংস্কৃতি ভাষার শব্দ।[৭১৪] এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রাজী খান খুব অল্প সময়ের জন্য ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীওয়ান ছিলেন। তাই বলা যায় যে, যদি সেই সময়ে অস্বাভাবিক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েও থাকে, তাহলে তা ছিল শুধু তার সময়ে। সৌভাগ্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, সলিমুল্লাহ যত্ন করে উল্লেখ করেছেন যে, তা ছিল জনশ্রুতি মাত্র। অনুমান করা যেতে পারে যে, মুর্শিদ কুলী খানের কঠোর ন্যায়পরায়নতা তাঁর সম্পর্কে অনেক অতিরঞ্জিত-কল্প কাহিনীর জন্ম দিয়ে থাকবে। সলিমুল্লাহর অনুরূপ আরেকটি বিবরণ থেকে একইরূপ অবস্থা বোঝা যায়, সেখানে তিনি বলেছেন যে, বিভিন্ন ধরণের শাস্তি দেয়ার পরেও যে সকল জমিদার কর না দিতেন, তাদের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাসহ তাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করা হত।[৭১৫] লেখক এইরূপ বল প্রয়োগ করে ধর্মান্তর করার একটি উদাহরণও পেশ করতে পারেননি। যদি এরূপ কিছু ঘটতো, যেমন একজন লেখক মনোযোগ আকর্ষণ করে যথার্থই বলেছেন,[৭১৬] তাহলে বিদ্রোহী জমিদার সীতারামের পরিবারবর্গকেও ইসলামে দীক্ষিত করা হত; এবং তাহলে তাঁর এত যে হিন্দু কর্মকর্তা ছিলেন, তারা কিন্তু অসহায় এবং ধর্মের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন না, তারাও তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতেন না। এখানে আরো বলা যেতে পারে যে, যদি এরূপ বলপূর্বক ইসলামে দীক্ষিত করার কোন ঘটনা আদৌ ঘটত, তাহলে সে ঘটনা সমসাময়িক ইউরোপীয় বণিকদের বিশেষ করে ইংরেজ বণিকদের লেখায় উল্লেখ পাওয়া যেত। কারণ তারা ছিলেন স্থানীয় যে কোন বিষয় সম্পর্কে সতর্ক পর্যবেক্ষক।

মুর্শিদ কুলী খান সম্পর্কে যদুনাথ সরকার আরেকটি ভুল ধারণা প্রচার করেছেন এবং তা হচ্ছে এই যে, তিনি "জমিদার নামে অভিহিত বাংলার প্রাচীন ভূস্বামীদেরকে" উৎখাত করে দেন এবং ইজারাদার বা ঠিকাদার নামে আরেক শ্রেণীর লোকের সঙ্গে রাজস্ব আদায়ের জন্য চুক্তি করেন। তারা অবশ্য নওয়াব-বাদশাদের ঘরে জন্মগ্রহণ করেননি বরং তারা ছিলেন "খ্যাতনামা বেসামরিক কর্মকর্তা মাত্র এবং সংগৃহীত রাজস্বের একটি ভাগ তাদেরকে দেয়া হত।" সরকার এ পদ্ধতিকে বলেছেন মালজামিনী পদ্ধতি এবং আরো বলেছেন যে, মুর্শিদ কুলী খান "এইভাবে বাংলায় একটি নতুন ভূম্যাধিকারী অভিজাত শ্রেণীর সৃষ্টি করেন।

---

[৭১৪] টি.বি. এফ. ৪৫ বি.

[৭১৫] টি.বি. এফ. ৩৭ এ এ

[৭১৬] কে.পি. বন্দোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৯

লর্ড কর্ণওয়ালিস তাদের অবস্থান এবং বংশানুক্রমিক মালিকানা চিরস্থায়ী করে দেন।"[৭১৭] মুর্শিদ কুলী খানের বিরুদ্ধে কিছু সংখ্যক অভিযোগ সম্পর্কে তিনি তার বক্তব্য দিয়েছেন আহকাম-ই-আলমগীরীর উপর ভিত্তি করে এবং জওয়াবে তার প্রদত্ত ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, "তিনি শুধুমাত্র ইজারাদারদের নিকট থেকে রাজস্ব সংগ্রহ সম্পর্কে মাল-বন্ধক রাখার অঙ্গীকার পত্র (Securiy bond) গ্রহণ করতেন।"[৭১৮] এই সমস্ত প্রমাণকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলেও এ থেকে বুঝা যায় যে, মুর্শিদ কুলী খান বাংলায় আসার অব্যবহিত পরেই তিনি নিয়মিতভাবে রাজস্ব আদায়ের জন্য চেষ্টা করেছেন। তিনি খাজনা আদায়কারী জমিদারদেরকে রাজস্বের ইজারাদার হিসেবে গণ্য করতেন এবং পূর্বসূরী কিফায়েত খানের মত তিনিও চাইতেন যে, জমিদারগণ যেন প্রজাদের অধিকার এবং খাজনার হার সম্পর্কে প্রচলিত আইন-কানুন মেনে চলেন। এই তথ্য কনিকা এমন কোন ইঙ্গিত দেয় না যে, মুর্শিদ কুলী খান বাংলায় এসেই অবিলম্বে এমন কোন সূদূর প্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, যার দ্বারা একটি সম্পূর্ণ নতুন ভূমি বন্দোবস্ত চালু হল এবং পূরাতন জমিদারগণ উচ্ছেদ হয়ে গেলেন। তাঁর রাজস্ব সংক্রান্ত বহুল পরিচিত পদক্ষেপগুলোর অধিকাংশই তাঁর জীবনের শেষভাগে গৃহীত হয়েছিল; জমিদার উচ্ছেদের যে কয়টি সু-পরিচিত ঘটনা ঘটেছিল, তার অধিকাংশই ঘটেছিল তাঁর জীবনের শেষ ভাগে এবং তা এ কারণেই ঘটেছিল যে, হয় তারা রাজস্ব প্রদান করেন নি বা অবাধ্যতা দেখিয়েছিলেন। সলিমুল্লাহ বা আহকাম-ই-আলমগীরি এমন কোন প্রমাণ পেশ করেনি যা থেকে ধরে নেয়া যায় যে, প্রাচীন জমিদারদেরকে পরিকল্পনা মাফিক উচ্ছেদ করা হয়েছিল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুর্শিদ কুলী খানের সময়ে পদ্ধতিগতভাবে যাদেরকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল, তারা হচ্ছেন বাংলার মুসলিম জাগীরদার, তবে তাদেরকে বিকল্প হিসেবে কম উৎপাদনশীল এলাকা উড়িষ্যায় জাগীর দেয়া হয়েছিল। বাংলার এসব জাগীরের অধিকাংশকেই রাজকীয় খাস জমিতে পরিণত করা হয়েছিল।

তবে এগুলোর মধ্যে কিছু সংখ্যক জায়গীর থেকে রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্বও জমিদারদেরকে প্রদান করা হয়েছিল। কাজেই দেখা যাচ্ছে, এই জাগীরগুলো সরকারের অনুমানের বহির্ভূতই রয়ে গেছে। এমন কি মুর্শিদ কুলী খান বাংলায় আগমনের পূর্বে জমিদারগণ জমির মালিক ছিলেন বলে সরকারের যে ধারণা, তাও ঠিক নয়। তিনি অবশ্য তাদেরকে "প্রাচীন, ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু শাসক পরিবারের

---

৭১৭ এইচ,বি. ২য় খন্ড, পৃঃ ৪০৯-৪১০

৭১৮ পূর্ববর্তী পৃঃ ২৫১

বংশধর" বলে বর্ণনা করেছেন অথবা আরো বলেছেন যে, তারা হচ্ছেন, "মোগল শাসন কায়েম হওয়ার পূর্বের প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান শাসক গোষ্ঠীভুক্ত ও বংশানুক্রমিকভাবে নিয়োজিত কর্মকর্তা বা খেতাব প্রাপ্তদের উত্তর পুরুষ।"[৭১৯] এই কথা বলে তিনি যদি "বার ভূঁইয়া" বা অন্যান্য ছোট খাট সর্দারদের কথা বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে বলতে হয় যে, বাংলার কররাণী রাজ্যের (আফগান) ধ্বংসের উপরই তাদের উত্থান ঘটেছিল (কল্পনাশক্তি যত প্রসারিতই হোক না কেন, সেখানে এমন কিছুই অনুমান করা যায় না যে, বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে সেখানে কোন প্রাচীন হিন্দু শাসক পরিবার অবশিষ্ট ছিল), এই বিষয়টিও অবশ্যই সংগে সংগে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, হিজলীর আফগান সর্দার ব্যতীত অন্য সকল যথা- যশোরের প্রতাপাদিত্য, বরিশালের রামচন্দ্র, ভুলুয়ার (নোয়াখালীর) অনন্তমাণিক্য প্রমুখ সকলকেই ইসলাম খান চিশতীর সময়েই উৎখাত করে তাদের এলাকা মোগল শাসনভুক্ত করা হয়।[৭২০] এমনকি যাদেরকে ক্ষমা মঞ্জুর করা হয়েছিল বা পরে কারাগার থেকে মুক্ত করা হয়েছিল, তাদেরকেও মোগলদের অধিনে চাকুরীতে নিয়োজিত করা হয়েছিল। আগে অবশ্য, সরকার নিজেই "প্রতাপাদিত্য এবং অন্যান্যদেরকে কোন গোত্রীয় প্রধান বা প্রাচীন ক্ষয়িষ্ণু রাজ পরিবারগুলোর বংশধর নয়" বরং "বড়জোর তারা ছিলেন স্ফীত (অহংকার ও উচ্চাকাঙ্খায়) জমিদার।"[৭২১] যে শ্রেণীর লোকেরা পরবর্তী পর্যায়ে জমিদার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন, তারা হচ্ছেন একটি আলাদা শ্রেণীর লোক। তারা ছিলেন সত্যিকারভাবে রাজস্ব আদায়কারী এজেন্ট, আদায়কৃত রাজস্ব থেকে একটি নির্ধারিত হারে কমিশন পেতেন বা তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জমি বরাদ্দ পেতেন। তারা যে জমির রাজস্ব আদায় করতেন, তারা কখনো সে জমির মালিক বলে স্বীকৃত হতেন না। এই প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জাগীরদারগণ শাসন ব্যবস্থার প্রধান অবলম্বন হওয়া এবং বংশানুক্রমিকভাবে জাগীর ভোগ-দখল করা সত্ত্বেও তারা কখনো জাগীরের স্বত্ত্বাধিকারী বা মালিক বলে গণ্য হতেন না, তাদেরকে জাগীর থেকে উচ্ছেদ করা যেত, বিকল্প জাগীর দেয়া যেতো। যেমন মুর্শিদ কুলী খানের সময়ে তা বাস্তবেই দেয়া হয়েছিল। তাদেরকে তাদের জাগীরভুক্ত এলাকা হতে বিশেষ মূল্যায়নের ভিত্তিতে বা নির্ধারিত হারে রাজস্ব সংগ্রহ করতে হতো এবং তাদেরকে প্রদেয় তংখ্যা বা সম্মানীর চেয়ে বেশি আদায়কৃত রাজস্ব রাষ্ট্রের ফাণ্ডে জমা দিতে হত।

---

[৭১৯] এইচ,বি. ২য় খন্ড, পৃঃ ৪০৯

[৭২০] পুর্ববর্তী পৃষ্ঠ ২৫৪

[৭২১] এইচ,বি. ২য় খন্ড, পৃঃ ২৩৬ আরো দেখুন পুর্ববর্তী পৃষ্ঠ .. ..

মুর্শিদ কুলী খানের আমলসহ এই সমগ্র সময়ব্যাপী জাগীর ভূমির রাজস্বই ছিল সরকারের সমগ্র রাজস্বের মধ্যে বড় অংকের রাজস্ব এবং তা একটি স্বতন্ত্র হিসেবে সংরক্ষণ করা হত। জাগীরের ব্যাপারটি যখন এই রকম, তখন এইরূপ চিন্তা করার সুযোগ খুবই কম যে, মোগল সম্রাটগণ সৌজন্য দেখিয়ে বিপুল পরিমাণ জাগীর ভূমির মালিকানা জমিদারদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে দিতেন। সাংবিধানিকভাবে সম্রাটগণ জাগীর মঞ্জুর করতেন, আর সুবাদারগণ অথবা আরো সঠিকভাবে দীওয়ানগণ জমিদার নিয়োগ করতেন, যেহেতু তারা নিজেরাও জাগীরদার ছিলেন।[৭২২] রাজস্ব প্রশাসকদের পক্ষে জমিদারদেরকে কোন জমির মালিকানা মঞ্জুর করার ক্ষমতা ছিলনা। জমিদারদেরকে কর প্রদানকারী সীমান্তবর্তী রাজাদের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা ঠিক হবে না; যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কুচ-বিহার ও ত্রিপুরার রাজাগণ মুর্শিদ কুলী খানের সময়ও কর প্রেরণ করতেন বলে সলিমুল্লাহ উল্লেখ করেছেন।[৭২৩] তবে আসলে মুর্শিদ কুলী খান যা করেছেন, তা হল, যে সকল জমিদার কর প্রদান স্থগিত রেখেছিলেন বা তিনি খাজনার যে হার বেঁধে দিয়েছিলেন, তা মেনে চলতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন বা প্রজাদের উপর জুলুম করতেন বা যারা নিজেদেরকে অবাধ্য বা বিদ্রোহাত্মক প্রমাণ করেছিলেন, তিনি তাদেরকে উচ্ছেদ করেছিলেন। যেখানেই এইরূপ উচ্ছেদ ঘটাতেন, সেখানেই মুর্শিদ কুলী খান একজন মুসলমানের থেকেও একজন হিন্দুকে অগ্রাধিকার দিয়ে তাকেই জমিদারী বন্দোবস্ত দিতেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর এই নীতির কারণেই কয়েকটি বড় বড় হিন্দু জমিদারীর গোড়া পত্তন হয়।

অচিরেই এই জমিদরগণ অন্যান্য হিন্দু কর্মকর্তা ও বিত্তশালী শেঠদের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি প্রভাবশালী শ্রেণী হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং মুসলমান অভিজাত শ্রেণীকে পশ্চাতে ঠেলে দেয়। তবুও তারা ঠিক জমিদার ছিলেন না, “যাদের অবস্থানকে লর্ড কর্ণওয়ালিস বংশানুক্রমিকভাবে স্থায়িত্ব দান করেন।” এ প্রসঙ্গে অন্ততঃ তিনটি পার্থক্য অবশ্যই মনে রাখতে হবে। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে কর্ণওয়ালিস বন্দোবস্ত করেছিলেন এক শ্রেণীর রাজস্ব ইজারাদারদের সঙ্গে, যারা বংশানুক্রমিক জমিদার ছিলেন না, বরং ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের

---

৭২২ প্রদেশসমূহে নাযিম, দীওয়ান এবং অন্যান্য উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদেরকে জাগীর মঞ্জুর করা হতো, তারা সেখান থেকে তাদের বেতন আদায় করে নিতেন। এমনকি মুর্শিদ কুলী খানের সময়েও বাংলায় নাযিম এবং দীওয়ানের জাগীরে কোন হস্তক্ষেপ করা হয়নি। তবে অন্যান্য কর্মকর্তাদের জাগীরকে উড়িষ্যায় স্থানান্তর করা হয়

৭২৩ টি,বি. এফ ৩৬ এ

মধ্যে অনুষ্ঠিত নিলামসমূহে সর্বোচ্চ পরিমাণ রাজস্ব দেয়ার অঙ্গীকার করে এবং বংশানুক্রমিক জমিদারদেরকে অপসারণ করেই তারা জমিদারী লাভ করেছিলেন। মুর্শিদ কুলী খান বা অন্য কোন নওয়াবের অধীনে কখনো ভূমির রাজস্ব নির্ধারণের জন্য প্রকাশ্য কিংবা গোপনে নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি অথবা প্রকাশ্য কিংবা গোপনে সর্বোচ্চ নিলামের ভিত্তিতে কখনো জমিদারী-বন্দোবস্ত (রাজস্ব আদায়ের অধিকার প্রদান) করা হয়নি। দ্বিতীয়ত, নওয়াবদের অধিনে, বিশেষ করে মুর্শিদ কুলী খানের সময়ে কখনো জমিদারগণকে তাদের আওতাধীন জমির মালিক বলে গণ্য করা হয়নি, যদিও তাদের মধ্যে কেহ কেহ যেমন মোগল কর্মকর্তা ও জাগীরদারগণ উত্তরাধিকার সূত্রে এই অধিকার ভোগ করতেন। পক্ষান্তরে কর্ণওয়ালিসের বন্দোবস্তে অর্থাৎ ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের নিলামের ভিত্তিতে যারা খাজনা আদায়ের জন্য দশ বৎসরের মেয়াদে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন, তাদেরকেই জমির মালিক বলে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। তৃতীয়ত, কর্ণওয়ালিসের বন্দোবস্ত সবচেয়ে মারাত্মক যে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, তা হচ্ছে জমিদারদের নিকট হতে সরকারের রাজস্ব চিরস্থায়ীভাবে নির্ধারণ করে দেয়া এবং প্রজাদের নিকট হতে যত বেশি সম্ভব খাজনা আদায়ের জন্য জমিদারদেরকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া এবং এইভাবে খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে জমিদারদেরকে কোন আইনের বা আদালতের মাধ্যম ছাড়াই প্রজাদেরকে জমি হতে উচ্ছেদ করা, তাদেরকে নির্বিচারে বন্দী করা এবং তাদের মালামাল ক্রোক করে নেয়ার অধিকার দেয়া হয়।

অপরদিকে মুর্শিদ কুলী খানের অধিনে জমিদারগণকে সর্বোতভাবে শুধুমাত্র সরকার কর্তৃক কড়াকড়িভাবে নির্ধারণ করে দেয়া হারেই প্রজাদের নিকট হতে খাজনা আদায় করতে বলা হতো এবং প্রজাদের সহিত আচরণে কোন ভাবেই জমিদারদেরকে স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। মুর্শিদ কুলী খানের সময়ে আমরা প্রজাদেরকে নয়, শুধুমাত্র জমিদারদেরকে “বন্দী করা এবং ভূমি হতে উচ্ছেদ করার কথা শুনতে পাই। সেই প্রথার কোন কিছুর স্থায়ীত্বদান দূরে থাকুক, কর্ণওয়ালিসের বন্দোবস্ত পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণভাবে পাল্টে দেয়। তার এই বন্দোবস্ত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমিদারদেরকে নয়, বরং হঠাৎ গজিয়ে উঠা এক শ্রেণীর ভূঁইফোড় ইজারাদারকে জমির স্থায়ী মালিকে পরিণত করে এবং নওয়াবের অধীনে যে প্রজারা বাস্তবেই জমির সত্যিকার মালিক ছিলেন, তাদেরকে মধ্যযুগের শেষভাগে এবং আধুনিক যুগের প্রথমভাগে ইউরোপের সার্ফদের (ভূমিদাসদের) যে করুন অবস্থা ছিল, তাদের চেয়েও দূরাবস্থায় নিক্ষেপ করে। অনেক পরে বৃটিশ ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কর্ণওয়ালিসের বন্দোবস্তের এই মারাত্মক ভ্রান্তি উপলব্ধি

করেন এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে এই ব্যবস্থার সবচেয়ে ক্ষতিকর কয়েকটি দিক সংশোধন, জমিদারের ক্ষমতা খর্ব এবং প্রজাদের দূরাবস্থাকে কিছুটা লাঘব করার চেষ্টা করেন। তখন জমিদারগণ তাদের এই কায়েমী স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার জন্য এই যুক্তি বলে চেষ্টা করে যে, তাদের এই মালিকানাস্বত্ত্ব এবং অন্যান্য "অধিকার" ঐতিহাসিকভাবেই নওয়াবদের আমল থেকে চলে আসছে। মনে হচ্ছে যদুনাথ সরকারের বক্তব্য আহকাম-ই-আলমগীরীর অত্যন্ত স্পষ্ট সাক্ষ্যের বিপরীত। উনবিংশ শতাব্দীর জমিদারদের আত্মপক্ষ সমর্থনে পেশকৃত বক্তব্য সত্য উদঘাটনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে।

৫. মুর্শিদ কুলী খান এবং ইউরোপীয় বণিক

যে সকল ইউরোপীয় বণিক আগের থেকে বাংলায় বাণিজ্য করতেন, যথা দিনেমার, ওলন্দাজ, ইংরেজ এবং ফরাসী; তারা সকলেই মুর্শিদ কুলী খানের সময়েও বাণিজ্য করেছেন, তবে একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে দিনেমারগণ, যারা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিবাদ করে ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দে এদেশ ত্যাগ করেন। অন্যদিকে মুর্শিদ কুলী খানের শাসনকালের শেষের দিকে এদেশে অষ্টেণ্ডারদের আগমন ঘটে, তবে তারা ইংরেজ ও ওলন্দাজদের যৌথ বিরোধিতার সম্মুখীন হয়।

সাধারণভাবে এইসব বিদেশী বণিকদের সঙ্গে মুর্শিদ কুলী খানের সম্পর্ক তাদের থেকে নিয়মিতভাবে শুল্ক আদায়ের বিবেচনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। কাজেই, এই ব্যাপারে তাঁর পূর্বসুরীদের নীতির যে বৈশিষ্ট্য ছিল, তাঁর নীতিও ছিল প্রায় একই ধরণের। কারো প্রতি কোন বিশেষ অনুগ্রহ না দেখিয়ে তিনি তাদের সকলের প্রতি সমব্যবহার করতেন, যদিও বাংলায় তাঁর আসার পূর্ব থেকেই ইউরোপীয় জাতিসমূহের দ্বারা ভোগকৃত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে যে পার্থক্য বিরাজ করত, সেজন্য তিনি তাদের সকলের নিকট থেকে সমহারে শুল্ক আদায় করেননি বা করতে পারেননি। ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে যে শত্রুতা ও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ছিল, তাও কিছুটা জটিলতা সৃষ্টি করেছিল। সে সময় যে তিনটি প্রধান ইউরোপীয় জাতি বাংলায় বাণিজ্য করত, তাদের মধ্যে ওলন্দাজ এবং ফরাসীরা তাদেরকে প্রদত্ত মঞ্জুরী অনুযায়ী স্বাভাবিক শুল্ক প্রদান করেই বাণিজ্য করত এবং যখনই কোন শাসনকর্তার পরিবর্তন ঘটতো, তখনই তারা নতুন শাসন কর্তার নিকট হতে তাদের জন্য নতুনভাবে মঞ্জুরী নিয়ে তাদের অবস্থানকে নিয়মিত হাল-নাগাদ করে রাখতো। এইভাবে ওলন্দাজরা ৩.৫% ভাগ হারে শুল্ক দিয়ে মোগল সাম্রাজ্যে বাণিজ্য করার জন্য ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট হতে

যে ফরমান লাভ করেছিল, তারা সে অনুযায়ী শুল্ক দিয়ে ১৭০১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাদের বাণিজ্য অব্যাহত রাখে। কিন্তু তখন ভারত মহাসাগরে মোগলদের বাণিজ্য জাহাজে ইউরোপীয়রা নির্বিচারে জলদস্যুতা করার অভিযোগের ভিত্তিতে আওরঙ্গজেব ইউরোপীয়দের বাণিজ্যের উপর সাধারণভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়ার পরে ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে ওলন্দাজরা তাদের আগের সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তাসহ মুর্শিদ কুলী খানের নিকট হতে নূতনভাবে আরেকটি পরওয়ানা লাভ করে।[৭২৪] তদুপরি, যখন বাহাদূর শাহ সিংহাসনে আরোহন করেন, তখন তাঁর দ্বিতীয় বৎসরে অর্থাৎ ১৭০৮ খ্রিস্টাব্দে ওলন্দাজরা তাঁর নিকট হতে মোগল সাম্রাজ্যে বাণিজ্য করার জন্য নূতনভাবে ফরমান লাভ করেন। এই ফরমান তাদের প্রদেয় বাণিজ্য শুল্ক ৩.৫% ভাগ থেকে ২.৫% ভাগে হ্রাস করে দেয়[৭২৫]এবং এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তারা বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যায় বাণিজ্য করার জন্য প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের নিকট হতে আরো দুটি পরওয়ানা লাভ করে। একটি তৎকালীন দিওয়ান জিয়া উল্লাহ খানের নিকট হতে এবং আরেকটি নায়েব সূবাদার সায়িদ হুসেন আলী খানের নিকট হতে।[৭২৬] আবার যখন জাহান্দার শাহ এবং ফাররুখ সিয়ার সিংহাসনে আরোহন করেন, তখন তারা তাদের প্রত্যেকের নিকট হতে নতুনভাবে একটি করে ফরমান লাভ করে এবং তাদের ভোগকৃত সুযোগ-সুবিধার[৭২৭] নিশ্চয়তাসহ মুর্শিদ কুলী খানের নিকট হতেও একটি পরওয়ানা লাভ করে।[৭২৮]

ইংরেজদের তুলনায় ব্যতিক্রমভাবে বেশি আলাপ-আলোচনা ছাড়াই তারা এইসব মঞ্জুরী লাভ করে এবং এই ধরনের কাজের উপর যে অর্থ স্বাভাবিকভাবে প্রদেয়, তা পরিশোধ করেই তারা তা লাভ করেন। যদিও ঠিক কি পরিমাণ অর্থ দেয়া হয়েছিল, ঐ সব সূত্র থেকে তা সন্তোষজনকভাবে নির্ণয় করা যাচ্ছে না।

অনুরূপভাবে ফরাসীরাও ১৬৯২-১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট হতে একটি ফরমান লাভ করে এবং তাদেরকেও ওলন্দাজদের মতই ৩.৫ ভাগ হারে শুল্ক প্রদানের শর্ত দেয়া হয়। মুর্শিদ কুলী খানের আমলে তারা ১৭১৮ খ্রিস্টাব্দে অন্ততঃ একবার সম্রাট ফাররুখ সিয়ারের নিকট হতে তাদের ভোগকৃত

---

৭২৪ উইলস, প্রথম খন্ড, পৃঃ ১৭০।

৭২৫ বৃটিশ মিউজিয়াম, এডি. এম এস এস, ২৯০৯৫ পৃঃ ৪১-৪২, করিম কর্তৃক উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত পৃঃ ১৯৬।

৭২৬ এফ, ডব্লিউ, ষ্টিপেল, করপাস ডিপ্লোমেটিকাস নেদারল্যান্ডো ইন্ডিকাম, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ২৯২-২৯৮, উইলসনর কর্তৃক উদ্ধৃত পৃঃ ১৯৫-১৯৬।

৭২৭ ঐ, পূর্বোক্ত পৃঃ ১৯৮ ।

৭২৮ ঐ, পৃঃ ১৯৯।

সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তাসহ নতুনভাবে আরেকটি ফরমান এবং ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদ কুলী খানের নিকট হতে একটি নতুন পরওয়ানা নিয়েছিলেন।[৭২৯] ওলন্দাজদের মত ফরাসীদের জন্যও শুল্কের হার ৩.৫% ভাগ থেকে হ্রাস করে ২.৫% ভাগ করা হয়। তবে বাংলায় ফরাসীদের বাণিজ্য ওলন্দাজ বা ইংরেজদের বাণিজ্যের মত প্রসার লাভ করেনি।

ইংরেজরা ইতিমধ্যে সম্রাট আওরঙ্গজেবের ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দের ফরমানের বদৌলতে নিজেদেরকে বাংলায় ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহ প্রাপ্ত জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং এখন তারা এই সকল সুযোগ-সুবিধা আরো সম্প্রসারণ করার জন্য চেষ্টা করে; ফলে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাদের দেন-দরবার দীর্ঘদিন পর্যন্ত চলতে থাকে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রদত্ত ফরমান দ্বারা তাদেরকে বৎসরে মাত্র ৩০০০.০০ টাকা প্রদানের বিনিময়ে বাংলা এবং উড়িষ্যায় শুল্ক-মুক্তভাবে বাণিজ্য করার অনুমতি দেয়া হয় এবং জাহাজে পরিবহনকৃত মালামাল কোম্পানীর মালামাল বলে তাদেরকে দস্তক (ছাড়পত্র) প্রদানের জন্য সুযোগ দেয়া হয়। তারা কলিকাতা, সুতানুটি এবং গোবিন্দপুর নামক তিনটি গ্রামের জমিদারী স্বত্বও লাভ করে এবং সেখানকার বসতিকে সুরক্ষিত করে গড়ে তোলে। মুর্শিদ কুলী খানের সময়ে তারা প্রাথমিক কিছু অসুবিধা কাটিয়ে উঠে নিজেদের অবস্থানকে আরো উন্নত করে এবং এই সময়ের পরে তারা বাংলার রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করার জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী ইউরোপীয় জাতিতে পরিণত হয়।

(ক) ইংরেজদের প্রাথমিক অসুবিধাসমূহ

মুর্শিদ কুলী খানের শাসনের প্রথম দিকে ইংরেজরা বাংলায় যে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল, তা ছিল তাদের নিজেদেরই সৃষ্ট। ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে রাজা তৃতীয় উইলিয়াম নতুন কোম্পানীর উদ্যোক্তাদের নিকট হতে একটি মোটা অংকের ঋণ পেয়ে পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য করার জন্য তাদেরকে একটি সনদ (Charter) প্রদান করেন, যার নাম নির্ধারিত হয় "দি ইংলিশ কোম্পানী ট্রেডিং টু দি ইষ্ট ইণ্ডিজ" এবং পূরাতন কোম্পানীকে একটু পরিমিত "দ্যা লণ্ডন কোম্পানী" নাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেন। ইংরেজ রাজ নতুন কোম্পানীর জন্য বাণিজ্য সুবিধা আদায় এবং পূর্ব ভারতে ইংরেজ জাতির প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি

---

[৭২৯] পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৫-১৯৬।

লাভের জন্য স্যার উইলিয়াম নরিসকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে মোগল দরবারে প্রেরণ করেন।[৭৩০] একই সময়ে স্যার এডওয়ার্ড লিটলটনের নেতৃত্বে নতুন কোম্পানীর এজেন্টগণ বাংলায় এসে পৌঁছেন এবং সুবাদার শাহজাদা আজীমুদ্দীনকে মোটা অংকের অর্থ দিয়ে তাঁর নিকট হতে "অনধিকার প্রবেশকারীদেরকে প্রদত্ত শর্তের অনুরূপ শর্তে অর্থাৎ প্রতিটি জাহাজের জন্য পণ্য দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি লাভের লক্ষ্যে তিন হাজার টাকা প্রদান এবং এক বৎসরের মধ্যে (১৬৯৯-১৭০০) রাষ্ট্রদূত যদি ফরমান সংগ্রহ করতে অপারগ হন, তাহলে ছয় হাজার টাকা জামানত দেয়ার শর্তে" নতুন কোম্পানীর জন্য বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ করে।[৭৩১]

সে বৎসর এমনকি তার পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যেও ফরমান লাভ করা সম্ভব হয়নি; আওরঙ্গজেবের দরবারে নরিসের দূতিয়ালী ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণ ছিল ভারত মহাসাগরে মোগলদের জাহাজের উপর নির্বিচারে জলদস্যুদের আক্রমণ। অভিযোগ করা হতো যে, জলদস্যুতার সঙ্গে ইংরেজরাও জড়িত এবং নুতন কোম্পানীর সুরাটের প্রেসিডেন্ট এই অভিযোগটি মোটামুটি নিশ্চিত করেন। তিনি মোগল সরকারকে অবহিত করেন যে, পুরাতন কোম্পানীর কর্মচারীরাই এই ধরণের জলদস্যুতার জন্য দায়ী।[৭৩২]

ফলে সম্রাট নতুন কোম্পানীর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, উইলিয়াম নরিসের কোন কিছু অর্জিত হওয়ার পূর্বেই তাকে দরবার হতে বিদায় করে দেন এবং অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ১৭০১ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে একটি সাধারণ ঘোষণা জারী করে মোগল সাম্রাজ্যের সাথে ইউরোপীয়দের ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ করে দেন। তবে এই নিষেধাজ্ঞা বাংলায় আংশিকভাবে বলবৎ করা সম্ভব হয়েছিল, বিশেষ করে ইংরেজদের ক্ষেত্রে। কারণ তারা কলিকাতায় নিজেদেরকে দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত করে তুলেছিল এবং হুগলী নদীর প্রবেশ পথ তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। আবার ঠিক এই সময়ে দীওয়ান (মুর্শিদ কুলী খান) এবং নাযিম (শাহজাদা আজীমুদ্দীন) নগদী সৈন্যদের বিষয়টি নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন।[৭৩৩] ফলে,

---

৭৩০ ব্রুস, ৩য় খন্ড, পৃঃ ২৮১।

৭৩১ ব্রুস, তয় খন্ড, ৪১৫, ৪৫০। বর্ণিত আছে যে, সুবাদার ৭০০০.০০ টাকা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে আরো অধিক সুযোগ সুবিধার জন্য এর চেয়ে অনেক কম পরিমাণ টাকা দিতে ইংরেজদের অনিচ্ছা থেকে এই পরিমাণ অর্থ অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। খুব সম্ভব এই পর্যায়ে ১৫০০০.০০ টাকা দেয়া হয়েছিল। দেখুন পরবর্তী পৃষ্ঠা ২৬১। আরো দেখুন এইচ. এম.এস ৬২৮(২১৩)

৭৩২ ঐ পৃঃ ৩২৪-৩২৮।

৭৩৩ পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা ২২৭।

তারা ইংরেজদের দিকে সম্মিলিতভাবে দৃষ্টি দিতে পারেননি। কাজেই, তাদের দূরবর্তী পাটনা, রাজমহল এবং কাশিম বাজারের মত কয়েকটি কুঠি বন্ধ করে দেয়া হলেও হুগলীর ফৌজদার কলিকাতার ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। এমন কি কোম্পানীর নৌকাসমূহকে নদী পথে চলাচলে বাধা প্রদানের প্রচেষ্টাও পরিত্যাগ করতে হয়। কারণ বাধা দিলে কলিকাতার উজানে বা ভাটিতে মোগলদের জাহাজ চলাচলের পথে ইংরেজরাও পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যদিও মুর্শিদ কুলী খান সম্রাটের আদেশ বাস্তবায়নে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু শাহাজাদা আজীমুদ্দীন ইংরেজদের পক্ষে হস্তক্ষেপ করেন। যাহোক, অল্প সময় পরেই এই অপ্রীতিকর অবস্থার অবসান ঘটে, যখন ১৭০২ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে সম্রাট তাঁর বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেন।

এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের অল্প আগে ১৭০২ খ্রিস্টাব্দের ২২ শে জুলাই ইংল্যাণ্ডে ইংরেজ কোম্পানী ২টি একটি "চার্টার অব ইউনিয়নের" মাধ্যমে একীভূত হয়ে যায় এবং "দ্যা ইউনাইটেড কোম্পানী অব মার্চেন্টস অব ইংল্যাণ্ড ট্রেডিং টু দ্যা ইস্ট ইণ্ডিজ" (The United Company of Merchants of England Trading to the East Indies) এই নতুন নামকরণ করে। নরিসের দূতিয়ালীতে ব্যর্থতা এবং এই অঞ্চলে একই জাতির একাধিক স্বতন্ত্র কোম্পানী থাকার ফলে উদ্ভুত সমস্যা সমূহের নিরসন কল্পে এই একত্রীকরণ সাধিত হয়। পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, যেহেতু পুরাতন কোম্পানী বাংলায় বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা অর্জন করেছিল, তাই একীভূত কোম্পানীও সে সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে বলে তারা আশা করেছিলেন। অতএব, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়ার পরে বাংলায় ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে উভয় কোম্পানীর প্রতিনিধিরা সেখানেও একত্রীকরণ কার্যকরী করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। অন্যদিকে মুর্শিদ কুলী খান ইউরোপীয় বণিকদেরকে তাদের স্বাভাবিক বাণিজ্যিক কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার অনুমতি দিলেও তাদের নিকট থেকে শুল্কসহ অন্যান্য যে সকল বকেয়া পাওনা রয়েছে, তা প্রদানের দাবী জানান। ইংরেজদের নিকট হতে দাবীকৃত অর্থের সঠিক পরিমাণ সম্পর্কে দু'টি কোম্পানীর নথি-পত্রে[৭৩৪] বিভিন্ন অংকের উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই প্রদান করা হয়নি।[৭৩৫]

---

৭৩৪ পূরাতন কোম্পানীর এজেন্ট এই পরিমাণ ২০,০০০.০০ টাকা বলে উল্লেখ করেছেন, আর নতুন কোম্পানীর এজেন্ট বলেছেন ১৫,০০০.০০। ব্রুস, প্রথম খন্ড, পৃঃ ৫০৭ এবং ৫২৫।

৭৩৫ এই বিষয়ে পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ দেখুন। ব্রুসের একটি অস্পষ্ট মন্তব্যের (পৃঃ ১৫২৫) উপর ভিত্তি করে ডঃ আব্দুল করিম বলেছেন যে, নতুন কোম্পানী "শাহাজাদা আজীমুদ্দীনকে প্রকৃত পক্ষে ১৫,০০০.০০ টাকা প্রদান করে এবং তার নিকট হতে পুরাতন কোম্পানী যে শর্তে বাণিজ্য করত,

তবে আরো অন্যান্য জরুরী রাজস্ব বিষয়ের দিকে এই সময় মুর্শিদ কুলী খানের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। তিনি সেসব সমাধান করে ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সম্রাট আওরঙ্গজেবের দরবারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের পূর্বে তিনি বাংলায় ফিরে অসেননি। তাঁর এই অনুপস্থিতির সময়ে দুই ইংরেজ কোম্পানীর প্রতিনিধিগণ বাংলায় তাদের একত্রীকরণ সম্পন্ন করে ফেলেন।[৭৩৬]

যখন মুর্শিদ কুলী খান বাংলায় ফিরে আসেন, তখন ইংরেজরা তাঁর নিকট নতুনভাবে একটি পরওয়ানা প্রদান করে একীভূত কোম্পানীকে পুরাতন কোম্পানীর উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি দান এবং তাদের প্রাপ্য বাণিজ্যিক সুবিধা সম্প্রসারণ করে বাংলা ও উড়িষ্যার সঙ্গে বিহারকেও অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনুরোধ জানায়।[৭৩৭] মুর্শিদ কুলী খান সঙ্গে সঙ্গে এই স্বীকৃতি দেননি এবং উভয় কোম্পানীর নিকট থেকে ইতিমধ্যে যে টাকা পাওনা রয়েছে তা প্রদান করার জন্য দাবী জানান। ইংরেজদের দলিল পত্রে স্পষ্টভাবে কোন খাতের উল্লেখ নেই যে, কি জন্য তাদের নিকট হতে টাকা দাবী করা হয়েছিল। কিন্তু প্রতীয়মান হচ্ছে যে, পুরাতন কোম্পানী কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য প্রদেয় পেশকাশ এবং নূতন কোম্পানী যদি ১৬৯৯-১৭০০ সালের মধ্যে তাদের অনুকূলে কোন ফরমান সংগ্রহে ব্যর্থ হয়, তাহলে সে বৎসরের জন্য শুল্ক হিসেবে প্রদেয় টাকা- এই উভয় ধরণের টাকাই তিনি দাবী করে থাকবেন। মুর্শিদ কুলী খান উল্লেখ করেন যে, ১৬৯০ সালে আওরঙ্গজেব কর্তৃক প্রদত্ত ফরমান এবং এর উপর ভিত্তি করে তৎকালীন বাংলার দীওয়ান কিফায়েত খান কর্তৃক প্রদত্ত পরওয়ানা শুধু বাংলা ও

সেই একই রকম শর্তাধীনে বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ করে।" একটু পরেই একত্রীকরণের আগে দু'টি কোম্পানীর অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ডঃ করিম আরো মন্তব্য করেছেন।"১৭০২ খ্রিস্টাব্দে নতুন কোম্পানী সুবাদারকে ১৫,০০০.০০ টাকা দিয়ে একই রকম সুযোগ-সুবিধা লাভ করে।" (ঐ, পৃঃ ১০৯) নতুন কোম্পানী বাণিজ্য করার অনুমতি লাভের জন্য শাহজাদাকে যে একবার মাত্র অর্থ প্রদান করেছিল, তা মনে হয় সম্রাট কর্তৃক বাণিজ্যের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পূর্বে। দূত হিসেবে তখন নরিস সম্রাটের দরবারে অবস্থান করছিলেন। ১৭০২ খ্রীস্টব্দে বাণিজ্য করার অনুমতি চাওয়া বা দেয়া সম্ভব ছিল না, যেহেতু ১৭০২ খ্রীস্টাব্দ শেষ হওয়ার আগে বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়নি এবং যেহেতু তার অল্প আগেই নতুন কোম্পানী শাহজাদাকে অর্থ দিয়ে বাণিজ্য করার জন্য তার অনুমতি লাভ করেছিল। এমন কি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়ার পর নতুন কোম্পানী আর স্বতন্ত্রভাবে বাণিজ্য করার অনুমতি চাইতেও পারেনা। যেহেতু ইতিমধ্যেই দুই কোম্পানী ১৭০২ খ্রীস্টাব্দের ২২ শে জুলাই ইংল্যান্ডে একীভূত হয়ে গিয়েছিল এবং বাংলায়ও একত্রীকরণ সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ এসে পৌঁছেছিল। খুব সম্ভব শুধু মাত্র প্রথম বারই শাহজাদাকে ১৫,০০০.০০ টাকা দেয়া হয়েছিল, অতিরঞ্জিত করে বলা ৭০,০০০.০০ টাকা দেয়া হয়নি।

[৭৩৬] কনসাল্টেশন্স ২৪ শে ফেব্রুয়ারী, ১৭০৪, উইলসন, প্রথম খন্ড, পৃঃ ২৫২-২৫৩।

[৭৩৭] কনসাল্টেশন্স ১৪ ই জুন, ১৭০৪।

উড়িষ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অতএব, ইংরেজরা যদি এই সুযোগ-সুবিধা বিহার পর্যন্ত সম্প্রসারণ চান, তাহলে এই ব্যাপারে তাদেরকে সম্রাটের নিকট থেকে ফরমান সংগ্রহ করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে মুর্শিদ কুলী খানের সঙ্গে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা অসমাপ্তভাবে চলতে থাকে।[৭৩৮] স্বাভাবিকভাবেই প্রতি বৎসর জাহাজে মাল তোলার মৌসুমে এই আলাপ-আলোচনা জোরালো হয়ে উঠে, কেন না ইংরেজরা আশংকা করতো যে, দীওয়ানের দাবী পূরণ করা না হলে তিনি তাদের মাল-সামগ্রী জাহাজে উঠাতে দিবেন না। সে যাহোক, মুর্শিদ খুলী খান কখনো এইরূপ জবরদস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি এবং ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজদের বিভিন্ন কুঠি হতে এমনকি বিহারের পাটনা থেকেও মালপত্র যথাযথভাবেই পরিবহণ করা হত এবং পুরাতন কোম্পানী বৎসরে যে তিন হাজার টাকা পেশকাশ দিত, তা একমাত্র হুগলীতে দিয়েই তারা তাদের মালামাল জাহাজে উঠাতো।[৭৩৯]

এতএব, দেখা যাচ্ছে যে, মুর্শিদ কূলী খান যদিও দু'টি কোম্পানীর একীভূত হয়ে যাওয়াকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেননি, তিনি মৌনভাবে একীভূত কোম্পানীকে পুরাতন কোম্পানীর উত্তরাধিকারী হিসেবে বাণিজ্য করা এবং বিহার পর্যন্ত তাদের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের অনুমতি দিয়েছেন।

৬. বাংলা থেকে মুর্শিদ কুলী খানের অন্তর্বর্তীকালীন অনুপস্থিতি (১৭০৮-১৭১০খ্রিঃ)

১৭০৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায় এবং ইংরেজদেরসহ অন্যান্য বিদেশী বণিকদের ভোগকৃত সুযোগ-সুবিধা নতুন সম্রাটের দ্বারা অনুমোদনের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং অল্প পরে মুর্শিদ কুলী খান নিজেও বাংলা থেকে বদলী হয়ে যান। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যে উত্তরাধিকার যুদ্ধ সংঘটিত হয়, ইংরেজরা সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে কলিকাতায় নিজেদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে। তাদের নথিপত্রে পাওয়া যায় "সম্রাটের ইন্তিকাল হওয়ায় আমাদের দুর্গকে শক্তিশালী করার জন্য এটাই

---

৭৩৮ এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন আব্দুল করিম, পূর্বোক্ত পৃঃ ১১১-১২০।

৭৩৯ আব্দুল করিম, পূর্বোক্ত পৃঃ ১২০-১২৪। আরো দেখুন কন্সাল্টেশন্স ৩রা এবং ১৬ই এপ্রিল, ১৭০৪ এবং ২৬ শে এপ্রিল, ১৭০৫, ২২ শে এপ্রিল, ১৭০৬।

সর্বোত্তম সময়। যেহেতু এখন একটি অন্তবর্তীকালীন সময় চলছে, আমরা কি করছি, সেদিকে নজর রাখার মতও কেউ নেই।" তাই তারা কলিকাতায় তাদের দুর্গকে আরো সম্প্রসারণ এবং শক্তিশালী করে তোলে।[৭৪০] উত্তরাধিকার যুদ্ধের অবসান এবং বাহাদুর শাহের সিংহাসনে আরোহনের পরে ১৭০৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে জিয়াউল্লাহ খান বাংলায় নতুন দীওয়ানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর নির্দেশে হুগলীর ফৌজদার বাণিজ্য করার জন্য ইংরেজদের নতুন করে সনদ বা অনুমতি লাভ না করা পর্যন্ত স্থানীয় বণিকদেরকে তাদের সঙ্গে কোন বাণিজ্যিক কাজ কারবার না করার নর্দেশ দেন।[৭৪১] তারপর ইংরেজগণ দীওয়ানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন এবং হুগলীর ফৌজদারকে তার বিরোধীতা থেকে নিবৃত করার জন্য আলোচনার অগ্রগতি সম্পর্কে তাকে অবহিত করতেন।[৭৪২] মনে হচ্ছে ফৌজদার তার বিধিনিষেধ শিথিল করেছিলেন। তবে দীওয়ানের সঙ্গে এই আলাপ-আলোচনা অনেক দিন পর্যন্ত চলতে থাকে; দীওয়ানেরও চেষ্টা ছিল যতটা বেশি নেয়া যায়। আর স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজদের চেষ্টা ছিল যত কম দিয়ে পারা যায়। মোগলদের দিক হতে আমাদের নিকট কোন তথ্য নেই। কিন্তু ইংরেজদের ওয়াকিল (আলোচক) এই অর্থের বিভিন্ন পরিমাণ যথা ৩৫,০০০.০০ টাকা হতে ১,৫০,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন।[৭৪৩] তবে ইংরেজদের দলিল পত্র থেকেই দুটি বিষয় পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে। প্রথমত- অন্যান্য ইউরোপীয় বণিক যথা ওলন্দাজরা দ্রুতভাবে ৩৫,০০০.০০ টাকা দিয়ে দীওয়ানের নিকট থেকে নতুনভাবে সনদ নিয়ে আইনগত প্রয়োজন পূরণ করে।[৭৪৪] এখানে বিবেচনা করার বিষয় হচ্ছে এই যে, সে সময় যেহেতু বাংলায় ইংরেজদের বাণিজ্য কোনভাবে ওলন্দাজদের চেয়ে বেশি ছিল না, তাই এটা অস্বাভাবিক যে, তাদের নিকট থেকে ওলন্দাজদের চেয়ে বেশি অর্থ দাবী করা হবে। দ্বিতীয়ত- ইংরেজরা মোগল সম্রাজ্যের ক্রমাবনতি এবং কলিকাতায় নিজেদের শক্তিশালী অবস্থান সম্পর্কে সচেতন থেকেই আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কাজেই তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই তাদের আলোচনা দীর্ঘায়িত করে এবং হুগলীর ফৌজদার যদি তাদের মালামাল চলাচলের পথে "বাধা" সৃষ্টি করে (তাদের ভাষায়) তাহলে তারা আশা করতো যে, শক্তি প্রয়োগ করলে বা প্রয়োগ করার হুমকি দিলে তিনি তাদের মালামাল জাহাজে চালান করার জন্য ছাড়পত্র দিয়ে দিবেন।

---

[৭৪০] কনসাল্টেশনস. ২৮শে এপ্রিল. ১৭০৮।

[৭৪১] কনসাল্টেশনস. ১৯শে এপ্রিল এবং ১৩ জুলাই. ১৭০৮।

[৭৪২] কনসাল্টেশনস. ২৬শে এপ্রিল. ১৭০৮।

[৭৪৩] কনসাল্টেশনস. ৯ আগস্ট,২৭ শে অক্টোবর. ২৭ নভেম্বর. ১৭০৮।

[৭৪৪] কনসাল্টেশনস. ৯ আগস্ট, ১৭০৮।

১৭০৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে যখন ইংরেজদের স্থানীয় এজেন্টগণ শুল্ক পরিশোধ না করে কোম্পানীর মালামাল ছাড় করার চেষ্টা করেন, তখন ফৌজদার তাদেরকে আটক করেন। আর এই অবস্থায় কলিকাতায় ইংরেজ কাউন্সিল যে কোন জরুরী অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য নিরাপত্তা রক্ষীদেরকে প্রস্তুত হতে নির্দেশ দেয় এবং ফৌজদারের যে কোন ঔদ্ধত্য আচরণকে প্রতিরোধ করার জন্য "সকল ইউরোপীয় খ্রিস্টান অধিবাসীদেরকে এবং জাহাজের মালিকদেরকে তাদের জাহাজসহ অথবা" কোন কারণ ঘটলে তার বিরুদ্ধে যা কিছু প্রয়োজন, তা করার জন্য হুগলীতে তলব করে।[৭৪৫] নায়েব সুবাদারের দু'জন অফিসারের মধ্যস্থতায় এই অবস্থা শান্ত হয় এবং তারা একদিকে ইংরেজদেরকে হুগলীতে কোন জাহাজ প্রেরণ না করতে রাজী করায় এবং অন্যদিকে ফৌজদারকে রাজী করায় ইংরেজদের লোকজনকে মুক্তি দিতে ও মালামাল ছেড়ে দিতে। ফৌজদার সে অনুযায়ী কাজ করেন এবং দীওয়ানের নিকট হতে সনদ সংগ্রহ করার জন্য তাদেরকে (ইংরেজদেরকে) আরো একমাস সময় দেন।[৭৪৬] এই সময়ের মধ্যেও দীওয়ানের সঙ্গে আলাপ -আলোচনায় কোন ফল লাভ হয়নি। আবার ১৭০৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে হুগলীতে সমস্যা সৃষ্টি হয়। তখন ইংরেজরা আরও ব্যাপকভাবে শক্তির মহড়া দেখায় এবং "গ্রেট ব্রিটেনের সকল নাগরিক" যারা স্থানীয় জাহাজে (মুসলমান এবং হিন্দুদের জাহাজ) চাকুরী করত তাদের সকলকে "অবিলম্বে রাজার পতাকা তলে এবং গ্রেট ব্রিটেনের কলিকাতাস্থ বসতিতে এসে যোগ দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।"[৭৪৭] আবার এই শক্তি প্রদর্শনীতে কাজ হয়। ফৌজদার নতি স্বীকার করেন এবং তিনি নিজেই সুবাদার এবং দীওয়ান উভয়ের নিকট হতে প্রয়োজনীয় মঞ্জুরী সংগ্রহের জন্য আলাপ-আলোচনা করবেন, যদি ইংরেজরা ৩৫,০০০.০০ টাকা প্রদান করে।[৭৪৮] জওয়াবে ইংরেজরা জানায় যে, তারা এই পরিমাণ অর্থ প্রদান করবে শুধু মঞ্জুরী পাওয়ার পরে।[৭৪৯]

ইংরেজরা বার বার শক্তি প্রদর্শন এবং তাদের অবস্থানকে আইন সিদ্ধ করাতে দৃশ্যত তাদের ইচ্ছাকৃত বিলম্ব নায়েব সুবাদার শাহজাদা ফাররুখ সিয়ারকে ধৈর্যহীন করে তোলে এবং এবার তিনি নিজেই ব্যাপারটি হাতে নেন। কলিকাতায় ইংরেজদের শক্তিশালী অবস্থান এবং তাদের চাপের মুখে হুগলীর

---

৭৪৫ কনসাল্টেশনস, ৫ই এবং ১০ই জুলাই, ১৭০৮।

৭৪৬ কনসাল্টেশনস, ১২ এবং ২৬শে জুলাই, ১৭০৮।

৭৪৭ কনসাল্টেশনস, ২২শে নভেম্বর, ১৭০৮।

৭৪৮ কনসাল্টেশনস, ২৭শে নভেম্বর, ১৭০৮।

৭৪৯ কনসাল্টেশনস, ২৭শে নভেম্বর, ১৭০৮।

ফৌজদারের অরক্ষিত অবস্থা উপলব্ধি করে শাহাজাদা পাটনা থেকে আসা ইংরেজদের নৌকা রাজমহলে আটক করেন এবং সেখানকার ইংরেজ কুঠিয়ালদের বন্দী করেন। যেহেতু সেখানে ইংরেজদের যুদ্ধ জাহাজ বা সৈন্য প্রেরণ সম্ভব ছিল না। তার পর শাহজাদা শুল্ক হিসেবে তাদের অবিলম্বে ১৪,০০০.০০ টাকা দাবী করেন এবং ইংরেজদেরকে জানিয়ে দেন যে, হুগলীর ফৌজদারের এ বিষয়ে শালিসী করার কোন অধিকার নেই।[৭৫০] প্রথমে ইংরেজরা নতি স্বীকার না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দাবীকৃত অর্থ প্রদান করতে বাধ্য হয় এবং তাদের মালামাল ও কুঠিয়ালকে মুক্ত করে আনে।[৭৫১] শাহাজাদার এই কাজের প্রতিশোধ নিতেই যেন এর অল্প কাল পরে ইংরেজরা কলিকাতার নিকটবর্তী খিজিরপুর শুল্ক আদায় কেন্দ্রে "দূর্ব্যবহার" ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে "অপমান" করার অভিযোগে ৩০ জন সৈন্য ২০ জন কালো বন্দুকধারীকে প্রেরণ করে এবং তারা কেন্দ্রটিকে তছনছ করে কমপক্ষে ছয় জন কর্মচারীকে ধরে নিয়ে যায় এবং তাদেরকে কঠোরভাবে প্রহার করে এবং শাস্তি দেয়।[৭৫২] ইংরেজদের এইরূপ ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ মনে হয় চুপিসারে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়; তার কারণ সম্ভবত এই যে, এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই শাহাজাদা ফাররুখ সিয়ারের বাংলা থেকে প্রস্থান।

শাহাজাদা ফাররুখ সিয়ারের উত্তরসূরী সারবুলান্দ খান ১৭০৯ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে বাংলায় এসে পৌঁছেন। ইংরেজগণ তাঁকে মাত্র ২০০০.০০ টাকার উপঢৌকন দিয়ে শান্ত করে এবং সেপ্টেম্বর মাসে বাণিজ্য করার জন্য তাঁর নিকট হতে একটি পরওয়ানা লাভ করে।[৭৫৩] তবে এই পরওয়ানাটি অকার্যকর থেকে যায়; এর আংশিক কারণ হচ্ছে এর পরের মাসেই সারবুলান্দ খানের বাংলা থেকে বদলী এবং আরেকটি আংশিক কারণ হচ্ছে এতে দীওয়ানের প্রয়োজনীয় অনুমোদন না থাকায় একে তিনি স্বীকৃতি দেননি এবং ১৭০৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে স্বাভাবিক শুল্ক প্রদান ব্যতীত ইংরেজদেরকে মাল সামগ্রী ছাড় দিতে অস্বীকৃতি জানান।[৭৫৪] পুনরায় ইংরেজরা শক্তি প্রদর্শনের পথ গ্রহণ করে। তারা হুগলীর ফৌজদারকে জানায় যে, যদি তাদের "মালামালের নৌকা ছাড় দেয়া না হয়" তাহলে "মুসলমানদের" একটি জাহাজকেও চলাচল করতে দেয়া হবে না।

---

৭৫০ কনসাল্টেশনস্, ১৩ ডিসেম্বর, ১৭০৮।

৭৫১ কনসাল্টেশনস্, ২৭ শে ডিসেম্বর, ১৭০৮।

৭৫২ কনসাল্টেশনস্, ২৫ ও ২৬ শে এপ্রিল, ১৭০৯।

৭৫৩ কনসাল্টেশনস্, ২০ আগস্ট এবং ২৯ শে সেপ্টেম্বর, ১৭০৯।

৭৫৪ কনসাল্টেশনস্, ১৭ডিসেম্বর, ১৭০৯।

তারা তাদের "আটক নৌকাগুলো ছাড় করাতে ৪০ জন সৈন্য এবং ৩০ জন কালো বন্দুকধারীকে প্রেরণ করার" সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৭৫৫] এই শক্তি প্রদর্শনের কারণে অথবা নগদী সৈন্যদের সঙ্গে দীওয়ান জিয়াউল্লাহ খানের সৃষ্ট সমস্যার কারণে তিনি ১৭১০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারীতে ইংরেজদের নৌকাগুলোকে ছাড় দিতে নির্দেশ জারী করেন।[৭৫৬] এর কয়েকদিন পরেই মুর্শিদাবাদে নগদী সৈন্যদের হাতে তিনি নিহত হন।[৭৫৭]

৭. মুর্শিদ কুলী খানের প্রত্যাবর্তন

ইংরেজদের জন্য ফাররুখ সিয়ারের ফরমান ১৭১৭খ্রিঃ

জিয়া উল্লাহ খানের মৃত্যুর পর মুর্শিদ কুলী খানকে দীওয়ান হিসেবে পুনরায় বাংলায় প্রেরণ করা হয়। একই সময়ে একজন নতুন অফিসার জিয়াউদ্দিন খানকে হুগলীর ফৌজদার নিয়োগ এবং পূর্ব উপকূলের সমুদ্র বন্দরসমূহ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও তাকে দেয়া হয়। মুর্শিদ কুলী খান ১৭১০ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে বাংলায় এসে পৌঁছেন এবং এর অল্পকাল পরেই নতুন নায়েব সুবাদার হিসেবে খান জাহান বাহাদুর এসে পৌঁছেন। হুগলীর ফৌজদার দাক্ষিণাত্যে থাকাকালীন সময়েই তার সঙ্গে ইংরেজদের সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। তারা এখন তার সঙ্গে এবং মুর্শিদ কুলী খানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অনুপস্থিত সুবাদার শাহাজাদা আজীমুশ্‌শানের অনুমতি এবং সম্রাটের নিকট হতে একটি ফরমান লাভের জন্য চেষ্টা শুরু করে। ১৭১১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসের প্রথম দিকে ইংরেজরা তাদের কাঙ্খিত সনদ লাভের জন্য দীওয়ানের দাবী অনুযায়ী ৬০,০০০.০০ টাকা দিতে প্রায়ই সম্মত হয়েছিল।[৭৫৮] কিন্তু এর কয়েকদিন পরেই জিয়াউদ্দীন তাদেরকে জানান যে, ইতিমধ্যেই শাহজাদার অনুমতি পাওয়া গেছে এবং তা যে কোন সময় এসে পৌঁছার আশা করা হচ্ছে। হুগলীর ফৌজদার কর্তৃক এই আশ্বাস পেয়ে তারা মুর্শিদ কুলী খানের সঙ্গে আলোচনা ভেঙ্গে দেয় এবং যদি তিনি ইংরেজদের নৌকা আটক করেন, তাহলে "আমাদের দূর্গের নিকট দিয়ে যাতায়াতকারী মুসলমানদের সকল জাহাজ" আটক করে রাখার হুমকি দেয়া হয়। তারা সে বৎসরের জন্য তাদের পুরো বিনিয়োগ মুর্শিদাবাদের খ্যাতনামা বণিক

---

[৭৫৫] কনসাল্টেশনস্, ২রা ডিসেম্বর, ১৭০৯।

[৭৫৬] কনসাল্টেশনস্, ১৭ই জানুয়ারী, ১৭১০।

[৭৫৭] কনসাল্টেশনস্, ২০ শে জানুয়ারী, ১৭১০।

[৭৫৮] কনসাল্টেশনস্, ১৭ জুলাই, ১৭১১। আরো দেখুন আব্দুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৫-১৪৬।

ফতেহ্ চাঁদ (পরবর্তীতে জগৎ শেঠ) এর মাধ্যমে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা সম্পন্ন করে[৭৫৯] এবং তাদের কাশিম বাজারের প্রতিনির্ধিকে ডেকে পাঠায়। এইসব ঘটনার প্রেক্ষাপটে মুর্শিদ কুলী খান হুগলী থেকে জিয়াউদ্দীনের বদলী চেয়ে তার বদলীর আদেশ প্রাপ্ত হন এবং এ বিষয়ে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এতে উভয়ের মধ্যে একটি দীর্ঘ মেয়াদী দ্বন্দ্ব সংঘাত সৃষ্টি হয়। ইংরেজরা এখন নায়েব সুবাদার খান জাহান বাহাদুরকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করে এবং তাকে ও তার কর্মকর্তাদেরকে মাত্র ৫০০.০০ টাকার সামগ্রী উপঢৌকন দিয়ে তার নিকট হতে ১৭১২ খ্রিস্টাব্দের প্রথম থেকে একটি পরওয়ানা লাভ করে।[৭৬০]

বাংলার কর্মকর্তাদের মধ্যকার এই অনৈক্য ছিল মোগল সাম্রাজ্যের পতন প্রক্রিয়ারই একটি সাধারণ প্রতিক্রিয়া মাত্র এবং ১৭১২ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে সম্রাটের মৃত্যুর কারণে রাজধানীর রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা আবার চরমে পৌঁছে এবং আরেকটি উত্তরাধিকার যুদ্ধ শুরু হয় এবং এর বিভিন্ন পর্যায় সারা বৎসরব্যাপীই চলতে থাকে। এই একই সময়ে মুর্শিদ কুলী খান একদিকে জিয়াউদ্দীন খান এবং অপরদিকে শাহাজাদা ফাররুখ সিয়ারের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব সংঘাত নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন; আর ইংরেজরা নায়েব সুবাদারের পরওয়ানা পেয়ে তাদের স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যায় এবং একটি শাহী ফরমান লাভের জন্যও তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে ফাররুখ সিয়ার সম্রাট হন। তিনি বাংলা থেকে খান জাহান বাহাদুরকে প্রত্যাহার করে নেন এবং দীওয়ান হিসেবে মুর্শিদ কুলী খানকে অনুমোদন প্রদানসহ তাকে প্রদেশের নায়েব সুবাদারও নিয়োগ করেন। এবার মুর্শিদ কুলী খান তার অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ইংরেজদের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করেন এবং গত কয়েক বৎসর পর্যন্ত তাদের যে শুল্ক বকেয়া হয়ে পড়েছে, তা দাবী করেন। তবে ইতিমধ্যে তারা জিয়াউদ্দীনের মাধ্যমে শাহী ফরমান লাভ না করা পর্যন্ত "আগের মতই বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি এবং উপঢৌকনসহ তাদের দূতের নিরাপদে দিল্লী পৌঁছার আদেশ কামনা করে সম্রাট ফাররুখ সিয়ারের নিকট একটি আবেদন এবং অন্য আরো চারজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীর নিকট পত্র প্রেরণ করে।[৭৬১] এই সকল পত্র থেকে কাঙ্খিত ফল পাওয়া যায়।

---

৭৫৯ কনসাল্টেশনস্, ৩রা জুলাই এবং ১৩ আগস্ট, ১৭১১

৭৬০ কনসাল্টেশনস্, ১লা মার্চ, ১৭১২।

৭৬১ কনসাল্টেশনস্, ২৩ এবং ২৮ শে ফেব্রুয়ারী, ১৭১৩। জিয়াউদ্দীনের সাহায্য নিয়ে ফাররুখ সিয়ারের নিকট ফার্সী ভাষায় লিখিত আবেদন পত্রের একটি কপি , ইংরেজী অনুবাদসহ, ২৭ শে মার্চ, ১৭১৩। এবং কনসাল্টেশনসের সঙ্গে সংযুক্ত করা আছে। (রেঞ্জ ১, ২য় খন্ড, ফলিও ৩০০)

১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে সম্রাটের মন্ত্রী তাকাররাব খানের নিকট হতে একটি পত্র পাওয়া যায়। এই পত্রে দিল্লী থেকে বাংলা পর্যন্ত সকল সুবাদারকে ইংরেজ রাষ্ট্রদূত এবং তার কর্মচারীদের যাত্রার নিরাপত্তা বিধান করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী মন্ত্রী সায়িদ আব্দুল্লাহ খানের সীল মোহরে আসা আরেক পত্রে "ইংরেজদেরকে কোন রকম হয়রানি না করতে এবং আগে আওরঙ্গজেবের সময়ে যেমনভাবে ইংরেজরা ব্যবসা করতো, তেমনভাবে ব্যবসা করতে দিতে মুর্শিদ কুলী খানের প্রতি আহবান জানানো হয়।[৭৬২] এই পত্র দুটি পাওয়ার পরে মুর্শিদ কুলী খান ইংরেজদের নিকট হতে আর কোন শুল্ক দাবী না করে তাদেরকে স্বাভাবিকভাবে বাণিজ্য করার অনুমতি প্রদান করেন।

এতে উৎসাহিত হয়ে ইংরেজরা জন সারম্যানের নেতৃত্বে মুঘল দরবারে দূত প্রেরণ করেন। এই দলে ছিলেন হুগলীতে ইংরেজদের বন্ধুভাবাপন্ন খাজা সারহাদ নামীয় এক আর্মেনিয়ান। এই দূত দিল্লী দরবারে প্রায় দুই বছর অবস্থান করেন। ১৭১৭ সালে সম্রাট ফাররুখ শিয়ারের নিকট থেকে একটি ফরমান লাভ করেন।[৭৬৩] এই ফরমান প্রধানত বৎসরে তিনটি প্রদেশে আমাদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য পরিচালনা করার নিশ্চিত সুবিধা প্রদান করে; তাছাড়া এই ফরমান দ্বারা ইংরেজদের চুরি যাওয়া পন্যদ্রব্য পূনরুদ্ধার, কোন বণিক বা তাঁতী অথবা অন্যান্যদের" নিকট হতে ইংরেজদের পাওনা আদায় এবং যে কোন জায়গায় তাদের কুঠি নির্মাণে সহায়তা করার জন্য প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হয়। এই ফরমান ইংরেজদের দ্বারা কলিকাতা, সুতানটি এবং গোবিন্দপুর গ্রাম তিনটি ক্রয় অনুমোদন দেয়া হয় এবং এগুলো সংলগ্ন আরও আটত্রিশটি গ্রাম নেয়ার জন্য তাদের আবেদন সম্পর্কে অনুমতি দিয়ে বলা হয় যে,"এগুলো মালিকদের থেকে ক্রয় এবং তারপর প্রদেশের দীওয়ানের অনুমতি প্রদান সাপেক্ষে" ইজারা নেয়া যাবে। প্রধান মন্ত্রী সায়িদ আব্দুল্লাহ খান কর্তৃক ইংরেজদের পক্ষে প্রদত্ত আরও কয়েকটি আদেশের মাধ্যমে ঐ ফরমানকে আরও শক্তিশালী করা হয়।[৭৬৪] এই সকল ফরমানে উল্লেখিত সুবিধাসমূহ পুনরায় উল্লেখ করা ছাড়াও ইংরেজ কুঠির প্রধান কর্তৃক সরবরাহকৃত তালিকার ভিত্তিতে ইংরেজদের মালামালকে ছাড়পত্র দেয়া এবং "সম্রাটের স্বার্থের বিরুদ্ধে না গেলে" মুর্শিদাবাদ টাকশাল থেকে সপ্তাহে তিন দিন কোম্পানীকে স্বর্ণপিণ্ড থেকে মুদ্রাঙ্কন করে নিতে অনুমতি দিতে নির্দেশ দেয়া হয়।"

---

৭৬২ কনসাল্টেশনস্, ২৭ শে ডিসেম্বর, ১৭০৮।

৭৬৩ এইচ, এম, এস, ৬৯তম খন্ড, পৃঃ ১৩০-১৩১

৭৬৪ এইচ, এম, এস, ৬৩০তম খন্ড, সংখ্যা-১,১২,১৪,২৮, এবং ২৯

এইভাবে মুর্শিদ কুলী খানের সামর্থ এবং সতর্ক থাকা সত্ত্বেও বাংলায় মোগল কর্মকর্তাদের মধ্যকার বিভেদের সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা তাদের সকলের উপর, বিশেষ করে তাঁর উপর একধাপ বিজয় অর্জন করে। বাংলায় তাঁর প্রাথমিক বৎসরগুলোতে মুর্শিদ কুলী খান গুরুত্বপূর্ণ রাজস্ব বিষয় নিয়ে এবং এ থেকে শাহজাদা আজিমুদ্দীন (আজীমুশ্শানের) এর সঙ্গে সৃষ্ট তার দ্বন্দ্ব কলহ নিয়ে এত বেশি ব্যতিব্যস্ত ছিলেন যে, বিদেশী বণিকদের প্রতি তার যত বেশি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন ছিল, তা তিনি দিতে পারেননি। যদিও ১৭০২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্যব্যাপী ইউরোপীয়দের ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর শাহী নিষেধাজ্ঞা আরোপিত ছিল। কিন্তু কলিকাতায় ইংরেজরা শক্তিশালী অবস্থায় থাকায় এবং দীওয়ান ও সুবাদার পরস্পর খড়গ হস্ত থাকার কারণে বাংলায় বাস্তবে ঐ নিষেধাজ্ঞা ছিল অকার্যকর। ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত যদিও মুর্শিদ কুলী খান দুটি ইংরেজ কোম্পানীর একত্রিত হওয়ার বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেননি, তথাপি তিনি বৎসরে মাত্র ৩০০০.০০ টাকা পেশকাশ দিয়ে এক কোম্পানী হিসেবে বাণিজ্য করার জন্য তাদেরকে মৌনভাবে অনুমতি দিয়েছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদ শুরু হওয়ার সময় থেকেই (১৭১০ খ্রিস্টাব্দের শেষ ভাগে) তিনি একদিকে হুগলীর ফৌজদার জিয়াউদ্দীন খানের সঙ্গে এবং অন্যদিকে, শাহজাদা ফাররুখ সিয়ারের সঙ্গে আরেকটি দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। একই সময়ে তাকে সীতারামের বিদ্রোহকেও মোকাবেলা করতে হয়েছে। যে সময়ে (১৭১৩) তিনি এ সকল জঞ্জাল থেকে মুক্ত হয়ে ইংরেজদের দিকে তাঁর দৃষ্টি দেয়ার জন্য অবকাশ পেলেন, তার পূর্বেই তারা শাহী দরবারের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলে এবং সেখান থেকে প্রথম তারা "আগের মত" বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ করে। তারপর লাভ করে ১৭১৭ সালে ফাররুখ শিয়ারের ফরমান। এই পটভুমি স্মরণে রেখেই ১৭০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ইংরেজদের গোলকধাঁধাঁ পূর্ণ সুচতুর এবং দীর্ঘ মেয়াদী আলাপ-আলোচনাকে বুঝতে হবে। ঘন ঘন শাসক এবং প্রাদেশিক কর্মকর্তাদের পরিবর্তন এবং এর ফলে তাদের ভোগকৃত সুযোগ-সুবিধাসমূহ পুনঃ অনুমোদন গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে প্রাদেশিক কর্মকর্তাদের পক্ষ হতে একটি সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ নীতির অনুপস্থিতি নিঃসন্দেহে বিদেশী বণিকদের জন্য অসুবিধাজনক ছিল। কিন্তু অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিসমূহ এই অবস্থার সঙ্গে নিজেদেরকে মানিয়ে নিলেও ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থে এই পরিস্থির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। স্থানীয়

কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাদের সামগ্রিক আচরণে তারা মোগল সাম্রাজ্যের ক্রমাগত পতনের দিকে ধাবিত হওয়া সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি, কলিকাতায় তাদের শক্তিশালী অবস্থান সম্পর্কে সচেতনতা এবং বাংলায় তাদের ভূখণ্ডগত এবং বাণিজ্যিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সংকল্প দ্বারাই তারা পরিচালিত হতো। এই প্রসঙ্গে ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দের ফাররুখ সিয়ারের ফরমান বাংলায় তাদের প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। তাঁর জীবনের অবশিষ্ট সময় মুর্শিদ কুলী খান কড়াকড়িভাবে ফরমানের শর্ত মেনে চলতেন এবং ফরমানে তাঁকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে তিনি কলিকাতার নিকটবর্তী গ্রামসমূহ ইজারা দিতে এবং বিনা চার্জে মুর্শিদাবাদের টাকশালে ইংরেজদেরকে মুদ্রাঙ্কন করতে দিতে অস্বীকার করেছেন। এমনকি তিনি ইংরেজদের অবস্থানকে আর অধিক সুরক্ষিত করতেও অনুমতি দেননি। তার মৃত্যুর পরে এবং মোগল সম্রাজ্যের আরো পতনের দিকে যাওয়ার কারণে অবশ্য ফরমানের বিধি ও শর্তাবলীতে অনেক অতিরঞ্জিত এবং অপপ্রয়োগ করা হয়, বিশেষ করে দস্তকের অপব্যবহার এবং ব্যাপকভাবে ব্যক্তিগত ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে। এর চেয়েও, যা বেশি, তা হচ্ছে ফরমান ইংরেজদেরকে বাংলায় যে নিশ্চিত অবস্থান করে দেয়, তাই পরিণামে এদেশে তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়।

৮. চরিত্র ও মূল্যায়ন

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদ কুলী খান তাঁর শেষ ঘনিয়ে আসছে উপলব্ধি করে শহরের পূর্ব পার্শ্বে একটি মসজিদ ও কাটরাসহ (মুসাফির ও বণিকদের জন্য বিশ্রামাগার এবং দোকানপাটসহ একটি বর্গাকৃতির চত্বর) নিজের সমাধি নির্মাণ করেন।[৭৬৫] ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে নির্মিত মসজিদের (সিড়ির) ধাপের নিচে সমাহিত করা হয়।

শাসক হিসেবে মুর্শিদ কুলী খান ছিলেন সৎ, দক্ষ এবং ন্যায়পরায়ন। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন এবং সরকারী কাজে কঠোরভাবে শরিয়তের বিধি-বিধান

---

৭৬৫ ট.বি. পৃঃ ১২১-১২২। তাওয়ারিখ-ই-বাঙ্গালাহ'র লেখক উল্লেখ করেছেন যে, জনৈক মুরাদের নিকট সমাধি ও মসজিদ নির্মাণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল। তিনি এই উদ্দেশ্যে পাশ্বর্বর্তী সকল হিন্দু-মন্দির ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। ফলে "মুর্শিদাবাদ বা এর থেকে চার দিনের সফরের দূরত্বে কোন হিন্দু মন্দির অক্ষত রাখা হয়নি।" এটা স্পষ্টতই বোধগম্য যে, এই বিবৃতি অসত্য। মসজিদ এবং সমাধি থেকে অনতিদূরে কতিপয় প্রচীন মন্দিরের অস্তিত্ব সম্পর্কে কে.পি. বন্দোপাধ্যায়ের উল্লেখ (পূর্বোক্ত পৃঃ ৬১-৬২) উপরোক্ত বিবৃতিকে অসত্য প্রমাণ করে

মেনে চলতেন। সলিমুল্লাহ লিখেছেন, "শায়েস্তা খানের পরে বাংলায় , এমনকি সারা হিন্দুস্তানের অন্য কোন অঞ্চলেও এমন একজন আমীর আর পাওয়া যাবে না, যিনি জাফর খানের (মুর্শিদ কুলী খানের) মত দীন প্রচারের জন্য এত আগ্রহী ছিলেন; আইন-কানুন প্রতিষ্ঠায় এ রকম বিজ্ঞ ছিলেন; এমন উদার ও মুক্তহস্ত ছিলেন; প্রখ্যাত এবং সদ্বংশীয় লোকজনকে উৎসাহ ও সমর্থন দান করতেন; কঠোর এবং নিরপেক্ষ বিচার করতেন; অন্যায়ের প্রতিকার এবং অপরাধীদের শাস্তি দিতেন; সংক্ষেপে তাঁর পূর্ণ প্রশাসনই ছিল মানবতার কল্যাণ এবং সৃষ্টিকর্তার প্রশংসায় নিবেদিত।"[৭৬৬] তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছিল আদর্শ স্থানীয়। তিনি কখনো সুরা পান বা মাদক দ্রব্য সেবন করেননি; এমনিক "কখনো তিনি নিজে গায়িকা বা নর্তকী নিয়ে আমোদ প্রমোদে লিপ্ত হতেন না।" সারা জীবন তিনি এক স্ত্রী নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাঁর কঠোর নিষ্ঠার কারণে তাঁর একান্ত বাসগৃহে কোন অপরিচিত নারী বা কোন খোজা প্রবেশ করতে পারত না।"[৭৬৭] তিনি খুবই কম ঘুম যেতেন এবং সতর্কভাবে নামাযের সময় সূচী মেনে চলতেন। রমজান মাসসহ বৎসরে তিনি তিন মাস রোজ রাখতেন। তাঁর দৈনিক কর্মসূচী ছিল এই যে, সকালের নাস্তা করার পরে দুপুর পর্যন্ত তিনি প্রতিদিন কোরআন নকল এবং বিচার কার্য পরিচালনা করতেন। "তিনি প্রতি বৎসর তাঁর হাতের লেখা কোরআন এবং অন্যান্য মূল্যবান উপহার সামগ্রী মক্কা, মদীনা এবং অন্যান্য পবিত্র স্থানে প্রেরণ করতেন।[৭৬৮] পোশাক পরিচ্ছদ এবং খানা-পিনায় মুর্শিদ কুলী খান সর্ব প্রকার বিলাসিতা অপছন্দ করতেন এবং শরিয়তে নিষিদ্ধ সকল বস্তু থেকে নিজকে দূরে রাখতেন। তাঁর দস্তরখানে কোন উন্নত মানের খানা পরিবেশন করা হত না। এমনকি সাধারণ বরফ ব্যতিত কোন হিমায়িত শরবত বা মাখন ও পরিবেশিত হত না।"[৭৬৯] তবে আম ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয় ফল এবং আমের মৌসুমে তিনি রাজমহলে একজন দারোগা নিয়োগ করে এটা নিশ্চিত করতেন যে, মালদহ (কোতয়ালী) এবং হুসেনপুরের সর্বাধিক পছন্দীয় গাছের আম যেন নিয়মিত মুর্শিদাবাদে পাঠানো হয়।[৭৭০]

---

[৭৬৬] তাওয়ারিখ-ই-বাঙ্গালাহ, পৃঃ ১০৯

[৭৬৭] তাওয়ারিখ-ই-বাঙ্গালাহ, পৃঃ ১১৩

[৭৬৮] তাওয়ারিখ-ই-বাঙ্গালাহ, পৃঃ ১১০

[৭৬৯] তাওয়ারিখ-ই-বাঙ্গালাহ, পৃঃ ১১৪

[৭৭০] তাওয়ারিখ-ই-বাঙ্গালাহ, পৃঃ ১১৪

PLATE XLIII

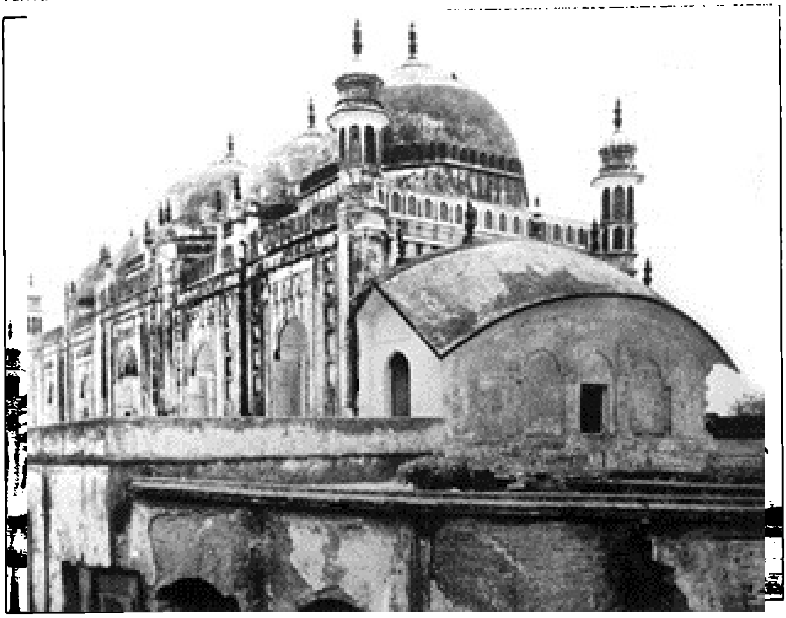

Kartalab Khan's Mosque, Begambazar, Dacca. Reproduced from M.A.A.T.P. Pl. 19b.

মুর্শিদ কুলী খান নিজে ছিলেন "একজন সুপণ্ডিত এবং বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। তিনি বিখ্যাত জ্ঞানী-গুণী এবং ধার্মিক ব্যক্তিদেরকে সম্মান করতেন। অংকে দক্ষ হওয়ার কারণে তিনি নিজেই সকল হিসাব-নিকাশ পরীক্ষা করতে সক্ষম ছিলেন।"[৭৭১] তিনি দুজন ধার্মিক এবং কারীকে নিয়োগ দিয়েছিলেন যারা সর্বদাই কোরআন তেলাওয়াত এবং অন্যান্য পুণ্যাত্মক কাজে নিয়োজিত থাকতেন।[৭৭২] আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি বীরভূম জেলাকে জরীপ এবং বন্দোবস্তের বাহিরে রেখেছিলেন, কারণ এর জমিদার আসাদুল্লাহ ধার্মিক এবং বিদ্যান ব্যক্তিদেরকে নিস্কর জমি দান করেছিলেন। মুর্শিদ কুলী খান মুর্শিদাবাদে কাটরা মাদ্রাসা নামে অন্ততঃ একটি বড় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এই নামকরণের কারণ হচ্ছে এই যে, এখানে একটি কাটরা বা মুসাফির ও বণিকদের জন্য একটি আবাসিক স্থান ছিল। "জনহিতকর কাজের জন্য কোন সরকারী বা তাঁর পূর্ববর্তী সুবাদারদের কোন দানই তিনি সংকোচন করেননি। বরং তিনি তা আরো বৃদ্ধি করেছিলেন।" নিজে শিয়া হলেও তিনি অন্যদের প্রতি সহনশীল ছিলেন এবং

---

৭৭১ তাওয়ারিখ-ই-বাঙ্গালাহ, পৃঃ ১১৫

৭৭২ তাওয়ারিখ-ই-বাঙ্গালাহ, পৃঃ ১১০

প্রায়ই সুন্নীদের জামায়াতে অংশগ্রহণ করতেন।[৭৭৩] মুর্শিদ কুলী খান পদ ও মর্যাদা নির্বিশেষে সকলের জন্য কঠোর ন্যায় বিচার করতেন এবং তাঁর রায় ও সিদ্ধান্তসমূহ "এত যুক্তিসঙ্গত এবং যথাযথ ছিল যে, সেগুলোকে খ্যাতনামা, সৎ ও ন্যায়পরায়ন বাদশাহদের আদেশের মতই সম্মান করা হত।"[৭৭৪] যদি কোন উপলক্ষ্যে বিচার বিভাগীয় কেউ কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করতেন এবং সঠিকভাবে ন্যায় বিচার করতে ব্যর্থ হতেন, তাহলে বিক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা দল মুর্শিদ কুলী খানের নিকট পুনঃবিচার প্রার্থনা করলে অবশ্যই ন্যায় বিচার পেয়ে যেতেন। বর্ণিত আছে যে, তার শাসনামলে হুগলীর কোতওয়াল একজন মোগল বণিকের কন্যাকে বলপূর্বক ছিনিয়ে নেন এবং তাঁর মর্যাদা হানি করেন এবং সেখানকার ফৌজদার আহসানুল্লাহ কোতয়ালের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কারণে বিষয়টি উপেক্ষা করেন। বালিকার পিতা মুর্শিদ কুলী খানের নিকট অভিযোগ পেশ করেন। তিনি নির্দেশ দেন যে, কোরআনের হুকুম অনুযায়ী অপরাধীকে পাথর ছুড়ে হত্যা করতে হবে এবং আহসানুল্লাহর অত্যন্ত প্রিয়ভাজন হওয়ার কারণে তার অনেক অনুরোধ ও কাকুতি মিনতি সত্ত্বেও তাঁর এই রায় কার্যকর করা হয়েছিল।[৭৭৫] আরো বর্ণিত হয়েছে যে, বাংলায় আসার পূর্বে মুর্শিদ কুলী খান তাঁর নিজ পুত্রকে বড় অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন।[৭৭৬]

একজন কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর জীবনের আরেকটি বৈশিষ্ঠ্য হচ্ছে দিল্লীর সিংহাসনের প্রতি তাঁর দৃঢ় আনুগত্য। উত্তরাধিকার যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে শাহজাদাদের মধ্যে যিনিই বিজয়ী হয়ে সিংহাসনে আরোহন করতেন, তিনি তাঁর প্রতিই আনুগত্য প্রকাশ করতেন এবং তাঁর নিকটই নিয়মিতভাবে প্রাদেশিক রাজস্ব প্রেরণ করতেন। বিনিময়ে সিংহাসনে আরোহনকারী প্রত্যেক সম্রাটই তাঁকে তাঁর পদে বহাল রাখতেন। সলিমুল্লাহ লিখেছেন যে, "মুর্শিদ কুলী খান সম্রাটের প্রতি সকল প্রকারে তাঁর আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা দেখাতে এত তৎপর ছিলেন যে, রাজকীয় তরীতে তিনি বসতেন না এবং বর্ষার মৌসুমে যখন প্রদর্শনীর নিমিত্তে সম্রাটের নাওয়রা জাহাঙ্গীর নগর থেকে আসত, তখন তিনিও বের হয়ে এগিয়ে যেতেন এবং রাজধানীর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকে অভিবাদন জানাতেন। তাঁর নজর (উপঢৌকন) পেশ করতেন এবং রাজকীয় নৌকার গদী চুম্বন করতেন।"[৭৭৭]

---

৭৭৩ তাওয়ারিখ-ই-বাঙ্গালাহ, পৃঃ ১১০

৭৭৪ তাওয়ারিখ-ই-বাঙ্গালাহ, পৃঃ ১০৯

৭৭৫ তাওয়ারিখ-ই-বাঙ্গালাহ, পৃঃ ১১৭

৭৭৬ ঐ, এফ, ২৫ বি.।

৭৭৭ ঐ, পৃঃ ১১৩

দিল্লীর সিংহাসনের প্রতি মুর্শিদ কুলী খানের সন্দেহাতীত আনুগত্য অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও মনে হচ্ছে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, কেন্দ্রীয় শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। কাজেই, তিনি তাঁর অধিনস্থ প্রদেশসমূহের শাসনভার নিজ হাতে কেন্দ্রীভূত করে সেখানে তাঁর বংশীয় রাজত্ব চালু করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আংশিকভাবে তাঁর নীতি এবং আংশিকভাবে তাঁর মন-মেজাজ, শিক্ষা-দীক্ষা এবং দূরদর্শিতার কারণে কেন্দ্রের সঙ্গে প্রকাশ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। তাঁর প্রশাসনিক কৌশল এবং তাঁর নিজের এবং তাঁর পরিবারের জন্য ভূমি গ্রহণই বলে দেয় যে, কেন তিনি তাঁর জীবনের শেষভাগে, যখন তাঁর বার্ধক্য আসে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দূর্বলতা ছিল তাঁর নিকট অত্যন্ত পরিস্কার, তখন তিনি তাঁর বিখ্যাত ভূমি জরিপ এবং বন্দোবস্তের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ভূমি জরিপ ছিল যথেষ্ট ব্যাপক এবং রাজস্ব বন্দোবস্ত করা হয়েছিল ভূমির উৎপাদনশীলতা এবং প্রজাদের কর দেয়ার সামর্থ সম্পর্কে দৃষ্টি রেখে ও ন্যায় সঙ্গত মূল্যায়নের ভিত্তিতে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর রাজস্ব নীতির অনুসরণীয় দিক ছিল রাজস্ব সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর অত্যাধিক এবং অন্যায় দাবী থেকে প্রজাদেরকে রক্ষা করা। বাজারে অব্যাহতভাবে খাদ্য শস্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং দ্রব্যমূল্যের একটি প্রমিত পর্যায় নিশ্চিত করার জন্য তাঁর গৃহীত পদক্ষেপের পিছনেও একই জনকল্যাণের উদ্দেশ্যই ছিল প্রধান। সলিমুল্লাহ লিখেছেন যে, "তিনি সর্বদাই দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন এবং খাদ্য শষ্যের একচেটিয়া কারবার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছিলেন। তিনি খাদ্য শষ্যের বাজার দর সম্পর্কে অব্যাহত এবং গোপনভাবে খোঁজ খবর রাখতেন; যখনই তিনি কোন কারসাজি আবিস্কার করতেন, অপরাধীদেরকে সর্বাধিক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতেন।" আবার শহর বন্দরে যখন খাদ্য শষ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক থেকে কমে যেত "তখন তিনি দেশের অভ্যন্তরভাগে কর্মকর্তাদেরকে প্রেরণ করতেন। তারা মজুতদারদের মজুত ভেঙ্গে দিয়ে খাদ্যশষ্য প্রকাশ্য বাজারে আনতে তাদেরকে বাধ্য করতেন..। তিনি খাদ্য শষ্যের রপ্তানী কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন এবং হুগলীর ফৌজদারের উপর এই স্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে, কোন জাহাজই (ইউরোপীয়দের বা যাদেরই হোক) নির্ধারিত সমুদ্র যাত্রায় নাবিকদের খাদ্যের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমানের অধিক খাদ্যশষ্য যেন পরিবহণ না করে। খাদ্য শষ্য মজুদের জন্য যেন কোন ব্যবসায়ীই ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।"[৭৭৮]

---

৭৭৮ তাওয়ারিখ-ই-বাঙ্গালাহ, পৃঃ ১১২

আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা এবং অপরাধ দমনের জন্য মুর্শিদ কুলী খান কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। যদি কোন চুরি বা ডাকাতি সংঘটিত হত, তিনি ফৌজদার এবং জমিদারদেরকে বাধ্য করতেন অপরাধীকে খুঁজে বের করে চোরাই দ্রব্য পুনরুদ্ধার করার জন্য। যার মাল চুরি হত "তাকে ঐ মাল বা এর সম পরিমাণ প্রদান করা হত এবং চোরকে জীবিত শূলে চড়ানো হতো।"[৭৭৯] যে সকল অঞ্চলে অহরহ অপরাধ সংঘটিত হত, তিনি সে সকল এলাকায় থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করেছিলেন। সলিমুল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, "পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য তিনি বর্ধমান সড়কের কাটুয়া, মুর্শিদগঞ্জ এবং পুবসেলে এইরূপ তিনটি থানা স্থাপন করেছিলেন এবং জনৈক মুহাম্মদ জানের উপর এই থানাগুলোর নিয়ন্ত্রণভার অর্পণ করেছিলেন।" এই লোকটি যখনই কোন সড়ক দস্যুকে ধরতেন, তার দেহকে দুভাগ করে সড়কের পাশে উঁচু গাছের সঙ্গে ঝুঁলিয়ে রাখতেন, এই জন্য তাকে সাধারণভাবে কুড়ালিয়া নাম দেয়া হয়েছিল।

মুর্শিদ কুলী খানের কঠোর ন্যায়-বিচার এবং নিয়মিতভাবে রাজস্ব আদায়ের জন্য স্বভাবতই তার সম্পর্কে বৈরী লোক কাহিনী সৃষ্টি হয়। এসব সূত্রের অসম্পূর্ণ পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং লোক কাহিনী থেকে গৃহীত অনুমান যথা, তিনি জমিদারদেরকে বর্বরের মত শাস্তি দিতেন অথবা তিনি নতুন এক শ্রেণীর রাজস্ব ইজারাদারদেরকে জমিদারদের স্থলাভিষিক্ত করেন অথবা তিনি বলপূর্বক রাজস্ব খেলাপী হিন্দু জমিদারদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করতেন, এসব কথার কোন বৈধ ভিত্তি নেই। আর একথাও সত্য নয় যে, তিনি বিদেশী বণিকদের নিকট হতে অন্যায়ভাবে ভীতি প্রদর্শন করে টাকা আদায় করতেন অথবা তাদের ব্যবসা বন্ধ করে দিতেন। পক্ষান্তরে তাঁর সময়ে দেশের রপ্তানী বাণিজ্য বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ দেশে আসায় দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক অবস্থার সার্বিক উন্নতি হয়। মুর্শিদ কুলী খানের অনেক গুণাবলী এবং দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজকে একজন প্রাদেশিক গবর্ণরের উর্ধে উঠে কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী অর্জন করতে পারেননি। এটা অবশ্য তাঁর কৃতিত্ব যে, যখন পুনঃপুনঃ উত্তরাধিকার যুদ্ধে কেন্দ্র প্রকম্পিত হচ্ছিল এবং মোগল সাম্রাজ্যের পতন দৃশ্যমান হচ্ছিল, তিনি তখনও এ প্রদেশে শান্তি বজায় রাখা এবং প্রশাসনিক ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু এটা ছিল কম-বেশ তাঁর নিজের অবস্থান অক্ষুন্ন রাখতে পারার ফলে; কারণ দিল্লীতে

[৭৭৯] তাওরিখ-ই-বাঙ্গলাহ, পৃঃ ১০৮

সিংহাসন নিয়ে সংগ্রামের পরিণতিতে বাংলায় তেমন উত্তেজনা দেখা দেয়নি। তাঁর অধীনে বাংলায় শান্তি বিরাজ করলেও দৃষ্টির আড়ালে পতনের প্রক্রিয়া সমভাবেই ক্রিয়াশীল ছিল। মুর্শিদ কুলী খান যে পদে উন্নীত হয়েছিলেন; দীর্ঘদিন সে পদে আসীন থাকায় এবং সাধারণভাবে তাঁর শাসন ব্যবস্থা পতনের অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়াকেই প্রতিবিম্বিত করে। তিনি ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজস্ব ও প্রশাসনিক রাজধানী স্থানান্তরিত করায় পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রীভূত মুসলমান জাগীরদারদের প্রভাবকে এড়িয়ে চলতে সক্ষম হয়েছিলেন। এতে একদিকে ঢাকার পতন এবং সামগ্রিকভাবে পূর্ব বাংলার অবনতি ঘটে এবং অন্যদিকে, এতে সরকারকে নতুনভাবে গড়ে উঠা ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের প্রভাবাধীন করে দেয়। অনুরূপভাবে মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের জাগীর পূর্ববাংলা থেকে উড়িষ্যায় স্থানান্তর ও তাদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। এই দুটি পদক্ষেপই বাংলার প্রাচীন মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর মেরুদণ্ড ভাঙ্গার কাজ করে। নতুন রাজধানীতে তাঁর সমর্থক ও অনুসারীরদের নিয়ে একটি নতুন মুসলমান অভিজাত শ্রেণী সৃষ্টি হওয়ার আগেই তিনি আরেক শ্রেণীর নতুন হিন্দু সরকারী ও আধা সরকারী চাকুরীজীবিদের উত্থানে সাহায্য করেন। তিনি হিন্দু কর্মচারী ও হিন্দু জমিদারদেরকে অগ্রাধিকার দেয়ায় আস্থা ও প্রভাবশালী অবস্থান থেকে মুসলমানদের উৎখাত প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় এবং প্রদেশে মুসলমানদের মধ্য থেকে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী দল সৃষ্টি হওয়া রোধ করার জন্য তাঁর পক্ষ থেকে যে দুর্বল প্রচেষ্টা ছিল, তাও ব্যর্থ হয়। আংশিকভাবে তার এই নীতির কারণে এবং আংশিকভাবে বিদেশীদের ব্যাপকভাবে বাণিজ্য সম্প্রসারণের কারণে তাঁর আমলে জগৎ শেঠের পরিবারের নেতৃত্বে একটি নতুন হিন্দু বণিক সম্প্রদায় গড়ে ওঠে।[৭৮০]

---

৭৮০ জগৎ শেঠের পরিবারের হিরানন্দ সাহার আদি নিবাস ছিল মারওয়ারের নাগাউরে। শাহ জাহানের রাজত্বের শেষ দিকে তিনি পাটনায় তার ব্যাংকিং ব্যবসা শুরু করেন। তিনি ১৭১১ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। কিন্তু তার পূর্বেই তার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাণিক চাঁদ সাহা ঢাকায় তাদের ব্যবসা শুরু করেন। তিনি মুর্শিদ কুলী খানের খুবই প্রিয় ভাজন ছিলেন এবং মুর্শিদ কুলী খান যখন ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে দিওয়ানী স্থানান্তর করেন, তখন তিনিও তাঁর সঙ্গে মুর্শিদাবাদ চলে যান। ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে উত্তরাধিকার যুদ্ধের সময়ে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে ফাররুখ সিয়ার তাকে নগর শেঠ বা সিটি ব্যাংকার উপাধি দেন। এর দুই বৎসর পরে মাণিক চাঁদ মারা যান এবং সমৃদ্ধিশালী ব্যাংকিং ব্যবসার উত্তরাধিকারী হন তার ভাগিনেয় ফতেহ চাঁদ। ১৭২৩ খ্রীস্টাব্দে মুর্শিদ কুলী খানের সুপারিশের ভিত্তিতে সম্রাট মুহাম্মদ শাহ তাঁকে "জগৎ শেঠ" বা "বিশ্ব ব্যাংকার" উপাধি দেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, জে-ইইচ-লিটন "দ্যা হাউজ অব জগৎ শেঠ" বি.পি.পি ২০তম খন্ড(১৯২০,) পৃঃ ১৪১-২০০, এবং ২১তম খন্ড (১৯২১ পৃঃ ১-১১৯)

১৭২১ সালের দিকে ফতেহ চাঁদ (জগৎ শেঠ) মুর্শিদ কুলী খানের এত বেশি প্রিয়ভাজন হয়ে উঠেন যে, তিনি তাকে ছাড়া অন্য কাউকেই বিদেশী বণিকদের দ্বারা আনীত স্বর্ণ হতে সরকারী টাকশালে মুদ্রা উৎকীর্ণ করতে অনুমতি দেননি। এতে জগৎ শেঠ শুধু স্বর্ণ মার্কেটেই একচেটিয়া কারবার নয়, বরং দেশের মুদ্রাও নিয়ন্ত্রণ করার মত ক্ষমতা লাভ করেন এবং অচিরেই হিন্দু সরকারী কর্মকর্তাগণও বণিক শ্রেণী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে একটি শক্তিশালী উপাদান হিসেবে আবির্ভূত হয়। তাছাড়া মুর্শিদ কুলী খানের সময়েই বাংলায় ইংরেজরা নিজেদেরকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে: প্রথম, উত্তরাধিকার যুদ্ধের সময় কলিকাতায় তারা তাদের অবস্থানকে দুর্গ বানিয়ে সুরক্ষিত করে তোলে এবং দ্বিতীয়ত, ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে তারা সম্রাট ফাররুখ সিয়ারের নিকট হতে একটি ফরমান লাভ করে। অতএব, যে সমস্ত কারণ ও উপাদান শেষ পর্যন্ত বাংলা থেকে মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে উচ্ছেদ করে, সেগুলো পরিস্কারভাবে মুর্শিদ কুলী খানের সময়েই প্রকট হয়ে ওঠে। ফলশ্রুতিতে তাঁর শাসনামলের বাহ্যিক ও বিভ্রান্তিকর শান্তি ও স্থিতিশীলতার পশ্চাতে অধঃপতন ও ধ্বংসের প্রক্রিয়া দ্রুত গতিতে চলতে থাকে।

নবম অধ্যায়[৭৮১]

১. শুজাউদ্দীন মুহাম্মদ খান এবং সরফরাজ খান

একটি বিলম্বিত যুদ্ধ

মুর্শিদ কুলী খান ক্ষয়িষ্ণু কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি তাঁর আনুগত্য বজায় রেখেছিলেন এবং একই সময়ে বাংলা ও উড়িষ্যা প্রদেশদ্বয়ে তাঁর বংশীয় শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় যে এক অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি করেছিলেন, তা তাঁর মৃত্যুর পূর্বে স্পষ্ট হয়ে উঠে। তাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না, তবে সরফরাজ খান নামে তাঁর এক দৌহিত্র ছিল, যার জন্য তিনি ইতিপূর্বেই বাংলার দীওয়ানি লাভ করেছিলেন। এবার মুর্শিদ কুলী খান তাকে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করেন এবং "তার সকল অর্থ ও বিষয়-সম্পদ তাকে হস্তান্তর করে দেন"[৭৮২] এবং মুঘল সম্রাটের নিকট হতে প্রদেশ দুটির সুবাদার হিসেবে সরফরাজ খানের আনুষ্ঠানিক নিয়োগ লাভের জন্য "তিনি সম্রাটের দরবারে তাঁর নিয়োজিত এজেন্টের নিকট পত্র লেখা এবং অর্থ ব্যয়সহ কোন প্রচেষ্টাই বাকি রাখেন নি।"[৭৮৩] সম্ভবত মৃত্যুপথযাত্রী নওয়াবের এই উপলব্ধি হয়নি যে, সম্রাটের দেয়া নিয়োগের যদি কোন গুরুত্ব থাকেই, তাহলে যে কেউ তার জন্য চেষ্টা করে সে নিয়োগ লাভ করতে পারে। আর যদি বিপরীতক্রমে এটা শুধুমাত্র একটি আনুষ্ঠানিকতা হয়ে থাকে এবং বাস্তবে তাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল, আর সে অবস্থায় কারো ব্যক্তিগত শক্তি-সামর্থ এবং স্থানীয় সমর্থনই উত্তরাধিকারিত্ব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মুর্শিদ কুলী খানের জামাতা, সরফরাজ খানের পিতা এবং উড়িষ্যার নায়েব সুবাদার ছিলেন মরনাপন্ন নওয়াবের পরিকল্পনার বিরোধী এবং তিনি নিজেই প্রদেশ দুটির সুবাদার হতে ইচ্ছুক ছিলেন।

মুর্শিদ কুলী খান তাঁর জামাতার ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত ছিলেন কিনা, তা অবশ্য জানা যায়নি। কারণ, গত কিছু কাল যাবত তাদের দুজনের মধ্যে সুসম্পর্ক যাচ্ছিল না; এর একটি কারণ হচ্ছে যে, তাদের মেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য।"

---

[৭৮১] মূল বইয়ে চতুর্বিংশ অধ্যায়

[৭৮২] টি.বি., পৃঃ ১২২

[৭৮৩] সিয়ার, ১, পৃঃ ২৭৬

অন্য আরেকটি কারণ হচ্ছে এই যে, শুজাউদ্দীন খানের তাঁর অন্য আরেক স্ত্রীর প্রতি অধিক অনুরাগী হয়ে যাওয়া, যে কারণে মুর্শিদ কুলী খানের কন্যা জিন্নাতুন্নিসা মুর্শিদাবাদে তাঁর পিতার নিকট তাঁর পুত্রসহ বসবাস করতেন। অতএব, সরফরাজ খানকে উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করার পিছনে মনে হচ্ছে মুর্শিদ কুলী খানের বংশীয় এবং ব্যক্তিগত উভয় পছন্দই ক্রিয়াশীল ছিল। সরফরাজ খান অবশ্য তার পিতা শুজাউদ্দীন খানের সঙ্গে কোন ভাবেই তুলনীয় ছিলেন না। শুজাউদ্দীন খান নিঃসন্দেহে সামরিক ও প্রশাসনিক দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। তিনি ইরানের পূর্বাঞ্চলের খুরাসানে বসবাসকারী তুর্কীদের আফশার গোত্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর পূর্ব পুরুষদের একজন শাহ তামাস্পের রাজত্বকালে সে প্রদেশের গভর্ণর ছিলেন। শুজাউদ্দীনের পিতা আওরঙ্গজেবের অধীনে দাক্ষিণাত্যের বুরহানপুরে এক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বুরহানপুরেই শুজাউদ্দীন মুর্শিদ কুলী খানের সান্নিধ্যে আসেন, তাঁর কন্যাকে বিয়ে করেন এবং পরবর্তীকালে তিনি বাংলায় চলে আসেন এবং মুর্শিদ কুলী খান তাঁকে উড়িষ্যার নায়েব সুবাদার নিয়োগ করেন। শুজাউদ্দীন প্রদেশের জন্য নিজকে দক্ষ এবং সফল গভর্ণর হিসেবে প্রমাণ করেন এবং নিজের জন্য একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনীও গড়ে তোলেন। তদুপরি তিনি কিছু সংখ্যক প্রভাবশালী ব্যক্তির সমর্থনও লাভ করেছিলেন, তাদের মধ্যে দিল্লীর দরবারে নিযুক্ত মুর্শিদ কুলী খানের নিজ প্রতিনিধি বালকিসান (বা বালকৃষ্ণ)ও কম প্রভাবশালী ছিলেন না।[৭৮৪] এই লোকটি তার নিয়োগ কর্তার মনোনীত সরফরাজকে সমর্থন না করে শুজাউদ্দীনের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং সম্রাটের নিকট হতে তাঁর জন্য নিয়োগ লাভের চেষ্টা করেন। পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে দেখা যায় যে, মুর্শিদ কুলী খানের বিশেষ অনুগ্রহভাজন জগৎ শেঠ ফতেহ চাঁদ ও শুজাউদ্দীনের নিয়োগকেই সমর্থন করেছিলেন। তাঁর আরেকটি সৌভাগ্য ছিল এই যে, তখন তাঁর অধীনে দু'জন যোগ্য ভ্রাতা যথা- হাজী আহমদ এবং মির্যা মুহাম্মদ আলী (পরে আলীবর্দী খান নামে খ্যাত) চাকুরী করতেন। তাঁরা দু'জন ছিলেন মির্যা মুহাম্মদের পুত্র এবং তিনি "আফশার গোত্রভুক্ত একজন মহিলার স্বামী" হওয়ার কারণে শুজাউদ্দীনের প্রতি তাঁর সমর্থন জ্ঞাপন করেন। মির্যা মুহাম্মদ প্রথম জীবনে আওরঙ্গজেবের পুত্র আযম শাহের অধীনে চাকুরী করতেন এবং আযম শাহের মৃত্যু হওয়ায় তিনি "চরম দারিদ্র এবং দুঃখ কষ্টে" নিপতিত হন। অবশেষে তিনি উড়িষ্যায় এসে পৌঁছলে শুজাউদ্দীন "আনন্দের সাথেই একজন আত্মীয়ের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন"

---

৭৮৪ টি.বি., পৃঃ ১২৪

করে তাঁকে তাঁর অধীনে চাকুরী প্রদান করেন এবং তাঁর প্রতি এত বেশি বদান্যতা দেখান যে, তাঁর পুত্রদেরকে তাঁদের সকল সঙ্গী-সাথী, সন্তানাদি এবং আত্মীয়স্বজনসহ পুরো পরিবার নিয়ে দিল্লী থেকে চলে আসতে উদ্বুদ্ধ করেন। তারা প্রথমে বাংলায় আসেন এবং সেখান থেকে উড়িষ্যা গিয়ে তাদের পিতার সঙ্গে মিলিত হন।[৭৮৫] শুজাউদ্দীন তাদেরকে তাঁর অধীনে চাকুরীতে নিয়োগ দেন এবং যেহেতু উভয় ভ্রাতাই ছিলেন অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তি এবং বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, তারা তাদের পৃষ্টপোষক শুজাউদ্দীনের সরকারকে বিপুলভাবে শক্তিশালী করে তোলেন, বিশেষ করে, প্রদেশের রাজস্ব ও অর্থ ব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তি দান করেন। ভ্রাতাদ্বয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ ভাই মির্যা মুহাম্মদ আলী একজন সৈনিক হিসেবে ছিলেন অধিক দীপ্তিমান, তাঁর পিতা বা ভ্রাতার চেয়ে অনেক বেশি যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং "অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তার সকল আত্মীয়, এমন কি শুজাউদ্দীনের সরকারভুক্ত সকল ব্যক্তিকেই" অতিক্রম করে যান।[৭৮৬]

শুজাউদ্দীন যখন তাঁর শশুর কর্তৃক সরফরাজ খানকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছেন বলে জানতে পারেন, তখন তিনি প্রধানত তাদের নিকটই পরামর্শ ও সমর্থন কামনা করেন, হাজী আহমদ এবং মির্যা মুহাম্মদ আলী সকল প্রকারে তাকে সাহায্য করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যান। প্রথমে তারা তাদের পরিচিত, আস্থাবান, প্রতিভাশালী ও প্রত্যুৎপন্ন ব্যক্তিকে মনোনীত করেন এবং শুজা উদ্দীন খানকে বাংলা ও উড়িষ্যা প্রদেশের দীওয়ান ও নাযিম নিয়োগ করার জন্য সম্রাট, উজির এবং প্রধান শাহজাদা খান দাউরানের নিকট সুচিন্তিতভাবে লিখিত আবেদন পত্রসহ তাকে দিল্লীর শাহী দরবারে প্রেরণ করেন। দ্বিতীয়ত, তাদের

---

৭৮৫ সিয়ার ২য় খন্ড, পৃঃ ২৭৫-২৭৬। এই দুই ভাই সম্পর্কে তাওয়ারিখ-ই-বাঙ্গালায় বর্ণিত কাহিনী (পৃঃ ১৩৪-১৩৫) হচ্ছে এই যে, হাজী আহমদ ও মির্যা মুহাম্মদ আলী তাঁদের পিতার মৃত্যুর পরে এবং দিল্লীর শাহী ধন ভান্ডার থেকে কিছু রত্ন নিয়ে পালিয়ে উড়িষ্যায় চলে আসেন এবং তাঁরা নোংরাভাবে তাঁদের পরিবারভুক্ত মহিলাদের দিয়ে পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে তাঁর (শুজাউদ্দীনের) কামনা পূরণ করে তারা তাকে মোহগ্রস্থ এবং তাঁর আস্থা ও বন্ধুত্ব অর্জন করেন। তাওয়ারিখের এই বর্ণনা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। যদি হাজী আহমদ এবং তার ভ্রাতার নিকট বহু ধন রত্নই থাকতো, তাহলে তারা উড়িষ্যায় আসার জন্য বিপদসঙ্কুল দাক্ষিণাত্যের পথে পরিভ্রমণ করতেন না এবং তাওয়ারিখেই এ তথ্য বর্ণিত হয়েছে। তদুপরি তাঁরা এরূপ কিছু করে থাকলে দিল্লীর দরবারে পরবর্তীকাল পর্যন্ত তাদের যে সুনাম অক্ষুন্ন ছিল তা আর থাকতো না। দ্বিতীয়ত, এই ব্যাপারে সিয়ারের বিবরণ অধিক যুক্তসঙ্গত বলে মনে হয় যে, তিনি এবং তাদের মাতা খোরাসানের আফসার গোত্রভুক্ত ছিলেন বলেই তারা শুজাউদ্দীনের নিকট গিয়েছিলেন। তৃতীয়ত, পরবর্তীকালে এই দুই ভ্রাতা বিশেষ করে আলী বর্দী খান, যে সামরিক ও প্রশাসনিক দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন, তাতেই শুজাউদ্দীন খান বিমোহিত হয়েছিলেন বলে সিয়ারের বর্ণনাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়।

৭৮৬ সিয়ার ২য় খন্ড, পৃঃ ২৭৬

পরামর্শক্রমে শুজাউদ্দীন তাঁর কিছু সংখ্যক সৈন্যকে বরখাস্ত করার ভান করেন এবং তাদেরকে মুর্শিদ কুলী খানের প্রাসাদের ধারে কাছে "আলাদা আলাদা ভাবে থাকার নির্দেশ দিয়ে" বিভিন্ন পথে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করেন এবং "তাদের কাছে প্রেরিতব্য যে কোন আদেশ পালন করার লক্ষ্যে তাদেরকে দিন-রাত প্রস্তুত থাকার জন্যও নির্দেশ দেন।"[৭৮৭] তৃতীয়ত, মুর্শিদাবাদের সঙ্গে যোগাযোগের পথ উন্মুক্ত রাখার জন্য এবং আসন্ন বর্ষা মৌসুমের কথা চিন্তা করে শুজাউদ্দীন "সকল কাজে ব্যবহারের উপযোগী বিভিন্ন আকারের বহু সংখ্যক নৌকা" এবং প্রচূর সংখ্যক মাঝি-মাল্লাও প্রস্তুত রাখেন, যেন "মুর্শিদ কুলী খানের মৃত্যু সংবাদ শুনা মাত্রই অবিলম্বে বিনা বাধায় মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হতে পারেন।" একই সময়ে দিল্লী ও মুর্শিদাবাদ থেকে প্রতিদিনের সংবাদ লাভ করার জন্য তিনি কিছু সংখ্যক গোপন পদও সৃষ্টি করেন।

অবশেষে নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর পাওয়া যায় যে, মুর্শিদ কুলী খান আর বড় জোর ৫/৬ দিন বাঁচবেন। অতএব, তাঁর অপর স্ত্রীর পক্ষ হতে তাঁর পুত্র মুহাম্মদ তকি খানকে উড়িষ্যায় তাঁর নায়েব নিযুক্ত করে তিনি লোক-লস্করসহ হাজী আহমদ এবং মির্যা মুহাম্মদ আলীকে নিয়ে মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে এসেই শুজাউদ্দীন মুর্শিদ কুলী খানের মৃত্যুর নিশ্চিত সংবাদ লাভ করেন এবং মেদিনীপুর এসে তিনি সম্রাট কর্তৃক প্রদেশ দুটোর শাসনকর্তা নিযুক্ত হওয়ার আদেশ প্রাপ্ত হন।[৭৮৮] এই জায়গাটিকে সৌভাগ্য স্থল গণ্য করে তিনি কিছু সময়ের জন্য এখানে যাত্রা বিরতি করেন এবং এই স্থানটির নাম দেন মোবারক মঞ্জিল (সৌভাগ্যের স্থান) এবং এখানে একটি কাটরা ও একটি সরাইখানা নির্মাণের জন্য আদেশ প্রদান করেন।[৭৮৯] মেদিনীপুর থেকে তিনি সরাসরি মুর্শিদাবাদে চলে যান এবং সেখানে "কাউকে নিঃশ্বাস ছাড়ার সুযোগ না দিয়ে" একেবারে সোজা চেহেল সুতুন বা চল্লিশ স্তম্ভ বিশিষ্ট পাবলিক মিলনায়তনে গিয়ে উঠেন। "সেখানে ওয়াকিয়া নাওয়িস (শাহী তথ্য কর্মকর্তা), সওয়ানাহ নাওয়িস (রাজকীয় বার্তা প্রেরক) এবং শহরের অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্যক্তিদেরকে

---

৭৮৭ সিয়ার, পৃঃ ২৭৬

৭৮৮ সিয়ার, পৃঃ ২৭৮। টি.বি. ১২৫। তাওয়ারিখের বর্ণনা অনুযায়ী সাধারণ সুবাদারী দরবারের প্রভাবশালী আমির খান দাউরানকে প্রদান করা হয়। তিনি আবার শুজাউদ্দীনকে বাংলা ও উড়িষ্যায় তাঁর নায়েব নিযুক্ত করে তাকে এক সনদ প্রদান করেন। সিয়ারে উল্লেখ রয়েছে যে, শুজাউদ্দীন "যে জন্য দরবারে আবেদন করেছিলেন, তিনি সে পদ লাভ করেন।" পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে জানা যায় যে, শুজাউদ্দীনকে সরাসরি প্রদেশ দুটির সুবাদার নিয়োগ করা হয়

৭৮৯ ঐ

ডেকে তিনি তাঁর সনদ উপস্থাপন করেন এবং ঐ দু'জন কর্মকর্তার দ্বারা তিনি সে সনদ উচ্চস্বরে পাঠ করান এবং এভাবে নিজেকে প্রদেশ দু'টির বৈধ সুবাদার হিসেবে স্বীকৃতি আদায় করে" মসনদের কর্তৃত্ব লাভ করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তাতে আসন গ্রহণ করেন।"[৭৯০] তখন উপস্থিত সকলেই তাকে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং অভিনন্দন জানান।

অত্যন্ত চমৎকার নৈপুণ্যের সঙ্গে পুরো অভিযান ও এই কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় এবং এরূপভাবে সমগ্র কাজ সম্পন্ন হয়ে যাওয়ায় সফরাজ খান যেন হত-বিহবল হয়ে পড়েন। তাওয়ারিখ-ই-বাঙ্গালাহ অনুযায়ী তার পিতার আগমণের খবর পেয়ে সরফরাজ খান তার মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু তার মাতা ও মাতামাহী এই বলে তাকে বিরত রাখেন যে, তার পিতা একজন বৃদ্ধ লোক হওয়ায় "তিনি সরকার এবং জাফর খানের রাজ্যের উত্তরাধিকারিত্ব থেকে বেশি দিন তাঁকে দূরে রাখতে পারবেন না"। অতএব, তাঁর উচিত হবে না "তাঁর পিতার বিরুদ্ধে সশস্ত্রভাবে অগ্রসর হওয়ার মত ভয়াবহ অধর্মাচারের মত অপরাধ করা, যা তাকে সারা দুনিয়ার সামনে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করবে।" অন্যদিকে সিয়ারের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, সরফরাজ খান যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন না এবং "তখন তিনি ছিলেন আসলে শহর থেকে মাত্র মাইল দুয়েক দূরে একটি মফস্বল এলাকায়, তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, তিনি নিঃসন্দেহে তাঁর মাতামহ জাফর খানের পদ ও ভূ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হচ্ছেন এবং তার খেতাবের প্রতি দাবী তোলার মত সাহসী আর কেউ নেই"।[৭৯১] অতএব, যখন তিনি প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হন, তখন প্রধান প্রধান সভাসদ এবং সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরবর্তী করণীয় নিয়ে আলোচনা করেন। তাদের অধিকাংশই ঐক্যমতের ভিত্তিতে এই মত ব্যক্ত করেন যে, "যেহেতু, তার পিতা সনদ লাভ করার ঘোষণা দিয়েছেন; শহরের প্রাসাদসহ ক্ষমতার মসনদ দখলে নিয়েছেন; শান্তিপূর্ণভাবে স্বীকৃতি পেয়ে গেছেন; ধন-ভাণ্ডারের মালিক হয়েছেন; এখন নতি স্বীকার করা ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই।"[৭৯২] এই উভয় বিবরণই অবশ্য একই পরিণতির দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, একটি কাজ সুসম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পরে সরফরাজ খান টের পান এবং তখন আর তার পিতার বিরোধিতা করা অসম্ভব বুঝতে পেরে শান্তিপূর্ণভাবে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। এইভাবে পিতা ও পুত্রের

---

[৭৯০] টিবি ১২৬

[৭৯১] সিয়ার, ১ম খন্ড. পৃঃ ২৭৮

[৭৯২] ঐ, পৃঃ ২৭৯

মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয়। কিন্তু একটু পরেই দেখা যাবে যে, উত্তরাধিকার যুদ্ধ আসলে শুধু বিলম্বিত করা হয়েছিল মাত্র। কারণ, তাঁর পিতার মৃত্যুর পরে সরফরাজ খানকে মসনদের জন্য যুদ্ধ করে প্রাণ দিতে হয়েছিল, যদিও তখন তিনি তার পিতার মনোনীত উত্তরাধিকারী ছিলেন।

২. শুজাউদ্দীন খানের প্রাথমিক পদক্ষেপসমূহ

শুজাউদ্দীনের সাফল্যের কারণ শুধু এই ছিল না যে, তিনি সম্রাটের সনদ লাভ করেছিলেন বা সম্ভাব্য বিরোধিতা মোকাবেলা করার জন্য যথেষ্ট সৈন্য সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, বরং তাঁর সাফল্যের প্রকৃত কারণ নিহিত রয়েছে উভয় প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের তাঁর পক্ষে টেনে এনে তাদের সমর্থন লাভের মধ্যে। যেমন ফতেহ চাঁদ জগৎ শেঠ এবং দিল্লীর দরবারে মুর্শিদ কুলী খানের নিজ প্রতিনিধির সমর্থন। আসলে শুজাউদ্দীন যে পন্থায় মসনদ লাভ করলেন এবং তাঁর কিছু প্রাথমিক পদক্ষেপ এই ইঙ্গিত দেয় যে, মুর্শিদ কুলী খানের অনুসৃত নীতির প্রতি ইতিমধ্যেই সেখানে বিরোধিতা সৃষ্টি হতে চলছিল, বিশেষ করে কর-খেলাপী জমিদারদের বিরুদ্ধে তাঁর কঠোর পদক্ষেপের কারণে তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবগণ মসনদের জন্য তাঁর মনোনীত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিত্ব ব্যর্থ করে দিয়ে তাঁর নীতিমালায় পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করেছিলেন। এমনকি সরফরাজ খানের মাতা এবং মাতামহী এবং তাঁর নিজ সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাগণেরও শুজাউদ্দীন খানের প্রতি তেমন কোন বিরোধিতা ছিল না। ক্ষমতায় আসার পরে তিনি অন্দর মহলের মহিলাদেরকে, বিশেষ করে তাঁর স্ত্রী জিন্নাতুন্নেসাকে শান্ত করার জন্য আরো কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। অনুকূল পরিবেশ পেলে তিনি তাকে এই বলে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করতেন যে, মুর্শিদ কুলী খানের কন্যা হিসেবে আসলে তিনিই তাঁর সরকার এবং ভূ-সম্পত্তির প্রকৃত এবং একমাত্র উত্তরাধিকারিনী এবং তিনি (শুজাউদ্দীন) শুধুমাত্র তাঁর পক্ষেই কাজ করছেন।

তাঁর প্রাথমিক পদক্ষেপসমূহের মধ্যে দুটি ব্যবস্থা তাঁর পূর্বসুরীর নীতিমালা থেকে নিশ্চিত বিচ্যুতি। এতএব, তাঁর মসনদে বসার অল্প পরেই তিনি সরকারের বিষয়াদি পরিচালনার জন্য হাজী আহমদ, মুহাম্মদ আলী যাকে ইতিমধ্যে আলীবর্দী খান উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল, জগৎ শেঠ এবং রায়-রায়ান আলম চাঁদকে নিয়ে একটি পরিষদ গঠন করেন।[৭৯৩] শেষোক্ত ব্যক্তি উড়িষ্যায় শুজাউদ্দীন খানের

---

[৭৯৩] সিয়ার, পৃঃ ২৮১

মুহাররির বা গৃহ সংক্রান্ত হিসাব করনিক ছিলেন, কিন্তু এখন তাকে বঙ্গীয় নিযামতের দীওয়ান নিযুক্ত করা হয় এবং তাকে ১০০০ জাতের মনসব দ্বারা পুরস্কৃত করা হয় এবং তাকে রায়-রায়ান উপাধিতে ভূষিত করা হয়। "এটা ছিল এমন এক সম্মান যা বাংলায় নিযামত বা দীওয়ানীর কোন কর্মকর্তাকে ইতিপূর্বে আর প্রদান করা হয়নি।"[৭৯৪] সিয়ারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই পরিষদকে "বাধা এবং খোলার" ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল ও এই পরিষদই তাঁর "মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কাজ করতো।"[৭৯৫] দ্বিতীয়ত, যে সকল জমিদারকে আটক বা বন্দী করে রাখা হয়েছিল, শুজাউদ্দীন তাদের বিষয়টি পুন বিবেচনা করেন। তিনি যাদেরকে নির্দোষ বা কোন প্রতারণামূলক অপরাধ বা এ থেকে মুক্ত দেখতে পান, তাদেরকে নিঃশর্তে মুক্তি দেন। অন্যদেরকে তিনি আনুষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতি এবং মুর্শিদ কুলী খানের বন্দোবস্তের উপর আরও কিছু অতিরিক্ত অর্থ প্রদান এবং নিয়মিতভাবে তাদের রাজস্ব পরিশোধের লিখিত অঙ্গীকারের ভিত্তিতে মুক্তি দেন।[৭৯৬] এতেই তারা সন্তুষ্ট হন। কারণ তাদের কেহ কেহ বছরের পর বছর কারারুদ্ধ ছিলেন। তারা শুজাউদ্দীনের উদারতা ও মহানুভবতার জন্য শুধু তার প্রতি কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করেননি, বরং তারা তাঁর "যে কোন আদেশকে অত্যন্ত আনুগত্য ও কর্তব্যপরায়ণতার সঙ্গে পালন করার"ও অঙ্গীকার প্রদান করেন।[৭৯৭]

এরপর শুজাউদ্দীন প্রশাসনের প্রধান পদগুলো তাঁর নিজ লোকজন এবং সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে বিতরণ করেন। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সরফরাজ খানকে বাংলার দীওয়ান পদে বহাল রাখেন এবং তাঁর দ্বিতীয় পুত্র তকী খানকে উড়িষ্যার নায়েব সুবাদার পদে বহাল রাখেন। শুজাউদ্দীন জাহাঙ্গীর নগরের (ঢাকার) নায়েব

---

[৭৯৪] টি.বি., ১৩৩-১৩৪। রায়-রায়ান উপাধিটি শুধু হিন্দুদেরকে প্রদান করা হত। এর অর্থ উপদেষ্টাদের উপদেষ্টা বা প্রধান উপদেষ্ট

[৭৯৫] সিয়ার, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৮১

[৭৯৬] সিয়ার, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৭৯-২৮০: টি.বি. পৃঃ ১২৮-১২৯

[৭৯৭] সিয়ার, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৮০: টি.বি. পৃঃ ১২৮-১২৯। শুজাউদ্দীন "তাদের (কারারুদ্ধ জমিদারদের) নিকট হতে এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আদায় করেন" এবং ফতেহ চাঁদের ব্যাংকের মাধ্যমে এই টাকা দিল্লী সম্রাটের ধন-ভান্ডারে প্রেরণ করেন" বলে যদুনাথ সরকার যে বক্তব্য দিয়েছেন(এইচ.বি. ২য় খন্ড, পৃঃ ৪২৪) তা তাওয়ারিখ-ই-বাঙ্গালার ভুল পাঠ করে দিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। কারণ তাওয়ারিখ-ই-বাঙ্গালায় অত্যন্ত সাধারণভাবে বলা হয়েছে যে, শুজাউদ্দীন জমিদারদের নিকট হতে নজরানা গ্রহণ করেন এবং তারপর আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, "জাগীর থেকে প্রাপ্ত মুনাফা ছাড়াও এমারাত, কারকানেহজাউত এবং নুজিরানেহ ইত্যাদির মাধ্যমে সংগৃহীত ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা প্রতি বৎসর জগৎ শেঠের ব্যাংকের মাধ্যমে শাহী ধন-ভান্ডারে প্রেরণ করা হত।" (টি.বি. পৃঃ ১২৯)। কাজেই প্রেরিত এ অর্থ ছিল বৎসরে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত মোট টাকা এবং জমিদারদের মুক্তির প্রাক্কালে তাদের থেকে গৃহীত শুধুমাত্র নজরানাই নয়

সুবাদারীর পদ দান করেন তাঁর জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলী খানকে। অন্যান্য নির্ভরযোগ্য এবং দায়িত্বপূর্ণ পদগুলোতে তিনি হাজী আহমদের তিন পুত্রকে নিয়োগ দান করেন এবং তারা তিন জন এর আগেই পুত্রহীন আলীবর্দীর তিন কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মুহাম্মদ রেযাকে (পরবর্তীতে নওয়াজিশ মুহাম্মদ উপাধিতে ভূষিত) সেনাবাহিনীর বখশী (বেতন প্রদানের দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রধান কর্মকর্তা),[৭৯৮] দ্বিতীয় জন, আগা মুহাম্মদকে (পরবর্তী কালে মির্যা সাঈদ আহমদ) রংপুর ঘোড়াঘাট অঞ্চলের ফৌজদার: আর সর্ব কনিষ্ঠ মুহাম্মদ হাশেম আলীকে (পরে মির্যা জয়নুদ্দীন উপাধিতে ভূষিত) আকবর নগরের (রাজমহলের) ফৌজদার নিয়োগ করা হয়।[৭৯৯]

এই সকল পদ পুন বন্টনের সঙ্গে সঙ্গে শুজাউদ্দীন সম্রাটের সমর্থন পাওয়ার জন্যও পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সম্রাটের জন্য তিনি সাবেক সুবাদারের ভূ-সম্পত্তির মূল্য হিসাবে “৪০ লক্ষ টাকা, প্রচুর সংখ্যক হাতি এবং অন্যান্য মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করেন।” বলা হয়ে থাকে যে, নতুন সুবাদার সাবেক সুবাদারের মালিকানাধীন ছাউনীর পুরানো অস্ত্রসস্ত্র এবং ব্যবহারের অযোগ্য পশু ইত্যাদি দ্বিগুণ মূল্যে ক্রয় করতে জমিদারদেরকে বাধ্য করেন। বছর শেষে শুজাউদ্দীন “দিল্লীতে নির্ধারিত রাজস্ব, প্রচলিত পেশকাশ হিসেবে হাতি, ঘোড়া, উৎকৃষ্ট কাপড় এবং অন্যান্য উৎপাদিত পণ্য” প্রেরণ করেন।[৮০০] শুজাউদ্দীন কর্তৃক প্রেরিত জিনিষপত্র পেয়ে এবং তাঁর অনুগত্য দেখে সম্রাট তাঁকে মুতামিনুল মূলক শুজাউদ্দীন মুহাম্মদ খান বাহাদুর আসাদ জং (সাম্রাজ্যের বিশ্বস্ত সেবক, ধর্মের পৃষ্ঠপোষক, সাহসী মুহাম্মদ খান এবং যুদ্ধে সিংহ সদৃশ) উপাধিতে ভূষিত করেন। তাছাড়াও তিনি

---

৭৯৮ সিয়ার, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৮১। তাওয়ারিখ-ই-বাঙ্গালা অনুযায়ী তাকে মুর্শিদাবাদের শুল্ক দপ্তরের দারোগা নিয়োগ করা হয়েছিল

৭৯৯ সিয়ার ১ম খন্ড, পৃঃ ২৮১ তাওয়ারিখ-ই-বাঙ্গালায় উল্লেখ কর হয়েছে যে, হাজী আহমদের ভ্রাতা মির্যা মুহাম্মদ আলীকে আলীবর্দী উপাধি দিয়ে রাজমহলের ফৌজদার নিয়োগ করা হয়েছিল। তাকে বিহারের নায়েব সুবাদার নিয়োগ করার আগ পর্যন্ত তিনি পরিষদের একজন সদস্য হিসেবে মুর্শিদাবাদই থাকবেন বলে সিয়ারের বক্তব্য দুটি কারণে সত্য বলে মনে হয়। প্রথম, হাজী আহমদের কনিষ্ঠ পুত্র মির্যা মুহাম্মদ হাশেমকে হাশেম আলী খান উপাধি দেয়া হয়েছিল বলে তাওয়ারিখ-ই-বাঙ্গালায় উল্লেখিত মন্তব্য(পৃঃ ১৩৫-১৩৬) স্পষ্টতই ঐতিহাসিকের একটি বিভ্রান্তি, কারণ এই লোকটির মূল নামই ছিল হাশেম আলী এবং তাকে অতিরিক্ত শুধু ‘খান’ উপাধি দেয়া হয়েছিল। যদি লেখকের কথাই ঠিক হয়ে থাকে, এবং এটা একান্তই একটি অতি তুচ্ছ পুরস্কার। দ্বিতীয়ত, আলীবর্দী খানকে যখন বিহারের নায়েব সুবাদার নিয়োগ করা হয়, তখন তিনি হাশেম আলী খানকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যান এবং রাজমহলের ফৌজদারের পদ শূন্য হলে সেখানে হাজী আহমদের জামাতা আতাউল্লাহ খানকে নিয়োগ দেয়া হয়

৮০০ টি.বি. পৃঃ ১২৯-১৩০

তাঁকে ৭ হাজারী জাত এবং অনুরূপ সংখ্যক অশ্বারোহী বিশিষ্ট মনসব, একটি খিলাত, ঝালোর বিশিষ্ট একটি পালকী এবং একটি পতাকা প্রদান করেন।[৮০১]

শুজাউদ্দীন নিজের অবস্থানকে সংহত করার লক্ষ্যে বেশি সংখ্যক লোকের সমর্থন আদায়ের জন্য সাবেক সরকারের দুজন গণ বিরোধী কর্মকর্তা যথা মুরাদ এবং নাজির আহমদকে বিচারের সম্মুখীন করেন। অত্যাচার এবং উদ্ধত ব্যবহারের জন্য তাদের বিচার করে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় এবং তাঁদের বিষয়-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। সলিমুল্লাহ লিখেছেন যে, "সংক্ষেপে তিনি তাঁর শাসনের শুরুতে তাঁর সাধারণ আচরণ দ্বারা দেখান যে, তিনি তাঁর প্রাপ্ত সৌভাগ্যের উপযুক্ত।"[৮০২] শেষে হলেও বিষয়টি মোটেই গুরুত্বহীন নয় যে, শুজাউদ্দীন এ কথা পুরোপুরি উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁর শক্তি এবং নিরাপত্তা নির্ভর করে তাঁর নিজের অধীনে একটি সুসজ্জিত ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী থাকার উপর; তাই শুজাউদ্দীন অশ্বারোহী, বরকন্দাজ এবং পদাতিকসহ তাঁর সৈন্যসংখ্যা ২৫০০০-এ উন্নীত বা বৃদ্ধি করেন। তিনি উদারভাবে তাদের বেতন ও ভাতা নির্ধারণ করে তাদের একাত্মতা এবং সহযোগিতা লাভ করেন।[৮০৩]

৩. জাহাঙ্গীর নগরের ঘটনাবলী

ত্রিপুরা বিজয়

শুজাউদ্দীনের কর্মকর্তা এবং বন্ধু বান্ধবগণ তাঁর জন্য খুব ভালভাবে কাজ করেন। বিশেষ করে বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে তাঁর জামাতার শাসন ব্যবস্থা খুব সফল বলে প্রমাণিত হয়। জাহাঙ্গীরনগর থেকে রাজধানী স্থানান্তর করার পরে অন্ততঃ একবার শুজাউদ্দীনের শাসনামলে ঐ স্থানের পরিস্থিতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেখানে মুর্শিদ কুলী খান দ্বিতীয়কে পারস্যের অন্তর্গত সিরাজের মীর হাবিব নামে একজন প্রতিভাশালী লোক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সাহায্য-সহযোগিতা করেন, তিনি অবশ্য কিছুদিন হুগলীতে একজন "অতি সাধারণ দালাল" হিসেবেও কাজ করেছেন। তার কোন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। তাই তিনি লিখতে ও পড়তে জানতেন না। কিন্তু "তিনি ফার্সী ভাষায় অনর্গল কথা

---

৮০১ টি.বি. পৃঃ ১৩০-১৩১। (আইনী আকবরীর অনুদিত ১ম খন্ড, পৃঃ ২৪৫) ভিত্তিতে গ্লাডউইন দেখিয়েছেন যে, সাত হাজারী ধাত মনসবের জন্য বৎসরে ৪৫,০০০.০০ টাকার ভাতা নির্ধারিত ছিল

৮০২ টি.বি. পৃঃ ১৩২

৮০৩ টি.বি. পৃঃ ১৩১

বলতে পারতেন এবং শীঘ্রই মুর্শিদাবাদে দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলী খানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলেন। শেষোক্তজন তাকে ঢাকায় নিয়ে আসেন এবং তার সহকারী নিযুক্ত করেন। একজন সফল ব্যবসায়ীর লব্ধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মীর হাবিব একজন সৈনিক ও একজন ব্যবসায়ীর বিরল যোগ্যতার অধিকারী হয়েছিলেন এবং তিনি অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম সহকারে তার দায়িত্ব পালন করতেন।[৮০৪] তিনি নৌ-বাহিনীর খরচ এবং অন্যান্য ব্যয়বহুল কাজ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে প্রশাসনের ব্যয় সংকোচন করেন এবং একচেটিয়াভাবে কিছু ব্যবসা পরিচালনা করে তার নিয়োগ কর্তার জন্য বিপুল অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা করেন।[৮০৫] তার বাণিজ্যিক অভিজ্ঞতাই তাকে নিশ্চিতভাবে একচেটিয়া ব্যবসা শুরু করার পথে চালিত করে; কিন্তু কি কি পণ্যের উপর একচেটিয়া ব্যবসা চালু করা হয়েছিল বা সাধারণভাবে জনগণের উপর এর কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল, তা অবশ্য জানা যায়নি। অনুরূপভাবে আরেকটি বিষয়ের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন বলা হলেও সে বিষয়টি অন্ধকারেই রয়ে গেছে। বলা হয় যে, তিনি বিশ্বাস ঘাতকতা করে ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমার জমিদার নুরুল্লাহকে মৃত্যুদণ্ড দেন এবং তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন।[৮০৬]

মীর হাবিবের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হচ্ছে ত্রিপুরা (পার্বত্য টিপারা) বিজয়। সে দেশের আভ্যন্তরীণ কোন্দলই তাকে এ দেশ জয় করার সুযোগ এনে দেয়। সে দেশের সাবেক রাজার পুত্র তার চাঁচা কর্তৃক বহিস্কৃত হয়ে ঢাকায় পালিয়ে আসেন এবং তার পৈত্রিক রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য কর্তৃপক্ষের সাহায্য চান। নায়েব সুবাদারের সম্মতি নিয়ে মীর হাবিব ত্রিপুরার রাজপুত্রকে তার জন্য "জমিদারী মঞ্জুরের" আশ্বাস দেন। সে অনুয়ায়ী মীর হাবিব প্যাট পিসারের জমিদার আগা সাদেককে সঙ্গে নিয়ে ত্রিপুরায় এক অভিযান পরিচালনা করেন। ত্রিপুরার রাজপুত্র "পাহাড়ী পথ এবং নদীর অগভীর" অংশের উপর দিয়ে সৈন্য নিয়ে হঠাৎ রাজধানীর সন্নিকটে এসে উপস্থিত হন। তার চাচা সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিলেন বলে কোন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পেরে পালিয়ে যান এবং পাহাড়ী অঞ্চলে আশ্রয় নেন; ফলে পুরো দেশই মীর হাবিবের অধিকারে চলে আসে। মীর হাবিব চণ্ডিগড় ও জয়ন্তাসহ প্রধান প্রধান দূর্গ দখল করেন এবং প্রচূর পরিমাণ গণিমত (যুদ্ধলব্ধ অর্থ সম্পদ) লাভ করেন। পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি

---

৮০৪ টি.বি. পৃঃ ১৪১

৮০৫ টি.বি. পৃঃ ১৪১-১৪২

৮০৬ টি.বি. পৃঃ ১৪২

রাজপুত্রকে জমিদারি অর্পন করেন। আবার অন্য অর্থে পুরো দেশটিই সুবে বাংলার অন্তর্ভূক্ত করে নেন। তিনি আগা সাদিককে সে দেশের জন্য ফৌজদার নিয়োগ করেন এবং বিভিন্ন এলাকায় শক্তিশালী সেনা-শিবির স্থাপন করেন। নতুন বিজিত রাজ্যের জন্য এই ব্যবস্থা করে প্রচূর পরিমাণ গণিমতের মাল এবং বহু সংখ্যক হাতিসহ মীর হাবিব জাহাঙ্গীর নগরে প্রত্যাবর্তন করেন। দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলী খান এই নতুন বিজয়ের বিস্তারিত বিবরণসহ প্রাপ্ত গণিমতের বৃহদাংশ শুজাউদ্দীনের জন্য প্রেরণ করেন। শুজাউদ্দীন ত্রিপুরার নাম পরিবর্তন করে এর নাম রাখেন রওশনাবাদ (আলোর দেশ) এবং দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলী খানকে বাহাদুর (বীরবিক্রম) এবং মীর হাবিবকে 'খান' উপাধি প্রদান করেন।[৮০৭]

দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলী ১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় সাত বৎসর জাহাঙ্গীর নগরে ছিলেন এবং সে বৎসর তকী খানের মৃত্যু হলে তাকে নায়েব সুবাদার হিসেবে উড়িষ্যায় বদলী করা হয়। মীর হাবিবও তাকে অনুসরণ করেন। এবার ঢাকার নায়েব সুবাদারী আনুষ্ঠানিকভাবে সরফরাজ খানকে প্রদান করা হয়। সরফরাজ খান অবশ্য রাজধানী (মুর্শিদাবাদ) ত্যাগ করেননি। তিনি বরং "পারস্যের রাজ পরিবারের একজন সদস্য" গালিব আলী খানকে ঢাকায় তার প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেন; রাজস্ব বিষয়ে তাকে সাহায্য করার জন্য মুর্শিদ কুলী খানের সময়ের একজন অভিজ্ঞ কর্মকর্তা যশওয়ান্ত রায়কে দেয়া হয়। সরফরাজ খান ঢাকার নওয়ারার (নৌ-বাহিনীর) দারোগা হিসেবে নিয়োগ দেন তাঁর জামাতা এবং বৈপিত্রেয় বোনের (নাফিসা বেগমের) ছেলে মুরাদ আলী খানকে। নওয়াব শায়েস্তা খানের আমলে ঢাকার যে উন্নতি হয়েছিল, গালিব আলী খানের সময়েও ঢাকার সেরূপ উন্নতি ও অগ্রগতি সাধন করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। যশোবন্ত রায় রাজস্ব প্রশাসক হিসেবে দক্ষতার পরিচয় দেন। সাবেক শাসনামলে যে সকল একচেটিয়া কারবার চালু করা হয়েছিল এবং খাদ্য শষ্যের উপর বিভিন্ন রকম কর বসানো হয়েছিল, তিনি তা বিলোপ করেন।[৮০৮] এতে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কৃষির উন্নতি হয় এবং শায়েস্তা খানের সময়ে যেমন ছিল, খাদ্য শষ্যের মূল্য হ্রাস পেয়ে ১টাকায় ৮মণ (প্রায় ৩২০ কেজি) চাল পাওয়া যেত। স্মরণ করা যেতে পারে যে, নওয়াব শায়েস্তা খান দিল্লীর উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করার প্রাক্কালে নগরের পশ্চিম প্রান্তের প্রবেশ দ্বার এই বলে বন্ধ করে দিয়েছিলেন যে, চালের মূল্য এ পর্যায়ে নামিয়ে আনতে না পারলে কেহ যেন এই দরজা আর না খোলেন। এই প্রবেশ

---

[৮০৭] টি.বি. পৃঃ ১৪১-১৪৩

[৮০৮] টি.বি. পৃঃ ১৪৯

দ্বার আবার খুলে দেয় হয়। সলিমুল্লাহ লিখেছেন,"মানবিক ও সুষ্ঠু নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত বিচক্ষণ প্রশাসন ব্যবস্থার ফলে সমৃদ্ধ জাহাঙ্গীর নগর প্রদেশের প্রতিটি এলাকাই আবাদি এলাকায় পরিণত হয় এবং একটি বসন্ত মৌসুমের বাগানের মত রূপ লাভ করে।[৮০৯]

এই অবস্থা ততদিন অব্যাহত ছিল যতদিন গালিব খান ও যশবন্ত রায় ঢাকায় ছিলেন। কিছু দিন পরে অবশ্য সরফরাজ খানের জামাতা মুরাদ আলী খানকে গালিব আলী খানের স্থলাভিষিক্ত করা হয়। মুরাদ খালী খান নৌ-বাহিনীর পেশকার (করণীক) রাজ বল্লভকে তার উপদেষ্টা নিয়োগ করেন এবং দু'জনে এমন আচরণ শুরু করেন যে, যশওয়ান্ত রায় বিরক্ত হয়ে পদত্যাগ করেন। পরিণতিতে বিভিন্ন অনিয়মের কারণে প্রদেশের রাজস্ব ব্যবস্থা পুনরায় এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় যে, শুজাউদ্দিনের শাসনের শেষ দিকে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং উন্নতি আর আগের মত ছিল না।

৪. উড়িষ্যা এবং অন্যান্য বিষয়

দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলী খান এবং তার সহকারী মীর হাবিব আগের মত উড়িষ্যায়ও কঠোর হস্তে প্রশাসন পরিচালনা করেন। এখানেও তারা "বিপুলভাবে ব্যয় হ্রাস করেন" এবং আরো নতুন কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, যার ফলে উল্লেখযোগ্যভাবে রাজস্ব বৃদ্ধি পায়।[৮১০] সেখানে দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলী খানের একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হচ্ছে পুরীর হিন্দুদের দেবতা জগন্নাথের মুর্তির উপর অভিভাকত্ব এবং সেখানে হিন্দুদের তীর্থ যাত্রার উপর পুনরায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। তাঁর পূর্বসুরী মুহাম্মদ তকী খানের সময়ে পুরীর জমিদার মূর্তিটিকে "উড়িষ্যার সীমা অতিক্রম করে চিলকা হ্রদের অপর পাড়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তার এই কাজে সরকার রাজস্ব আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস থেকে বঞ্চিত হয় এবং এতে বৎসরে তীর্থ যাত্রীদের নিকট থেকে সংগৃহীত" প্রায় নয় লাখ টাকা রাজস্ব হ্রাস পায়। দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলী খান পার্শ্ববর্তী হিন্দু এলাকার বিরুদ্ধে মীর হাবিবকে প্রেরণ করেন, যেখানে পুরীর জমিদার মূর্তিটিকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানকার শাসক ডুগু দেব (রামচন্দ্র দেব?) দ্বিতীয় প্রচুর নজরানা প্রদান এবং মূর্তিটিকে ফেরত দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হন। অতএব, এইভাবে পুরীর তীর্থ যাত্রার উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাজস্বের ক্ষতি বন্ধ হয়।[৮১১]

---

[৮০৯] টি.বি. পৃঃ ১৫০
[৮১০] টি.বি. পৃঃ ১৪৩-১৪৫
[৮১১] টি.বি., পৃঃ ১৪৪

শুজাউদ্দীনের শাসনামলের শেষের দিকে তাঁর অধিনস্থ কুচবিহারের রাজা এবং দিনাজপুরের জমিদার "তাদের ধন সম্পদ ও শক্তি সামর্থের উপর আস্থাশীল" হয়ে রাজস্ব এবং কর প্রদান বন্ধ করে দেন এবং "নিজেকে স্বাধীন করতে চান।" তখন শুজাউদ্দীন রংপুরের ফৌজদার মির্যা মুহাম্মদ সাঈদের (হাজী আহমদের দ্বিতীয় পুত্র) অধীনে তাদের বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করেন। তার এই অভিযান পুরোপুরি সফল হয়, পুরো দেশই তিনি দখল করেন, এর সঙ্গে লাভ করেন বিপুল পরিমাণ ধন সম্পদ, যা রাজা এবং তার পূর্ব পুরুষরা পুঞ্জীভূত করেছিলেন।" কুচ বিহারকে সুবার অন্তর্ভূক্ত করে নেয়া হয়। এই বিজয়ের জন্য শুজাউদ্দীন মির্যা সাঈদকে "খান এবং বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন।[৮১২] এই সময়ে আবার বীরভূমের আফগান জমিদার বদিউজ্জামান তার মালিকানাধীন প্রায় ১৪,০০,০০০ বিঘা (৭,০০,০০০ একর) আবাদি জমির রাজস্ব প্রদান বন্ধ করে দেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ফলে ঐ জেলার দায়িত্বে নিযুক্ত সরফরাজ খান মীর শরাফ উদ্দীন এবং খাজা বাসন্তের নেতৃত্বে তার বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করেন। বদিউজ্জামান ঐ বাহিনীর বিরোধিতা করা অসম্ভব ভেবে বশ্যতা স্বীকার করাকেই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেন। দুই সেনাপতি তাঁকে সঙ্গে করে মুর্শিদাবাদ নিয়ে আসেন এবং বৎসরে তিন লক্ষ টাকা কর প্রদানের অঙ্গীকার এবং বর্ধমানের জমিদার কীরাত সিংহ "তার কার্যকলাপের ব্যাপারে জামিন হওয়ায়" শুজাউদ্দীন তাকে ক্ষমা করেন এবং বীরভূমে ফিরে যেতে অনুমতি দেন।[৮১৩]

৫. বিহার সংযোজন

আলীবর্দী খানের উত্থান

১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দের দিকে বিহারের সুবাদার ফখরুদ্দৌলাহ দিল্লীর দরবারে প্রভাবশালী আমির খান-ই-দৌরানের সঙ্গে এক বিবাদে জড়িয়ে পড়েন, ফলে তিনি পদচ্যূত হন। এর পর খান-ই-দৌরানের ইচ্ছাতেই বিহারের দায়িত্বও শুজাউদ্দীনকে প্রদান করা হয়। তিনি তাঁর পুত্র সরফরাজ খানকে নতুন সংযোজিত প্রদেশের নায়েব সুবাদার নিযুক্ত করতে ইচ্ছা করেছিলেন, কিন্তু সরফরাজ খানের মাতা জিন্নাতুন্নেসা তার পুত্রের নিকট থেকে আলাদা থাকতে এবং তাকে রাজধানী থেকে দূরে পাঠাতে রাজী হননি। তাই এজন্য আলীবর্দী খানকে মনোনীত করা

৮১২ টি.বি.. পৃঃ ১৪৭-৪৮
৮১৩ টি.বি.. পৃঃ ১৫১

হয়। সিয়ারের বর্ণনানুযায়ী জিন্নাতুন্নেসা নিজেই আনুষ্ঠানিকভাবে আলীবর্দী খানকে দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি তার বাসভবনের দ্বার পর্যন্ত আলী বর্দী খানকে ডেকে পাঠান এবং তাঁর কাঁধে এক দামী খিলাত (শাসনকর্তা কর্তৃক কাউকে উপঢৌকন হিসেবে প্রদত্ত পোশাক) রেখে "তিনি নিজেই (জিন্নাতুন্নেসা) আলীবর্দী খানকে বিহারের দায়িত্ব ন্যাস্ত করেন।" এই ঘটনার পরই শুজাউদ্দীন তার নিজের পক্ষ থেকেও তাকে একটি খিলাত এবং নায়েব সুবাদারীর সনদসহ উপঢৌকন হিসেবে "একটি হাতি, একটি তলোয়ার এবং বিশেষ পরিমাণ রত্ন প্রদান করেন।"[৮১৪] শুজাউদ্দীন খান অবশ্য আলীবর্দী খানকে "মহাবত জং (যিনি যুদ্ধে ভয়ংকর) উপাধি, একটি ঝালরযুক্ত পালকী, একটি পতাকা এবং একটি নাকাড়া" উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করেন এবং তার মনসব পাঁচ হাজার অশ্বে উন্নীত করার জন্য সম্রাট এবং খান-ই-দৌরানকে অনুরোধ জানান।[৮১৫] তাঁর এই পদ মর্যাদা লাভের মাত্র অল্প কিছুদিন পূর্বে তাঁর কনিষ্ঠ কন্যা আমিনা বেগমের ঘরে তার এক দৌহিত্র জন্ম গ্রহণ করে।

আমিনা বেগমের বিয়ে হয়েছিল তার কনিষ্ঠ ভ্রাতুস্পুত্র হাশেম আলী খানের (পরে জৈনুদ্দীন আহমদ খান নামে অভিহিত) সঙ্গে। যেহেতু আলীবর্দীর কোন পুত্র সন্তান ছিল না, তাই তিনি এই শিশুটিকে অত্যন্ত আপন করে গ্রহণ করেন এবং নিজ নামানুসারে তার নাম রাখেন মির্যা মুহাম্মদ আলী (পরে তাকে বাদশাহ কুলী এবং সিরাজ উদ্দৌলাহ উপাধিতে ভূষিত করা হয়)। আলীবর্দী তাকে, তার পিতাকে এবং তাঁর (আলী বর্দীর) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুস্পুত্র এবং জামাতা মুহাম্মদ রেজাকে (নওয়াজিশ মুহাম্মদ খান) তার সঙ্গে করে বিহারে নিয়ে যান। শুজাউদ্দীন আলীবর্দী খানের সঙ্গে ৫০০০ অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্যও প্রেরণ করেন।[৮১৬]

বিহারে গিয়ে আলীবর্দী খান তার প্রশাসনিক এবং সামরিক যোগ্যতা প্রদর্শন এবং নিজ শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র লাভ করেন, যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীকালে বাংলার মসনদ লাভে সক্ষম হন। বিহারের সাবেক নায়েব সুবাদার ফখরুদ্দৌলাহর সময় বিহারের প্রশাসন ব্যবস্থা ভীষণভাবে বিপর্যস্ত

---

৮১৪ সিয়ার, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৮২

৮১৫ ঐ, তাওয়ারিখ-ই-বাঙ্গালাহতে বর্ণিত হয়েছে যে, আলীবর্দী খান বিহারে যাওয়ার পরে তাঁর বন্ধু ইসাহাক খান এবং দিল্লীর অন্যান্য মন্ত্রীদের মাধ্যমে মহাবত জং উপাধি লাভ করেন এবং "তার পৃষ্টপোষক এবং উপাকারী" শুজা খান তা জানতেন না বলে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে, তা সত্য বলে মনে হয় না। তিনি অবশ্য সেখানে যাওয়ার পরেই উপাধি ও সম্মান এসে পৌছায়

৮১৬ টি.বি. পৃঃ ১৩৮

হয়ে পড়েছিল। তার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কয়েকটি এলাকায় যথা বেটিয়া, ভোজপুর, ফুলওয়ারা এবং চকওয়ারের জমিদারগণ সরকারকে রাজস্ব প্রদান বন্ধ করে দেন এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই স্বাধীনভাবে আচরণ শুরু করেন। মুঙ্গীরের নিকটবর্তী এই শেষোক্ত স্থানের জমিদার এবং বিশেষভাবে একই এলাকার বাঞ্জারা গোত্র ভীষণ উৎপাত শুরু করে দেয়। বাণিজ্য করার ছদ্মাবরণে তারা প্রায় সারা দেশ থেকে "অর্থ আদায় শুরু করে এবং সরকারী রাজস্ব লুণ্ঠন শুরু করে।"[৮১৭] তাদের মধ্যে সর্বাধিক দুধর্ষ জামিদার ছিলেন টিকারীর সুন্দর সিংহ এবং নরহাট সামাইর নামদার (কামগার) খান মঈন।

'Alivardi Khān Hunting Near Rajmahal
Gouche. Murshidabad School, c. 1750. Preserved in the Victoria and Albert Museum, London. By courtesy of the Trustees of the Victoria and Albert Museum.
(To face p. 820)

বিদ্রোহী জমিদার এবং উপজাতিগুলিকে নিয়ন্ত্রণে এনে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং দেশে শান্তি স্থাপনের জন্য আলীবর্দী ছিলেন কৃতসংকল্প। তিনি অবশ্য এটা উপলব্ধি করেন যে, বাংলা থেকে প্রেরিত মাত্র ৫০০০ অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্য এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়। তাই তিনি প্রথমেই নিজের জন্য একটি সুসংগঠিত এবং সুসজ্জিত সেনাবাহিনী গড়ে তোলার প্রতি মনোনিবেশ করেন। মনে হচ্ছে যে, এই সময়ে সম্ভবত পারস্যের সম্রাট নাদির শাহের ভয়ে বিপুল সংখ্যক আফগান নিরাপত্তা এবং সুযোগের সন্ধানে ভারতের

---

৮১৭ ঐ

পূর্বাঞ্চলের দিকে আগমন করেন। যেহেতু, তখন বিহারে এই ধরণের আফগানদের সংখ্যা ছিল প্রচুর, তাই আলীবর্দী খানের বাহিনীতে নিয়োগের জন্য অতি প্রয়োজনীয় মূহূর্তে তিনি প্রচুর সৈন্য পেয়ে যান।[৮১৮] এইভাবে তিনি বড় আকারের একটি সেনাবাহিনী গঠন করেন এবং তিনি যাদেরকে তার অধীনে চাকুরী দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে "আবদুল করিম নামে একজন আফগান রোহিলা তার দেশী ১৫০০ আফগান সৈন্য পরিচালনা করতেন," তাদের নিয়ে একটি শক্তিশালী সৈন্য বাহিনী গড়ে তোলে তিনি বিদ্রোহী জমিদারকে একে একে শায়েস্তা করেন ও প্রদেশের সকল অঞ্চলের উপরই নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। "তারা সকলে নজরানা এবং পেশকাশ (সম্মানজনক উপঢৌকন এবং কর) প্রদান করতে সম্মত হন এবং তাদের প্রদেয় রাজস্বের পরিমাণ স্থায়ীভাবে নির্ধারণ করা হয়। এই বিজয়ের কারণে এবং আব্দুল করিম এবং তাঁর সৈন্যরাও লুন্ঠন কাজের মাধ্যমে সম্পদশালী হয়ে যান।"[৮১৯] মাত্র এক বৎসরের মধ্যে সারা প্রদেশ তাঁর কার্যকরী নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এনে আলীবর্দী খান তাঁর নিয়োগকর্তা এবং উপকারী শুজাউদ্দীন খানকে সম্মান জানানোর জন্য মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন। শুজাউদ্দীনও তাঁকে যথাযোগ্য মর্যাদা ও অনুগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং তাঁকে পুনরায় বিহারের দায়িত্ব দিয়ে সেখানে পাঠিয়ে দেন। শীঘ্রই তিনি দিল্লী থেকে উপাধি ও সম্মান লাভ করেন, শুজাউদ্দীন এই জন্য আগেই দিল্লীতে সুপারিশ পাঠিয়েছিলেন।

এসব উপাধি এবং আনুষ্ঠানিক মর্যাদায় আলীবর্দী খানের চোখে ধাঁধাঁ লাগেনি। "একজন বিচক্ষণ এবং পরিশ্রমী ব্যক্তি একটি বিরাট উদ্যোগী মনের অধিকারী হওয়ায় তিনি সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত রাখেন এবং তাদেরকে পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ-খাইয়ে চলতে অভ্যস্ত করে তোলেন। তিনি প্রজাদের অন্তর জয় করেন এবং তাঁর নিজের প্রতি সৈন্যদেরকে আকৃষ্ট করেন... । সর্বোপরি, তাঁর স্থায়ী নিয়ম ছিল যে, পার্শ্ববর্তী যে কোন রাজ্যের সামরিক চরিত্র বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে পারলেই তিনি তাকে তাঁর নিজ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করতেন; এইভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এমন একটি বাহিনী গড়ে তোলেন, যা ছিল সুসজ্জিত এবং সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তার সব কিছু দ্বারা সমৃদ্ধ।"[৮২০] তাঁর কিছু সংখ্যক আফগান সৈন্য অবশ্য কিছুটা সমস্যাও সৃষ্টি করে; তবে তিনি ছিলেন সতর্ক এবং তাদেরকে শায়েস্তা করতেও মোটেই

---

৮১৮ সিয়ার, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৮৩

৮১৯ টি.বি. পৃঃ ১৩৯

৮২০ সিয়ার, ১ম খন্ড, ২৮৩

দ্বিধা করেন নি এবং যারা ভবিষ্যতে সম্ভাব্য বৈরী উপাদান, তাদের সামনে এভাবে উদাহরণ সৃষ্টি করেন। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে আব্দুল করিম খানের কথা উল্লেখ করা যায়। এই আফগান ছিলেন "তার নিজ শৌর্য-বীর্যে গর্বিত, তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রতি অমনোযোগী এবং কাউকে কোন ভয় করতেন না, তার প্রভূর প্রতি অবাধ্য এবং অব্যাহতভাবে এমন সব অন্যায় আচরণ করে যেতেন, যা থেকে তার এমন একগুঁয়ে এবং স্বাধীন চেতা মন-মেজাজ প্রকাশ পায় যে, তিনি ছিলেন সর্ব প্রকার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত।"[৮২১] আলীবর্দী খান উপলব্ধি করেন যে, তার এই বাড়াবাড়ি এবং ঔদ্বত্যের প্রতি আরো উপেক্ষা করা হলে তা হবে চরম নির্বুদ্ধিতা এবং ভয়াবহ; কিন্তু তার সঙ্গে কোন প্রকাশ্য দ্বন্দ্বকেও সমীচীন মনে করা হয়নি। তাই আলীবর্দী খান তার বিরুদ্ধে কয়েকজন বিশ্বস্ত লোক নিয়োগ করেন এবং কোন এক সকালে তিনি যখন তার "বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের জবাব দিতে যাচ্ছিলেন," তখন তারা তাকে হত্যা করেন।[৮২২] এইরূপ একজন ক্ষমতাশালী সেনাপতিকে এমন ভয়াবহ এবং অনিয়মের মাধ্যমে হত্যা করিয়ে অন্যান্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী উপাদানগুলোর মধ্যে ভীতি সঞ্চার এবং তাদেরকে নিরব করে ফেলেন। পরবর্তীকালে আলীবর্দী খান যখন বাংলার সুবাদার হন, তখনও এই আফগান সৈন্যরা তাঁর জন্য অব্যাহতভাবে সমস্যা সৃষ্টি করতে থাকে। শুজাউদ্দীনের শাসনের অবশিষ্ট সময়ব্যাপী আলীবর্দী খান তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন এবং বিহারে তাঁর নায়েব সুবাদার হিসেবে কঠোর হস্তে এবং দক্ষতার সঙ্গে বিহারের শাসন পরিচালনা করেন এবং একই সঙ্গে তাঁর নিজের আর্থিক ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকেন।

৬. ইউরোপীয় বণিক

ইউরোপীয় বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্যের যে ধারা তাঁর পূর্বেই শুরু হয়েছিল, তা তাঁর আমলেও অব্যাহত থাকে। শুজাউদ্দীন খান মসনদে আরোহণ করার পূর্বে তারা যে সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন, সাধারণত তার ভিত্তিতেই তাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নির্ণীত হয়। ইংরেজদের নথিপত্রে অবশ্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা "বাধা সৃষ্টি" এবং মাঝে মধ্যে "বলপূর্বক অর্থ আদায়ের" উল্লেখ পাওয়া যায়; কিন্তু একটু নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করলেই বুঝা যায় যে, এসব ঘটনা ছিল

---

[৮২১] সিয়ার, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৮৪

[৮২২] ঐ, এবং টি.বি., পৃঃ ১৩৯

আসলে ইউরোপীয় বণিকদের বাড়াবাড়ি এবং অনিয়মের ফল। তাদের আচার-অচরণের ফলেই এমন ৫টি সাধারণ বিষয় সৃষ্টি হয়েছিল, যা তাদের এবং সরকারের সম্পর্কের মধ্যে টানা-পোড়েন সৃষ্টি করে। এসব কারণের মধ্যে

প্রথমত, ইংরেজ, ফরাসী এবং ওলন্দাজদের দ্বারা অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি, বিশেষ করে অষ্টেণ্ডারদেরকে বাংলায় বাণিজ্য করার পথে বাধা সৃষ্টি এবং নিছক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাদেরকে এদেশ থেকে বহিস্কার করে দেয়া।

দ্বিতীয়ত, তারা তাদের সাধারণ বাণিজ্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আবার নিজেরা পরস্পরের বিরুদ্ধে ছিল তীব্র বৈরী এবং তারা প্রায়ই স্থানীয় কর্মকর্তাদেরকে একে অপরের বিরুদ্ধে উস্কানী দিয়ে নিজেদের পক্ষে টানার চেষ্টা করে। স্থানীয় ঠিকাদার এবং উৎপাদনকারীদেরকে অন্য বণিকদের সঙ্গে কারবার করতে বাধা দিতে গিয়ে একদিকে নিজেদের জন্য এবং অন্যদিকে সরকারের জন্যও জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

তৃতীয়ত, ইংরেজরা তাদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য বিপুলভাবে সম্প্রসারণ করেছিল এবং তাদের দ্বারা দস্তক (মালপত্র চলাচলের ছাড়পত্র) প্রদানের সুবিধাকে ব্যাপকভাবে অপব্যবহার করা আরম্ভ করেছিল। নিজেদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়েও তারা তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত স্থানীয় বহু বণিকদের জন্যও দস্তক প্রদানের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয়কে বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে দেয়।

চতুর্থত, মুর্শিদ কুলী খানের মৃত্যুর পরে তারা কলিকাতা, সৃতানুটি এবং গোবিন্দপুর গ্রাম তিনটির ইজারা নেয়া সত্ত্বেও এগুলোর জন্য খাজনা প্রদান বন্ধ করে দিয়েছিল। এ গ্রামগুলোর জন্য রাজস্ব দাবী করাকে তারা "অতিরিক্ত অর্থ দাবী" ও "বলপূর্বক অর্থ আদায়" ইত্যাদি বলে অপব্যাখ্যা করত।

পঞ্চমত, মুর্শিদ কুলী খানের নিকট থেকে সরকারী টাকশালের মাধ্যমে তাদের স্বর্ণের পিণ্ড দ্বারা বিনা মাশুলে মুদ্রাঙ্কনের সুবিধা আদায় করতে ব্যর্থ হয়ে তারা বাংলায় তাদের বাণিজ্য পরিচালনার জন্য মাদ্রাজী মুদ্রা ব্যবহারের চেষ্টা করে; তাদের এই প্রচেষ্টা সরকার এবং ফতেহ চাঁদ জগৎ শেঠ কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হয়। কারণ ফতেহ চাঁদ একটি নির্ধারিত হারে মাশুল দিয়ে সরকারী টাকশাল থেকে স্বর্ণের বুলিয়ন দ্বারা মুদ্রাঙ্কন করার সুবিধা লাভ করেছিলেন। কাজেই, ইউরোপীয় বণিকদেরকে জগৎ শেঠের নিকট সোনার বুলিয়ন বিক্রি করে দিয়ে তার নিকট হতে মুদ্রা সংগ্রহ করতে হত। এতে কোন কোন সময় তাদের জন্য কিছুটা সমস্যা সৃষ্টি হত।

বাংলায় বাণিজ্য করার অনুমতি সম্বলিত একটি শাহী ফরমান লাভের উদ্দেশ্যে মুর্শিদ কুলী খানের মৃত্যুর পূর্বে অস্টেণ্ডারগণ এক সমঝোতার মাধ্যমে তাঁর নিকট ৩০,০০০.০০ টাকা এবং জগৎ শেঠের নিকট ৭০,০০০.০০ টাকা জমা দেয়।[৮২৩] মুর্শিদ কুলী খান তাঁর মৃত্যুর পূর্বে এই ফরমান সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে পারেননি। কিন্তু তিনি তাঁর মৃত্যুর পূর্বে অস্টেণ্ডারদেরকে বাংলায় বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়ে এক পরওয়ানা প্রদান করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে অস্টেণ্ডারদেরকে প্রদত্ত নওয়াবের পরওয়ানা বাতিল করা এবং তাদেরকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য ইংরেজ এবং ওলন্দাজরা ঐক্যবদ্ধ হয়। ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের এক সেনাদল হুগলী নদী অবরোধ করে এবং কলিকাতা ও বঙ্কিমবাজারের উজানে এং কলিকাতা থেকে ১৫ মাইল উজানে জার্মানদের দুটি জাহাজের একটিকে দখল করে নেয়। এই বিষয় নিয়ে সৃষ্ট বিতর্কের অবসান হওয়ার পূর্বেই তারা ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে হুগলীর ফৌজদারকে বিপুল পরিমাণ উৎকোচ দিয়ে বাংলায় তাদের বাণিজ্য করা থেকে বিরত রাখার জন্য তাদের বিরুদ্ধে একটি সেনাদল প্রেরণের ব্যবস্থা করে। শুজাউদ্দীনের সরকার স্পষ্টতই একটি বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যায়। এর কারণ একদিকে, ফৌজদারের কর্মকাণ্ড এবং অন্যদিকে ইংরেজদের দ্বারা অস্টেণ্ডারদের দুটি জাহাজের একটি দখল করে নেয়া। অবশেষে ইংরেজদের নথিপত্র অনুযায়ী অস্টেণ্ডারদের জাহাজ দখলের প্রতি নওয়াবের পরোক্ষ সম্মতি আদায় করার জন্য ওলন্দাজদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নওয়াবের সরকারকে তাদের দু'লক্ষ টাকা দিতে হয়েছে।[৮২৪] খুব সম্ভব অস্টেণ্ডারদের ক্ষতি পূরণ করার জন্য এই অর্থ নেয়া হয়েছিল; তাই ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দের দিকে বাংলায় তাদের বাণিজ্য বাস্তবে বন্ধ হয়ে যায়, যদিও ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তা কোন রকমে টিকে ছিল; অবশেষে আলীবর্দী খানের শাসনামলে তাদেরকে বাংলা থেকে বহিস্কার করে দেয়া হয়।

সরকারের জন্য এর থেকেও বড় বিরক্তির কারণ ছিল ইংরেজ এজেন্টদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ব্যাপক বৃদ্ধি এবং তাদের দ্বারা দস্তকের অপব্যবহার। শুজাউদ্দীন প্রায়ই অভিযোগ উত্থাপন করতেন যে, "ইংরেজরা বণিকদের বিপুল পরিমাণ মালামালকে আড়াল করে দিচ্ছে, এর ফলে নওয়াবকে তার প্রাপ্য শুল্ক থেকে প্রতারিত করা হচ্ছে।" মনে হচ্ছে অস্টেণ্ডারদের জাহাজ আটকের পরপরই ১৭৩৪-৩৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে এই বিতর্কটি তীব্র আকার ধারণ করে। ইংরেজদের

---

৮২৩ আব্দুল করিম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৯

৮২৪ এইচ,বি. ২য় খন্ডে উদ্ধৃত, পৃঃ ৪৩০

দস্তকের মাধ্যমে কাঁচা রেশমের বেল এবং কাপড় বোঝাই কয়েকটি নৌকা হুগলীর ফৌজদার আটক করেন। কলিকাতার ইংরেজ কাউন্সিল এই ঘটনার প্রতি তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে এবং একদল সৈন্য প্রেরণ করে। তারা হুগলী দুর্গের দেয়াল টপকিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে এবং ফৌজদারকে অপমান করে মালামাল সব ছিনেয়ে নিয়ে আসে।[৮২৫] এই ঘটনার খবর জানার পর শুজাউদ্দীন হুগলীতে সৈন্য প্রেরণ করেন এবং কলিকাতা ও কাসিম বাজারে খাদ্যশস্য প্রেরণ বন্ধ করে দেন। ইংরেজরা শুজাউদ্দীনকে তিন লক্ষ টাকা প্রদানে সম্মত হয়ে শান্তি ক্রয় করতে বাধ্য হন। কলিকাতা কাউন্সিলের প্রধান প্রকৃতপক্ষে বণিকদের নিকট থেকে অর্থ আদায় এবং পুরো টাকা কাসিম বাজারে প্রেরণ করেন এবং সেখান থেকে তা নাযিমকে পরিশোধ করা হয়।"[৮২৬] এই ঘটনা থেকে জানা যায় যে, ইংরেজদের দস্তকের আড়ালে অন্যের মালামাল পরিবহন করা হত এবং এই মালামাল আটকের কারণে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল, তা ছিল মূলত কলিকাতার বণিকদের সমস্যা। এই ঘটনা অবশ্য দস্তক অপব্যবহারের অবসান ঘটায়নি। এই ঘটনাটি সমস্যার স্বরূপ প্রকাশ করে দেয় এবং সমস্যাটি পুরো সময়ব্যাপী অব্যাহতভাবে চলতে থাকে।

এই সময়ে কলিকাতার গ্রাম কটির জন্য যে খাজনা বকেয়া পড়েছিল, সর্বশেষ মুর্শিদ কুলী খানের নিকট প্রদত্ত খাজনার পর থেকে টাকা হিসেব করে যত বকেয়া পাওনা হয়, শুজাউদ্দীন তা দাবী করেন। বড় নগরে বসবাসকারী ওলন্দাজদেরকেও খাজনা দিতে বলা হয়। তারা দ্রুত খাজনা পরিশোধ করে দেয়। কিন্তু ইংরেজরা ১৭৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খাজনা পরিশোধ করতে গড়িমসি করতে থাকে। তখন তাদের উপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নওয়াব মুর্শিদাবাদের নিকট আজিমগঞ্জে তাদের "মালামালের এক বড় চালান" আটক করেন। শুধু তখনই কলিকাতার কাউন্সিল কাসিম বাজারের কুঠিয়ালকে "নওয়াবের সঙ্গে ব্যাপারটির মিটমাট করার" নির্দেশ দেয়। কাসিম বাজারের কুঠিয়ালগণ হাজী আহমদের মধ্যস্থতায় নওয়াবকে ৫৫,০০০.০০ (পঞ্চান্ন হাজার) টাকা পরিশোধ করে বিষয়টির একটি সুরাহা করেন।[৮২৭] তাদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি এবং দস্তকের ক্রমবর্ধমান অপব্যবহার সত্ত্বেও তাদের সঙ্গে নওয়াবের আর কোন সমস্য সৃষ্টি হয়নি।

---

৮২৫ টি.বি. পৃঃ ১৩৭

৮২৬ টি.বি., পৃঃ ১৩৭

৮২৭ এইচ. .বি., ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৩২-৪৩৩

৭. শেষের বৎসরসমূহ এবং মূল্যায়ন

তাওয়ারিখ-ই-বাঙ্গালাহ অনুযায়ী শুজাউদ্দীন তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে প্রশাসনের সকল দায়িত্ব হাজী আহমদ, রায় রায়ান আলম চাঁদ এবং জগৎ শেঠের উপর ছেড়ে দিয়ে নিজে "অলসতা ও আমোদ-প্রমোদে" নিমগ্ন থাকেন।[৮২৮] এই মন্তব্যটিকে একটি অযাচিত বিবৃতি বলে মনে হয়। শুজাউদ্দীনের রাজত্বের শুরু থেকেই এই তিনজন তাঁর উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছিলেন এবং দিন যতই যাচ্ছিল, তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই আরও অভিজ্ঞ এবং প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু শুজাউদ্দীন অলসভাবে আমোদ প্রমোদে নিমগ্ন থাকেন এবং তিনজনের উপর শাসনকার্যের যাবতীয় দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন বলে যে মন্তব্য করা হয়েছে, বাস্তব ঘটনাবলী থেকে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না। উপরে ইউরোপীয়দের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে, তা থেকে দেখা যায় যে, তাঁর মৃত্যুর মাত্র এক বৎসরের কিছু বেশি সময় পূর্বেও তিনি ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে আচরণ করেছেন। তাঁর রাজত্বের শেষ পাঁচ বৎসর বা অনুরূপ সময়কালের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। যথা- বিহার সংযোজন, বীরভূম ও দিনাজপুরের জমিদার এবং কুচবিহারের রাজার বিদ্রোহ দমন করা এবং তিনি পূরীতে হিন্দুদের তীর্থ যাত্রার উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। এই সকল ঘটনা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, তাওয়ারিখ-ই-বাঙ্গালাহ আমাদেরকে যা বিশ্বাস করাতে চেয়েছে, যথা শুজাউদ্দীন তাঁর শাসনের প্রথম দিকের কয়েক বৎসর পরই অলস ও শাসনকার্যের প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়েন, তা মোটেই ঠিক নয়।

সম্ভবত, শুজাউদ্দীনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মসনদ নিয়ে যে পারিবারিক বিপ্লব ঘটে যায়, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে উল্লেখিত ত্রয়ীর ক্রমবর্ধমান প্রভাব সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করার জন্য উপরোক্ত মন্তব্য করা হয়েছে। তার শাসনামলের শেষের দিকে উত্তর ভারতের রাজনীতিতে অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যায়। বাংলার উপরও যথাসময়ে তার প্রতিক্রিয়া অনুভূত হয়। মারাঠারা দিল্লীর চর্তুপাশ পর্যন্ত লুন্ঠন করে ধ্বংস যজ্ঞ চালায়। ১৭৩৭ সালে তারা নালওয়া এবং রাজপুতানার উপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং পরবর্তী বৎসর (১৭৩৮ সালে) তারা মোগল সম্রাটের উপর অবমাননাকর দুরাই সরাই চুক্তি চাপিয়ে দেয়। এই চুক্তির মাধ্যমে সম্রাট নর্মদা এবং চাম্বল নদীর মধ্যবর্তী সমগ্র ভূভাগ তাদেরকে ছেড়ে দেন। মনে হচ্ছিল যেন মোগল সাম্রাজ্যের পতন প্রক্রিয়াকে

[৮২৮] তাওয়ারিখ-ই-বাঙ্গালাহ, পৃঃ ১৩৩

ত্বরান্বিত করার জন্য পারস্য সম্রাট নাদির শাহ একই সময়ে পশ্চিম দিক থেকে ভয়ানক হুমকি স্বরূপ এগিয়ে আসছিলেন। নাদির শাহ যখন পানি পথের নিকটবর্তী কার্ণালে মোগল সৈন্যদেরকে পরাজিত এবং ছত্রভঙ্গ করে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, ঠিক সে সময় ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই মার্চ শুজাউদ্দীন খান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সে সময় উত্তর ভারতকে যে অরাজকতা এবং প্রশাসনিক অস্থিতিশীলতা গ্রাস করেছিল, তার বিপরীতে বাংলায় প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা বিরাজমান থাকায় যে শান্তি ও স্বস্তি বিরাজমান ছিল, তার কৃতিত্বের জন্য তিনিও তাঁর শ্বশুর মুর্শিদ কুলী খান সমভাবে অংশীদার। যদিও তাদের সফলতার প্রধান কারণ ছিল উত্তর ভারতের রাজনৈতিক গণ্ডির বাহিরে বাংলার অবস্থান এবং এখানকার পরিস্থিতি এবং কয়েকজন যোগ্য সহযোগীর সেবা, তবুও মুর্শিদ কুলী খান এবং শুজাউদ্দীন খান উভয়ই ছিলেন দক্ষ লোক। প্রথম দিকের একজন বৃটিশ পর্যবেক্ষকের মতে শুজাউদ্দীন খান ছিলেন "সংযমী, দৃঢ় এবং সতর্ক" এবং "দেশের উন্নতির জন্য নির্ভরযোগ্য।"[৮২৯] তিনি সাধারণভাবে মুর্শিদ কুলী খানের রাজস্ব বন্দোবস্ত অব্যাহত রাখেন এবং কয়েকটি মাত্র নতুন কর বসিয়েছিলেন, যথা- ইমারত নির্মাণ কর, কারখানাজাত ওয়ার্কশপ কর এবং নযরানা (উপঢৌকন), এবং তিনি জগৎ শেঠের ব্যাংকের মাধ্যমে মোটামুটি নিয়মিতভাবে মোগল সম্রাটের নিকট রাজস্ব প্রেরণ করতেন।[৮৩০] এমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে, তাঁর এই সকল অতিরিক্ত কর প্রজাদের জন্য সাধারণভাবে কোন কষ্টকর অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। বিপরীতক্রমে তাঁর সময়ে খাদ্য শষ্যের মূল্য যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছিল এবং অন্তত কিছু দিনের জন্য তা পূর্ব বাংলায় সে পর্যায়ে নেমে এসেছিল যে পর্যায়ে শায়েস্তা খানের সময়ে নেমে এসেছিল বলে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

তাওয়ারিখ-ই-বাঙ্গালাহ এবং সিয়ার উভয় গ্রন্থেই শুজাউদ্দীন খানের প্রশংসা করা হয়েছে। তিনি ছিলেন "একজন সাহসী সৈনিক, অত্যাধিক দানশীল এবং ব্যবহারে অত্যন্ত অমায়িক।" তিনি ছিলেন অত্যন্ত সদাশয় এবং যে কেহ "একবার তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন," তিনিই তাঁর থেকে কিছু না কিছু উপকার পেয়েছেন। তাঁর "অধীনস্থদের মধ্যে এমন কেহ ছিলেন না, যাকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে অনুগ্রহ করে কৃতার্থ করেননি।"[৮৩১] তিনি তাঁর পরিচিত সকল লোকের একটি তালিকা (টোকা/স্মারক লিপি) সংরক্ষণ করতেন এবং তাঁর

[৮২৯] শোরের মতামত, ১৮ই জুন, ১৭৮৯ ফার্মিংগারের ৫ম প্রতিবেদন, ২ খন্ড, পৃঃ ৯

[৮৩০] টি.বি., পৃঃ ১২৯

[৮৩১] টি.বি. পৃঃ ১২৮: সিয়ার, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩২২

"অভ্যাস ছিল প্রতি রাতে শয্যায় যাওয়ার পূর্বে তিনি একবার করে মনোযোগ দিয়ে দেখতেন এবং করো কারো নামের পার্শ্বে তিনি যা যথোপযুক্ত মনে করতেন, এমন একটি অংকের টাকা উল্লেখ করতেন (কোন কোন সময় এই পরিমানটি যথেষ্ট বড় অংকের হত)। এভাবে তিনি কিছু সংখ্যক লোকের শ্রীবৃদ্ধি করতেন এবং তালিকা হতে তাদের নাম মুছে ফেলতেন। তারপর আবার অন্য কিছু সংখ্যক লোকের নাম চিহ্নিত করতেন; এই মহৎ অভ্যাস তিনি তাঁর সারা জীবনব্যাপীই চালু রেখেছিলেন।[৮৩২] তাঁর দরবারে নবাগতদের প্রতি তিনি ছিলেন বিশেষভাবে দয়ালু; মনে হয় যে, উপমহাদেশের উত্তরাঞ্চলের বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্য বহু সংখ্যক লোক বাংলায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল। যখনই সামান্য কোন যোগ্যতা নিয়েও কোন লোক মুর্শিদাবাদে আসতেন অথবা তার মধ্যে কোন যোগ্যতা থাকতে পারে বলে মনে হত অথবা তিনি কোন ভদ্র ভাষা জানতেন বলে শুজাউদ্দীন খবর পেতেন, তখন তিনি তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করতেন।[৮৩৩] তাঁর জন্মদিনে তিনি "সোনা-রূপা দিয়ে তার নিজের ওজন নিতেন এবং তা দান করে দিতেন..।[৮৩৪] তাঁর মুত্যুর প্রাক্কালে তিনি তাঁর অধিনস্থ প্রত্যেক সভাসদ, সামরিক বা বেসামরিক কর্মকর্তা, প্রত্যেক সৈন্য-অশ্বারোহী বা সাঁজোয়া, প্রত্যেককে উপঢৌকন হিসেবে দুমাসের বেতন প্রদান করেন; এমনকি তাঁর প্রাসাদের চাকর-বাকর এবং হারেমের খেদমতে নিয়োজিত মহিলা পরিচারিকারাও এ সুযোগ থেকে বাদ পড়েনি এবং তাঁর মৃত্যুর অল্প কিছু দিন পূর্বে তাঁকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য প্রত্যেকের নিকট অনুরোধ জানান।"[৮৩৫]

অত্যন্ত ধার্মিক প্রকৃতির মানুষ শুজাউদ্দীন শিক্ষিত এবং পরহেজগার ব্যক্তিদেরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং কঠোর নিরপেক্ষতার সঙ্গে বিচার কার্য পরিচালনা করতেন। "মামলার দরিদ্রতম বাদীও তাঁর সামনে তাঁর পুত্র যেরূপ অধিকার নিয়ে দাঁড়াতেন, ঠিক তদ্রুপ সম অধিকারের ভিত্তিতেই দাঁড়াতে পারতেন" এবং ইতিহাসের জ্ঞান সম্পন্ন লোকেরা মনে করত যে, তারা বাদশা নও-শেরওয়ানের রাজত্বে বাস করছেন।[৮৩৬] বাদশাহের মর্যাদা সম্পর্কে তিনি অতি উঁচু ধারণা পোষণ করতেন এবং তাঁর দরবারের জাক-জমক এবং সাজ-সজ্জায় তিনি তাঁর সকল পূর্বসূরীদের ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর শশুর মুর্শিদ কুলী খানের নির্মিত প্রাসাদকে তিনি অত্যন্ত ছোট এবং অপরিকল্পিত বলে মনে করতেন। তাই

---

[৮৩২] সিয়ার, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩২৫

[৮৩৩] ঐ, পৃঃ ৩২৩-৩২৪

[৮৩৪] টি.বি., পৃঃ ১৩১

[৮৩৫] প্রথম খন্ড, পৃঃ ৩২৫

[৮৩৬] সিয়ার, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩২৫ এবং টি.বি., পৃঃ ১৩২

তিনি এটিকে ভেঙ্গে ফেলেন এবং "তাঁর ধারণা অনুযায়ী বিরাট আকারের এবং অধিক মানানসই আরেকটি নতুন প্রাসাদ নির্মাণ করেন।" গণবিরোধী এবং ধিকৃত কর্মকর্তা নাযির আহমদ ভাগীরথির তীরে দেহমারা গ্রামে যে মসজিদ নির্মাণ শুরু করেছিলেন, তিনি তা সমাপ্ত করেন এবং "অত্যন্ত চমৎকার এবং মনোমুগ্ধকর করে বাগানটি সাজিয়ে তোলেন" এবং এর নামকরণ করেন ফারাহ বাগ বা খোশবাগ। বসন্তকালে তিনি তাঁর পরিবার ও পরিবারিক সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে এখানে চলে আসতেন এবং এখানে কিছুদিন অত্যন্ত সুরুচিপূর্ণ পরিবেশও আরাম-আয়েশে কাটাতেন। বৎসরে একবার তিনি এখানে তাঁর দরবারের সকল কর্মকর্তার জন্য বিশাল আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতেন।"[৮৩৭] এখানে, এই বাগানে এবং মসজিদের নিকটে তিনি মৃত্যুর পূর্বে তার সমাধি নির্মাণ করেন এবং "তৎকালীন সুলতান ও বড় বড় আমির-ওমরাহের মত" তাঁর মৃত্যুর পর তাকে এখানে সমাহিত করা হয়।[৮৩৮]

৮. সরফরাজ খান, বিলম্বিত উত্তরাধিকার যুদ্ধ

মৃত্যুর পূর্বে শুজাউদ্দীন তাঁর পুত্র আলাউদ্দৌলত সরফরাজ খানকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। তদনুযায়ী সরফরাজ খান প্রথম দিকে বিনা বাধায় মসনদে বসেন। এটা জানা যায়নি যে, শুজাউদ্দীন এজন্য সম্রাটের কোন অনুমোদন বা তাঁর কোন নিশ্চিত স্বীকৃতি চেয়েছিলেন কিনা। তিনি সম্ভবত এই জন্য তা করেননি যে, তখন কেন্দ্রীয় সরকার ছিল নাদির শাহের নিকট নতজানু। শুজাউদ্দীন অবশ্য সতর্ক ছিলেন এবং তিনি তাঁর পুত্রকে হাজী আহমদ, রায় রায়ন (আলম চাঁদ) এবং জগৎ শেঠ ফতেহ চাঁদকে তার "পিতার প্রতিনিধি হিসেবে সম্মান দেখানোর জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের উপদেশ মেনে চলার জন্যও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।"[৮৩৯] এই পরামর্শ থেকে বুঝা যায় যে, মৃত্যু পথযাত্রী নওয়াব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, মসনদের পিছনে এই তিনজনই হচ্ছেন আসল শক্তি এবং তাঁর পুত্র ততদিনই সিংহাসনে থাকতে পারবেন, যতদিন তিনি তাদেরকে খোশ-মেজাজে রাখতে পারবেন। কিন্তু তার নির্দেশ পালন করা ছিল প্রায় অসম্ভব; কারণ যে পরিস্থিতিতে এই ত্রয়ী শুজাউদ্দীনের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন এবং তাঁর প্রতি অনুগত থেকেছেন, তা পুরোপুরি বদলে গিয়েছিল। বিশেষ করে হাজী আহমদ, তাঁর ভ্রাতা, তাদের পরিবার-পরিজন এবং আত্মীয় স্বজনগণ আর অসহায় অবস্থায়

[৮৩৭] টি.বি., পৃঃ ১৩২-৩৩
[৮৩৮] ঐ, পৃঃ ১৫২, ১৫৩
[৮৩৯] টি.বি., পৃঃ ১৫২

কারো সাহায্য এবং পৃষ্ঠপোষকতার সন্ধানী ছিলেন না। তাঁরা তখন শুধু সুপ্রতিষ্ঠিতই ছিলেন না, বরং সুবার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ক্ষমতার পদগুলোর অধিকারী ছিলেন। হাজী আহমদ নিজে এই ত্রয়ীর মধ্যে প্রভাবশালী সদস্য হিসেবে সরকারের সঠিক নীতিমালা নিয়ন্ত্রণ করতেন, তার দ্বিতীয় পুত্র সাঈদ আহমদ খান এবং জামাতা আতাউল্লাহ খান যথাক্রমে সামরিক কৌশলের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ রংপুর ও রাজমহলের ফৌজদার ছিলেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজনগণও সেনাবাহিনী এবং অন্যান্য উপযুক্ত পদে নিয়োজিত ছিলেন। সর্বোপরি, তাঁর ভ্রাতা আলীবর্দী খান বিহারের নায়েব সুবাদার হিসেবে বাংলার মসনদ দখল করার উদ্দেশ্যে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অনুসারী গড়ে তুলেছিলেন। তিনি তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য শুজাউদ্দীনের মৃত্যু এবং ভারত থেকে নাদির শাহের ফিরে যাওয়ার অপেক্ষা করছিলেন।[৮৪০] এটাও লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, হাজী আহামদ তার উচ্চাভিলাষী এবং যোগ্য ভাইয়ের ইচ্ছা পূরণে সহায়তা করার জন্য শুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর দুই পুত্র সরফরাজ খান ও তকী খানের (তখনও জীবিত) মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করেছিলেন।

উপরোক্ত অবস্থায় সমঝোতা ও আপোষ রফার জন্য সরফরাজ খানের পক্ষ হতে সম্ভাব্য সবকিছু করা হলেও সাফল্যের কোন নিশ্চয়তা ছিল না। ইতিমধ্যেই হাজী আহমদের পরিবারের ক্রম বর্ধমান প্রভাব প্রতিপত্তিতে সরফরাজ খানের বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল। আমির ওমরাহদের এই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজন হচ্ছেন সরফরাজ খানের তিন জামাতা- হাফিজুল্লাহ খান (মির্যা আমানী), গজনফর হোসেন খান এবং হাসান মুহাম্মদ খান; তাদের ছাড়া আরো ছিলেন, হাজী লুৎফে আলী, হাজী কুরবান আলী, মীর মুর্তাজা, মীর কামাল, মীর গদাই, মীর শরিফউদ্দীন, মর্দান আলী খান, শমশের খান কোরায়শী (সিলেটের ফৌজদার), মীর হাবিব এবং গউছ খান। সরফরাজ খানের ভগ্নিপতি উড়িষ্যার নায়েব সুবাদার দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলী খান তার প্রতি খুব একটা প্রসন্ন না থাকলেও হাজী আহমদের দলের বিরোধী ছিলেন। আমির-ওমরাহদের মধ্যে সৃষ্ট এই দুটি বৈরী শিবির পরিস্থিতিকে উত্তেজনাপূর্ণ করে ফেলে এবং হাজী আহমদের জন্য রায় রায়ান এবং জগৎ শেঠকে তার দলে ভিড়াতে সুযোগ এনে দেয়। তিনি তাদের আশংকাকে এই বলে উস্কিয়ে দেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সাফল্য তাদের ধ্বংস ডেকে আনবে। রায় রায়ান এবং জগৎ শেঠের মধ্যস্থতায় তিনি কিছু সংখ্যক প্রভাবশালী হিন্দু জমিদার, বিশেষ করে রাজশাহীর জমিদারকে তার পক্ষে টেনে আনতে সক্ষম হন। আসন্ন সংঘাতের

---

[৮৪০] সিয়ার, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩২৬

আলামত স্পষ্টই দৃশ্যমান হচ্ছিল এবং যখন শুজাউদ্দীন ইন্তেকাল করেন, তখন সরফরাজ খান "শত্রুদের চক্রান্ত সম্পর্কে এত বেশি শংকিত ছিলেন যে, তিনি তাঁর পিতার দাফনের কাজে অংশ গ্রহণ করতেও সাহস করেননি।"[৮৪১]

তথাপি সরফরাজ খান পিতার আদেশের প্রতি অনুগত থেকে হাজী আহমদ, রায় রায়ান এবং জগৎ শেঠের উপর সাধারণভাবে যাবতীয় দায়িত্ব ন্যাস্ত করেন এবং তাদের কোন ক্ষতি করেননি।[৮৪২] তা সত্ত্বেও তারা তাঁর প্রতি সহযোগিতা করা দূরে থাক, ভিতরে ভিতরে তাঁর ধ্বংস সাধনের জন্য চেষ্টা করেন। মসনদে আরোহণ করার পরপরই সরফরাজ খান নাদির শাহের একটি পত্র পান, যা আদতে লেখা হয়েছিল শুজাউদ্দীন খানের নিকট। পত্রে বাংলার নাযিমকে আনুগত্য স্বীকারসহ পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোর রাজস্ব প্রেরণ করতেও নির্দেশ দেয়া হয়। হাজী এবং রায় রায়ান শুধু রাজস্ব প্রেরণই নয়, নাদির শাহের নামে মুদ্রাঙ্কন এবং খুতবা পাঠ করার জন্যও সরফরাজ খানকে উদ্বুদ্ধ করেন। এর অল্প কিছুকাল পরেই যখন নাদির শাহ পারশ্যের উদ্দেশ্যে ভারত ত্যাগ করেন, তখন হাজী এবং তার ভ্রাতা গোপনে প্রতিনিধি প্রেরণ করে মোগল সম্রাট মুহাম্মদ শাহকে জানান যে, সরফরাজ খান একজন বিশ্বাস ঘাতক।[৮৪৩] অন্যদিকে আবার আলীবর্দী খান পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ তিনটির নিযামতের সনদ লাভ এবং "যুদ্ধের মাধ্যমে সরফরাজ খানের হাত থেকে প্রদেশ তিনটি পুনরুদ্ধার করার জন্য নির্দেশের জন্য" মোগল দরবারের প্রভাবশালী আমির ইসহাক খানের মাধ্যমে সম্রাটের নিকট আবেদন জানান।[৮৪৪] এই পরিকলপনা বাস্তবায়নের সুবিধার্থে হাজী আহমদ এবং তার সহযোগীরা সরফরাজ খানকে বলেন যে, তাঁর সেনাবাহিনী অত্যাধিক বড় এবং এই বাহিনী অর্ধেক হ্রাস করে তিনি শুধু সরকারের ব্যয় সংকোচনই নয়, বরং সম্রাটেরও আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হবেন। সহজ সরল এবং বিশ্বাস প্রবণ সরফরাজ খান তাঁর বাহিনীর অর্ধেক হ্রাস করতে সম্মত হন; যখনই সৈন্যদেরকে ছাটাই করা হয়, তখনই হাজী গোপনে তাদেরকে আলীবর্দী খানের জন্য সাদরে গ্রহণ করেন এবং এই জন্য তিনি নিজে এবং তাঁর তিন পুত্র, তাঁর (আলীবর্দী খানের) নিকট ২৪,০০,০০০.০০ (চব্বিশ লক্ষ) টাকা প্রেরণ করেন এবং সুবাদারী লাভ করার পরে পরিশোধ করে দেবেন এমন আশায় তার অন্যান্য আত্মীয় স্বজনগণও তাকে বিরাট অংকের টাকা অগ্রিম প্রেরণ করেন।[৮৪৫]

---

৮৪১ টি.বি., পৃঃ ১৫৪
৮৪২ ঐ, এবং সিয়ার ১ম খন্ড, পৃঃ ৩২৬
৮৪৩ টি.বি., পৃঃ ১৫৫-১৫৬
৮৪৪ সিয়ার ১ম খন্ড, পৃঃ ৩২৮-৩২৯
৮৪৫ টি.বি., পৃঃ ১৫৮

অল্প সময়ের মধ্যেই সরফরাজ খান দরবারে তার নিজের লোকের মাধ্যমে এই চক্রান্তের বিষয়টি জানতে পারেন এবং আলীবর্দী খান এবং তাঁর আত্মীয় স্বজনদেরকে তাঁদের পদ থেকে প্রত্যাহার করে তাঁর নিজের লোক নিয়োগ দেয়ার জন্য সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু হাজী এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হয়েই তার নিজের এবং তার আত্মীয় স্বজনদের অকৃত্রিম আনুগত্য সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবাদ জানান এবং সরফরাজ খানের মনে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করেন যে, "এত দ্রুত জনবল পরিবর্তন এবং নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ ঠিক হবেনা।" যেহেতু বৎসর শেষ হতে আর মাত্র তিন মাস বাকী এবং এখনই "রাজস্ব আদায়ের সর্বোত্তম মৌসুম।" "খোলা মনের অধিকারী এবং সন্দেহ পরায়ন ছিলেন না" বলে সরফরাজ খান তার এই টোপ গিলেন এবং নিজের পরিকল্পনা ত্যাগ করেন।[৮৪৬] এটা ছিল তাঁর জন্য মারাত্মক ভুল এবং এভাবে যে সময় পাওয়া গেল, হাজী তার চক্রান্তকে পূর্ণরূপ দেয়ার জন্য সে সময়টার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন এবং আর সময় ক্ষেপন না করে সৈন্য বাহিনী নিয়ে বাংলায় আগমণ করার জন্য আলীবর্দী খানের প্রতি আহ্বান জানান। হাজী তার জামাতা রাজমহলের ফৌজদার আতাউল্লাহ খানকে বাংলা এবং বিহারের মধ্যে সকল যোগযোগ বন্ধ করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দেন, যেন আলীবর্দী খানের প্রস্তুতি ও গতিবিধি সম্পর্কে সরফরাজ খান কিছু জানতে না পারেন।

ভ্রাতার নির্দেশ অনুযায়ী আলীবর্দী খান তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাতা হাশেম আলী খানকে (জৈনুদ্দীন আহমদ খান) বিহারের দায়িত্বে রেখে ১১৫২ হিজরী সালের যিলহজ্জ/১৭৪০ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে অভিযান নিয়ে বাংলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। পুরো যাত্রাপথেই তিনি হাজী আহমদ, রায় রায়ান এবং জগৎ শেঠের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন এবং তাঁর অগ্রগতি সম্পর্কে তাদের অবহিত রাখেন এবং সরফরাজ খানের সমর্থকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য সম্ভাব্য সব কিছু করার জন্য তিনি তাদেরকে অনুরোধ জানান। আলীবর্দী খানের সঙ্গে ছিল মোস্তফা খান এবং অন্যান্য আফগান নেতাদের পরিচালনাধীন আফগান সৈন্য সমন্বয়ে গঠিত এক বিরাট এবং সুসজ্জিত বাহিনী আর বিহার থেকে সংগৃহীত প্রচুর সংখ্যক হিন্দু সৈন্য।[৮৪৭] প্রদেশের কিছু সংখ্যক হিন্দু জমিদার যথা- তুরহাট-সেমাইর জমিদারগণ এবং টিকারীর জমিদার সুন্দর সিংহ তাদের দলবল নিয়ে আলীবর্দীর সঙ্গী হন।[৮৪৮]

---

৮৪৬ টি.বি., পৃঃ ১৫৮

৮৪৭ সিয়ার ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৩০

৮৪৮ সিয়ার ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৫৮

আলীবর্দী খান যখন সামরিক গুরুত্বপূর্ণ তেলিয়াগড়ী এবং সাক্রাগলী গিরিপথ অতিক্রম করে রাজমহলে এসে পৌঁছেছেন, তখনই জগৎ শেঠ "বাহ্যিকভাবে আশংকা প্রকাশ করে" সরফরাজ খানকে এই পর্যন্ত আলীবর্দী খানের আগমণ সম্পর্কে অবহিত করেন এবং তাঁর নিকট আলীবর্দীর একটি পত্রও হস্তান্তর করেন। পত্রে তিনি তাঁর অনানুগত্যহীনতার অভিযোগের বিরুদ্ধে আপত্তি জানান। তাঁর পরিবারকে "আরো অধিক অবমাননা" থেকে উদ্ধার করার জন্য এসেছেন বলে উল্লেখ করেন এবং পত্রে তিনি হাজী আহমদ, তার পরিবার এবং অন্যান্য নির্ভরশীলদেরকে তাঁর (আলীবর্দী) সঙ্গে মিলিত হতে অনুমতি দেয়ার জন্য আহবান জানান।[৮৪৯] এই সংবাদ পেয়ে সরফরাজ খান স্বভাবতই হতবুদ্ধি হয়ে যান। যাহোক, নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি হাজীকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। গউছ খান এবং মীর শরাফুদ্দীনের নেতৃত্বে আলীবর্দী খানের অগ্রগতি রোধ করার জন্য অবিলম্বে এক বাহিনী প্রেরণ করেন।[৮৫০] এর অল্পকাল পরে সরফরাজ খান নিজেই তাঁর প্রধান প্রধান আমীর এবং কর্মকর্তা যথা রায় রায়ান, আলম চাঁদ এবং হাজী আহমদকে (সম্ভবত বন্দী করে) সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হন।[৮৫১] তিন দিন চলার পর সরফরাজ খান মুর্শিদাবাদ থেকে ২২ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে গিরিয়ায় পৌঁছেন, আলীবর্দী খানও অবশ্য এই সময় সেখানে এসে পৌঁছেন। তাওয়ারিখ-ই-বাঙ্গালাহ অনুযায়ী চতুর্থ দিনে দুই বাহিনীর মধ্যে প্রথম যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর আলীবর্দীর বাহিনী হাল ছেড়ে দেয় এবং "সরফরাজ খানের জন্য চূড়ান্ত বিজয় হয়ে যেত।" কিন্তু তা হয়নি রায় রায়ানের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য। তিনি দেখেন যে, "সরফরাজ খান যদি এই সুবিধা পেয়ে আরো যুদ্ধ চালিয়ে যান, তাহলে তার সঙ্গের চক্রান্তের হোতাদের সব শেষ হয়ে যাবে।" তাই তিনি তাঁকে এই বলে নিবৃত করেন যে, আজ সৈন্যরা ক্লান্ত-শ্রান্ত এবং তাদের শক্তি নিঃশেষ প্রায় এবং আগামী সকালে আবার যুদ্ধ শুরু করা যাবে, তখন "তার সৈন্যরা তাদের শক্তি ফিরে পাবে এবং ছত্র-ভঙ্গ এবং ভগ্ন হৃদয় শত্রুদের উপর সহজে বিজয় অর্জন সম্ভব হবে।"[৮৫২] তার পরামর্শ মত সরফরাজ

---

৮৪৯ সিয়ার ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৩২

৮৫০ টি.বি., পৃঃ ১৫৯। সিয়ারের বিবরণ অবশ্য একটু ভিন্ন ধরণের। এতে বলা হয়েছে যে, সরফরাজ খানের প্রতি হাজীর আনুগত্যের দৃঢ় ঘোষণা এবং আলীবর্দীকে বিহারে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকারের ভিত্তিতে তিনি তাকে আলীবর্দীর নিকট যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন (সিয়ার, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৩৩)

৮৫১ টি.বি., পৃঃ ১৩০। প্রধান প্রধান আমির-ওমরাহদের মধ্যে যারা সরফরাজ আলী খানের সঙ্গী হয়েছিলেন তারা হচ্ছেন- গজনফর হোসেন খান, হাসান মুহাম্মদ খান, মীর মুহাম্মদ বাকীর খান, মির্যা মুহাম্মদ ইরাজ খান, মীর কামাল, মীর গদাই, মীর হায়দার শাহ, মীর দিলীর আলী, শামসির খান কোরেশী, শুজা কুলী খান, মীর হাবিব, মর্দান আলী খান, বিজয় সিংহ এবং রাজা গুনড্রেপ।

৮৫২ টি.বি., পৃঃ ১৬২। সিয়ারে শুধু একটি যুদ্ধের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আলীবর্দী খান হঠাৎ আক্রমণ করেন এবং সরফরাজ খানকে পরাজিত করেন

খান সেদিনের মত যুদ্ধ স্থগিত করে পশ্চাদধাবন বন্ধ করে দেন এবং গিরিয়ায় শিবির স্থাপন করেন। কিন্তু মুহাম্মদ গউছ খান সৈন্যদল নিয়ে আরো দেড় মাইল উত্তর-পশ্চিমে সুতি পর্যন্ত পশ্চাদধাবন করেন এবং সেখানে শিবির ফেলেন।

যুদ্ধ বিরতির এই সুযোগে আলীবর্দী ঘুরে দাঁড়ান এবং ভাগীরথির অপর পাড়ে সুতির অনতিদূরে আওরঙ্গবাদে শিবির স্থাপন করেন। সেখান থেকে তিনি এখন আলাপ-আলোচনার সূত্রপাত করেন।[৮৫৩] হাজী আহমদকে মুক্ত করা এবং সরফরাজ খানের জন্য একটি অরক্ষিত অবস্থা সৃষ্টির জন্য বার বার তাঁর প্রতি আনুগত্যের দৃঢ় ঘোষণা দেন। এভাবে সরফরাজ খানকে সম্পূর্ণ বোকা বানানো হয় এবং তার এসব ঘোষণায় তিনি এমনভাবে প্রতারিত হন যে, তিনি হাজী আহমদকে শুধু মুক্ত করেই দেননি, বরং তার সদিচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ তাকে আলীবর্দী খানের নিকটও পাঠিয়ে দেন-- ।[৮৫৪] আলীবর্দী খান তাঁর ভাইকে পেয়ে সম্পূর্ণ চিন্তামুক্তভাবে সরফরাজ খানকে ধোকায় ফেলার জন্য তাঁর যেসব প্রতিনিধি হাজীকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন, তাদের সামনে আলীবর্দী খান, "সরফরাজ খানের বিরাট বাহিনীর সামনে দাঁড়াতে তাঁর সম্পূর্ণ অপারগতার কথাও উল্লেখ করেন; আগে থেকে এক টুকরা কাপড়ে একটি ইট জড়িয়ে রেখে কোরআনের ভান করে শপথ করে বলেন যে, আগামী সকালে তিনি নিজেকে সরফরাজ খানের পদতলে সমর্পণ করবেন।"[৮৫৫] আলীবর্দী খান প্রত্যেক প্রতিনিধিকে ২০০ সোনার মোহর উপঢৌকন দেন। আর জগৎ শেঠ গোপনে সরফরাজ খানের সেনাপতিদেরকে বখশিশ এবং প্রমিসরী নোট প্রদান করে তাদেরকে সরফরাজ খানের দল ত্যাগ করে চলে আসা বা তাকে ধোকা দেয়ার জন্য আহবান জানান। এভাবে তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য সর্বক্ষণ চেষ্টা করতে থাকেন।[৮৫৬] হাজীর পৌঁছার পরে হঠাৎ করে আক্রমণ পরিচালনা করার

---

৮৫৩ সিয়ার , ১ম খন্ড, ৩৩৩-৩৩৬ পৃষ্ঠায় এই আলাপ-আলোচনার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে

৮৫৪ টি.বি., পৃঃ ১৬৩

৮৫৫ টি.বি., পৃঃ ১৬৪

৮৫৬ সিয়ার , ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৩৬ অনুবাদকের টিকা। সিয়ারের গ্রন্থকার, যার পিতা আলীবর্দী খানের অধিনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকুরী করতেন, এই ঘটনা সম্পর্কে তথ্য বিকৃত করেছেন এবং ঠিক উল্টোভাবে বলেছেন যে, জগৎ শেঠ আলীবর্দী খানের সেনাপতিদেরকে প্রমিজরী নোট দিয়ে তার পক্ষ ত্যাগ করার আহবান জানিয়েছেন। সিয়ারের অনুবাদক অবশ্য সঠিকভাবেই এই বিকৃতি তুলে ধরেছেন এবং আরো বলেছেন, "-তাদের (অফিসারদের) মধ্যে এখনো জীবিত একজন আমাদেরকে নিশ্চিত করে বলেছেন যে, আমি (তিনি) নিজেও ৪০০০.০০ টাকা বখশিস পেয়েছেন এবং মাটি ও আবর্জনা দিয়ে কামান ভর্তি করতে বলা হয়েছিল।" তাওয়ারিখে উল্লেখ করা হয়েছে (পৃঃ ১৬৬) যে, সরফরাজ খান যখন মুর্শিদাবাদের ২০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে কমরাহে পৌঁছেন, তখন আবিস্কার করেন যে, হাজীর এক আত্মীয় গোলান্দাজ বিভাগের দারোগা শাহরিয়ান খান

চূড়ান্ত প্রস্তুতি হিসেবে আলীবর্দী খান তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত সৈন্যকে রাতের বেলা সরফরাজ খানের শিবিরের নিকট এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন যে, "তারা শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় তাদের পরিচিত এবং বন্ধু-বান্ধবদের অভিনন্দন জানানোর ভান করবে এবং প্রয়োজনীয় কাজে না ডাকা পর্যন্ত তারা সুবাদারের শিবিরের আশে পাশে ওঁৎ পেতে থাকবে।"[৮৫৭]

এইভাবে সরফরাজ খানের জন্য সম্পূর্ণভাবে রক্ষীহীন অবস্থা সৃষ্টি করে ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দের ৯ই এপ্রিল ভোরে আলীবর্দী খান হঠাৎ আক্রমণ করেন। তিনি অগ্রগামী গউছ খানের মোকাবেলা করার জন্য নন্দলালের অধীনে কিছু সৈন্য এবং তিনিও তাদের মধ্যেই আছেন, এই বিশ্বাস সৃষ্টি করার জন্য তাঁর পতাকা-বাহী হাতিও নন্দলালের নিকট রেখে যান। তারপর তাঁর সর্বাধিক পছন্দনীয় কিছু লোক নিয়ে আলীবর্দী খান অগভীর স্থান দিয়ে নদী পার হন এবং রাজশাহীর জমিদার রমাকান্তের লোকজন তাঁকে রাতের আধারে সরফরাজ খানের শিবিরের নিকট নিয়ে যায়।[৮৫৮] সকাল হতেই আলীবর্দী খান শিবিরের সম্মুখ এবং পিছন দিক দিয়ে একই সঙ্গে আক্রমণ শুরু করেন, সরফরাজ খান তখন ফজরের নামাজ পড়ছিলেন। তাঁর সৈন্যরা প্রতিরোধ সৃষ্টি করার জন্য সংগঠিত হতে সময়ই পায়নি; আংশিকভাবে বিশৃঙ্খলা এবং আংশিকভাবে তাদের মধ্যে আগের থেকেই বিভেদের বীজ বপন করে রাখার কারণে তাদের অনেকেই শত্রু পক্ষে গিয়ে যোগ দেয়। তাঁর ভক্ত অবশিষ্ট লোকজন নিয়ে যাদের মধ্যে "অল্প কিছু হাবসী"ও ছিল, সরফরাজও বীর বিক্রমে আক্রমণ করেন। তাঁর লোকজনদের মধ্যে মর্দান আলী খান ও তার সেনাদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। আর মীর কামাল, মীর গদাই, মীর সিরাজুদ্দীন, হাজী লুৎফে আলী খান, হাজী কুরবান আলী এবং অন্যান্যরা যুদ্ধ করতে করতেই মারা যান। সরফরাজ খানের হাতির মাহুত তাঁকে পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়; কিন্তু তিনি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন এবং স্বল্পপরেই যুদ্ধ করতে করতে কপালে গুলি বিদ্ধ হয়ে মারা যান। সরফরাজ খানের মৃত্যু সংবাদ শুনে মীর দিলির আলী "তার প্রভু এবং বন্ধুর পরে আর বেঁচে থাকতে অস্বীকার করেন" এবং তার অনুসারী ১৬ জন সৈন্য নিয়ে শত্রুদের আক্রমণ করেন এবং যুদ্ধ করতে করতে মারা যান। অনুরূপভাবে বিজয় সিংহ নামে একজন রাজপুত বীরত্বের সঙ্গে শত্রুদের আক্রমণ করেন এবং ঠিক যে

গোলা-বারুদের পরিবর্তে ইট ও মাটি দিয়ে কামান ভর্তি করেছে। এই কর্মকর্তাকে অপসারণ করা হয়। সম্ভবতঃ সিয়ারের অনুবাদক কর্মকর্তা বলে শাহরিয়ার খানের ই উল্লেখ করেছেন।

[৮৫৭] টি.বি., পৃঃ ১৬৫-১৬৬

[৮৫৮] টি.বি., পৃঃ ১৬৬-১৬৭

মূহুর্তে তিনি তার বর্শা আলীবর্দী খানের প্রতি তাক করছিলেন, তখনই গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। সিয়ারে মন্তব্য করা হয়েছে যে, "হিন্দুস্তানে বাস্তবিকভাবে সরফরাজ খানের সৈন্য এবং বন্ধুদের মত এমন উৎসাহী ও প্রাণ উৎসর্গকারী সমর্থক আর ছিল না বললেই চলে।"[৮৫৯]

গউছ খান এবং মীর শারাফ উদ্দীনের অধিনস্থ সেনাদল ইতিমধ্যে নন্দলালের সৈন্যদেরকে সম্পূর্ণভাবে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে। পতাকাবাহী হাতি দেখে তারা বিভ্রান্ত হয় এবং নন্দলালকেই তারা আলীবর্দী খান বলে ধরে নেয় এবং তাকে হাতি থেকে টেনে নামিয়ে হত্যা করে। পরে তারা সরফরাজ খানের শিবিরের দিকে এগিয়ে আসেন। কিন্তু দেখতে পান যে, তিনি নিহত হয়েছেন এবং যুদ্ধের মাঠে আলীবর্দী খান বিজয়ী হয়েছেন। এই দুই সেনাপতি অবশ্য আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করেন এবং তাদের ক্ষুদ্র সেনাদল নিয়ে বীরের মত আক্রমণ করনে। গউছ খান ও তার দুই পুত্র যুদ্ধ করতে করতে নিহত হন, আর মীর শারাফ উদ্দীন প্রায় ৬০ জন সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ অব্যাহত রখেন। কিন্তু পরাজয় নিশ্চিত জেনে যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগ করেন এবং বর্ধমানের দিকে পালিয়ে যান। মীর হাবিব, শামশীর খান কোরেশী এবং অন্যান্যরা আলীবর্দী খানের নিকট আত্মসমর্পণ না করে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান। রায় রায়ান আলম চাঁদের "বিশ্বাসঘাতকতার উচিত শাস্তি হিসেবে তার ডান হাতে তীর বিদ্ধ হয়।" তিনি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং অর্ধমৃত অবস্থায় বাড়ী পৌঁছে "তার জঘন্য আচরণের জন্য গভীর অনুতাপ এবং লজ্জায় হীরের ছাই খেয়ে আত্ম হত্যা করেন।"[৮৬০] গউছ খান এবং মীর শারাফউদ্দীন বীর দর্পে যুদ্ধ করায় যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, সেই ফাঁকে সরফরাজ খানের হাতির মাহুত তাঁর লাশ দ্রুত বেগে মুর্শিদাবাদে নিয়ে যান। অনুরূপভাবে নওয়াবের দুই জামাতা- গজনফর হুসেন খান এবং হাসান মুহাম্মদ খান অন্যান্য কয়েকজনের সাথে মুর্শিদাবাদে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন এবং সেখানে রাতের আধারে সরফরাজ খানের লাশের দাফন সম্পন্ন করেন এবং পরিখা খনন করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তারা অবশ্য পরাজিত সৈন্যদের নিকট থেকে কোন উৎসাহ পাননি। অতএব, প্রতিরোধ করার পরিকল্পনা ত্যাগ করে বিজয়ীর নিকট আত্মসমর্পণ করার জন্য প্রস্তুত হন।

এইভাবে আলীবর্দী খান বাংলার মসনদ দখল করেন। বাহ্যিকভাবে সরফরাজ খানের ব্যর্থতার কারণ হচ্ছে তাঁর সহজ-সরল মন, সততা এবং কিছু

---

৮৫৯ সিয়ার, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৩৯

৮৬০ রিয়াদ ১ম খন্ড, পৃঃ ৩২০, টি.বি., পৃঃ ১৭২

লোকের অনান্তরিকতা এবং শত্রুতা উৎঘাটিত হওয়ার পরও তাদের কথায় অব্যাহতভাবে বিশ্বাস স্থাপন। তাঁর চতুপার্শ্বে ক্ষমতা ও আস্থার স্থানে দৃঢ়ভাবে আকড়ে বসা লোকদের চক্রান্ত ও বিশ্বাসঘাতকতাকে মোকাবেলা করার জন্য যে ধরণের চাতুরী এবং নির্দয়তা থাকার দরকার ছিল, তা তাঁর ছিল না। তাঁর দোদুল্যমানতা এবং দৃশ্যত দূর্বলতার কারণ হয়ত এই ছিল যে, তিনি তার শত্রুদের ব্যাপক ক্ষমতা এবং তাঁর বিরুদ্ধে তাদের সুবিস্তৃত চক্রান্ত সম্পর্কে অবগত ছিলেন। যাহোক, গিরিয়ার যুদ্ধ এবং সরফরাজ খানের পতন ছিল আসলে মুর্শিদ কুলী খান এবং শুজাউদ্দীন খানের সৃষ্ট পরিবেশ পরিস্থিতির ফল, যা মাত্র ১৭ বৎসর পরে পলাশীর মাঠে অনুরূপ এক নাটকের প্রহসন ঘটায়। এই উভয় ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিকগণ সাধারণত পতিত বীরদের ব্যক্তি চরিত্রের মধ্যে ফলাফলের ব্যাখ্যা খুঁজতে চেষ্টা করেছেন- যা আসলে তাদের ব্যাপারে ঘটনোত্তর মতামত। তা যাই হোক, তাওয়ারিখ-ই-বাঙ্গালাহও তাই করেছে এবং সরফরাজ খানকে একজন আরাম প্রিয় ও নারী-বিলাসী যুবক হিসেবে চিত্রিত করেছে। যদিও তা অনেকটা স্ব-বিরোধী বক্তব্য, কারণ তাওয়ারিখে আরো বলা হয়েছে যে, শাহজাদা ধর্মের "বাহ্যিক অনুশাসনের" প্রতি ছিলেন নিবেদিত এবং তাঁর পিতার নিয়োজিতদের (কোরআনের আবৃত্তিকারী) অনেককেই তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।[৮৬১] সম্ভবত তাঁর সম্পর্কে সিয়ারের মন্তব্য অনেক বেশি বাস্তবধর্মী; এতে বলা হয়েছে যে, "সরফরাজ খান ছিলেন একান্তই ধার্মিক ব্যক্তি, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান অনুশীলনের ব্যাপারে আসক্ত এবং নির্ধারিত (ফরজ) নামাজের ব্যাপারে অত্যন্ত পাকাপোক্ত। পবিত্র রমজান মাস ছাড়াও তিনি বৎসরে আরো পুরো তিন মাস রোজা রাখতেন এবং সারা বৎসরব্যাপী অন্যান্য যে সকল ধর্মীয় কর্তব্য ছিল, তাও তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। কিন্তু, একই সঙ্গে একজন রাজা-বাদশার জন্য যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, চাতুরতা এবং দূরদৃষ্টি আবশ্যক, তা তাঁর মধ্যে একান্তই অভাব ছিল বলে তিনি প্রমাণ দিয়েছেন।"[৮৬২]

---

৮৬১ টি.বি., পৃঃ ১২৬-১২৭

৮৬২ সিয়ার ১ম খন্ড, পৃঃ ৩২৬

দশম অধ্যায়[৮৬৩]

আলীবর্দী খান

আভ্যন্তরীণ মতভেদ এবং বিদেশী অনুপ্রবেশ

(১৭৪০-১৭৫৬ খ্রিঃ)

১.আলীবর্দী খানের বাংলার মসনদে আরোহণ

আলীবর্দী খান সংযম ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তাঁর বিজয়কে ব্যবহার করেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদাবাদ গমণ করেননি, বরং শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে গোবরা পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে সেখানেই শিবির স্থাপন করেন এবং তাঁর বিজয়ের ঘোষণা প্রদান, পরলোকগত নওয়াবের ধন-ভাণ্ডারের নিরাপত্তা বিধান, একটি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা এবং সকলের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সকল কর্মকর্তা ও অধিবাসীদেরকে পক্ষে টেনে আনার জন্য তার ভাই হাজী আহমদকে মুর্শিবাদে প্রেরণ করেন।[৮৬৪]

আলীবর্দী খানের পক্ষ হতে নিঃসন্দেহে এটা ছিল একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ পদক্ষেপ। কারণ তাওয়ারিখ-ই-বাঙ্গালায় যথার্থই মন্তব্য করা হয়েছে যে, যদি বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নগরে প্রবেশ করতেন, "তাহলে সরফরাজ খানের ধন-ভাণ্ডার এবং অন্যান্য বিষয় সম্পদ লুট করা থেকে তাদেরকে (সৈন্যদেরকে) সামলানো সম্ভব হত না।"[৮৬৫] মনে হয় হাজী আহমদের জন্য এ কাজ সহজ সাধ্য হয়েছিল। কারণ, পূর্ব থেকেই শহরের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এবং কর্মকর্তাদের সঙ্গে তার পরিচয় এবং সমঝোতা ছিল। অতএব, মুর্শিদাবাদের ফৌজদার ইয়াসিন খানের সহায়তায় তিনি সরফরাজ খানের ধন-ভাণ্ডার এবং তার পরিবারের নিরাপত্তা বিধান করেন এবং সরকারী কর্মকর্তাদেরকে উদ্বেগমুক্ত ও নিরাপদ করেন।

---

৮৬৩ মূল বইয়ে পঞ্চবিংশ অধ্যায়

৮৬৪ টি বি ১৭১; সিয়ার ১ম খন্ড, ৩৩৯-৩৪০: রিয়াদ, ৩২০-৩২১।

৮৬৫ টি বি, ১৭৩ রিয়াদে যে মন্তব্য করা হয়েছে, আলীবর্দী খানের শহরের বাহিরে তাঁবু ফেলে তিনদিন অপেক্ষা করার উদ্দেশ্যে ছিল আফগান এবং ভালিয়াদের দ্বারা সরফরাজ খানের ধন-ভান্ডার লুট হওয়া এবং নির্মমভাবে নগরীর লুন্ঠন কাজের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা" তা, যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হয় না। কারণ আলীবর্দী নিজের স্বার্থেই সৈন্যদেরকে সরফরাজ খানের ধন-ভান্ডার লুট করে নিতে অনুমতি দিতে পারেন না।।

চতুর্থদিনে আলীবর্দী খান নগরে প্রবেশ করেন। সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা এবং শীর্ষস্থানীয় নাগরিকদের নিকট থেকে অভিবাদন এবং উপঢৌকন লাভ করেন। তিনি সরফরাজ খানের কোটি কোটি টাকার বিরাট ধন-ভাণ্ডার, যা মুর্শিদকুলী খানের সময় থেকে সঞ্চিত হয়ে আসছিল, তা অধিকার করেন এবং সরফরাজ খানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী, যারা যুদ্ধে নিহত হয়েছেন, যথা- হাজী লুৎফ আলী, মিনুসির খান এবং মীর মুর্তাজা তাদের সকলের ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন। তিনি অবশ্য সরফরাজ খানের পরিবারের সদস্য, তাঁর বোন নফিসা বেগমসহ সকলের প্রতি সদয় এবং সম্মানজনক ব্যবহার করেন। তাদেরকে তাদের ব্যক্তিগত বিষয়-সম্পদ রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছিল এবং তদুপরি তাদের জন্য উপযুক্ত ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছিল। কিছুদিন পরে সরফরাজ খানের স্ত্রী, পুত্র-কন্যা এবং নাফিসা বেগমকেও ঢাকা পাঠিয়ে দেয়া হয়, স্পষ্টতই তাদেরকে কেন্দ্র করে আলীবর্দী খানের শাসনের বিরুদ্ধে কোন প্রকার বিরোধীতা বা বিদ্রোহদানা বেঁধে ওঠা প্রতিহত করার জন্যই এটা করা হয়। নাফিসা বেগম সরফরাজ খানের নাবালেগ পুত্র আগা বাবা কুচককে তার পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন এবং ঢাকার গভর্ণর নওয়াজিশ মুহাম্মদ খানের পরিবারের জন্য গৃহ শিক্ষিকার চাকুরীতে যোগ দেন।

স্বাভাবিকভাবেই আলীবর্দী খানের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল সরকারের প্রধান প্রধান পদগুলো তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং সমর্থকদের মধ্যে বণ্টন করা। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতুস্পুত্র এবং জামাতা জয়নুদ্দীন আহমদ খান, যাকে বিহারের দায়িত্বে রেখে এসেছিলেন, তাকে সে প্রদেশের নায়েব সুবাদার বা গভর্ণরের পদে স্থায়ী করেন। রওশনাবাদ (ত্রিপুরা) এবং সিলেটসহ জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকা) প্রদেশের নায়েব সুবাদারী এবং বাংলার নামমাত্র দিওয়ানী প্রদান করেন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুস্পুত্র এবং জামাতা নওয়াজিশ মুহাম্মদ খানকে এবং একজন বিশ্বস্তকর্মচারী হোসেন কুলী খানকে তার নায়েব নিযুক্ত করেন। সরফরাজ খানের ভগ্নিপতি দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানের হাত থেকে উড়িষ্যা পুনরুদ্ধার করা এবং এর নায়েব সুবাদারের পদ আলীবর্দী খানের দ্বিতীয় জামাতা সাঈদ আহমদ খানের জন্য নির্ধারণ করে রাখা হয়। আলীবর্দী খানের ভ্রাতা কাশিম আলী খানকে দেয়া হয় রংপুরের ফৌজদারী যা এতদিন পর্যন্ত ছিল সাঈদ আহমদ খানের হাতে। হাজী আহমদের কনিষ্ঠ জামাতা আতাউল্লাহ খানকে সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ রাজমহলের ফৌজদারীতে বহাল রাখা হয়। তদুপরি ভাগলপুরের দায়িত্বও তাকে প্রদান করা হয়। বাংলার সাবেক সেনাবাহিনী (যে বাহিনী আলীবর্দী খানের সঙ্গে

বিহার থেকে আসেনি) এর বখশীর পদ দেয়া হয় আলীবর্দী খানের শ্যালিকার স্বামী মীর জাফর খানকে; আর নতুন বাহিনীর ঐ পদ দেয়া হয় তাঁর আরেক আত্মীয় নাসর আলী খানকে। রায় রায়ান আলম চাঁদ মারা যাওয়ায় তার পেশকার (ক্লার্ক) চিন রায়কে ঐ উপাধি দেয়া হয় এবং তাকে বাংলার নায়েবে দীওয়ান নিযুক্ত করা হয়; অন্যদিকে আলীবর্দী খানের পারিবারিক দীওয়ান জানকিরামকে বিবিধ বিভাগের দীওয়ান নিযুক্ত করা হয়। তাঁর অন্যান্য আত্মীয় এবং সমর্থক যথা নুরুল্লাহ বেগ খান, ফকীরুল্লাহ বেগ খান, হায়দার আলী খান প্রমুখকে মনসব বৃদ্ধির মাধ্যমে পদোন্নতি দিয়ে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দান এবং জাগীর প্রদান করেন। আলীবর্দী খানের দৌহিত্র, তাঁর কনিষ্ঠ কন্যার পুত্র মির্যা মুহাম্মদ আলীকে (জয়নুদ্দীন আহমদ খানের পুত্র) সিরাজুদ্দৌলাহ শাহকুলী খান বাহাদূর উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং তাকে জাহাঙ্গীর নগরের নাওয়ারার (রনতরীর বহরের) নামে মাত্র অধীনায়কত্ব প্রদান করা হয়; আর তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মির্যা মেহেদী আলীকে ইকরামুদ্দৌলাহ বাদশা কুলী খান উপাধি প্রদান করা হয় এবং নওয়াজিশ মুহাম্মদ খানের কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তিনি তাকে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন।

একই সময়ে আলীবর্দী খান তাঁর অবস্থাকে বৈধ করার জন্য সম্রাটের নিকট থেকে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন এবং নিয়োগ লাভের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। নাদির শাহের ধ্বংসাত্মক আক্রমণের (১৭৩৯) ফলে সম্রাটের মর্যাদা ও ক্ষমতা দারুণভাবে হ্রাস পেয়েছিল এবং বাস্তবে তখন তাঁর সামনে এই জবর দখলকে স্বীকৃতি বা এর প্রতি সম্মতি দেয়া ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না। আলীবর্দী খানের অবশ্য তাঁর অবস্থানকে সমসাময়িকদের নিকট আইন সঙ্গত করার জন্য এরূপ অনুমোদন প্রয়োজন ছিল। কারণ বলা হয়েছে যে, তাদের অনেকেই আলীবর্দী খান কর্তৃক তাঁর আশ্রয়দাতা উপকারীর পুত্রের প্রতি এরূপ ভয়াবহ লোমহর্ষক আচরণকে দারুন ঘৃণার চোখে এবং ভীষণ আতঙ্কের দৃষ্টিতে দেখতেন এবং তাকে জঘন্য অকৃতজ্ঞতার অপরাধে অপরাধী গণ্য করতেন। তদুপরি পরলোকগত নওয়াবের সমর্থক ও আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে যারা উড়িষ্যায় ছিলেন, তাদের বিরোধিতা দমনের জন্য তাদেরকে নিরস্ত্র করাকেও তারা সুনজরে দেখতেন না। ইতিমধ্যেই সম্রাট মুহাম্মদ শাহ সরফরাজ খানের ধন-ভাণ্ডার বুঝে নেয়া এবং বাংলার রাজস্ব সংগ্রহের জন্য মুরাদ খান নামক একজন অফিসারকে প্রেরণ করেছিলেন।[৮৬৬] তাই আলীবর্দী খান মুরাদ খানের মাধ্যমে সরফরাজ খানের ধন

---

[৮৬৬] সিয়ার, পৃঃ ৩৪৭।

ভাণ্ডার থেকে ৪০,০০,০০০.০০ টাকা এবং পারিতোষিক হিসেবে আরো ১৪,০০,০০০.০০ টাকা এবং এর সঙ্গে বাংলার স্বাভাবিক রাজস্বও সম্রাটের জন্য প্রেরণ করেন। আলীবর্দী খান দিল্লীর দরবারের প্রভাবশালী আমীর ও ওয়াজীরদের যথা ওয়াজীর কমরুদ্দীন এবং আসফ জাহ্ নিযামুল মুলককে যথাক্রমে তিন লক্ষ এবং এক লক্ষ টাকা দিয়ে তাদের সমর্থন আদায় করেন। তাছাড়াও তিনি দিল্লীর দরবারে পরলোকগত নওয়াবের প্রতিনিধি রাজা জুগল কিশোরকেও স্বপক্ষে টেনে নেন।[৮৬৭] এই সকল উপায় অবলম্বন করে আলীবর্দী খান সম্রাট মুহাম্মদ শাহকে শান্ত করতে সক্ষম হন। সম্রাট অবশ্য তাঁর অসহায় অবস্থাকে যথা সম্ভব সদ্ব্যবহার করে আলীবর্দী খানকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা-এই তিন প্রদেশের নিযামত অর্পণ করেন। অন্যদিকে, আলীবর্দী খানও তার পক্ষ থেকে সম্রাটকে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বাংলার রাজস্ব হিসেবে বৎসরে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা প্রদান করতে অঙ্গীকার করেন।[৮৬৮] ১১৫৩ হিজরী সালের রজব মাসে (১৭৪০ খ্রিঃ) গিরিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পাঁচ মাসের মধ্যে এইসব ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয় বলে মনে হচ্ছে।

২. উড়িষ্যা অধিকারের চেষ্টা

বাংলার মসনদে আরোহণকে বৈধ করে এবার আলীবর্দী খান উড়িষ্যার দিকে তাঁর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। সরফরাজ খানের ভগ্নিপতি দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খান তখন উড়িষ্যা শাসন করতেন। সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার শুরুতেই আলীবর্দীখান দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানকে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা করেননি, এমন কি তাকে সাহায্য করার জন্য সরফরাজ খানের আহবানেও তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেননি। তবে সরফরাজ খানের পতন এবং আলীবর্দী খান কর্তৃক বাংলা দখল করার সংবাদ তার নিকট পৌঁছার ঠিক মূহূর্তে তিনি মাত্র একটি সাহায্যকারী সেনাদল প্রেরণ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।[৮৬৯] হঠাৎ পরিস্থিতির মোড় ঘুরে যাওয়ায় দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খান তার নিজের অবস্থা সম্পর্কে শংকিত হয়ে পড়েন এবং আত্মরক্ষার্থে কঠোর প্রস্তুতি শুরু করেন। একই সময়ে তিনি তাঁর অধীনে দীর্ঘদিন যাবত কর্মরত হাজী

---

৮৬৭ টি বি ১৭৫ রিয়াদ, ৩২২। সিয়ারের বর্ণনানুযায়ী সরফরাজ খানের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে আলীবর্দী খান মুরাদ খানের নিকট সত্তুর লক্ষ টাকার মনি-মুক্তা , প্রচুর পরিমান স্বর্ণ এবং রৌপ্যের আসবাবপত্র, অন্যান্য মূল্যবান ধাতব পদার্থ এবং প্রচুর সংখ্যক হাতিও ঘোড়া প্রদান করেছিলেন এবং মুরাদ খানকেও "তাঁর মর্যাদা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সর্বপ্রকার উপঢৌকন দিয়েছিলেন।"

৮৬৮ টি বি , ১৭৫।

৮৬৯ রিয়াদ, ৩২৫।

আহমদের জামাতা মুখলেস আলী খানকে একটি সমঝোতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আলাপ-আলোচনা করার জন্য মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করেন।[৮৭০] তাওয়ারিখ-ই-বাঙ্গালাহ এবং রিয়াদ-এ উভয় গ্রন্থানুযায়ীই আলীবর্দী খান এবং তাঁর ভ্রাতা হাজী আহমদ বাহ্যিকভাবে একটি আপোষ-নিষ্পত্তির আশা দিয়ে মুখলেস আলী খানকে দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানের নিকট উড়িষ্যায় ফেরত পাঠান, কিন্তু তাদের গোপন উদ্দেশ্য ছিল তার সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ বপন করা এবং তাদেরকে প্রলুব্ধ করা।[৮৭১] সিয়ারে অবশ্য এই বলে দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলী খানকে দোষারোপ করা হয়েছে যে, তাঁর স্ত্রী (সরফরাজ খানের বোন) এবং তাদের জামাতা মির্যা বাকির খান চক্রান্ত করে তাকে সরফরাজ খানের হত্যার বদলা নিতে উস্কানী দিয়ে সমঝোতার সম্ভাবনা নস্যাত করে দেন।[৮৭২] সে যাই হোক, এখন তিনটি সূত্র থেকেই এটা পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে যে, উভয় পক্ষের মধ্যেই কিছুটা আলোপ-আলাচনা শুরু হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খান নন, বরং আলীবর্দী খানই স্বসৈন্যে উড়িষ্যার বিরুদ্ধে অভিযান নিয়ে অগ্রসর হন। এটাই ছিল স্বাভাবিক, কারণ আলীবর্দী খান চক্রান্ত ও যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলার মসনদ লাভ করেছিলেন এবং তার অধীনে ছিল একটি বিজয়ী এবং দুধর্ষ আফগান এবং বিহারের বাহলিয়া হিন্দুদের সমন্বয়ে গঠিত একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী, তদুপরি তিনি সম্রাট কর্তৃক আনুষ্ঠানিক নিয়োগও পেয়েছিলেন; তাই তিনি কোনভাবেই এরূপ একটি বড় প্রদেশে নিহত নওয়াবের কোন উপযুক্ত আত্মীয়ের অস্তিত্ব সহ্য করতে পারছিলেন না। আলীবর্দী খান অবশ্য দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানের মত একজন অধীনস্থ মিত্রের অধীনে উড়িষ্যার মত একটি প্রদেশ, যা তার নিজের এবং উদীয়মান মারাঠাশক্তির মধ্যে একটি মধ্যবর্তী রাষ্ট্র (Buffer State) হিসেবে থাকার যে সুবিধা ছিল, তা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

১৭৪১ সালের প্রথম দিকে আলীবর্দী খান একটি বিরাট বাহিনী এবং প্রচুর সংখ্যক গোলন্দাজ সৈন্য নিয়ে উড়িষ্যার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন।[৮৭৩] এই সংবাদ জানতে পেরে দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খান তাঁর ধন-সম্পদ ও পরিবারকে কটকের

---

৮৭০ টি,বি, ১৭৮; রিয়াদ, ৩২৫, সিয়ারে মুখলেস আলী খানের কোন উল্লেখ নেই। তবে বলা হয়েছে, দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খান "সুরাটের জনৈক আগা মাহমুদ তকীকে আলীবর্দী খানের মনোভাব জানার জন্য এবং একটি সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের জন্য মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করেছিলেন" (১ম খন্ড, ৩৪৮)।

৮৭১ টি, রি, ১৭৮, রিয়াদ, ৩২৫

৮৭২ সিয়ার, ১ম খন্ড, ৩৪৮, ৩৪৯

৮৭৩ রিয়াদ অনুযায়ী (পৃঃ ৩২৭) আলীবর্দী খানের বাহিনীতে "প্রায় এক লক্ষ অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সৈন্য ছিল।" তবে সিয়ারে (১ম খন্ড পৃঃ ৩৪৯) এই সংখ্যা "দশ থেকে বার হাজার বাছাই করা সৈন্য ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।"

নিকটবর্তী বরাহবাটি দুর্গে রেখে তার সেনাবাহিনী এবং দুই জামাতা যথা, পারশ্যের রাজপুত্র মির্যা মুহাম্মদ বাকির এবং আতাউদ্দীন মুহাম্মদ খানকে সাথে নিয়ে অগ্রসর হন এবং বালাশোরের নিকটবর্তী প্রাকৃতিকভাবে নিরাপদ এবং সামরিক কৌশলের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ দুটি পাহাড় এবং খাঁড়া পাড় বিশিষ্ট নদীর মধ্যবর্তী জায়গায় এসে ট্রেঞ্চ বা পরীখা খনন করে অবস্থান গ্রহণ করেন। আলীবর্দী খান কোন সমস্যা মোকাবেলা না করেই মেদিনীপুর পর্যন্ত অগ্রসর হন; কিন্তু তার পরেই উড়িষ্যার সীমান্তের জমিদারগণ, যারা দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলী খানের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, তারা চাননি যে, বাংলার বাহিনী তাদের রাজ্যের মধ্য দিয়ে উড়িষ্যার বিরুদ্ধে অগ্রসর হোক; বিশেষ করে ময়ূর ভাঞ্জের জমিদার, রাজা জগরধর ভাঞ্জ (অথবা রঘুনাথ ভাঞ্জ) সুবর্ণরেখা নদীর অপর পাড়ে রাজঘাটের নিকট তার সৈন্য মোতায়েন করেন এবং আলীবর্দী খানকে ফেরী পার হতে বাধা প্রদান করেন। আলীবর্দী খান শুধু ব্যাপকভাবে কামান দাগিয়ে রাজার সৈন্যদের নিকটবর্তী জঙ্গলে তাড়িয়ে দিয়েই নদী পার হতে সক্ষম হন। এরপর আলীবর্দী খান মুর্শিদ কুলী খানের অবস্থানের তিন মাইলের মধ্যে রামচন্দ্রপুরে এসে পৌঁছেন এবং মুর্শিদকুলী খানের প্রবল এবং দুর্জয় অবস্থান সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পেরে অনতিবিলম্বে তার বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করা যথাযথ হবে না বলে মনে করেন এবং প্রায় ১ মাস পর্যন্ত রামচন্দ্রপুরের শিবিরে অবস্থান করে বিভিন্ন রকম আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকেন এবং মুখলেস খান ও অন্যান্য এজেন্টদের মাধ্যমে মুর্শিদ কুলী খানকে তার সুরক্ষিত স্থান থেকে বেরিয়ে আসতে প্ররোচিত করেন; আরও বিভিন্নভাবে তার কর্মকর্তাদের প্রলুব্ধ করেন। ইতিমধ্যে আলীবর্দী খান তীব্র রসদ ঘাটতির সম্মুখীন হন। বিশেষ করে তাঁর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন জমিদারগণ তাঁর পিছনের রসদ সরবরাহের লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেন। কাজেই, সিয়ারের বর্ণনানুযায়ী আলীবর্দী খানের অবস্থান ছিল[৮৭৪] "তাঁর সহজাত সাহসিকতা থমকে দাঁড়িয়েছিল; এরূপ ক্রুদ্ধ এবং এরূপভাবে ট্রেঞ্চদ্বারা সুরক্ষিত শত্রুকে আক্রমণ করা ছিল দুঃসাধ্য। সে সুরক্ষিত স্থান থেকে তাকে বের হয়ে আসতে প্ররোচিত করাই ছিল সুনিশ্চিত পন্থা (জয়ের জন্য); কিন্তু তখন তাঁর অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়ায়। বাংলার সীমান্তবর্তী জমিদারগণ তাঁর শিবিরে সরবরাহ যান প্রেরণে ছিল অমনোযোগী, এবং কদাচিত কেহ সেদিকে অগ্রসর হলেও উড়িষ্যার বড় বড় ভূস্বামীগণ তাদেরকে বাধা দিতে কখনো ব্যর্থতার পরিচয় দেননি, তারা যেমন তাঁকে অপছন্দ করতেন, তেমনি তাঁর শিবিরকেও বৈরী শিবির বলে গণ্য করতেন। নারায়ণগড়ের গভর্ণর কর্তৃক প্রেরিত কিছু রসদও এইভাবে

---

[৮৭৪] সিয়ার, ১ম খন্ড, ৩৫০-৩৫১; আরো আছে টি. রি. ১৮০; রিয়াদ, ৩২৮

মাঝপথে পাকড়াও করা হয় এবং সরবরাহকারীগণ হতবুদ্ধি হয়ে তাদের সরবরাহ কাজ বন্ধ করে দেয়, ফলে রসদের তীব্র ঘাটতি দেখা দেয় এবং অবশেষে দুস্প্রাপ্য হয়ে অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়।"

এই অবস্থায় মুর্শিদকুলী খানের পক্ষ হতে প্রয়োজন ছিল শুধু ধৈর্য ধারণ যেন অনাহারক্লিষ্ট হয়ে শত্রুর ধ্বংসাত্মক পশ্চাদপসারণ ঘটে; এবং এজন্য তিনি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু মুখলেস আলী খান উড়িষ্যা বাহিনীতে কর্মরত আফগান সৈন্যদের অধীনায়ক আবিদ আলী খানকে গোপনে স্বপক্ষে টেনে নেন এবং "কৌশলে প্রতারণার জন্য ফন্দি করে" মুর্শিদ কুলী খানের জামাতা মির্যা বাকির খানের "যুব ও উচ্চাকাংখী মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে" তাকে ট্রেঞ্চ থেকে বের হয়ে এসে বাংলার বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হন। তাই মুর্শিদকুলী খানের আপত্তি উপেক্ষা করে মির্যা বাকির খান ১৭৪১ সালের ৩রা মার্চ বাংলার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ঠিক এটাই আলীবর্দী খান চেয়েছিলেন। তথাপি মুর্শিদকুলী খান ও মির্যা বাকির খান তাদের অধীনস্থ বাড়ের সায়িদদের সাহসী সৈন্যদের নিয়ে তাদের চেয়ে বিপুল সংখ্যাধিক শত্রুদেরকে বহু দূরে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হন; এমনকি, যে হাতিতে আলীবর্দী খান ও তাঁর স্ত্রী আসীন ছিলেন, সেটিকে মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন করে বেশ কিছুটা দূরে তাড়িয়ে নিয়ে যান। এ সংকট মূহুর্তে দুটি ঘটনা যুদ্ধের গতি পালটিয়ে দেয়। আবিদ আলী খান তার অধীনস্থ সেনাদল এবং আরো কিছু সংখ্যক সেনা কর্মকর্তা নিয়ে পক্ষ ত্যাগ করে আলীবর্দী খানের সঙ্গে যোগ দেন। একই সময়ে বর্ধমানের রাজার পেশকার, মানিক চাঁদ একটি শক্তিশালী সাহায্যকারী সৈন্যদল নিয়ে পৌঁছেন এবং আলীবর্দী খানের সঙ্গে যোগ দেন।[৮৭৫] আলীবর্দী খান ঘুরে দাঁড়ান এবং এক প্রচণ্ড যুদ্ধের পর মুর্শিদ কুলী খান সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন এবং তিনি মাত্র দুই থেকে তিন হাজার সৈন্যসহ বালাশোরে পশ্চাদপসারণ করেন। এখন এদের মধ্য থেকেও বিশ্বাস ঘাতকতার আশংকা করে তিনি তার জামাতা মির্যা বাকির খানসহ একটি নৌযানে চড়ে দাক্ষিনাত্যের দিকে পাঁড়ি দেন এবং সেখানে হায়দারাবাদের নিযামুল মুলক আসফ জাহর নিকট আশ্রয় লাভ করেন। আলীবর্দী খান কোন সময় ক্ষেপন না করে বালাশোরে এসে পৌঁছেন এবং সেখান থেকে দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানের পরিবার পরিজন এবং তাঁর ধন-সম্পদ আটক করার জন্য একটি শক্তিশালী সেনাদল কটকে প্রেরণ করেন। মুর্শিদকুলী খানের সৌভাগ্য যে, বাংলার সেনাদল প্রাসাদে পৌঁছার পূর্বেই এখানকার বিশ্বস্ত গভর্ণর হাফীজ কাদির তার সহকারী শাহ মুরাদের সহায়তায় সবে মাত্র মুর্শিদকুলী খানের

---

[৮৭৫] টি.রি, ১৮১-১৮২; রিয়াদ, ৩২৮-৩৩০, সিয়ার, ১ম খন্ড, ৩৫১-৩৫৩

স্ত্রী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে তাদের ব্যক্তিগত ধন-সম্পদের বিরাট অংশসহ কটকের একশত মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে শিকাকোলে প্রেরণ করেন। এই এলাকাটি ছিল মুর্শিদ কুলি খানের পূরানো পরিচিত এবং বন্ধু আনোয়ার উদ্দীনের শাসনাধীন। শিকাকোল থেকে পরবর্তী সময়ে মির্যা বাকির খান তাদেরকে দাক্ষিনাত্যে নিয়ে যান।

আলীবর্দী খান বালাশোর থেকে কটকের দিকে অগ্রসর হন এবং সেখানে মুর্শিদকুলী খানের অবশিষ্ট বিষয় সম্পদ এবং ধন-ভাণ্ডার হস্তগত করেন। তার প্রতি অনুগতদের বিষয় সম্পদও বাজেয়াপ্ত করেন। তারপর আলীবর্দী খান এক ঘোষণার মাধ্যমে সকলের জন্য সাধারণ ক্ষমা মঞ্জুর এবং যারা নিজ নিজ কাজে যোগদান করবেন, তাদের জন্য জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করেন। এইভাবে ক্ষমা মঞ্জুর এবং সদয় আশ্বাস দেয়ায় জমিদারগণ তাঁকে নজরানা প্রদানে উদ্বুদ্ধ হন এবং তিনি তাদের সঙ্গে রাজস্ব প্রদানের ব্যাপারে চুক্তি সম্পাদন করেন। তিনি কটকে প্রায় একমাস অবস্থান করে প্রদেশের বিভিন্ন বিষয় নিষ্পত্তি করে তার দ্বিতীয় জামাতা সৈয়দ আহমদ খানকে তার নায়েব সুবাদার নিয়োগ করেন। তাকে নাসিরুল মুলক সওলাত জং উপাধি প্রদান করেন। সওলাত জংকে সাহায্য করার জন্য জনৈক রোহিলা আফগান গুজার খানের নেতৃত্বে তিন হাজার অশ্বারোহী এবং চার হাজার পদাতিক সৈন্য রেখে আলীবর্দী খান বিজয়ীর বেশে বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন।

তবে তার বিজয় ছিল বাহ্যিক, কারণ উড়িষ্যার জনগণ সাধারণভাবে এবং ব্যবসায়ী, জমিদার, সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ বিশেষভাবে মনে প্রাণে দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। এর প্রমান পাওয়া যায় মাত্র এক বৎসর যেতে না যেতেই মুর্শিদকুলী খানের জামাতা মির্যা বাকিরের নাটকীয়ভাবে প্রত্যাবর্তনে। বুঝা যাচ্ছে যে, আলীবর্দী খানের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সুযোগ নিয়ে ক্ষমতাচ্যূত গভর্ণরের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা ও সেনাধ্যক্ষ, এমন কি শাহ মুরাদ পর্যন্ত, যিনি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মূহুর্তে তার পরিবারকে বাঁচিয়ে ছিলেন, তারা কটকেই থেকে গিয়েছিলেন। সেখানে তারা "গোপনে তাদের সাবেক প্রভুর, বিশেষ করে মির্যা বাকেরের প্রতি ভক্তি পোষণ করতেন।"[৮৭৬] সাঈদ আহমদ খানের নিজের কর্মকাণ্ডও তার শত্রুদেরকে সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। তার সরকারের ব্যয় সংকোচন এবং অর্থ সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে তিনি তার সৈন্য বাহিনীর বেতন-ভাতা কমিয়ে দেন এবং এতে বিরক্ত হয়ে অনেকেই বাংলায় ফিরে আসেন। সাঈদ আহমদ খান হ্রাসকৃত বেতনে স্থানীয়ভাবে সৈন্য নিয়োগ করে

---

[৮৭৬] সিয়ার, ১ম খন্ড, ৩৬০

তাদের শূন্যস্থান পূরণ করেন এবং এরা ছিলেন মূলত মুর্শিদকুলী খানের কর্মকর্তা ও তার ভক্ত। অল্প সময়ের মধ্যে এই ধরনের লোকেরাই সেনা বাহিনীর সকল স্তরে অনুপ্রবেশ করে। এই সময়ে সাঈদ আহমদ খানের দুর্ভাগ্য আরো বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হলে শাহ ইয়াহিয়া নামের তার পুরানো পরিচিত জনৈক ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া। এক সময় তিনি দিল্লীতে একই স্কুলে তার সঙ্গে পড়তেন এবং এই সময় তিনি সমগ্র দাক্ষিনাত্য ভ্রমন করে কটকে এসে উপস্থিত হন। শীঘ্রই সাঈদ আহমদ খানের একজন প্রিয় ভাজন এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিনত হন।[৮৭৭] এই লোকের পরামর্শ অনুসারে সাঈদ আহমদ খান এলাকার ধনী লোকদের নিকট থেকে হুমকি দিয়ে অর্থ আদায় করতে শুরু করেন এবং "বাড়ী বাড়ী সৈন্য পাঠিয়ে স্বীকৃতি আদায় ও তথ্য উদঘাটনের ছল করে সেখান থেকে মহিলাদেরকে ধরে নিয়ে আসতো।" এইভাবে অনেক সহিংস ঘটনাও ঘটে এবং সারা দেশব্যাপী একটি সাধারণ বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। "বিজিত রাজধানীর নাগরিকগণ" এই অত্যাচার থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করার জন্য এরূপ সংকল্পবদ্ধ হয় যে, সিয়ারের ভাষায়, "কেহ তাদেরকে দেখতে পেতো এক মাথা, এক কথা, এক অন্তর এবং এক অস্ত্রের মতো।"[৮৭৮] মির্যা বাকিরও নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। তিনি প্রথমে তার শ্বশুর মুর্শিদ কুলী খানকে উড়িষ্যা পুনরুদ্ধার করার জন্য রাজী করাতে চেষ্টা করেন; কিন্তু তিনি এই উদ্যোগের প্রতি কোন উৎসাহ প্রদর্শন না করায় মির্যা বাকির নিজেই এই উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি শুরু করেন। তিনি দাক্ষিনাত্য থেকে একটি বড় আকারের সেনাবাহিনী সংগ্রহ করেন এবং তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মারাঠীও ছিল।[৮৭৯]এরপর তিনি উড়িষ্যার দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং সেখানকার জমিদার ও ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে কটকে তার সমর্থকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেন। সংঘঠিত ঘটনাবলী থেকে এ ইঙ্গিতও পাওয়া যায় যে, সাঈদ আহমদ খান কর্তৃক সৈন্যদের বেতন হ্রাস করা, স্থানীয়ভাবে সৈন্য ও সেনা কর্মকর্তাদের নিয়োগ এবং ধনী ব্যক্তিদের নিকট থেকে জোর পূর্বক অর্থ আদায়, এ সকলই মির্যা বাকির ও তার সমর্থকদের সুচতুর ষড়যন্ত্রের ফলও হতে পারে। এমনকি শাহ ইয়াহিয়া মির্যা বাকিরের গোপন এজেন্টও হতে পারে। সে যাই হোক, মির্যা বাকির যখন দেখতে পান যে, সামরিক বেসামরিক সকল বিভাগই তার সমর্থকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং বর্তমান শাসন চূড়ান্তভাবে জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেছে, তখনই তিনি বিদ্রোহ সংঘটিত করার জন্য সংকেত দেন এবং নিজে দ্রুত সৈন্য সামন্ত নিয়ে কটকে এসে উপস্থিত হন। রাজধানীতে হঠাৎ বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং এতে

---

৮৭৭ সিয়ার, ১ম খন্ড, ৩৬০

৮৭৮ সিয়ার, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৬১

৮৭৯ সিয়ার, পৃঃ ৩৬২ এবং ৩৬৬-৩৬৭

সাঈদ আহমদ খানের সেনাপতিদেরকে হত্যা করা হয় এবং তিনি নিজেও স্ত্রী-পুত্রসহ বন্দী হন। মির্যা বাকির নিজকে কটকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং শহরের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এসে তাকে সম্মান জানান।"[৮৮০]

সাঈদ আহমদ খানের ক্ষমতাচ্যুতি এবং বন্দী হওয়া এবং মির্যা বাকির কর্তৃক উড়িষ্যার ক্ষমতা গ্রহণে মুর্শিদাবাদে বিস্ময় ও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। আলীবর্দী খান সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি সন্দেহ করতেন যে, "দাক্ষিনাত্যের সুবাদার নিযামুল মুলকের গোপন সমর্থন ব্যতীত এরূপ একটি ব্যাপক বিপ্লব ঘটানো সম্ভব নয়"।[৮৮১] সাঈদ আহমদ খানের পিতা-মাতা, হাজী আহমদ ও তার স্ত্রী স্বভাবতই উদ্বিগ্ন হন এবং "সাঈদ আহমদও তার পুরো পরিবারকে মুক্তির বিনিময়ে মির্যা বাকেরের নিকট উড়িষ্যার সরকারী দায়িত্ব ন্যস্ত করা যুক্তিযুক্ত বলে পরামর্শ দেন।" কিন্তু আলীবর্দী খানের চিন্তা ছিল যে, এ ধরনের কোন পদক্ষেপ তাঁর অবস্থান ও মর্যাদাকে দারুনভাবে ক্ষুন্ন করবে। অতএব, তাঁর ভ্রাতুস্পুত্রও উড়িষ্যা প্রদেশ পুনরুদ্ধার করার জন্য তিনি ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু করেন। মনে হচ্ছে যে, তাঁর প্রথম উড়িষ্যা অভিযান শেষে তাঁর বিশাল বাহিনীর একটি অংশকে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। তাই তিনি এখন তাঁর সেনাপতিদেরকে সৈন্য সংগ্রহ করতে নির্দেশ দেন। তিনি তাদেরকে আরো নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তারা যেন নতুন সৈন্য সংগ্রহ না করে, সম্ভবত বিলম্ব এড়ানো এবং বিশ্বাস ঘাতকতার ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকার জন্যই ঐ নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে "যাদেরকে হাতের কাছে পাওয়া যাবে, তাদেরকেই নিয়োগ করতে বলেছিলেন।"[৮৮২] সে অনুযায়ী তাঁর আফগান সেনাপতি মুস্তফা খান, শামশির খান, সর্দার খান এবং উমর খান প্রায় ১৫,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করেন। আর অন্যান্য সেনাপতি যথা, মীর জাফর খান, আতাউল্লাহ খান, হায়দার কুলী খান, ফকীর উল্লাহ বেগ খান আরো দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করেন। আলীবর্দী খান ফতেহ রাও এবং অন্যান্য হিন্দু কর্মকর্তাদেরকে আরো পঞ্চাশ হাজার বন্দুকধারী সৈন্য সংগ্রহ করতে নির্দেশ দেন।[৮৮৩] হাজী আহমদ এবং নওয়াজিশ মুহাম্মদের অধীনে ৫০০০ অশ্বারোহী

---

৮৮০ সিয়ার, ১ম খন্ড, ৩৬৩; টি, বি, ১৮৫-১৮৬, রিয়াদ ৩২২-৩২৩

৮৮১ সিয়ার, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৬৪

৮৮২ সিয়ার, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৬৫

৮৮৩ সিয়ার ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৬৫। বর্ণিত আছে যে, মোস্তফা খানের অধিনে ৫,০০০, শামশির খানের অধিনে ৩,০০০, সর্দার খানের অধিনে ২,০০০ এবং উমর খানের অধিনে ৩,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। অন্যদিকে আতাউল্লাহ খানের পরিচালনাধীনে ছিল ২,০০০, মীর জাফর খান, হায়দার কুলী হান এবং ফকীর উল্লাহ খানসহ প্রত্যেকের অধিনে ছিল ১,৫০০, বাহাদূর আলী খান, মীর শরাফউদ্দীন এবং শাহ মুহাম্মদ মাসুম প্রত্যেকের অধিনে ছিল ২০০ অশ্বারোহী সৈন্য

এবং ১০,০০০ পদাতিক সৈন্যসহ তাদেরকে মুর্শিদাবাদের দায়িত্বে রেখে আলীবর্দী খান অবশিষ্ট বাহিনী নিয়ে মির্যা বাকিরের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হন। বাংলার বাহিনী যখন কটক থেকে কিছুটা দূরে, তখন মির্যা বাকির তাদেরকে বাধা দেয়ার জন্য তার সৈন্যসহ এগিয়ে আসেন। কয়েকজন প্রহরী এবং ৫০০ মারাঠা সৈন্যের দায়িত্বে তার বন্দীকে রেখে যান এবং তাদেরকে এই নির্দেশ দিয়ে যান যে, যদি শত্রুরা তাদের নিকটে এসেই পড়ে, তাহলে তাকে শেষ করে দিতে। ১৭৪১ সালের ডিসেম্বরে মহানদীর তীরে উভয় পক্ষের মোকাবেলা হয় এবং মির্যা বাকির সংখ্যাধিক্যের নিকট সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন। কিছুক্ষণ তাদের আক্রমণ প্রতিহত করে তিনি শাহ মুরাদ ও তার অন্যান্য অনুসারিদের নিয়ে কটকে পশ্চাদপসারণ করেন এবং সেখান থেকে দ্রুত দাক্ষিনাত্যে পালিয়ে যান। মীর জাফর দ্রুত কিছু সৈন্য নিয়ে যেখানে সাঈদ আহমদকে আটক রাখা হয়েছিল, প্রহরীরা তার কোন ক্ষতি করার পূর্বেই তিনি সেখানে এসে উপস্থিত হন এবং তাকে উদ্ধার করেন।[৮৮৪] তার পরিবারকেও যেখানে আটক করা হয়েছিল, সে বরাহবাটি দূর্গ থেকে তাদেরকে উদ্ধার করা হয়। আলীবর্দী খান এরপরে মির্যা বাকিরের বন্ধু এবং অনুসারীদেরকে শাস্তি দেন। তাদের বিষয় সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন। এমন কি তাদের চিহ্নিত ঘোড়াগুলিকেও রেহাই দেননি। কিছুদিন পরেই বিশাল বাহিনীর বৃহদাংশের সঙ্গে সাঈদ আহমদ খান এবং তার পরিবারকে বাংলায় ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়। আলীবর্দী খান প্রায় তিনমাস কটকে অবস্থান করে সেখানকার প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করেন। তিনি পানিপথের শাহ মুহাম্মদ মাসুমের উপর প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করেন এবং তিনি তাঁর "সেরা কর্মকর্তা" ও পাঁচ হাজার অশ্বারোহী এবং সমসংখ্যক বন্ধুকধারী সৈন্য সঙ্গে নিয়ে ফেরত যাত্রা শুরু করেন।[৮৮৫] ফেরত আসার পথে তিনি মির্যা বাকিরের পক্ষাবলম্বন করায় ময়ূরভাঞ্জের রাজাকে আক্রমণ করেন। সিয়ারের বর্ণনানুযায়ী রাজা বশ্যতাস্বীকার করেন এবং মোস্তফা খানের মাধ্যমে তার প্রাণ ভিক্ষা চান; কিন্তু আলীবর্দী খান তার সেনাপতির মধ্যস্থতাকে উপেক্ষা করেন এবং রাজা যখন ব্যক্তিগতভাবে তাঁর নিকট ক্ষমা চাইতে আসেন, তখন চক্রান্তমূলকভাবে তিনি তাকে হত্যা করেন। তারপর তার "সমগ্র এলাকা পদদলিত এবং ব্যাপকভাবে লুণ্ঠন করা হয়।"[৮৮৬]

---

৮৮৪ সিয়ার ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৬৬-৩৬৭ , টি,বি, ১৮৬-১৮৭, রিয়াদ পৃঃ ৩৩১-৩৩৩

৮৮৫ সিয়ার, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৭০ ও ৩৭৭

৮৮৬ সিয়ার, এবং রিয়াদ, পৃঃ ৩৭৭। তবে তাওয়ারিখ-ই-বাঙ্গালাহ এবং রিয়াদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ময়ূরভাঞ্জের রাজা এবং তার পরিবার দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন

৩. প্রতিরোধ যুদ্ধ ঃ মীর হাবীব এবং মারাঠাদের আক্রমণ

পরলোকগত নওয়াব সরফরাজ খানের বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিরোধ যুদ্ধ দীর্ঘ-মেয়াদী রূপ নেয় এবং ধ্বংসাত্মক মারাঠা-আক্রমণে পর্যবশিত হয়। মহানদীর তীরে মির্যা বাকিরের পরাজয় এবং দাক্ষিনাত্যে পালিয়ে যাওয়ার সঙ্গে তিনি অতীতের গর্ভে হারিয়ে যান; তার স্থান দখল করেন মীর হাবীব, যিনি ছিলেন দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলী খানের ডান হাত এবং ঢাকায় তার নায়েব সুবাদারীর সময় থেকেই তার প্রধান সেনাপতি। মনে হচ্ছে দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলী খানের পরাজয়ের পরে মীর হাবীব বেরারের মারাঠা শাসক রঘুজী ভোঁসলার সঙ্গে একটি জোট গঠন করার জন্য আত্মনিয়োগ করেন।[৮৮৭]এটা স্পষ্ট যে, মির্যা বাকির যখন উড়িষ্যা দখল করেন, তখন তাদের আলোচনায় যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল বলে বুঝা যায়, যেহেতু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তার বাহিনীতে কিছু সংখ্যক মারাঠী সৈন্যও ছিল। এইভাবে মারাঠাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার পিছনে নিঃসন্দেহে মীর হাবীব এবং দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলী খানের স্বপক্ষীয়দের উদ্দেশ্য ছিল আলীবর্দী খানের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ এবং আরেক দিক দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বিহারের হিন্দু এবং আফগান সদস্যদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দিয়ে তাকেই অনুকরণ করেছিলেন মাত্র। তবে পার্থক্য ছিল শুধু এই যে, আলীবর্দী খান তাঁর সৈন্যদের উপর তাঁর নিজ ইচ্ছা প্রয়োগ করতে পারতেন, আর মীর হাবিব এবং তার অন্যান্য সহযোগীগণ তার সমকক্ষ ছিলেন না এবং তারা ছিলেন অনেকটা মারাঠাদের অধীনস্থ সহযোগী। যাই হোক, এটি একটি "শিক্ষণীয় বিষয়"। যেমন- একজন লেখক যথার্থই উল্লেখ করেছেন যে এ বিষয়টি, "তৎকালীন সময়ে পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোয় মুসলমানদের মধ্যে যে বুদ্ধিবৃত্তিক এবং নৈতিক দৈন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল, তা-ই প্রকাশ করছে।"[৮৮৮]

---

৮৮৭ রিয়াদ, ৩৩৭-৩৩৮। সিয়ার (১ম খন্ড, ৩৮১, ৩৮৪, ৩৮৭) এবং তাওয়ারিখ-ই-বাঙ্গালাহ উভয় গ্রন্থেই বর্ণিত হয়েছে যে, বর্ধমানের নিকট আলীবর্দী খানের সঙ্গে যুদ্ধের সময় মারাঠারা মীর হাবীবকে বন্দী করে এবং তারপর থেকেই তিনি তাদের সঙ্গে হাত মিলান এবং তাদেরকে বাংলায় হামলা চালানোর জন্য নিয়ে আসেন। এ তথ্য অবশ্য অযৌক্তিক বলে মনে হয়। কারণ, মীর হাবীব দীর্ঘদিন পর্যন্ত দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানের সঙ্গে ছিলেন এবং তিনি আলীবর্দী খানের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন বলে কোথায়ও উল্লেখ নেই। দ্বিতীয়ত, সিয়ারের বর্ণনানুযায়ী যদি মীর হাবিব বর্ধমানে বন্দী হওয়ার আগেই "তিন স্থানে আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে থাকেন," তাহলে এরপরই তারপক্ষে মারাঠা বাহিনীকে বাংলায় নিয়ে আসা আদৌ সম্ভব নয়। অথচ সকল বর্ণনায়ই তিনি তা করেছেন বলে জানা যায়। কাজেই, তিনি দাক্ষিনাত্য থেকেই মারাঠাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন বলে যে বিবরণ রয়েছে, তাই বেশী যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

৮৮৮ আবদুস সালামের টীকা, রিয়াদ, পৃঃ ৩৩৭-৩৩৮

মীর হাবীবের প্রস্তাব সহজেই গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে যায়, কারণ মারাঠারা ইতিমধ্যে উত্তর ভারতের দিল্লী পর্যন্ত নিয়মিতভাবেই হামলা চালিয়ে যাচ্ছিল। অতএব, তারা পূর্বাঞ্চলের দিকে হামলা ও লুণ্ঠন কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য একটি নতুন ক্ষেত্রের সন্ধান পেয়ে স্বভাবতই (মারাঠারা) খুশী হয়। বিশেষ করে রঘুজী ভোঁসলা মারাঠা সংঘের অন্যতম নেতা পেশোয়া বালাজী রাওয়ের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছিলেন। কাজেই, ভারতের উত্তর এবং পশ্চিমাঞ্চল তার প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্য ছেড়ে দিয়ে রঘুজী পূর্বাঞ্চলের প্রতি মনোনিবেশ করেন।[৮৮৯] সে অনুযায়ী তিনি বাংলায় হামলা চালানোর জন্য তার সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে এবং মীর হাবীবের সঙ্গে ২৫০০০ অশ্বারোহীর এক বাহিনী প্রেরণ করেন।[৮৯০] মারাঠা বাহিনী ১৭৪২ সালের এপ্রিল মাসে উড়িষ্যাকে পাশ কাটিয়ে বিহারের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে পশ্চিম বাংলার বর্ধমান জেলায় হামলা চালায়। আলীবর্দী খান তখন উড়িষ্যা থেকে মির্যা বাকিরকে বিতাড়িত করে বাংলার দিক প্রত্যাবর্তন করছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, আলীবর্দী খান যখন উত্তর মেদিনীপুর অতিক্রম করছিলেন, তখনই তিনি মারাঠাদের আক্রমণের বিষয় জানতে পারেন। তখন তার সঙ্গে ছিল মাত্র চার অথবা পাঁচ হাজার অশ্বারোহী এবং অনুরূপ সংখ্যক পদাতিক বন্দুকধারী সৈন্য; তার মূল বাহিনীকে ইতিপূর্বেই সাঈদ আহমদ খানের অধীনে বাংলায় ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। তবে আলীবর্দী খান তাঁর ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে দ্রুত বর্ধমানের দিকে অগ্রসর হন; কিন্তু তাঁর সেখানে পৌঁছার পূর্বেই মারাঠারা সেখানে পৌঁছে যায় এবং বর্ধমান শহরের অংশ বিশেষ লুটতরাজ করে সেটাকে জ্বালিয়ে দেয়। বর্ধমানে আলীবর্দী খানের সৈন্য সংখ্যার চেয়ে মারাঠাদের সৈন্যসংখ্যা ছিল অনেক বেশি এবং তারা তাকে চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে ফেলে। তার মালপত্র ও লটবহর দখল করে নেয় এবং চতুর্দিকে লুণ্ঠনকার্য করে তার রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। শত্রুদের বুহ্য ভেদ করে বের হয়ে যাওয়ার জন্য তিনি মরিয়া হয়ে চেষ্টা করেন। তাঁর সে প্রচেষ্টা সফল হয়নি। এর আংশিক কারণ হচ্ছে তার সেনাচর বা শিবির-বাহকদের নির্বুদ্ধিতা, তারা সৈন্যদের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাদের চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে এবং আংশিক কারণ হচ্ছে তার আফগান সেনাপতি মুস্তফা খান, শামশির খান এবং সর্দার খানের পক্ষ থেকে

---

৮৮৯ সিয়ারে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, (১ম খন্ড, ৩৭৬) হায়দারাবাদের নিযামুল মুলকের নিকট দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলী খান আশ্রয় নেয়ায় তিনি মারাঠাদের উস্কানী দিতেন। এই ইঙ্গিতের উপর ভিত্তি করে কে, কে, দত্ত (আলীবর্দী খান এন্ড হিজ টাইম্‌স, পৃঃ ৫৬) বলেছেন যে, নিজামুল মুলক তার রাজ্য থেকে মারাঠাদের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য তাদেরকে বাংলার দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য উস্কানী দেন। এই অনুমানটি আপাত দৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত হলেও এর স্বপক্ষে কোন প্রত্যক্ষ প্রমান নেই

৮৯০ সিয়ারে এই সংখ্যা কখনো বলা হয়েছে ৪০,০০০ এবং কখনো বলা হয়েছে ২৫,০০০

সহযোগিতার অভাব। শেষোক্ত ব্যক্তিরা বিভিন্ন কারণে অসন্তুষ্ট ছিলেন। প্রথমত, আলীবর্দী খান তাঁর ওয়াদার বরখেলাপ করে উড়িষ্যা যুদ্ধ এবং সাঈদ আহমদ খানকে উদ্বার করার পর তিনি তাঁর আফগান সৈন্যদের অধিকাংশকেই চাকুরী হতে বিদায় করে দেন। দ্বিতীয়ত, আলীবর্দী খান মুস্তফা খানের মধ্যস্থতাকে উপেক্ষা করে ময়ূর ভাঞ্জের রাজাকে হত্যা করায় মোস্তফা খান অপমানিত বোধ করতেন। তৃতীয়ত, আফগান সেনাপতিগণ জৈনুদ্দীন আহমদ খান কর্তৃক রওশন খান নামক জনৈক আফগান সেনাপতিকে হত্যা করায় খুবই ক্ষুদ্ধ ছিলেন।[৮৯১] সঙ্গীন অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরে আলীবর্দী খান এক রাতে তাঁর দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলাহকে সঙ্গে নিয়ে মোস্তফা খার শিবিরে হাজির হন এবং সেখানে আরো বেশি বেশি উপঢৌকন এবং ভবিষ্যতে ভাল ব্যবহারের জন্য নতুন করে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি আফগান সেনাধ্যক্ষদের শান্ত করতে সক্ষম হন।[৮৯২] এইভাবে তাদের আস্থা অর্জন করে তিনি যুদ্ধ করতে করতে শত্রুদের মধ্য দিয়ে বের হয়ে আসেন এবং মুর্শিদাবাদ পৌঁছার মহাসড়কের কাটোয়ার দিকে অগ্রসর হন। অবশ্য এরপরও মারাঠাগণ অব্যাহতভাবে পশ্চাদ দিক থেকে তাকে আক্রমণ করে এবং গমন পথের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে লুটতরাজ করে তাকে বিব্রত করতেই থাকে। এমন কি আলীবর্দী খান কাটোয়া পৌঁছার পূর্বেই মারাঠা সৈন্যদের দ্রুতগামী একটি দল সেখানে পৌঁছে যায় এবং লুটপাট চালায়; আর যে সকল খাদ্যশষ্য ও রসদপত্র স্থানান্তর করতে পারেনি, সেগুলো আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়।" আলীবর্দী খান এপ্রিলের (১৭৪২) শেষের দিকে কাটোয়ায় পৌঁছেন এবং মুর্শিদাবাদ থেকে হাজী আহমদ এবং নওয়াজিশ মুহাম্মদ খান কর্তৃক প্রেরিত অতিরিক্ত সৈন্য এবং রসদপত্র পেয়ে শীঘ্রই নিরাপদ হন।

আলীবর্দী খান যখন কাটোয়ায় তাঁর সৈন্যদলকে পুনসংগঠিত করছিলেন, তখন মারাঠা সৈন্যদের একটি দল হঠাৎ হঠাৎ আক্রমণ করে তাকে অস্থির করে রাখতো। আবার অন্যদিকে, মীর হাবীব মারাঠা সৈন্যদের আরেকটি দল নিয়ে রাজধানী মুর্শিদাবাদের দিকে হঠাৎ এক দুঃসাহসিক আক্রমণ পরিচালনা করে এবং শহরে প্রবেশ করে "তার ভাই মীর শরীফ, তাদের পারিবারিক ধন-সম্পদ, তাদের অধীনস্থ এবং সন্তানাদিসহ সকলকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে"।[৮৯৩] হাজী আহমদ ও নওয়াজিশ মুহাম্মদ খান নগরের দায়িত্বে থাকলেও তারা তাকে বাধা দিতে সাহস করেননি, বরং দূর্গে আশ্রয় নিয়ে ফটক বন্ধ করে দেন। মীর হাবীব

---

৮৯১ সিয়ার, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৭৯-৩৮১

৮৯২ ঐ, পৃঃ ৩৮২-৩৮৭

৮৯৩ টি. বি. পৃঃ ১৯৩-১৯৪, রিয়াদ, ৩৪১

নগর তছনছ করে নগরীর বাণিজ্যিক এলাকা এবং শহরতলী লুণ্ঠন করে, জগৎ শেঠের বাড়ী লুট করে প্রচুর পরিমান স্বর্ণ-রৌপ্যসহ প্রায় দুই কোটি টাকা নিয়ে যায়।[৮৯৪] আলীবর্দী কাটওয়া থেকে দ্রুত তাদের অনুসরণ করেন। কিন্তু তিনি নগরীতে পৌঁছতে না পৌঁছতেই মীর হাবীব তার মারাঠা সৈন্যদের নিয়ে বর্ধমানের দিকে পশ্চাদপসারণ করেন।

ঐ বৎসরের (১৭৪২) বর্ষা মৌসুম সন্নিকটে বলে আলীবর্দী খান রাজধানীতেই থেকে যান এবং বর্ষা মৌসুম অবসান হলে মারাঠাদেরকে বাংলা থেকে বিতাড়নের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। অন্যদিকে, মারাঠারা ভাগিরথির পূর্ব তীরে তাদের লুটতরাজ বন্ধ রাখে এবং কাটোওয়ায় তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করে। সৈন্যদের একটি অংশকে ভাসকর পণ্ডিতের অধীনে সেখানে রেখে মীর হাবীব সমগ্র পশ্চিম বাংলাকে তার নিয়ন্ত্রণে নেয়ার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। মারাঠা সৈন্যদের একটি দল নিয়ে মীর হাবীব বাংলার বন্দর নগরী হুগলীর দিকে অগ্রসর হয়। তার জীবনের প্রাথমিক বৎসরগুলো সেখানেই কেটেছিল এবং "তখনও সেখানে তার অনেক বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন ছিল।" তাদের সাহায্য, বিশেষ করে মীর আবুল হাসানের সহায়তা নিয়ে হাবীব সেখানকার বহু অফিসারকে তার স্বপক্ষে নিয়ে আসে, হুগলী দূর্গ দখল করে নেন এবং কাজী, হিসাব রক্ষক এবং অন্যান্য অফিসার নিয়োগ দিয়ে সমগ্র অঞ্চলের উপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।[৮৯৫] আবুল হাসানকে হুগলীর গভর্ণর নিয়োগ দেয়া হয় এবং তাকে সাহায্য করার জন্য মারাঠা সৈন্যদের একটি দলকেও তার অধীনে ন্যস্ত করা হয়। স্থানীয় জমিদারগণ মারাঠাবর্গীদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য রাজস্ব আদায় ও পরিশোধ করার জন্য তার সঙ্গে বন্দোবস্ত করেন। এভাবে আকবর নগর (রাজমহল) থেকে মেদিনীপুর এবং জালাশোর পর্যন্ত পুরো অঞ্চল মীর হাবীব এবং তার মারাঠা মিত্রদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।[৮৯৬] সম্পদশালী এবং মর্যাদাবান নাগরিকদের অনেকেই গঙ্গানদী অতিক্রম করে বাংলার পূর্বাঞ্চল এবং উত্তরাঞ্চলে আশ্রয় নেন।[৮৯৭] পশ্চিম বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে মারাঠাদের ধ্বংসযজ্ঞের খবরে রাজধানী মুর্শিদাবাদে আতংকের সৃষ্টি হয়। সিয়ারের লেখক লিখেছেন, মহানগরী রাজধানীর শান্তিকামী জনগণ এরূপ ধ্বংসযজ্ঞ দেখা দূরে থাকুক, এ ধরনের কর্মকাণ্ডের কথা শোনেনওনি। তারা তাদের পরিবার পরিজন এবং ধন-সম্পদ

---

৮৯৪ সিয়ার, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৯৩, অনুবাদক রেমন্ডের টীকা (হাজী মোস্তফা)

৮৯৫ সিয়ার, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৯৪-৩৯৫, টি, বি, ১৯৫-১৯৬, রিয়াদ, ৩৪৩

৮৯৬ ঐ

৮৯৭ টি, বি, ১৯৬-১৯৭, রিয়াদ, ৩৪৩

নিয়ে অত্যন্ত শংকিত হয়ে পড়েন: এবং তারা বর্ষার মৌসুমের সুযোগ নিয়ে গঙ্গানদী অতিক্রম করে দূরবর্তী অঞ্চল যথা, জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকা), মালদহ এবং রামপুর-বোয়ালিয়ায় চলে যান এবং তাদের অনেকেই সেখানে ঘর-বাড়ী নির্মাণ করে বসবাস শুরু করেন। এমন কি নায়েব সুবাদার নওয়াজিশ মুহাম্মদ খান নিজেও তার পরিবার, আসবাবপত্র এবং ধন-সম্পদ নিয়ে নদী পাড়ি দেন এবং রাজশাহী জেলার গোদাগাড়িতে কিছুদিন বসবাস করেন। সেখানে তার নিজের এবং পরিবারের জন্য একটি বসতির গোড়া পত্তন করেন।[৮৯৮]

আলীবর্দী খান মারাঠাদের বিতাড়িত করার জন্য ইতিমধ্যেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বর্ধমানে তাঁর সৈন্যদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সে অনুযায়ী তাদের মধ্যে দশ লাখ টাকা বিতরণ করেন এবং তাদের পদ ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে তাদের অন্তর, বিশেষ করে তার আফগান সেনাপতিদের অন্তর জয় করেছিলেন। তিনি প্রতিটি সৈন্যদলের শক্তিও বৃদ্ধি করেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, মোস্তফা খানের অধীনস্থ আফগান সৈন্যদের সংখ্যা পাঁচ হাজার থেকে আট হাজারে বৃদ্ধি করা হয়।[৮৯৯] অনুরূপভাবে শামশীর খান, সর্দার খান, উমর খান এবং অন্যান্যদের অধীনস্থ সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। একই সময়ে, আলীবর্দী খান বিহারের সুবাদার এবং তার ভ্রাতুস্পুত্র জৈনুদ্দীন আহমদ খানকে তার সেনাবাহিনী নিয়ে এসে মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তার সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্যও নির্দেশ দেন। আলীবর্দী খান সম্রাট মুহাম্মদ শাহকে মারাঠাদের আক্রমণে বাংলার পরিস্থিতি সম্পর্কে লিখিতভাবে অবহিত করেন এবং প্রদেশ থেকে আক্রমণকারীদেরকে বিতাড়নের জন্য তাঁর সাহায্য কামনা করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, মারাঠাদের ধ্বংসযজ্ঞের কারণে পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহ থেকেও কোন রাজস্ব প্রেরণ করা সম্ভব হবে না। এইভাবে প্রস্তুতি সম্পন্ন করে এবং বর্ষা মৌসুম সমাপ্ত হলে আলীবর্দী খান ১৭৪২ সালের সেপ্টেম্বরে (১১৫৫ হিজরী) মারাঠাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তিনি একদিন অন্ধকার রাতে নৌকা সেতুর সাহায্যে কাটোওয়ার নিকট দিয়ে ভাগিরথি ও অজয় নদী অতিক্রম করে আকস্মিকভাবে মারাঠাদেরকে আক্রমণ করেন। তারা ছিল সম্পূর্ণ অনবহিত এবং তাদের সৈন্যরা হুগলীর মত আরো অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। ফলে মারাঠারা চরমভাবে পরাজিত হয় এবং বর্ধমান জেলার পশ্চিমাঞ্চলের জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু মীর হাবীব শীঘ্রই তাকে বিভ্রান্ত করে এবং

---

৮৯৮ সিয়ার, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৯৫-৩৯৬

৮৯৯ সিয়ার ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৯৬, ৩৯৯-৪০০

মারাঠাদেরকে প্রথমে মেদিনীপুর এবং সেখান থেকে তাদেরকে উড়িষ্যায় নিয়ে যায় এবং এর গভর্ণর শাহ মুহাম্মদ মাসুমকে পরাজিত ও হত্যা করে উড়িষ্যা দখল করে। পরিস্থিতি এরূপ মোড় নেয়ায় আলীবর্দী খান আবার উড়িষ্যায় অভিযান পরিচালনা করেন। মীর হাবীব ও ভাস্কর পণ্ডিত আরও দক্ষিণে পশ্চাদপসারণ করে। আলীবর্দী খান চিলকা হ্রদ (উড়িষ্যার দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত) পর্যন্ত অগ্রসর হন, কিন্তু শত্রুদের কোন চিহ্ন না পেয়ে কটকে ফিরে আসেন। তিনি তাঁর আফগান সেনাপতি মোস্তফা খানের জ্ঞাতিভাই আবদুন্নবী খানকে উড়িষ্যার গভর্ণর নিয়োগ করেন এবং তাকে সাহায্য করার জন্য রাজা জানকিরামের পুত্র রায় দূর্লভ রামকে তার পেশকার হিসেবে নিয়োগ দেন এবং তারপর ১৭৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করেন।

সাধারণভাবে উড়িষ্যা এবং পশ্চিম বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল সম্পর্কে মীর হাবীবের ব্যাপক জ্ঞান এবং তার আঘাত করে পালিয়ে যাওয়ার কৌশল আলীবর্দী খানের জন্য আসলে একটি স্থায়ী মারাঠা হুমকীতে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে, আলীবর্দী খান মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তনের পরে একটি মাস অতিক্রম না করতেই মারাঠারা পুনরায় এসে হাজির হয় এবং তার জন্য আরো সংকটের সৃষ্টি করে। কারণ, এবার মারাঠাদের একটি নয় বরং দুটি বাহিনী দুদিক থেকে এসে হাজির হয়। একটি রঘুজী ভোঁসলার নেতৃত্বে উড়িষ্যার দিক থেকে আসে এবং অন্যটি তার প্রতিদ্বন্দ্বী এবং ব্যক্তিগত শত্রু পেশোয়া বালাজী রাও এর নেতৃত্বে বিহারের দিক থেকে আসে। যে পরিস্থিতিতে মারাঠাদের এই দ্বিতীয় এবং দ্বৈত আক্রমণ ঘটে (১৭৪৩), তা সংক্ষেপে এরূপ যে, ভাস্কর পণ্ডিতের অভিযানের ব্যর্থতা এবং এ ক্ষতি পুষিয়ে নিতে রঘুজী ভোঁসলা নিজে তার সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত এবং তার মিত্র মীর হাবীবসহ এক বিরাট বাহিনী নিয়ে বাংলার দিকে অগ্রসর হন।[৯০০] তার এ আক্রমণের পিছনে তিনি মারাঠা সংঘের প্রধান রাজা শাহুর নিকট থেকে উৎসাহ পেয়েছিলেন। কারণ এর পূর্বে মোগল সম্রাট তাকে চৌথ দেয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা কয়েক বৎসর যাবত বকেয়া পড়েছিল। এর প্রধান কারণও ছিল এই যে, আলীবর্দী খান কর্তৃক কয়েক বৎসর পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলো যথা বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যা থেকে তাকে কোন রাজস্ব প্রেরণ না করা। তাই রাজা শাহু বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যা থেকে তার জন্য চৌথ আদায় করতে ভোঁসলার প্রতি আহবান জানিয়েছিলেন। অন্যদিকে মারাঠাদের গত অভিযানের প্রাককালে আলীবর্দী খান কর্তৃক সম্রাটের নিকট সাহায্যের জন্য

[৯০০] সিয়ার ১ম খন্ড, পৃঃ ৪০৮

আবেদনের প্রেক্ষিতে তিনি পেশোয়া বালাজী রাওকে বাংলার দিকে অগ্রসর হয়ে সে প্রদেশ থেকে রঘুজী ভোঁসলাকে বহিস্কার করার জন্য অনুরোধ জানান। স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতিদ্বন্দ্বীর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা ও প্রভাবকে খর্ব করতে আগ্রহী এবং অন্যদিকে, লুণ্ঠন করার সম্ভাবনা এবং সম্রাটের অনুমোদনক্রমে পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহ থেকে চৌথ আদায়ের সম্ভাবনায় প্রলুব্ধ হয়ে পেশোয়া বালাজী রাও তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেন এবং একটি বিরাট অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে বিহারের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হন এবং তার যাত্রা পথের প্রতিটি শহর এবং গ্রাম পদদলিত এবং লুণ্ঠন করেন।[৯০১]

এইভাবে ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চের প্রথম দিকে আলীবর্দী খান নিজকে দুটি প্রবল মারাঠা বাহিনীর মধ্যে দেখতে পান - রঘুজী ভোঁসলা তার বাহিনী নিয়ে বর্ধমান জেলার কাটওয়ায় শিবির স্থাপন করেছেন এবং পেশোয়া বালাজী রাও মুর্শিদাবাদ জেলার বরহামপুরের নিকট শিবির স্থাপন করেছেন। এই পরিস্থিতিতে নওয়াব পেশোয়ার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন এবং তার শিবির পরিদর্শনের ফলে দুই পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। আলীবর্দী খান পেশোয়াকে তার অভিযানে সৈন্য বাহিনীর পিছনে ব্যয় বাবদ বাইশ লক্ষ টাকা প্রদান করেন এবং রঘুজীকে বাংলা ও উড়িষ্যা থেকে বিতাড়ন এবং তার দ্বারা পুনরায় বাংলা ও উড়িষ্যায় আক্রমণ না করার নিশ্চয়তা প্রদানের শর্তে তাকে চৌথ দিতেও প্রতিশ্রুতি দেন। এই চুক্তির কথা জানতে পেরে এবং আলীবর্দী খান ও পেশোয়ার যৌথ বাহিনীর সম্মুখে তার অপারগতা সম্পর্কে সচেতন রঘুজী ভোঁসলা উড়িষ্যায় পশ্চাদপসারণ করেন। পেশোয়া বালাজী রাও অবশ্য দ্রুত তার পশ্চাদধাবন করেন। তাকে নাগালে পেয়ে পরাজিত করেন এবং অবিলম্বে তাকে তাঁর রাজধানী নাগপুরে ফিরে যেতে বাধ্য করেন। তারপর পেশোয়া বালাজী রাও ও রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। এভাবে তিনি আংশিকভাবে কুটনীতি দ্বারা এবং আংশিকভাবে পেশোয়া বালাজী রাওকে উল্লেখযোগ্য একটি বড় অংকের অর্থ দিয়ে মারাঠাদের দ্বিতীয় অভিযান প্রতিহত করেন।

আলীবর্দী খান অবশ্য দীর্ঘদিন শান্তি ভোগ করতে পারেন নি। প্রায় ঠিক এক বৎসর পরে ১৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দের মার্চে ভাস্কর পণ্ডিত প্রায় ২০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে পুনরায় বাংলা আক্রমণ করেন। মারাঠাদের এই তৃতীয় আক্রমণ কয়েকটি দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, মীর হাবীব মারাঠাদের একজন মিত্র এবং উৎসাহ

---

[৯০১] সিয়ার, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪১৮-৪১৯

দাতা হওয়া সত্ত্বেও এ অভিযানে অংশ নেননি। অন্যদিকে, তার স্থান দখল করেন আলী কারাওয়াল ওরফে আলী ভাই। বর্ণিত আছে যে, আলী ছিলেন একজন মারাঠা নেতা এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।[৯০২] তার অধীনে ছয় থেকে সাত হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ছিল।

দ্বিতীয়ত, এই আক্রমণাভিযানের পিছনে শুধু মারাঠা সংঘের প্রধান রাজা শাহুরই অনুমোদন ছিল না, বরং পেশোয়া বালাজী রাওয়ের অনুমোদনও ছিল। যিনি এর আগের বৎসর বাংলা ও বিহারে কোন প্রকার উপদ্রব করা থেকে ভাস্কর পণ্ডিতকে বিরত রাখার জন্য আলীবর্দী খানকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। পেশোয়ার এ ডিগবাজীর কারণ ছিল ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে রাজা শাহু কর্তৃক তার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাপতির মধ্যে আপোষ রফা করে দেয়া; তিনি বাংলা ও উড়িষ্যার চৌথ রঘুজী ভোঁসলার জন্য এবং বিহারের চৌথ মঞ্জুর করেন পেশোয়া বালাজী রাওয়ের জন্য এবং একই সঙ্গে তারা দুজনের কেউ যেন একে অপরের লুণ্ঠন ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করে। তৃতীয়ত, তাদের মধ্যে এ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ভাস্কর পণ্ডিত তার আক্রমণাভিযানে আরো নিষ্ঠুর এবং নির্দয়তার পরিচয় দেয় এবং বর্ধমানের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে ভয়ানক লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞ সাধন করে।

এই আক্রমণের প্রতি আলীবর্দী খানের প্রতিক্রিয়াও ছিল সমভাবে উল্লখযোগ্য। তিনি চরমভাবে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে যান এবং বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেন যে, বাংলার নওয়াবের জন্য শান্তি নিশ্চিত করার কথা বলে তাঁর থেকে একটি বিরাট অংকের অর্থ নেয়া সত্ত্বেও রঘুজী ভোঁসলার সঙ্গে লুণ্ঠন কার্যে যোগ দিয়ে বালাজী রাও তার অংশীদার হয়েছেন। একজনের পরিবর্তে তাঁকে এখন দুজন মারাঠা হামলাকারীকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে। তাঁর আর্থিক অবস্থাও সংকটাপন্ন হয়ে গিয়েছিল। মারাঠাদের বারবার আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ফলে তাঁর রাজস্ব সংগ্রহ দারুণভাবে হ্রাস পেয়েছিল। অন্যদিকে, গত কয়েক বৎসর যাবত তাঁর সামরিক ব্যয় প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এভাবে অব্যাহত যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং "তিনি অনুভব করতেন যে, তাঁর এই অব্যাহত দৈহিক ও মানষিক শ্রম, যার কোন শেষ নেই, তাতে তিনি ক্রমেই ভেঙ্গে পড়ছেন।" তিনি শান্তিপূর্ণ মনোভাব নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করে চৌথ দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং তিনি চেয়েছিলেন এভাবে মারাঠা নেতাদেরকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়ে এসে তাদেরকে খতম করে দিতে। তিনি একাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব অর্পন করেন হিন্দু পেশকার রাজা

---

৯০২ রিয়াদ, ৩৪৭, সিয়ার ১ম খন্ড, ৪৩০, টি, বি, ১৯৯

জানকিরাম এবং আফগান সেনাপতি মোস্তফা খানের উপর। শেষোক্ত জন দ্বিধান্বিত ছিলেন। কিন্তু আলীবর্দী খান এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার উচ্চাকাংখা সৃষ্টি করেন যে, যদি তিনি ভাস্কর পণ্ডিতসহ তার অন্যান্য সেনাপতিদেরকে এ ফাঁদে আটকাতে পারেন, তাহলে তাকে আজিমাবাদের (বিহার) গভর্ণরের পদ প্রদান করা হবে।"[৯০৩] দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা, উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দের পারস্পরিক সাক্ষাৎ, উপঢৌকন বিনিময়, সর্বোপরি জানকিরাম নিজে একজন হিন্দু হিসেবে ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে দিনের পর দিন কাটানো এবং তিনি বারবার ঐকান্তিকভাবে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে এবং পবিত্র শপথের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত তাকে আলীবর্দী খানের সঙ্গে এক সম্মেলনে বসতে সম্মত করাতে সক্ষম হন। সাক্ষাতকারের জন্য দুই বাহিনী কর্তৃক স্থাপিত শিবিরের মধ্যবর্তী স্থান, (মুর্শিদাবাদ জেলার কয়েক মাইল পশ্চিমে) বর্ধমান জেলার মানকারা সমতল ভূমিকে নির্বাচন করা হয়। আলীবর্দী খান সেখানে সুকৌশলে একটি বিরাট শিবির স্থাপন করেছিলেন এবং দুটি করে পর্দা ঝুলিয়ে তার আড়ালে তার বাছাই করা ও সুসজ্জিত ১২০০০ সৈন্য লুকিয়ে রেখেছিলেন। ভাস্কর পণ্ডিত নির্ধারিত তারিখে হাজির হন। তবে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ভাবে আসেননি। তিনি আলী ভাইসহ সেরা সেরা ২২ জন সেনানায়ককে সঙ্গে নিয়ে আসেন এবং তাঁর সঙ্গে আরো ছিল কমপক্ষে ৫০ জন সুসজ্জিত ও সশস্ত্র বাছাই করা সৈন্য। তারা সকলে শিবিরে প্রবেশ করা মাত্রই আলীবর্দী খানের ইঙ্গিতে হঠাৎ আক্রমণ করে তাদেরকে সহজেই কাবু করে ফেলা হয় এবং সকলকেই হত্যা করা হয়। আলীবর্দী খান পরক্ষণেই তাঁর সমগ্র বাহিনী নিয়ে মারাঠাদের শিবিরে হামলা চালান এবং তাদেরকে চরমভাবে পরাজিত করেন এবং নেতৃত্বহীন মারাঠা সৈন্যদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করেন। তাদের একজন মাত্র জেনারেল রঘুজী গাইকোয়ার, যিনি অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনার জন্য যাননি, তিনি অবশিষ্ট এবং বিক্ষিপ্ত মারাঠা সৈন্যদের নিয়ে বাংলা থেকে পালিয়ে যান।[৯০৪]

৪. আফগান বিদ্রোহ এবং চতুর্থ মারাঠা আক্রমণ

এইভাবে আলীবর্দী খান মারাঠা সংঘের নেতা শিবাজী কর্তৃক মোগল সেনাপতি আফজাল খানকে বিশ্বাস ঘাতকতা মূলকভাবে হত্যার প্রায় অনুরূপ কৌশল প্রয়োগ করে ভাস্কর পণ্ডিত এবং তার লুণ্ঠনকারী বাহিনীর হাত থেকে রেহাই পান। এই প্রক্রিয়াটি অবশ্য আলীবর্দী খানের জন্য মোস্তফা খানের মত একজন প্রবল আভ্যন্তরীণ শত্রুর জন্ম দেয়। তিনি এখন নওয়াব কর্তৃক তাকে

---

৯০৩ সিয়ার, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৩১

৯০৪ সিয়ার, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৩২-৪৩৭; রিয়াদ, পৃঃ ৩৪৭-৪৯

বিহার প্রদেশের গভর্ণর নিয়োগ করার জন্য প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য জিদ ধরেন। সিয়ারের ভাষ্য অনুযায়ী আলীবর্দী খানের নিকট প্রয়োজনের মূহূর্তে সবার জন্য তার প্রদত্ত কোন সাধারণ প্রতিশ্রুতিকে প্রয়োজন শেষ হওয়ার পরে বাস্তবায়নের জন্য জিদ ধরাকে বেশ কঠোর মনে হচ্ছিল।"[৯০৫] অবশ্য তাঁর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে তাঁর অনিচ্ছার প্রধান কারণ ছিল এই যে, এই পদটিতে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় এবং যোগ্যতম ভ্রাতুস্পুত্র এবং জামাতা জিয়াউদ্দীন আহমদ খান এবং আলীবর্দী খান নিজেও মোস্তফা খানের ক্ষমতা এবং প্রভাব বৃদ্ধিতে শংকিত হয়ে পড়েছিলেন। সে সময়ে তার ক্ষমতা এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, তা একজন প্রজা, এমন কি একজন সমকক্ষের চেয়েও বেশি হয়ে গিয়েছিল। তিনি নিজকে সেরা বলেই ভাবতেন; তার সম্পদায়ের লোকেরা এত বেশি সংখ্যায় বাংলায় প্রবেশ করেছিল যে, আলীবর্দী খানের সেনাবাহিনী এবং হারেমে তারা ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। তার (মোস্তফা খানের) চতুর্পাশ্বে এত বেশি সংখ্যায় তারা ভীড় করে থাকতো যে, কেহ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে, এমনকি আফগান নামধারী কাউকে কোনরূপ অসন্তুষ্ট করতে সাহস পেত না; এত বেশি ছিল তাদের সংখ্যা; এবং এত বেশি ছিল তাদের ঐক্য।[৯০৬] কাজেই, আলীবর্দী খান সম্মান, উপঢৌকনসহ আরো বিভিন্নভাবে তার অভিজ্ঞ সেনাপতিকে সন্তুষ্ট করার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু এসব কিছু মোস্তফা খানকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। আজ হবে বা কাল হবে - এরূপ কয়েক মাস পর্যন্ত শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে তিনি বিরোধী মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেন এবং দরবারে উপস্থিত হওয়া বন্ধ করে দেন। তার সৈন্যদেরকে সমবেত করেন, যাদের সংখ্যা ছিল, "কয়েক হাজার বন্দুকধারী সৈন্য ব্যতীতও ৯,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য।"[৯০৭] এইভাবে বিভেদ সৃষ্টি হওয়ার পরে পূরানো ক্ষত নতুন করে ইন্ধন যোগায়। আলীবর্দী খান বিহারের সুবাদার থাকাকালীন সময়ে বিশ্বাস ঘাতকতা করে আবদুল করীম খান নামক একজন আফগান সেনাপতিকে হত্যা করেছিলেন এবং জৈনুদ্দীন খান অতি সাম্প্রতিক কালে একই রকম বিশ্বাসঘাতকতা করে রওশন খান নামক আরেকজন আফগান সেনাপতিকে হত্যা করেন। আগেই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, মারাঠাদের সঙ্গে আলীবর্দী খানের বর্ধমানের নিকট প্রথম বার মোকাবেলার সময় এই শেষোক্ত ঘটনাটি আফগান সেনাপতিদের মধ্যে প্রায় পক্ষ ত্যাগ করার অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। সে সময় মোস্তফা খান এবং তার সৈন্যদের মধ্যে এই সমস্ত

---

[৯০৫] সিয়ার, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৩৯

[৯০৬] সিয়ার, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৩৭।

[৯০৭] ঐ, পৃঃ ৪৩৯-৪৪০

হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের এই দিকটি সম্পর্কে সিয়ারে উল্লেখ করা হয়েছে: "যে কোন কারণেই হোক না কেন, কোন একজন আফগানের মৃত্যু হলে তা এমন অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হতো যে, তা যত সময়ই পরে হোক বা যা কিছুই করা হোক না কেন, কিছুতেই যেন তার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হতো না। মৃতের জন্য প্রতিশোধ নেয়ার চেতনা অন্তরে নিহিত থাকতো এবং এই সুপ্ত ইচ্ছা কখনো লোপ পেত না, যদিও"[৯০৮] প্রতিশোধ নেয়ার এ মনোভাবের সঙ্গে যোগ হয়েছিল ধর্মীয় বিদ্বেষ। আফগানরা ছিল সুন্নী, তাই তারা তাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শিয়া মতাবলম্বী আলীবর্দী খান, তাঁর পরিবার এবং তাঁর আত্মীয় স্বজনদেরকে ভীষণভাবে অপছন্দ করতেন। বর্ণিত আছে যে, মোস্তফা খান এইরূপ ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, "শিয়ারা বেখবর কাফিরদের চেয়েও খারাপ। আগে তাদেরকে শায়েস্তা করতে হবে। তারপর পর্যায়ক্রমে অন্যদের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।"[৯০৯]

মোস্তফা খানের পক্ষ ত্যাগ এবং সৈন্য সমাবেশে মুর্শিদাবাদ শহর দুটি শত্রু শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং এর নাগরিকগণ কিছুদিন ভয়ানক শংকার মধ্যে ছিলেন। আফগানদের দ্বারা আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হওয়ার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য আলীবর্দী খান সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। আলীবর্দী খানের সৌভাগ্য ছিল এই যে, তিনি মোস্তফা খানের তিনজন গুরুত্বপূর্ণ সেনাধ্যাক্ষকে তাঁর স্বপক্ষে টেনে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তারা বিদ্রোহে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। এ জন্য হতাশ হয়ে মোস্তফা খান ঘোষণা দেন যে, তিনি মুর্শিদাবাদ ছেড়ে যেতে প্রস্তুত, যদি তাকে তার এবং তার বাহিনীর সৈন্যদের বকেয়া পাওনা সত্তর লক্ষ টাকা অবিলম্বে পরিশোধ করে দেয়া হয়। মোস্তফা খানের মনোভাবের এই পরিবর্তনে আলীবর্দী খান স্বস্তি লাভ করেন এবং "অফিসারদের দ্বারা নিয়মমাফিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য" কোন দাবী না তোলেই তিনি অবিলম্বে পুরো টাকাই পরিশোধ করে দেয়ার নির্দেশ দেন।[৯১০] এরপরে মোস্তফা খান তার সেনাদল নিয়ে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করেন এবং বিহারের দিকে যাত্রা করেন। তার ভ্রাতুস্পুত্র আবদুর রশিদ খান, যিনি তার পিতা আবদুন্নবী খানের উত্তরাধিকারী হিসেবে উড়িষ্যার গভর্ণর হয়েছিলেন, তিনিও পদত্যাগ করে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে মোস্তফা খানের সঙ্গে যোগদান করেন।

---

[৯০৮] সিয়ার, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৩৮

[৯০৯] সিয়ার, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৫১-৪৫২

[৯১০] সিয়ার, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৪২-৪৪৩

এভাবে তার সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৪,০০০ অশ্বারোহী; এছাড়াও ছিল অসংখ্য বন্দুকধারী এবং "৫০টি কামান বিশিষ্ট একটি গোলন্দাজ বাহিনী, যার প্রতিটি কামানই ছিল পুরোপরি ব্যবহারযোগ্য এবং তদুপরি তার সঙ্গে ১৫০টিরও বেশি হাতি ছিল।" মোস্তফা খানের উদ্দেশ্য ছিল জৈনুদ্দীন আহমদ খানের হাত থেকে বিহার দখল করে নেয়া। শেষোক্ত জন অবশ্য আলীবর্দী খানের নিকট থেকে সময়মত সতর্কবাণী পেয়েছিলেন এবং নিজকে রক্ষা করার জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। মোস্তফা খান মুঙ্গীরের দিকে অগ্রসর হয়ে সহজেই তা দখল করেন এবং ১৭৪৫ খ্রিষ্টাব্দের মার্চের মাঝামাঝি সময়ে পাটনা আক্রমণ করেন।[৯১১] কিন্তু বারবার হামলা করা স্বত্বেও তিনি তা দখল করতে ব্যর্থ হন এবং একদা চোখে বন্দুকের গুলিবিদ্ধ হয়ে পশ্চিমের শাহাবাদ জেলায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। ইতিমধ্যে বাংলা থেকে আলীবর্দী খান এসে পৌঁছেন এবং জৈনুদ্দীন আহমদ খান তার সঙ্গে যোগ দিয়ে মোস্তফা খানের পশ্চাদধাবন করেন; ফলে তিনি আরো পশ্চিমে চলে যান এবং পূর্ব অযোধ্যার চুনার দূর্গে অবস্থান গ্রহণ করেন। আলীবর্দী খান মোস্তফা খানের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান নিয়ে আর অগ্রসর হতে পারেননি। কারণ:

ইতিমধ্যে মোস্তফা খান মীর হাবীব এবং মারাঠা নেতা রঘুজী ভোঁসলার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তাদেরকে আলীবর্দীর পিছনে পিছনে বাংলা আক্রমণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ভাস্কর পণ্ডিত এবং তার অন্যান্য সেনাপতিদের হত্যার পর থেকে রঘুজী ভোঁসলা "গর্তে আশ্রয় নেয়া অক্ষত সাপের মত" প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি ইতিমধ্যেই বহু সংখ্যক গুপ্তচরকে সন্ন্যাসী বেশে উড়িষ্যায় প্রেরণ করেছিলেন; উড়িষ্যা থেকে আবদুর রশিদের চলে যাওয়ার পরে গভর্ণর হিসেবে নিয়োজিত রায় দুর্লভ রামের সঙ্গে নিজেদেরকে তারা ঘনিষ্ঠ করে তুলেছিলেন এবং তাদের প্রভুর নিকট প্রয়োজনীয় সকল সংবাদই প্রেরণ করতেন।[৯১২] মোস্তফা খানের আমন্ত্রণ পেয়ে রঘুজী ভোঁসলা মীর হাবীবকে সঙ্গে নিয়ে ১৪,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যসহ অগ্রসর হন এবং রায় দুর্লভ রামকে বন্দী করেন এবং সহজেই মীর আবদুল আজীজ নামক একজন বিশ্বস্ত অফিসারের প্রদত্ত প্রতিরোধ ভেঙ্গে উড়িষ্যা এবং মেদিনীপুর পর্যন্ত সমগ্র ভূ-ভাগের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ১৭৪৫ সালের এপ্রিলে

---

৯১১ যখন মোস্তফা খান পাটনা আক্রমন করেন, তখন সিয়ারের লেখক গোলাম হুসেইন তাবাতাবাই জৈনুদ্দীন আহমদ খানের প্রতিরোধ বাহিনীভুক্ত ছিলেন এবং পরবর্তী সংঘর্ষগুলোতে অংশ নিয়েছিলেন, সিয়ার ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৪৫, ৪৬২-৪৬৩, ৪৬৬

৯১২ ঐ পৃঃ ২-৫

তারা বর্ধমান জেলায় প্রবেশ করেন।[৯১৩] কাজেই, আলীবর্দী খান দ্রুত বিহার ত্যাগ করে আসতে বাধ্য হন এবং সেখানে জৈনুদ্দীন আহমদ খানকে সাহায্য করার জন্য তার আফগান সেনাপতি রহিম খানকে তার সেনাদলসহ রেখে আসেন। দুজন প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হয়ে আলীবর্দী খান রঘুজী ভোঁসলার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সূত্রপাত করেন। কিন্তু তা সফল হয়নি। মারাঠা প্রধান বর্ধমান দখল করে নেন এবং বর্ষা আসন্ন বিধায় কাটোয়ায় শিবির স্থাপন করে অপেক্ষা করতে থাকেন। আলীবর্দী খানও রাজধানী মুর্শিদাবাদে সতর্কতা অবলম্বন করেন।

ইতিমধ্যে আলীবর্দী খানের বাংলায় প্রত্যাবর্তন করার সুযোগ নিয়ে মোস্তফা খান চুনার দূর্গ থেকে বেরিয়ে আসেন এবং পাটনার দিকে অগ্রসর হন। রহিম খানের সাহায্য নিয়ে জৈনুদ্দীন আহমদ খান শাহাবাদ জেলার জগদিশপুরের নিকটে তাকে বাধা দেন। সেখানে ১৭৪৫ সালের ২০ শে জুনের যুদ্ধে মোস্তফা খান প্রায় বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে তখন অকস্মাৎ এক বন্দুকের গুলিতে তিনি নিহত হন। এতে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। আফগানরা তাদের নেতার পতনে রনে ভঙ্গ দেয় এবং সাসারাম এবং মগ্ররের পাহাড়ী অঞ্চলের দিকে পশ্চাদপসারণ করে। সেখান থেকে মোস্তফা খানের পুত্র মুর্তজা খান এবং অন্যান্য আফগান নেতা যথা আলিফ খান (সর্দার খানের জামাতা) এবং বুলন্দ খান তাদেরকে বিহার থেকে উদ্ধার করার জন্য মীর হাবীব এবং রঘুজী ভোঁসলার নিকট জরুরী সাহায্যের আবেদন জানান। সে অনুযায়ী ১৭৪৫ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে রঘুজী ভোঁসলা এবং মীর হাবীব তাদের সেনাদলসহ বিহারে এসে উপস্থিত হন। তারা খারাগপুর, টিকারী এবং শাহপুরার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হন এবং এ সকল জায়গায় নির্মমভাবে লুটতরাজ করেন এবং সন নদী অতিক্রম করে আফগানদের সঙ্গে মিলিত হন; তখন তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ছয় হাজার। এভাবে রঘুজীর বাহিনী "আফগানদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ২০,০০০ অশ্বারোহীর এক বাহিনীতে পরিণত হয়"।[৯১৪] আলীবর্দী খানও অবিলম্বে ১২,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বিহারের দিকে অগ্রসর হন এবং শীঘ্রই জৈনুদ্দীন আহমদ খান তার সৈন্যদল নিয়ে তার সঙ্গে যোগ দেন। ১৭৪৫ সালের নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে আলীবর্দী খান ও মারাঠা আফগান কোয়ালিশন বাহিনীর মধ্যে মাহিলীপুর এলাকায় রানীর দীঘির সন্নিকটে একটি তীব্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধটি চুড়ান্ত হয়ে যেত, কিন্তু আলীবর্দী খানের অবশিষ্ট আফগান সেনাপতি যথা শামশীর খান, সর্দার খান এবং রহিম খানের শৈথিল্য বা

---

[৯১৩] সিয়ার, ২য় খন্ড, পৃঃ ২

[৯১৪] সিয়ার, ২য় খন্ড, পৃঃ ৭

অবহেলার কারণে হয়নি। কথিত আছে যে, তারা সক্রিয়ভাবে যুদ্ধ করেননি, যে জন্য রঘুজী ভোঁসলা এবং তার যৌথ বাহিনী চূড়ান্ত পরাজয় এড়াতে সক্ষম হয়।[৯১৫] যাহোক, এবার আলীবর্দী খানের স্ত্রী রঘুজী ভোঁসলার সঙ্গে একটি আপোষরফার জন্য আলাপ-আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু মীর হাবীব তা ব্যর্থ করে দেন। তিনি তার মারাঠা ও আফগান মিত্রদেরকে দ্রুত বাংলার দিকে অগ্রসর হয়ে অরক্ষিত রাজধানী মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করে আলীবর্দী খানকে ফাঁদে ফেলার পরামর্শ দেন। তাই করা হল। আলীবর্দী খান দ্রুত তাদের অনুসরণ করেন, কিন্তু তিনি রাজধানীতে পৌঁছার পূর্বেই মীর হাবীব এবং তার মিত্ররা রাজধানীর আশে পাশে লুণ্ঠন করে বর্ধমান জেলার কাটোয়ায় চলে যেতে সক্ষম হন। আলীবর্দী খান তাদের পশ্চাদধাবন করে সেখানে যান এবং আরেকটি তীব্র যুদ্ধে তাদেরকে পরাজিত করেন এবং বিপুল সংখ্যক মারাঠা সৈন্যকে হত্যা করেন। এই পরাজয়ের পরে রঘুজী ভোঁসলা তার রাজধানী নাগপুরে ফিরে আসেন। তবে মীর হাবীবের অধীনে "দুই থেকে তিন হাজার মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্য এবং ছয় থেকে সাত হাজার আফগান সৈন্য রেখে আসেন।" তিনি সমগ্র উড়িষ্যা এবং বর্ধমান পর্যন্ত বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপর নিয়ন্ত্রণ অক্ষুন্ন রাখেন। আলীবর্দী খান মুর্শিদাবাদে নিজে ৩ মাসের বিশ্রামে গিয়ে এবং সৈন্যদেরকে বিশ্রাম দিয়ে পুনরায় ১৭৪৬ সালের এপ্রিল মাসে মীর হাবীবের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং বর্ধমান থেকে তাকে উড়িষ্যায় পশ্চাদপসারণ করতে বাধ্য করেন। এ সময়কালে আবার মোস্তফা খানের বিপুল সংখ্যক অনুসারী সৈন্য মীর হাবীবের সঙ্গে যোগ দেয়।[৯১৬]

৫. মীর হাবীব উড়িষ্যা অধিকারে রাখে, আফগানদের দ্বিতীয় বিদ্রোহ (১৭৪৬ সাল)

আলীবর্দী খান অবিলম্বে মীর হাবীবকে উড়িষ্যা থেকে বিতাড়ণের জন্য কোন পদক্ষেপ নিতে পারেননি; তার প্রধান কারণ হচ্ছে তার আফগান সেনাপতি শামশীর খান ও সর্দার খানের অধীনায়কত্বে অবশিষ্ট আফগান সৈন্যদের তার পক্ষ ত্যাগ। এর আগের বৎসর রাণীর দীঘির যুদ্ধে এ দুই নেতার ব্যাপারে বিশ্বাস ঘাতকতার সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল। এখন মীর হাবীব ও রঘুজী ভোঁসলার সঙ্গে

---

৯১৫ সিয়ার, ২য় খন্ড, পৃঃ ১০

৯১৬ রিয়াদ, ২৫৩-৩৫৪

বিহারের সরকার দখল করার জন্য তাদের নিশ্চিত বিদ্রোহাত্মক যোগাযোগ পরিলক্ষিত হয়।[৯১৭] তাদেরকে আরো সন্দেহ করা হয় যে, তারা হাজী আহমদের জামাতা এবং রাজমহলের ফৌজদার আতাউল্লাহ খানকে "এ প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের পক্ষে নিয়ে গেছে যে, আজিমাবাদ দখল করার পরে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব তাকেই প্রদান করা হবে"।[৯১৮] ১৭৪৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে আফগান সেনাপতিগণ বকেয়া বেতন প্রদানের দাবীর অজুহাতে বিদ্রোহাত্মক মনোভাব প্রকাশ করেন; আলীবর্দী খান তাদের বেতন পরিশোধ করে দেন এবং আফগান সৈন্যদেরকে চাকুরী হতে অব্যাহতি প্রদান করেন।[৯১৯] তারপর এ দুই আফগান সেনাপতি তাদের অধীনস্থ ছয় থেকে সাত হাজার দক্ষ ও অভিজ্ঞ সৈন্য নিয়ে বিহারের দারভাঙ্গার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। আলীবর্দী খান স্বস্তি লাভ করেন। কিন্তু উড়িষ্যা পুনরুদ্ধার করার জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেননি, কারণ তাদের শূন্যস্থান পূরণ করার লক্ষ্যে নতুনভাবে সৈন্য সংগ্রহের জন্য তার সময়ের প্রয়োজন ছিল। মারাঠা সংঘের প্রধানের সঙ্গে একটি আপোষ রফার জন্য সম্রাটের পক্ষ হতে তখন যে আলাপ-আলোচনা চলছিল, তার ফলাফলের জন্যও তিনি অপেক্ষা করছিলেন। রাজা শাহু বা বালাজী রাও কর্তৃক প্রদেয় কোন মৌখিক আশ্বাসের দ্বারা প্রতারিত হতে আলীবর্দী খানের অস্বীকৃতি ছিল যথার্থ। অবশেষে ১৭৪৬ সালের নভেম্বরে তিনি মেদিনীপুর এবং উড়িষ্যা থেকে মীর হাবীবকে বিতাড়িত করার জন্য তার সেনাপতি মীর জাফরকে প্রেরণ করেন। ১৭৪৬ সালের ডিসেম্বরের প্রথম দিকে মেদিনীপুরের নিকট এক যুদ্ধে মীর জাফর মীর হাবীব কর্তৃক সাঈদ নূরের নেতৃত্বে প্রেরিত এক বাহিনীকে পরাজিত করেন; কিন্তু যখন রঘুজী ভোঁসলার পুত্র জানোজীর অধীনায়কত্বে এক মারাঠী বাহিনী নিয়ে মীর হাবীব নিজে বালাশোর থেকে আগমন করে, তখন মীর জাফর দ্রুত বর্ধমানের দিকে পশ্চাদপসারণ করেন। আলীবর্দী খান আতাউল্লাহ খানের নেতৃত্বে আরো সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু এ দুই সেনাপতি মীর হাবীবের বিরুদ্ধে অগ্রসর না হয়ে তাদের পৃষ্ঠপোষককে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেরা ক্ষমতা দখল করার জন্য এক ষড়যন্ত্র করেন।[৯২০] আলীবর্দী খান এ চক্রান্তের কথা জানতে পেরে ১৭৪৭ সালের মার্চ মাসে দ্রুত বর্ধমানের দিকে অগ্রসর হন। মীর জাফরকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান করেন এবং আতাউল্লাহ খানকে স্বপক্ষে নিয়ে আসেন এবং

---

৯১৭ রিয়াদ, ৩৫৫; সিয়ার ২য় খন্ড, পৃঃ ১৬

৯১৮ ঐ

৯১৯ রিয়াদ, ৩৫৫

৯২০ সিয়ার, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৪-২৫

এরপর জানোজীর নেতৃত্বাধীন মারাঠা বাহিনীকে ভীষণভাবে পরাজিত করেন: জানোজী বর্ধমান থেকে মেদিনীপুরের দিকে পশ্চাদপসারণ করেন।[৯২১] তখন বর্ষা মৌসুম আসন্ন বলে আলীবর্দী খান মেদিনীপুর এবং উড়িষ্যায় অভিযান প্রেরণের জন্য ঝুঁকি না নিয়ে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। এভাবে বারবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তিনি মীর হাবীব এবং তার মিত্রদেরকে মেদিনীপুর এবং উড়িষ্যা থেকে বহিষ্কার করতে পারেননি; ফলে ১৭৪৫ সালের প্রথম থেকেই এ সকল অঞ্চল তাদের নিয়ন্ত্রনেই থেকে যায়। এমনকি ১৭৪৮ সাল পর্যন্ত আলীবর্দী খান উড়িষ্যার দিকে মনোযোগ দিতে পারেননি। কারণ, তার আফগান সেনাপতি শামশীর খান এবং সর্দার খান তখন বিহারের দিকে চলে গেলেও এখন সেখানে গোলযোগ শুরু করে দেন। বাংলা থেকে তারা যে সকল সৈন্য সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাদেরকে অব্যাহতি না দিয়ে তারা বরং তাদের "দেশবাসীর মধ্য থেকে আরো সৈন্য সংগ্রহ করে তাদের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি করেন" এবং মীর হাবীব এবং মারাঠাদের সঙ্গে চক্রান্ত করে[৯২২] জৈনুদ্দীন আহমদ খানের মনে এ মর্মে কুমন্ত্রণা দেন যে, তাদেরকে (আফগানদেরকে) তার অধীনে চাকুরীতে নিয়ে তিনি নিজে স্বাধীন হতে পারেন বা তার নিজ অবস্থানকে আরো শক্তিশালী করতে পারেন। এভাবে ফাঁদে পড়ে জৈনুদ্দীন আহমদ খান আফগানদেরকে তার অধীনে চাকুরী দেয়ার সিদ্ধান্ত করেন এবং আলীবর্দী খানকে জানিয়ে দেন যে, "এ সকল লোককে প্রদেশ থেকে বের করে দেয়া কঠিন কাজ।" তবে যখন ১৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকে জৈনুদ্দীন আহমদ খান আফগান জেনারেল এবং তাদের অধীনস্থ বাহিনীকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন, তখনই তারা অতর্কিত আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে এবং সে সময় পাটনায় অবস্থানকারী আলীবর্দী খানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী আহমদসহ বেশ কিছু সংখ্যক আমির-ওমরাহকে হত্যা করে। তারা আলীবর্দী খানের কন্যাসহ জৈনুদ্দীন আহমদ খানের পরিবারকে আটক করে এবং বিহারের সরকারী ক্ষমতা করায়ত্ত করে। তখনকার পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত আতংকজনক। কারণ নাদির শাহর পূর্বাঞ্চলীয় সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী আফগান বীর আহমদ শাহ আবদালী সে সময় উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে মোগল সাম্রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। এর ফলে আরেকবার প্রচুর সংখ্যক আফগানের ভারতে অনুপ্রবেশ ঘটে এবং তাদের অনেকেই বিহারে এসে শামশীর খানের সঙ্গে যোগ দেয়। "তিনি তার সাহার্য্যার্থে এগিয়ে আসার জন্য তার দেশবাসীর প্রতি সর্বত্রই আহবান জানান এবং এটা ছিল বিধাতার বিশেষ

---

৯২১ সিয়ার, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৫-২৮

৯২২ রিয়াদ, ৩৫৫-৩৫৬, সিয়ার, ২য় খন্ড, ২৯-৩০

অনুগ্রহ।" সিয়ারের গ্রন্থাকার লিখেছেন, "সে বৎসর মনে হচ্ছে মাটি ফুঁড়ে ঘাসের ডগা বের হওয়ার মত আফগানদের অঙ্কুরোদগম ঘটে। ফলে সমগ্র ভারতের প্রতিটি এলাকাই ছিল অস্ত্র সজ্জিত আফগানদের দ্বারা পরিপূর্ণ, এমন একটি দিনও অতিক্রান্ত হয়নি, যখন আজিমাবাদের নাগরিকদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়নি এবং দিনে অন্ততঃ পাঁচ থেকে ছয় বার নাকাড়ার শব্দে তাদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি হত এবং খোঁজ খবর নিলে তারা সর্বদাই জানতে পারতো যে, বিশেষ কোন আফগান অধীনায়কের নেতৃত্বে এত সংখ্যক লোক শামশীর খানের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসছে।"[৯২৩] বর্ণিত আছে যে, শামশীর খান যে বিপুল পরিমান ধন-সম্পদ হস্তগত করেছিলেন, তা বণ্টন করে তিনি তার নিজ জাতির মধ্য থেকে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন।[৯২৪]

বিহারের এই করুন ঘটনার কথা জানতে পেরে আলীবর্দী খান আফগানদের কবজা থেকে বিহার প্রদেশ এবং তাঁর কন্যা ও অন্যান্যদেরকে উদ্ধার করার জন্য স্বভাবতই তাঁর সকল সম্পদ ও শক্তি নিয়োগ করেন। তিনি জগৎ শেঠ ও অন্যান্য ব্যাংকার এবং তাঁর জামাতা নওয়াজিশ মুহাম্মদ খানের নিকট হতে বিপুল পরিমান অর্থ ধার করে তাঁর বকেয়া বেতন প্রদানের আর্থিক সমস্যা কাটিয়ে উঠেন।[৯২৫] আলীবর্দী খান পুনরায় মীর জাফরের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং রাজধানী রক্ষার দায়িত্ব আতা খান, নওয়াজিশ মোহাম্মদ খান এবং তার উপর অর্পণ করেন। তার অনুপস্থিতিতে রাজধানী এবং এর চতুপার্শ্ব যে মারাঠাদের দ্বারা লুণ্ঠিত হতে পারে, সে সম্পর্কে পুরোপরি অবগত থাকায় তিনি নাগরিকদেরকে তাদের নিরাপত্তার জন্য "আরো কোন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে" পরামর্শ দেন। এতে স্বভাবতই মুর্শিদাবাদ থেকে গঙ্গা নদীর অপর পাড়ে, উত্তর ও পূর্ব বাংলায় সম্মানিত ও সম্পদশালীদের আরেক দফা আগমন ঘটে।[৯২৬]এভাবে সকল প্রকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সম্পন্ন করে আলীবর্দী খান ১৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে ফেব্রুয়ারি (২রা রবিউস সামী, ১১৬১ হিজরী) বিহার অভিযানে বের হন। মীর হাবীব এবং তার মিত্ররা ও মুশিদাবাদ নগরী লুণ্ঠন করার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে "জঙ্গলাকীর্ণ পথ ধরে। আলীবর্দী খানকে অনুসরণ করে তাঁর পশ্চাতে পশ্চাতে অগ্রসর হয় এবং ডান ও বাম দিক আগুন দিয়ে ভস্মিভূত করে দেয়।"[৯২৭]

---

[৯২৩] সিয়ার, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৯-৪০

[৯২৪] সিয়ার, ২য় খন্ড, ৪৪-৫০

[৯২৫] ঐ, পৃঃ ৪৬; রিয়াদ, পৃঃ ৩৫৭

[৯২৬] সিয়ার, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৬

[৯২৭] রিয়াদ, পৃঃ ৩৫৭

ভাগলপুরে (বিহারে) মীর হাবিব হঠাৎ আলীবর্দী খানকে আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধে পরাজিত হন। আলীবর্দী খান টিকারীর (মুঙ্গীর) জমিদার সুন্দর সিংকে তার পক্ষে টেনে তাঁর অবস্থা আরো শক্তিশালী করেন। তিনি এবং অন্যান্য স্থানীয় জমিদারগণ একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে আলীবর্দী খানের সঙ্গে যোগ দেন। অন্যদিকে পাটনায় বিপ্লব ঘটাতে পারলে মীর হাবীব আফগান সেনাপতিদেরকে পুরস্কার প্রদানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা নিয়ে তাদের সঙ্গে তার ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাতে তার অবস্থানও দুর্বল হয়ে যায়। তথাপি তারা তাদের সেনাবাহিনী নিয়ে তার সঙ্গে যোগ দেয়[৯২৮] এবং ১৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল পাটনা থেকে ২৬ মাইল পূর্ব দিকে রাণী চকে আলীবর্দী খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু আলীবর্দী খান তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। যুদ্ধে শামশীর খান নিজেও নিহত হন।[৯২৯] অবশিষ্ট আফগান সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়; আর মীর হাবীব তার সৈন্যদের নিয়ে উড়িষ্যায় পশ্চাদপসারণ করে। এই যুদ্ধে জৈনুদ্দীন আহমদ খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র সিরাজুদ্দৌলা আলীবর্দী খানের পার্শ্বে থেকে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন।[৯৩০] তারপর নওয়াব তাঁর কন্যা এবং কন্যার দ্বিতীয় পুত্র মির্যা মেহদী (ইকরামুদ্দৌলাহ) কে উদ্ধার করেন।

যদিও আলীবর্দী খান আফগানদের হাত থেকে বিহার পুনরুদ্ধার করেন, তথাপি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় এবং সবচেয়ে যোগ্য জামাতা জৈনুদ্দীন আহমদ খান এবং হাজী আহমদের মৃত্যুতে তিনি ভীষণ আঘাত পান। এই বিয়োগান্ত ঘটনার ফলশ্রুতিতে তাঁর পরিবারের অবশিষ্ট জীবিত সদস্যদের মধ্যে সৃষ্ট বিভেদ ও তাঁকে আরো দূর্বল করে ফেলে। বিহার ত্যাগের পূর্বে আলীবর্দী খান তাঁর দ্বিতীয় জামাতা সাঈদ আহমদ খানকে প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত করেন; কিন্তু সিরাজুদ্দৌলাহ এই নিয়োগের বিরোধিতা করেন এবং প্রদেশটি তাঁর পিতার অধীনস্থ ছিল বলে অধিকার হিসেবেই তিনি এ পদ দাবী করেন।[৯৩১]এ বিষয় নিয়ে সাঈদ আহমদ খান এবং তার মধ্যে অনেক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। অবশেষে আলীবর্দী খান তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন এবং তাঁর পেশকার রাজা জানকীরামকে প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। এই ব্যবস্থা নিয়ে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক বন্দোবস্ত সম্পন্ন করে আলীবর্দী খান সাঈদ আহমদ খান এবং সিরাজুদ্দৌলাহ- উভয়কে সঙ্গে নিয়ে ১৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বরের শেষের

---

৯২৮ সিয়ার, ২য় খন্ড, পৃঃ ৫০-৫২

৯২৯ ঐ, পৃঃ ৫২-৫৬; রিয়াদ, পৃঃ ৩৫৮

৯৩০ সিয়ার, ২য় খন্ড,পৃঃ ৫৪

৯৩১ সিয়ার ২য় খন্ড, পৃঃ ৬৩-৬৪

দিকে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করেন। তবে তাঁর প্রত্যাবর্তনের পূর্বে আলীবর্দী খান আতাউল্লাহ খানকে (হাজী আহমদের জামাতা) বাংলা ছেড়ে দিল্লীতে ফিরে যেতে বাধ্য করেন। কারণ তার পূর্বের চক্রান্তমূলক আচরণ ব্যতীত গত অভিযানের সময়েও মীর হাবীবের সঙ্গে তার ষড়যন্ত্রমূলক যোগাযোগে লিপ্ত হওয়ার কথা জানা যায়।[৯৩২]

৬. মীর হাবীব এবং মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি (১৭৫১)

বিহারের যুদ্ধের পরে জানোজী তার দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু মীর হাবীব কিছু সংখ্যক আফগান এবং মারাঠা সৈন্য নিয়ে উড়িষ্যায় অবস্থান গ্রহণ করে এবং মেদিনীপুরসহ উড়িষ্যার উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। ১৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৭৫১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বারবার আলীবর্দী খান মীর হাবীবকে উৎখাত করে উড়িষ্যা পুনর্দখলের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সফল হতে পারেননি। এভাবে তিনি ১৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে সিরাজুদ্দৌলাহ এবং মীর জাফরকে নিয়ে মীর হাবীবের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কিন্তু মীর হাবীব তাঁর সঙ্গে সম্মুখ সমর পরিহার করে এবং মেদিনীপুরে তার নিজ শিবির জ্বালিয়ে দিয়ে উড়িষ্যার জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে। আলীবর্দী খান তার পশ্চাদাবন করে সেখানেও যান, কিন্তু তার কোন হদিস করতে পারেননি। কাজেই, তিনি কটক এবং বরাহবাটি দুর্গ পর্যন্ত অগ্রসর হন, যা তখনো মীর হাবীবের সমর্থক সাঈদ নূর, সরন্দাজ খান এবং ধরমদাসের নিয়ন্ত্রণে ছিল। আলীবর্দী খান শান্তির আশ্বাস দিয়ে এ সকল সেনাপতিদেরকে তার শিবিরে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তারপর বিশ্বাস ঘাতকতামূলকভাবে তাদেরকে হত্যা করেন।[৯৩৩] তারপর ১৫ দিন অবরোধ করে রেখে দূর্গ দখল করেন। কিন্তু মীর হাবীব এবং মারাঠাদের ভয়ে কেহই উড়িষ্যার গভর্ণর হতে রাজী হননি। ফলে আলীবর্দী খান শাহ আবদুর রহমান নামক একজন অখ্যাত অশ্বারোহী সৈনিককে কটকে তার নায়েব হিসেবে নিয়োগ করতে বাধ্য হন। কিন্তু আলীবর্দী খানের কটক ত্যাগের এক সপ্তাহের মধ্যে মীর হাবীব শাহ আবদুর রহমানকে পরাজিত এবং বহিস্কার করে বরাহবাটি দূর্গ পুনর্দখল করে।[৯৩৪] এভাবে আলীবর্দী খান মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করার পূর্বেই উড়িষ্যায় তার অর্জন ভণ্ডুল হয়ে যায়। ইতিমধ্যে বর্ষা মৌসুম শুরু হয়ে যাওয়ায় নদীর পানি স্ফীত হয়ে ওঠা, অব্যাহত বর্ষণ এবং রাস্তা-ঘাটের দুরবস্থার কারণে সীমাহীন কষ্ট ও দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

---

[৯৩২] সিয়ার, ২য় খন্ড, পৃঃ ৫৪

[৯৩৩] সিয়ার, ২য় খন্ড, পৃঃ ৮১-৮২

[৯৩৪] ঐ, পৃঃ ৮৪-৮৫

বর্ষা মৌসুমের অবসান হলে আলীবর্দী খান পুনরায় রাজধানী ত্যাগ করেন এবং বাংলায় মীর হাবীবের অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য তিনি একটি স্থায়ী শিবির প্রতিষ্ঠা করেন। স্পষ্টতই এটা ছিল একটি আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ। এমনকি মীর হাবীব তাঁর এ পদক্ষেপও অকেজো করে দেয় এবং একদল মারাঠা ও আফগান সৈন্য নিয়ে মেদিনীপুরকে পাশ কাটিয়ে এবং বর্ধমানের পশ্চিম দিকের বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত এসে পৌঁছে এবং ১৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের মার্চের আগ পর্যন্ত এ সমগ্র ভূ-ভাগে লুটতরাজ করে। আলীবর্দী খান দ্রুত মেদিনীপুর থেকে বর্ধমান এসে উপস্থিত হন, কিন্তু ততক্ষণে মীর হাবীব আবার চলে যায়। আলীবর্দী খান পুনরায় মেদিনীপুরের দিকে অগ্রসর হন, কিন্তু এবার তিনি একটি নতুন এবং অপ্রত্যাশিত সমস্যার সম্মুখীন হন। তার প্রিয়তম দৌহিত্র সিরাজুদ্দৌলাহ একটি বিদ্রোহাত্মক মনোভাব গ্রহণ করেন এবং রাজা জানকিরামের নিকট হতে পাটনার সরকারী ক্ষমতা গ্রহণের জন্য সেদিকে অগ্রসর হন। সিরাজুদ্দৌলাহ প্রাপ্ত বয়স্ক হয়েছিলেন, কিন্তু এখনো তাকে কোন উপযুক্ত পদ দেয়া হয়নি। আলীবর্দী খান সিরাজুদ্দৌলাহকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করার বিষয় মনে মনে সিদ্ধান্ত করে রেখেছিলেন। কিন্তু তখনো তা প্রকাশ করেন নি। কাজেই, যুবক রাজপুত্র স্বাভাবিকভাবেই অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন। তিনি আরো এজন্য অসন্তুষ্ট ছিলেন যে, আফগানদের হাত থেকে প্রদেশটি পুনরুদ্ধারের পরও তাকে বিহারের গভর্ণরের পদ দেয়া হয়নি। পাটনায় আরো অনেক অফিসার ছিলেন, যারা রাজা জানকিরামের প্রশাসন নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন। এ অসন্তুষ্ট গ্রুপের নেতা মেহদী নিসার খান[৯৩৫] মুর্শিদাবাদে এসে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সিরাজুদ্দৌলাহকে উস্কানী দিয়েছিলেন। তার এ কর্মকাণ্ডের কথা জানতে পেরে আলীবর্দী খান মীর জাফর এবং দুর্লভ রামকে মেদিনীপুর শিবিরের দায়িত্বে রেখে সিরাজুদ্দৌলাহকে ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি নিজে গ্রীষ্মের তাপ ও বর্ষণ উপেক্ষা করে দ্রুত পাটনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। অতএব, নওয়াব সহজেই সিরাজুদ্দৌলাহকে মুর্শিদাবাদে ফিরে আসতে রাজী করাতে সক্ষম হন।[৯৩৬] মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তনের সময় আলীবর্দী খান ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং নিবিড় পরিচর্যাধীনে নৌকায় করে রাজধানীতে এসে পৌঁছেন। ইতিমধ্যে আলীবর্দী খানের অসুস্থতা এবং অনুপস্থিতির সুযোগে মীর হাবীব পুনরায় মেদিনীপুরে হানা দেয়। মীর জাফর এবং দুর্লভ রাম শিবির পরিত্যাগ করে

---

৯৩৫ তিনি ছিলেন সিয়ারের লেখক গোলাম হুসেন খানের চাচা

৯৩৬ এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সিয়ারের খন্ড. ৯২-১০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বর্ধমানে পশ্চাদপসারণ করেন। এ পরিস্থিতিতে আলীবর্দী খান সম্পূর্ণ রোগমুক্ত না হলেও রাজধানী থেকে বেরিয়ে আসেন এবং ১৭৫১ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কাটোয়ায় অবস্থান গ্রহণ করেন।

দীর্ঘ যুদ্ধ বিগ্রহে উভয় দলই ক্লান্ত এবং নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। আর মীর হাবীব এবং তার মারাঠা মিত্ররাও উপলব্ধি করে যে, বারবার আক্রমণ এবং আঘাত করে পালিয়ে আসার কৌশল অবলম্বন ও অনুসরণ করা সত্ত্বেও আলীবর্দী খানের শৌর্যবীর্য ও সামরিক শক্তির কারণে তারা কোন প্রকার স্থায়ী সুবিধাই অর্জন করতে পারেনি। আবার, আলীবর্দী খানও জীবনের ৭৫ বছর বয়সে উপনীত হয়ে বয়সের ভার অনুভব করেন। তাঁর আফগান সেনাপতি ও সৈন্যরা তাঁর পক্ষ ত্যাগ করায় তিনি অনেকটা দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন। তারপরে তারা আবার মীর হাবীবের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এবং তদুপরি জৈনুদ্দীন আহমদ ও হাজী আহমদের মৃত্যুতেও তার শক্তি হ্রাস পেয়েছিল; জনগণের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট এবং ধন-সম্পদের উপর অব্যাহত ধ্বংসলীলাও এজন্য সমভাবে দায়ী ছিল। তাছাড়া, তাঁর পরিবারের জীবিত সদস্যদের মধ্যেও বিভেদ সৃষ্টি হচ্ছিল। এর ফলে উভয় পক্ষই শান্তি কামনা করছিল। এ উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়; মারাঠা এবং মীর হাবীবের পক্ষে তার ভ্রাতুস্পুত্র মীর সলিহ এবং নওয়াবের পক্ষে মীর জাফর আলাপ-আলোচনা পরিচালনা করেন। এর ফলে ১৭৫১ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে (১১৬৫ হিঃ) নিম্নোক্ত শর্তে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়।[৯৩৭]

১। এখন থেকে মীর হাবীব আলীবর্দী খানের অধীনে চাকুরিরত বলে গণ্য হবেন এবং এভাবেই তিনি উড়িষ্যার গভর্ণর থাকবেন। প্রশাসনের ব্যয় নির্বাহ করার পর তিনি তার উদ্বৃত্ত রাজস্ব থেকে রঘুজী ভোঁসলার সেনাবাহিনীর বেতন প্রদান করবেন।

২। মারাঠাগণ চৌথ হিসেবে বৎসরে বার লক্ষ টাকার বিনিময়ে আর কখনো আলীবর্দী খানের রাজ্যে পদার্পণ না করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়।

৩। বালাশোরের নিকটস্থ সুবর্ণরেখা নদীকে বাংলা ও উড়িষ্যার মধ্যে সীমান্ত হিসেবে নির্ধারণ করা হয় এবং এভাবে মেদিনীপুর জেলাকে চূড়ান্তভাবে বাংলার অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

এ চুক্তিটি ছিল নিঃসন্দেহে আলীবর্দী খানের পক্ষ থেকে পরাজয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ। অবশেষে এভাবে তিনি তাঁর বাংলা ও বিহার প্রদেশের জনগণের জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তবে তা করেন জনগণের এত দুঃখ-কষ্ট এবং

---

৯৩৭ সিয়ার, ২য় খন্ড, পৃঃ ১১২-১১৩

ধ্বংসযজ্ঞের বিনিময়ে, এমনকি মারাঠা বর্গীদেরকে চৌথ প্রদান এবং উড়িষ্যা প্রদেশ চূড়ান্তভাবে ছেড়ে দেয়ার বিনিময়ে। প্রদেশটি বাংলা এবং মারাঠাদের মধ্যে নড়জোর একটি মধ্যবর্তী রাজ্যে (Buffer state) পরিণত হয়। আলীবর্দী খান যদি দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলী খান বা তার জামাতা মির্যা বাকিরকে প্রদেশটির গভর্ণর হিসেবে বহাল রাখার মানষিক কষ্ট স্বীকার করতেন, তাহলে তিনি আরো অনেক সুবিধাজনকভাবে এবং সম্মানের সঙ্গে এ অবস্থাটা লাভ করতে পারতেন। এমনকি বহু বৎসরব্যাপী এমন প্রচণ্ড পরিশ্রম ও ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও মীর হাবীব প্রকৃতপক্ষে আদৌ কোন লাভবান হতে পারেননি। আলীবর্দী খানের প্রতি তার আনুগত্য ছিল নামমাত্র। তিনি আসলে মারাঠাদেরই অধীনস্থ হয়ে পড়েন। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলায় মারাঠাদের বারবার হামলার পিছনে তিনিই ছিলেন প্রধান চালিকা শক্তি ও উৎসাহ দাতা; তার সাহায্য ও সহযোগিতা না হলে তা নিশ্চিত ভাবেই এত দীর্ঘ ও এত বেশি ধ্বংসাত্মক হতে পারতো না। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি আলীবর্দী খানের বিশ্বাসঘাতকতা ও ক্ষমতা দখলের প্রতিশোধ নেয়ার অদূরদর্শী নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। কিন্তু মারাঠাদের সঙ্গে মৈত্রী করার কারণে মীর হাবীব বাংলায় মুসলিম রাজশক্তির ধ্বংসের জন্য অন্য যে কোন লোকের চেয়ে বেশি দায়ী। "মনে হচ্ছে সে সময় একটি ঘৃণ্য নৈতিক অরাজকতা দেশকে গ্রাস করেছিল," লিখেছেন আবদুস সালাম, "যার নিকট ধর্মীয় বন্ধন বা জাতীয় আবেগের কোনই গুরুত্ব ছিল না।"[৯৩৮] মীর হাবীবও তার আজীবন শ্রমের অলীক ফল বেশি দিন ভোগ করতে পারেন নি। কারণ, শীঘ্রই তার ও তার মারাঠা মিত্রদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়। তার কারণ হয়ত এই ছিল যে, তখন আর যুদ্ধ করার মত তাদের কোন সাধারণ (Common) শত্রু ছিল না। শান্তি চুক্তি সম্পাদনের মাত্র এক বছর পরেই রঘুজী ভোঁসলার পুত্র জানোজী তাকে বিশ্বাসঘাতকতা মূলকভাবে হত্যা করে।[৯৩৯] এরপর মীর হাবীবের ভ্রাতুষ্পুত্র মির্যা সালিহকে মির্যা মুসলেহ উদ্দীন উপাধি সহকারে আলীবর্দী খান কর্তৃক মারাঠা প্রধানের অনুমোদন দিয়ে উড়িষ্যার গভর্ণর নিযুক্ত করা হয় এবং এর সঙ্গে প্রদেশের উপর তাদের অধিকার বাস্তবে সম্পূর্ণ হয়ে যায়।

---

৯৩৮ রিয়াদ, ৩৫০-৩৫১, টীকা

৯৩৯ সিয়ার ২য় খন্ড, পৃঃ ১১৫-১১৭, রিয়াদের বর্ণনানুযায়ী (৩৬০-৩৬১) আলীবর্দী খান "উদ্দেশ্যমূলকভাবে মীর হাবীবের নামে তার একটি বানোয়াট বানির উত্তরে একটি পত্র লিখে" তার ধ্বংস ডেকে আনেন; পত্রে তাকে (জানোজীকে) শেষ করে দেয়ার আহবান জানানো হয়েছিল এবং এমন ফন্দি করা হয়েছিল যেন পত্রটি তার নিকট ধরা পড়ে এবং এরপরে জানোজী বিশ্বাস ঘাতকতা করে মীর হাবীবকে হত্যা করে একথা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না, কারণ তাতে আলীবর্দী খানের কোন উদ্দেশ্য পুরণ হয়নি।

মীর হাবীব-মারাঠাদের আক্রমণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলাফল যে কি মারাত্মক হয়েছিল, তার সঙ্গে তুলনায় উড়িষ্যা হারানো আলীবর্দী খানের জন্য ছিল তুচ্ছ। তাদের আক্রমণের সর্বাধিক প্রত্যক্ষ এবং লক্ষ্যণীয় ফল ছিল পশ্চিম বাংলার অর্থনৈতিক জীবন ধ্বংস হয়ে যাওয়া। যতবারই মারাঠা দস্যুরা এসেছে, ততবারই তারা শহর-গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে, লুণ্ঠন করেছে এবং তাদের পিছনে রেখে গিয়েছে দীর্ঘস্থায়ী ধ্বংস এবং দুর্ভোগের চিহ্ন। প্রায় এক দশক পর্যন্ত পশ্চিম বাংলার জনগণ কাটিয়েছে ইতিহাসে অজানা এমন এক দুঃস্বপ্নের মধ্যে, যখন সেখানে সাধারণভাবে ছিল না জীবন ও সম্পদের কোন নিরাপত্তা, যা সমসাময়িক রচনা ও প্রচলিত ছড়ায় চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। জনগণ কর্তৃক বর্গী নামে অভিহিত মারাঠা দস্যুরা তাদের ধন-সম্পদ লুটে নিয়ে যেত, শুধু তাই নয়, তারা তাদের উপর অমানবিক নির্যাতন চালাত। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, মারাঠা দস্যুরা মানুষের হাত কেটে ফেলতো, "কারো কারো নাক এবং কান কেটে ফেলতো; কাউকে সরাসরি হত্যা করে ফেলতো। তারা সুন্দরী মহিলাদেরকে ধরে নিয়ে যেত আর প্রকাশ্যে লুণ্ঠন করার পরে তারা গ্রামে প্রবেশ করতো, আগুন দিয়ে ঘর-বাড়ী পুড়িয়ে দিত। শুধু ভাগিরথি অতিক্রম করেই মানুষ নিরাপত্তা লাভ করতো।"[৯৪০] কৃষি এবং ব্যবসা সমভাবেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। কারণ মারাঠারা শুধু মাঠ লুট করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং গৃহপালিত জীবজন্তু ও গরুবাছুর ধরে নিয়ে যেত। ব্যবসায়ী এবং কারিগরগণ তাদের পণ্যদ্রব্য এবং যন্ত্রপাতি নিয়ে পালিয়ে বেড়াত। "স্বর্ণকারগণ তাদের নিক্তি ও বাটখারাসহ, প্রসাধনীসহ মুদি দোকানীরা এবং কাঁসা-পিতলের কর্মচারীরা তাদের দোকান বন্ধ করে চলে যেত। কর্মকার এবং কুম্ভকাররা তাদের যন্ত্রপাতি, জেলেরা তাদের জাল ও রশি নিয়ে এবং শাঁখারুরা তাদের জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়ে যেত।"[৯৪১] বাংলার একজন সমসাময়িক ইংরেজ কুঠিয়াল লিখেছেন যে, মারাঠারা "সবচেয়ে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ এবং নিষ্ঠুরতম আচরণ করতো।" তারা তাদের ঘোড়া এবং অন্যান্য জন্তুকে তুঁতগাছ খাওয়াতো এবং এভাবে রেশম শিল্পের অপুরণীয় ক্ষতি সাধন করতো। তারা তাদের পিছনে একটি সাধারণ ধ্বংসের চিহ্ন রেখে যেত, বহু অধিবাসী, তাঁতী এবং গৃহস্থ পালিয়ে যেত। আড়ংসমূহ (কাপড় এবং রেশমের বাণিজ্য কেন্দ্রসমূহ) বহুলাংশে পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল; জমি থাকতো অনাবাদী"।[৯৪২]

---

[৯৪০] একজন প্রত্যক্ষদর্শী গঙ্গা রামের বিবরণ, এইচবিতে উদ্বৃত, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৫৭

[৯৪১] ঐ

[৯৪২] জে, এইচ হলওয়েল, ইন্টারেষ্টিং হিষ্ট্রিক্যাল ইভেন্টস্, ২য় সংস্করণ, লন্ডন, ১৭৬৬, পৃঃ ১২১

সমসাময়িক সকল বিবরণ থেকেই জানা যায় যে, সে সময় পশ্চিম বাংলা থেকে বহু লোকের পূর্ব বাংলায় আগমন ঘটেছিল। এর ফলে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও জনসংখ্যাতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। ভাগিরথির পশ্চিম পাড়ের জেলাগুলিতে জনসংখ্যা কমে গিয়ে অত্যন্ত হালকা জনবসতিপূর্ণ এলাকায় পরিণত হয়েছিল। আর পূর্বাঞ্চলে সমানুপাতিকহারে ও দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সমসাময়িক সূত্রগুলোতে পশ্চিম বাংলা থেকে পূর্ববাংলায় অর্থাৎ মারাঠা অশ্বারোহীদের নাগালের বাহিরে, নদীর উত্তর ও পূর্ব পাড়ে বহু বহু সম্পদশালী ও সম্মানিত মুসলিম পরিবারের আগমনের উল্লেখ পাওয়া যায়। এটা নিঃসন্দেহে পূর্ববাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা গরিষ্ঠতার একটি অন্যতম কারণ। এর রাজনৈতিক ফলাফল ছিল আরো গুরুত্বপূর্ণ। মারাঠা বর্গীদের সহযোগিতা নিয়ে মীর হাবীব রাজধানী মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত বারবার হামলা করায় আলীবর্দী খানের রাজ্যের বৃহত্তর অঞ্চলব্যাপী শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার ব্যাপারে তাঁর সামর্থের প্রতি জনগণের আস্থা নষ্ট হয়ে যায় এবং এতে তাঁর দ্বারা জবরদস্তিমূলকভাবে ক্ষমতা গ্রহণের বিষয়টি জনগণের চোখে ভাসতে থাকে এবং তাঁর শাসনের পুরো সময়কালব্যাপী অব্যাহতভাবে চলতে থাকা যুদ্ধগুলোকে উত্তরাধিকার যুদ্ধ বলেই মনে হত। তাঁর আফগান সেনাপতি ও সৈন্যদের তাঁর পক্ষ ত্যাগ, মীর হাবীব ও মারাঠাদের সঙ্গে তাদের মৈত্রী স্থাপন, মারাঠাদের সঙ্গে আলীবর্দী খানের যুদ্ধের সময় মীর জাফর ও আতাউল্লাহ খান কর্তৃক বিদ্রোহ ঘটানোর প্রচেষ্টা, বিহার প্রদেশকে স্বাধীন করার জন্য জৈনুদ্দীন আহমদ খানের দুর্ভাগ্যজনক পরিকল্পনা এবং সিরাজুদ্দৌল্লাহ কর্তৃক সে প্রদেশের সরকার দখলের প্রচেষ্ঠা- এ সকল ঘটনা এবং দীর্ঘকালব্যাপী অব্যাহত যুদ্ধবিগ্রহের উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে আলীবর্দী খান কর্তৃক ক্ষমতা জবর দখল সম্বন্ধে সাধারণ চেতনার মধ্যে। সর্বোপরি, মীর হাবীব ও মারাঠাদের বারবার আক্রমণের ফলে একাধিকভাবে ইংরেজদের দ্বারা বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পথ প্রশস্ত হয়। একদিকে, আফগান ও মারাঠাদের হামলার মুখে মোগল সম্রাটের অসহায়ত্ব, আবার অন্যদিকে, বাংলার কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত মারাঠাদের আক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দ্বন্দ প্রভৃতি বিষয় অত্যাধিক উচ্চাকাংখী এবং অভিযান প্রিয় ইংরেজদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষকে জাগিয়ে তোলে, বিশেষ করে ইতিমধ্যেই তারা দক্ষিণ ভারতে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ফরাসীদের সঙ্গে একাধিকবার সশ্রস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। ইংরেজদের বসতি ছিল কলিকাতায় এবং সেখানে ছিল তাদের একটি সুদৃঢ় দূর্গ; এবং মারাঠাদের সঙ্গে আলীবর্দী খানের যুদ্ধ বিগ্রহের সুযোগ নিয়ে, তাছাড়া মারাঠাদের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য, আরো অধিক নিরাপত্তা

বিধানের লক্ষ্যে তারা কলিকাতায় তাদের সামরিক শক্তি আরো বৃদ্ধি করে। বাস্তবেও ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে মারাঠাদের দ্বিতীয়বারের হামলার সময় কলিকাতার বিখ্যাত মারাঠা পরীখা খনন করা হয় (এটা এখন ভরাট করে সার্কুলার রোডে রূপান্তর করা হয়েছে)। উদ্দেশ্য ছিল কলিকাতায় তাদের অনিরাপদ উন্মুক্ত অংশের নিরাপত্ত বিধান করা। এতে একদিকে কলিকাতা নগরীর দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটে, অন্যদিকে, উদ্বাস্তুদের নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারে ইংরেজদের ক্ষমতার প্রতিও তাদের আস্থা বৃদ্ধি করে। উল্লেখিত মারাঠা-পরীখা খননের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের বৃহত্তর অংশই যোগাড় করা হয়েছিল সেখানকার ব্যবসায়ী অধিবাসীদের নিকট হতে চাঁদা তোলে। অল্প সময়ের মধ্যেই ইংরেজরা কিছু সংখ্যক জমিদার, ব্যবসায়ী এবং ব্যাংকারদেরকে তাদের পক্ষে টেনে নেয়, এমনকি আলীবর্দী খানের মৃত্যুর পূর্বেই তারা দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য পরিকল্পনা তৈরী করে।

৭. আলীবর্দী খানের শেষের কয়েক বৎসর

বাংলায় ইংরেজদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ

মারাঠাদের সঙ্গে এই শান্তি চুক্তি সম্পাদনে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং পুনর্গঠণের জন্য কোন নতুন যুগের সূচনা হয়নি। বরং ইতিপূর্বেই যে ভাঙ্গন ও পতনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, এটা ছিল তারই একটি পর্যায় মাত্র। এই চুক্তি সম্পাদনের পরে আলীবর্দী খান মাত্র ৫ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং এই সময় বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে একদিকে তাঁর পরিবারের বিচ্ছিন্নতা এবং দূর্বলতা প্রকট হয়ে প্রকাশ পায় এবং অন্যদিকে প্রকাশ পায় বাংলায় ইংরেজদের ক্রম বর্ধমান রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ। তাঁর পরিবারের বিচ্ছিন্নতার কারণ ছিল মুর্শিদ কুলী খানের সময় হতে বিদ্যমান বা সম্ভাব্য উদীয়মান প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলো একে একে নির্মূল হয়ে যাওয়া।

ঢাকার আদি মুসলমান আমীর ওমরাহদের সঙ্গে মুর্শিদ কুলী খানের বিবাদ, ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তর, বাংলার মুসলিম জায়গিরদারদের জায়গীর বাংলা থেকে উড়িষ্যায় সরিয়ে নেয়া, সর্বশেষে হিন্দু জমিদার ও ব্যাংকারদের সহযোগিতা নিয়ে বাংলায় তাঁর বংশীয় রাজত্ব কায়েমের জন্য তাঁর প্রচেষ্টা দেশে মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতা ও প্রভাবকে নিঃশেষ করে দিয়েছিল। মুর্শিদ কুলী খান ও সুজাউদ্দীন খানের আমলে অবশ্য তাঁদের আত্মীয় স্বজন ও অনুরাগীদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বাংলায় আগমন ঘটেছিল। আলীবর্দী

খানের পরিবার ও তাদের আত্মীয়স্বজনেরা এই নতুন আগমনকারীদের দলভুক্ত ছিল। কিন্তু নবাগত এই দল নতুন অভিজাত শ্রেণী হিসেবে নিজেদের পাকা করার পূর্বেই তারা নিজেদের মধ্যে বিভেদে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এর কারণ ছিল আলীবর্দী খান কর্তৃক তাঁর পৃষ্টপোষকের পরিবারের নিকট হতে সরকারী ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়ার জন্য উচ্চাকাঙ্খা। শেষ পর্যন্ত যখন তিনি তাই করলেন, তখন তিনি সরফরাজ খান ও তার ভগ্নিপতি দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলি খানের সমর্থক নবাগতদের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যককে দৃশ্যপট থেকে বহিস্কার করেন। আলীবর্দী খান বিহার থেকে দশ হাজারেরও বেশি যোদ্ধা এবং অর্ধ ডজন দক্ষ সেনাপতিকেও সঙ্গে এনেছিলেন।

কিন্তু যখন তারা তাকে ছেড়ে চলে যায়, তখন তাঁর দৃঢ় সমর্থকদের সংখ্যা দারুনভাবে হ্রাস পায় এবং অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, তাদের সংখ্যা তাঁর পরিবার পরিজন এবং নিকটাত্মীয়দের মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়ে। অবস্থা এমন ছিল না যে, দক্ষ মুসলমান সরকারী আমলা, অভিজাত শ্রেণীর অভাব পড়ে গিয়েছিল বরং তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে পশ্চাতে ঠেলে দেয়া হয়েছিল অথবা আলীবর্দী খান তাদের উপর আস্থা স্থাপন করতে পারছিলেন না। এই পরিস্থিতিতে তাকে ক্রমবর্ধমান হারে অমুসলমানদের সমর্থনের উপর নির্ভর করতে হচ্ছিল। তাই আফগানদের নিকট থেকে বিহার পুনরুদ্ধার করার পর তাকে রাজা জানকি রামকে সেখানকার গভর্ণর নিয়োগ করতে হয়েছিল এবং যখন ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মারা যান, তখন তাঁর দীওয়ান রাম নারায়নকে সেখানকার গভর্ণর নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। মারাঠাগণের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের পর আলীবর্দী খান অনুরূপভাবে তাঁর গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান রাজা রাম সিংকে গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত অঞ্চল মেদিনীপুরের গভর্ণর নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ জাহাঙ্গীর নগর (চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা এবং সিলেটসহ ঢাকা) ও অমুসলমান কর্মকর্তাগণের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল; যদিও নওয়াজিশ মুহাম্মদ খান ছিলেন এর নামমাত্র গভর্ণর, কিন্তু তিনি রাজধানী মুর্শিদাবাদে থাকতেন এবং আলীবর্দী খানের অসংখ্য অভিযানের সময় তিনি এর প্রশাসনিক বিষয় দেখাশুনা করতেন; পরবর্তীকালে তিনি আলীবর্দী খানের উপদেষ্টা হিসেবে সেখানেই থাকতেন এবং ঢাকার দায়িত্ব পালন করতেন। তার (নেওয়াজিশ মুহাম্মদ খানের) দীওয়ান ছিল রাজা রাজ বল্লভ এবং আরেকজন অধস্তন কর্মকর্তা, গকুলচাঁদ। এমনকি রাজধানী মুর্শিদাবাদেও হিন্দু কর্মকর্তাগণের প্রাধান্য ছিল; তাছাড়া সরকারী কর্মকর্তা না হলেও জগৎশেঠ ভ্রাতাগণ অত্যন্ত প্রভাবশালী অবস্থানে আসীন ছিলেন। আলীবর্দী খান তাঁর শাসনামলের শুরুতেই দিওয়ান নিযুক্ত করেছিলেন রাজা চীন রায়কে, তিনি অল্প কয়েক বৎসর পরে মারা

যাওয়ায় বিরু দত্তকে এই পদে নিয়োগ দেয়া হয়। এই শেষোক্ত জনও ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। তখন তিনি এই পদে নিয়োগ দেন প্রয়াত রায় রায়ান আলম চাঁদের পুত্র রাজা কিরাত চাঁদকে। তিনিও ১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। তখন তাঁর নায়েব উমিদ রায় (উমিচাঁদ)কে রায় রায়ান উপাধিসহ দীওয়ান নিযুক্ত করা হয়। একই সময়ে জানকিরামের পুত্র রায় দূর্লভ রামকে সামরিক বিভাগের দীওয়ান নিযুক্ত করা হয়। তিনি বিহারের গভর্ণর রাম নারায়ণের প্রতিনিধি হিসেবেও মুর্শিদাবাদের দরবারে দায়িত্ব পালন করতেন।

এইভাবে দেখা যায় যে, বিহার এবং জাহাঙ্গীর নগরের মত দূরবর্তী প্রদেশসহ রাজধানীরও কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পদ হিন্দু কর্মকর্তা ও হিন্দু অভিজাত শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণে ছিল। স্বভাবতই তাদের অব্যাহত সমর্থনের উপর প্রশাসনের স্থিতিশীলতা নির্ভর করত। এমন কি আলীবর্দী খান শেষ পর্যন্ত তাঁর সকল হিন্দু সমর্থকদের আন্তরিক সমর্থন ধরে রাখতে পারেননি। তাঁর বিভিন্ন অভিযানের ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি জমিদার ও জগৎশেঠদের নিকট থেকে বাধ্যতামূলক ঋণ নিয়েছিলেন, যা তাদের অনেকের মধ্যে বিরক্তি সৃষ্টি করেছিল। ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে মারাঠাদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের পর তাঁর নতুন দীওয়ান কিরাত চাঁদ বর্ধমানের প্রভাবশালী জমিদার (বর্ধমানের রাজা) এবং জগৎশেঠের দ্বারা কিছু আর্থিক অনিয়ম সংঘটনের বিষয় নিরূপণ করেন। তাদেরকে অনিয়ম স্বীকার করা এবং সরকারী কোষাগারে "এক কোটি কয়েক লক্ষ টাকা"[৯৪৩] ফেরত প্রদান করতে বাধ্য করা হয়।

এই ঘটনা তাদের অন্তরে এক গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে এবং তাদেরকে আলীবর্দী খান এবং তার পরিবারের প্রতি বৈরী করে তোলে। কিরাত চাঁদও বেশিদিন বৃদ্ধ নবাব আলীবর্দী খানের প্রতি তাঁর সমর্থন অব্যাহত রাখতে পারেননি। তিনি ১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তার পর উমিচাঁদ দীওয়ান নিযুক্ত হন। এমনকি নিয়োগের সময়ও এই লোকটি নওয়াবের পরিবারের প্রতি আন্তরিকভাবে অনুরক্ত ছিলেন না এবং শীঘ্রই দেখা যাবে যে, তিনি ছিলেন সে ব্যক্তি, যার নিকট থেকে তখনই ইংরেজরা তাদের রাজনৈতিক অভিলাষ পূরণের জন্য সবচেয়ে কার্যকরী সাহায্য আশা করত।

এমনকি মৃত্যুর কারণে আলীবর্দী খানের পরিবারের সদস্য সংখ্যা হ্রাস পায় এবং জীবিতদের মধ্যে মতভেদের কারণে বিভক্তি সৃষ্টি হওয়ায় বাংলায় মুসলিম শাসন এবং তার নিজের জন্যও অধিকতর ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জৈনুদ্দীন

---

[৯৪৩] সিয়ার, ২য় খন্ড, ১১৪-১১৫

আহমদ খান এবং হাজী আহমদের মৃত্যুর পর আলীবর্দী খানের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে জীবিত ছিলেন তাঁর জৈষ্ঠ জামাতা নওয়াজিশ মুহাম্মদ খান, দ্বিতীয় জামাতা সাঈদ আহমদ খান এবং শেষোক্ত ব্যক্তি এবং মৃত জৈনুদ্দীন আহমদ খানের পুত্রগণ। নওয়াজিশ মুহাম্মদ খানের কোন পুত্র-কন্যা ছিল না। তাই তিনি সিরাজুদ্দৌলাহর ছোট ভাই ইকরামুদ্দৌলাহকে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন: কিন্তু ১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে হঠাৎ গুটি বসন্তে আক্রান্ত হয়ে ইকরামুদ্দৌলাহ মারা যান। শোকে দুঃখে মর্মাহত নওয়াজিশ মুহাম্মদ খান পরের বৎসর ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে ইন্তিকাল করেন। এর মাত্র কয়েক মাস পরে ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর (আলীবর্দী খানের) দ্বিতীয় জামাতা সাঈদ আহমদ খানও হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পরলোক গমন করেন। এইভাবে দেখা যায় যে, আলীবর্দী খান যখন তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেন, তখন তাঁর তিন বিধবা কন্যা, দ্বিতীয় এবং কনিষ্ঠ কন্যাদ্বয়ের প্রত্যেকের একজন করে প্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র যথা সিরাজুদ্দৌলাহ ও পূর্ণীয়ার নবাব শওকত জং জীবিত ছিলেন। তাঁর পরিবারের এই জীবিত সদস্যরাও নিজেদের মধ্যে দারুণভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

আলীবর্দী খান ইতিমধ্যেই সিরাজুদ্দৌলাহকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন এবং সিরাজুদ্দৌলাহ নিঃসন্দেহে শওকত জং থেকে অধিক দক্ষ এবং অভিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু এই মনোনয়ন আলীবর্দী খানের জ্যেষ্ঠ কন্যা মেহেরুন্নেসা ওরফে ঘষেটি বেগমের পছন্দ হয়নি। তিনি চেয়েছিলেন তার প্রিয় পুত্র মীর নজর আলী "যিনি তার অন্তর এবং গৃহে একটি স্থান করে নিয়েছিলেন,"[৯৪৪] তার মাধ্যমে মসনদ নিয়ন্ত্রণ করতে। এমনকি আলীবর্দী খানের মৃত্যুর পূর্বেই তিনি "সিরাজুদ্দৌলার বিরুদ্ধে তাঁর জন্য যুদ্ধ করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে বেশ কয়েকজন সেনাপতি ও সৈন্যদের মধ্যে"[৯৪৫] তাঁর ধন-ভাণ্ডার থেকে প্রচুর অর্থ ও স্বর্ণ বিতরণ করেছিলেন। শওকত জংও সিরাজুদ্দৌলার প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণ করতেন না এবং তিনি নিশ্চিতভাবেই ঘষেটি বেগমের দ্বারা উস্কানি পেয়ে থাকবেন। আলীবর্দী খানের অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে মীর জাফর ছিলেন সবচেয়ে অভিজ্ঞ। কিন্তু তার উচ্চাভিলাস এবং বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণ ইতিপূর্বেই ধরা পড়েছিল, এ কারণে কিছু দিন তাকে বিশেষ কোন দায়িত্ব পালন থেকে অব্যাহতি দেয় হয়েছিল। বিহারে আফগানদের বিরুদ্ধে আলীবর্দী খানের অভিযানের পূর্বে আবার তাকে দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়। পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে দেখা যায় যে, মীর জাফর তার রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ পরিত্যাগ করেননি

---

[৯৪৪] সিয়ার, ২য় খন্ড, ১৮৬

[৯৪৫] ঐ পৃঃ ১৮৫

এবং মসনদের জন্য সিরাজুদ্দৌলাহ্ এবং শওকত জংয়ের পিছনে ওঁৎ পেতে ছিলেন। অতএব, আলীবর্দী খানের শাসনের শেষভাগে তাঁর পরিবার প্রভাবশালী মুসলমানদের থেকে আলাদা, তাদের হিন্দু বন্ধুদের থেকেও অনেকটা বিচ্ছিন্ন এবং নিজেদের মধ্যে নৈরাশ্যজনকভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

এই পরিস্থিতি ইউরোপীয়দের বিশেষ করে ইংরেজ ও ফরাসীদের উচ্চাকাঙ্খা পূরণের জন্য ছিল অনুকূল। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা প্রাচ্যে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য একে অপরের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতায় লিপ্ত হয়েছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যে বৎসর আলীবর্দী খান বাংলার মসনদে আরোহণ করেছিলেন, ঠিক সে বৎসরই ইউরোপে অস্ট্রিয়ান উত্তরাধিকার যুদ্ধ (১৭৪০-১৭৪৮) শুরু হয়ে যায়, যে যুদ্ধে এই দুই জাতি পরস্পররের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এই যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে তারা দক্ষিণ ভারতেও সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হয়, যা প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধ নামে অভিহিত হয়। করোমণ্ডল উপকূলের পণ্ডিচেরিতে ছিল ফরাসীদের প্রধান বাণিজ্য কুঠি, আর অধীনস্থ কুঠি ছিল মসলিপটম, কারিকল, মাহে চন্দর নগর (বাংলায়) এবং অন্যান্য কয়েকটি স্থানে।

অপরপক্ষে, ইংরেজদের সদর দপ্তর ছিল মাদ্রাজে, আর গুরুত্বপূর্ণ কুঠি ছিল বোম্বে এবং কলিকাতায়। যুদ্ধ চলাকালে ফরাসী গভর্ণর জেনারেল ডুপ্লে ১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজ অধিকার করেন। মাদ্রাজ পুনরুদ্ধার এবং পণ্ডিচেরী দখল করার জন্য ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের প্রচেষ্টা সফল হয়নি। এই যুদ্ধ দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে । ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে আইলা স্যাপেলের সন্ধির মাধ্যমে ইউরোপীয় যুদ্ধের সমাপ্তি হলে এখানেও যুদ্ধের অবসান ঘটে। সন্ধির শর্তনুসারে ইংরেজদের নিকট মাদ্রাজ প্রত্যার্পণ করা হয়, যা ডুপ্লেকে ক্ষুদ্ধ করে।

আলীবর্দী খানের জন্য সৌভাগ্য ছিল এই যে, ইঙ্গো-ফরাসী যুদ্ধের এই প্রথম পর্যায়টি বাংলা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়নি এবং এর প্রধান কারণ ছিল এই যে, মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত এই পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির রাজনৈতিক দূর্বলতা তখনও যথেষ্ট প্রকাশ পায়নি; এজন্য এবং অন্যান্য কারণেও ইউরোপীয় এই দু'টি জাতি প্রধানত দাক্ষিণাত্য এবং সাধারণভাবে দক্ষিণ ভারতের দিকেই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছিল। আলীবর্দী খান তাঁর পক্ষ হতে তাঁর রাজ্যের মধ্যে নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য জাতি দু'টিকে একে অপরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া থেকে নিষেধ করে দিয়েছিলেন এবং উড়িষ্যার উপকূলের পামিরাসকে নিরপেক্ষতা শুরুর (রক্ষার) জন্য স্থান নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল।[৯৪৬]

---

৯৪৬ ইম্পোরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়া দ্রষ্টব্য, ২৪ তম খন্ড(এটলাস), পামিরাসের স্থান নির্ণয় করার জন্য প্লেট ৩১ সি ৪ দেখা যেতে পারে। নিরপেক্ষতা শুরুর স্থান হিসেবে আলীবর্দী খান কর্তৃক

সাধারণভাবে এই জাতি দুটি তখনও বাংলায় একে অপরের সঙ্গে শান্তি বজায় রেখেছিল এবং তাতে আলীবর্দী খান তাঁর অবস্থানকে সংহত করার কাজে মনোনিবেশ করার সুযোগ পান। স্বাভাবিকভাবেই তিনি তাঁর রাজ্যের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য আগ্রহী ছিলেন; তাই তিনি ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গে ন্যায় সঙ্গত এবং সুবিচারমূলক ব্যবহার করতেন। তাদের প্রদেয় শুল্ক সম্পর্কে তিনি সাধারণত মোগল সম্রাটদের প্রদত্ত শুল্ক-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে নিজে একজন স্বাধীন শাসক হিসেবে তাঁর অবস্থান ও সচেনতা দ্বারাই বেশি পরিচালিত হতেন। ফরাসী প্রতিনিধি এম, জীন ল' লিখেছেন যে, তিনি তাঁর কর্তৃত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন, "বিশেষ করে যখনই তাঁর নিজের এবং ইউরোপীয়ানদের মধ্যে কোন বিষয় নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠতো, তখনই তিনি ব্যাপক স্বাধীনতা প্রয়োগ করতেন। তাঁর কাছে সম্রাটের নিকট থেকে প্রাপ্ত ফরমান বা সুবিধার কথা উপস্থাপন করা হলে তিনি তাতে ক্ষেপে যেতেন। তিনি (আলীবর্দী খান) ভালভাবেই জানতেন যে, ''কখন কিভাবে নিজেকে রাজা বা উজির উভয়ভাবে পরিচয় দেয়া যাবে।" সম্ভবত তাঁর এই মনোভাব থেকেই এই বিষয়ে ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে যে, তিনি মাঝে মধ্যে ইউরোপীয় বণিকদের নিকট হতে তাদের ব্যাপক বিস্তৃত বাণিজ্যের উপর মোটামুটি নিয়মিত শুল্ক হিসেবে অর্থ দাবী করতেন। পুনঃ পুনঃ মারাঠাদের আক্রমণ এবং এর ফলে তাঁর উপর আর্থিক চাপের কারণেই তিনি যেমন ইউরোপিয় বণিকদের নিকট থেকে, তেমনি স্থানীয় জমিদারদের নিকট থেকেও কোন কোন সময় অনুদান হিসেবে অর্থ দাবী করতেন।

যদিও প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধের সময় বাংলায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্পর্কে আলীবর্দী খানের আরোপিত শর্তাবলী ইংরেজ এবং ফরাসীরা মেনে নিয়েছিল, কিন্তু তবু তারা মীর হাবিব ও মারাঠাদের আক্রমণের সময় আলীবর্দী খানের ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে তাদের অবৈধ বাণিজ্যিক কার্যক্রম ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করে। ইংরেজরা কলিকাতায় তাদের সামরিক শক্তিকে বৃদ্ধি করার জন্য দূর্গের সম্প্রসারণ করে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে আলীবর্দী খান যখন মারাঠাদের দ্বৈত আক্রমণ (একদিকে রঘুজী ভোঁসলার আক্রমণ, অন্যদিকে পেশোয়া বালাজী রাওয়ের আক্রমণ) মোকাবেলা করছিলেন, তখন ইংরেজরা কলিকাতায় তাদের দূর্গের চতুর্দিকে মারাঠা পরীখা খনন করে। ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে যখন আলীবর্দী খান মারাঠাদের আক্রমণের চাপ থেকে তুলনামূলকভাবে একটু মুক্ত হলেন, তখন তিনি ইউরোপীয় বণিকদের দিকে

উড়িষ্যার মধ্যবর্তী স্থান নির্ধারণ করার কারণ হল এই যে, প্রদেশটি তখন ও তাঁর নিয়ন্ত্রণে আসেনি। সরফরাজ খানের অনুসারীরা তখনও প্রদেশটি তাদের অধীনে রেখেছিল।

মনোযোগ দেন এবং তাদের বাণিজ্যের কারণে তাদের নিকট থেকে পাওনা বকেয়া টাকা পরিশোধ করার দাবী জানান। তিনি সে সময় মারাঠাদের সাহায্য করার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে অভিযোগও উত্থাপন করেন। এই অভিযোগ সম্পর্কে আর কোন বিবরণ পাওয়া যায়নি। তবে স্পষ্টতই আলীবর্দী খান ইংরেজদের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। আলীবর্দী খানের ভ্রাতস্পুত্রদের সমর্থন নিয়ে তাঁর আফগান সেনাপতি মোস্তফা খান বাংলা থেকে ইংরেজদের বহিস্কার করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন।[৯৪৭] এই ধরণের প্রস্তাব গ্রহণের বিপদ ছাড়াও আলীবর্দী খানের জন্য আরও অনেক সমস্যা বিরাজ করছিল। মোস্তফা খানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তার মনে সন্দেহ ছিল। বর্ণিত আছে যে, আলীবর্দী খান তাঁর ভ্রাতুস্পুত্রদেরকে বলেছিলেনঃ [৯৪৮]

''প্রিয় বৎসগণ, মোস্তফা খান একজন ভাগ্যান্বেষী সৈন্য এবং মাসিক বেতনে নিয়োজিত একজন লোক, যে তার তরবারীর দ্বারাই জীবিকা অর্জন করে; অবশ্য সে চায় অবস্থা এমন হোক যে, আমি যেন সব সময়ই তাকে নিয়োজিত রাখি এবং তার কাছে এমন কিছু থাকুক, সে যেন তার নিজের জন্য এবং তার বন্ধুদের জন্য অনুগ্রহ দাবী করতে পারে; এটি একটি সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের ব্যাপার। কিন্তু তোমাদের নিজেদের কি হলো? তোমরা কেন তার সঙ্গে একমত হবে এবং কোন বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে যৌথভাবে অগ্রসর হবে? ইংরেজরা আমার কি ক্ষতি করেছে, আমি কেন তাদের বিষয়ে খারাপ চিন্তা করব? তোমাদের সামনের ঐ তৃণ আচ্ছাদিত মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখো; তোমরা কি সেখানে অগ্নি সংযোগ করবে? তাহলে আর তা স্থিমিত হবে না; তাহলে এমন ব্যক্তি কে আছে যে, একবার সাগরে আগুন জ্বলে উঠলে তা নিভাতে পারবে এবং তখন কি হবে যখন সেখান থেকে তা ডাঙ্গায় উঠে আসবে? আবার এই ধরণের প্রস্তাবের প্রতি কর্ণপাতের আগে সতর্ক হও, কারণ তাতে অকল্যাণ ছাড়া কোন কল্যাণ হবে না।"

যদিও আলীবর্দী খান ইংরেজদের প্রতি বিরক্ত ছিলেন, তথাপি তাদের নৌ-শক্তির বিবেচনায় তাদের সঙ্গে সংঘর্ষের পরিণতি সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। অবশ্য ইংরেজদের উদ্যোগে জগৎ শেঠ, রায় রায়ান চিন রায় এবং আলীবর্দী খানের দ্বিতীয় ভ্রাতুস্পুত্র সাঈদ আহমদ খানের মধ্যস্থতায় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে

---

৯৪৭ সিয়ার ২য় খন্ড, পৃঃ ১৬৭। সিয়ার এই ঘটনার তারিখ উল্লেখ করেনি। তবে যেহেতু মোস্তফা খান আলীবর্দী খানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন এবং ১৭৪৫ সালে তাঁর অধিনে চাকুরী ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। তাই এই ঘটনা অবশ্যই ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দের কোন এক সময় ঘটে থাকবে।

৯৪৮ সিয়ার, ২য় খন্ড, ১৬৩-১৬৪

তাদের মতভেদসমূহ নিষ্পত্তি করা হয়। ইংরেজদের নথিপত্র থেকে দেখা যায় যে, নওয়াবের দাবী পূরণের জন্য তাকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা প্রদান করে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ফরাসী এবং ওলন্দাজরাও দাবী অনুযায়ী "তাদের অংশ" প্রদান করে।[৯৪৯]

প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধের শেষের দিকে আরেকবার ইংরেজদের সঙ্গে নওয়াবের সম্পর্কের টানা-পোড়েন সৃষ্টি হয়। ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে তারা খামখেয়ালী করে আর্মেনীয়দের কয়েকটি জাহাজ আটক করে। তখন আলীবর্দী খান কড়া ভাষায় একটি পরোয়ানা জারী করে ইংরেজদেরকে জাহাজগুলো ফেরত প্রদান এবং এজন্য আর্মেনীয়দের যে ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণ করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দেন। তিনি একাধিক পরোয়ানা জারী করেন এবং অন্যদিকে, ইংরেজদের বিভিন্ন কুঠির বিরুদ্ধে সৈন্যও প্রেরণ করেন। নওয়াবের এই দৃঢ় মনোভাব দেখতে পেয়ে ইংরেজরা আর্মেনীয় বণিকদেরকে সন্তুষ্ট করতে বাধ্য হয়।

১৭৪৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজ ও ফরাসীরা দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকে, যদিও ইউরোপে তাদের মধ্যে শান্তি বজায় ছিল। এই দ্বিতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ ছিল স্পষ্টত উপমহাদেশে তাদের উচ্চ রাজনৈতিক অভিলাষেরই ফল। তাদের সংঘর্ষের এই পর্যায়ে তাদের উভয়ের যা কৌশল ছিল, তা হচ্ছে কর্ণাটক ও হায়দারাবাদের মসনদে তাদের নিজেদের মনোনীত ব্যক্তিকে বসিয়ে তাদের মাধ্যমে এই অঞ্চলগুলোর ক্ষমতা কব্জা করা। কিছু সময় পর্যন্ত ডুপ্লে ফরাসীদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে এবং তার মনোনীত মোজাফফর জং এবং চাঁদ সাহেবকে যথাক্রমে হায়দরাবাদ এবং কর্নাটকের মসনদে বসাতে সমর্থ হন। এই সময় দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের প্রভাব ছিল অত্যন্ত প্রবল। অবশ্য ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ কর্তৃক হঠাৎ কর্ণাটকের রাজধানী আর্কট আক্রমণ ও অধিকার করায় ইংরেজদের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। পরের বৎসর স্টিংগর লরেন্স কর্তৃক ট্রিচিনপলি অবরোধ করায় তাদের অবস্থার আরো উন্নতি হয়। এসব পরাজয়ে ডুপ্লের ব্যর্থতা প্রকাশ পাওয়ায় তার কর্তৃপক্ষ তাকে দেশে ডেকে পাঠান। নতুন ফরাসী গভর্ণর জেনারেল গডু ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের সঙ্গে একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদন করে শত্রুতার অবসান ঘটান। এভাবে দ্বিতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ শেষ হয় এবং ইংরেজদের অবস্থার পরিবর্তনের নিশ্চিত আভাস পাওয়া যায়। হায়দারাবাদ এবং উত্তরাঞ্চলে ফরাসীদের শক্তিশালী অবস্থা অব্যাহত থাকে।

---

[৯৪৯] কোর্ট প্রেরিত পত্র, ৮ নভেম্বর, ১৭৪৪ খ্রিঃ

বর্ণিত আছে যে, "দাক্ষিণাত্য এবং করমণ্ডল উপকূলে ইংরেজ এবং ফরাসী জাতিদ্বয়ের এই অগ্রগতিতে আলীবর্দী খান বিস্ময় এবং ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কারণ, তিনি তার নিয়োজিত গোয়েন্দার মাধ্যমে সেখানে সংঘটিত প্রতিটি ঘটনা সম্পর্কেই অবহিত ছিলেন। তিনি ভয় করতেন যে, আগে হোক বা পরে হোক, ইউরোপীয়রা তাঁর সরকারের বিরুদ্ধেও অনুরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।"[৯৫০] তাঁর ভয় যুক্তিসঙ্গত ছিল; কারণ, দ্বিতীয় কর্ণাটক যুদ্ধের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং দক্ষিণ ভারতে ফরাসীদের শ্রেষ্ঠতর অবস্থানের কারণে ইংরেজরা বাংলার ক্ষেত্রেও একই কৌশল প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং বাংলায় ফরাসীদের আধিপত্য প্রতিহত করতে ইংরেজরা তাদের নিজেদের মনোনীত কাউকে মসনদে (বাংলার মসনদে) বসাতে চেষ্টা করে। এ উদ্দেশ্যে তারা যে পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তা হচ্ছে দ্বিতীয় কর্ণাটক যুদ্ধের শেষের দিকে দাক্ষিণাত্যে তাদের অবস্থার উন্নতি হওয়ায় তারা তাদের কলিকাতা দূর্গের সম্প্রসারণ করে। অনেকে বলেছেন যে, "ফরাসীদের হুমকির" মুখে দূর্গের সম্প্রসারণ ছিল আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা; কিন্তু এ কথা পুরোপুরি ঠিক নয়, কারণ এ পর্যন্ত ইঙ্গ-ফরাসীদের দ্বন্দ্ব উপমহাদেশের দাক্ষিণাত্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং তা অবিলম্বে বাংলা পর্যন্ত সম্প্রসারণের কোন সম্ভাবনা ছিল না। এই দুই জাতির মধ্যে ইউরোপেও তখন শান্তি বিরাজমান ছিল।

পরে দেখা যাবে যে, পরবর্তী পর্যায়ে যখন ফরাসীদের সঙ্গে নতুন করে সংঘর্ষের হুমকি সৃষ্টি হয়, তখনও ইংরেজ কুঠিয়ালদের অভিমত ছিল এই যে, দাক্ষিণাত্যই হবে সংঘর্ষের ক্ষেত্র। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী (১৭৫৬-১৭৬৩) এই দুই জাতি পরস্পরের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, সে যুদ্ধের খবর ১৭৫৭ সালের ফেব্রুয়ারীর আগে বাংলায় এসে পৌঁছেনি। এর অন্ততঃ তিন বৎসর পূর্বেই কলিকাতা দূর্গের সুদৃঢ়করণের কাজ হাতে নেয়া হয়। ফরাসীদের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করাই এর উদ্দেশ্য ছিলনা, এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইংরেজরা নিজেরাই নথিভুক্ত করেছেন যে, তাদের অনুকূলে "একটি বিপ্লব" ঘটানোই ছিল লক্ষ্য। এইভাবে দূর্গ সুদৃঢ়করণের পিছনে ফরাসীদের সম্পর্কে যদি আদৌ কোন চিন্তা থেকে থাকে, তাহলে তা ছিল এই যে, এর মাধ্যমে তাদের (ইংরেজদের) অবস্থানকে শক্তিশালী করে প্রয়োজন হলে সহজেই ফরাসীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করা যাবে। কলিকাতায় ইংরেজদের দূর্গ সুদৃঢ়করণের পদক্ষেপটি ফরাসীদের সম্ভাব্য হামলা থেকে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা তো ছিলই না, বরং এটা ছিল ঠিক তার বিপরীত একটি পদক্ষেপ, একটি সামরিক এবং রাজনৈতিক অভিযানের জন্য প্রস্তুতি মাত্র।

---

[৯৫০] মেময়র অব জিন ল' হিল, ৩য় খন্ড (১৬২-১৬৩ পৃঃ)

ইংরেজদের এই পদক্ষেপটি অবশ্য তাদের দিক থেকে ছিল একটি সময়োপযোগী এবং বুদ্ধিমানের কাজ: কারণ সে সময় নওয়াব আলীবর্দী খান ছিলেন বয়সে ভারাক্রান্ত এবং তিনি আর বেশিদিন বাঁচবেন বলে আশা করা যেত না। তাঁর পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও মতভেদের লক্ষণ ছিল সুস্পষ্ট, তাতে তাঁর মৃত্যুর পরে একটি সম্ভাব্য উত্তরাধিকার যুদ্ধেরই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল। ইংরেজরা এখন একটি সম্পদশালী ও সুচতুর ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে বানিয়া এবং শেঠদের সমর্থন ও সহযোগিতা পাওয়ার বিষয়ও হিসেবে ধরতে পারতো, যা ছিল দক্ষিণ ভারতে অনুপস্থিত। এই শ্রেণীর লোকদের উদ্ভবের কারণ হচ্ছে প্রায় শতাব্দীকালব্যাপী বাংলায় ইউরোপীয় কোম্পানীগুলোর বাণিজ্যিক কারবার পরিচালনা করা। এই সময় কিছু সংখ্যক হিন্দু পরিবার ইউরোপীয় কোম্পানীসমূহের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে বা অন্য কোনভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করে সম্পদশালী এবং প্রভাবশালী হয়ে উঠে। তাদের কেউ কেউ ব্যাংকার এবং রাজস্ব প্রশাসক হিসেবে ক্ষমতাশালী এবং বিখ্যাত হয়ে উঠেন। শীঘ্রই তারা দেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এইভাবে তারা মুর্শিদ কুলী খানের মৃত্যুর প্রাক্কালে তাঁর মনোনীত এবং দৌহিত্র সরফরাজ খানের উত্তরাধিকারী হিসেবে মসনদে আরোহণের বিরোধিতা করেছিলেন বলে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

কারণ তারা তাকে তাদের স্বার্থের অনুকূলে নয় বলেই মনে করেছিলেন। তার পরিবর্তে তারা সফলভাবে তার পিতা শুজাউদ্দীন খানের প্রতি সমর্থন দিয়েছিলেন। তাঁর শাসনামলে স্বভাবতই বাণিয়া এবং শেঠগণ দরবারের প্রধান উপদলে পরিণত হয় এবং তাদের নেতা আলম চাঁদ এবং জগৎশেঠই দেশের সত্যিকার শাসকে পরিণত হন। শুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পরে এই উপদলটি বাংলার মসনদ দখল করার জন্য আলীবর্দী খানকে সাহায্য করে এবং তিনি তার শাসনামলের শেষের দিকে তাদের উপর খুব বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। তখন তাদের যে অবস্থান ও প্রভাব ছিল, তা স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে আরও বেশি রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা সৃষ্টি করে থাকবে। কারণ ব্রিজেন কে গুপ্ত উল্লেখ করেছেন যে, তখন সারা ভারতব্যাপী হিন্দু পুনর্জাগরণের একটি ভাব সৃষ্টি হয়েছিল।[৯৫১] একই সময়ে শুরু হয়েছিল মোগল সাম্রাজ্যের ভাঙ্গণ এবং মারাঠা ও শিখদের উত্থান। এইরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বাংলার স্বচ্ছল এবং হিন্দু বণিক সম্প্রদায়

---

৯৫১ ব্রিজেন কে গুপ্ত, সিরাজুদ্দৌলাহ এন্ড দ্যা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, ১৭৫৬-১৭৫৭ লিডেন, ১৯৬২ পৃঃ ৩০

এই চেতনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল না। তবে সরাসরি প্রদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণ করার জন্য তাদের মধ্যে মারাঠা ও শিখদের মতো সামরিক গুণাবলী ছিল না। অতএব, স্বাভাবিকভাবেই তারা দেশের রাজনীতিতে নিজেদের অবস্থানকে আরো এগিয়ে নেয়ার জন্য পরোক্ষ পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে থাকবেন। তাদের সৌভাগ্য ছিল এই যে, সে সময় ইংরেজরা বাংলায় তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থের সঙ্গে রাজনৈতিক উচ্চাকাংখাকে যুক্ত করে একটি অগ্রগামী নীতি (Forward policy) গ্রহণ করেছিল। কতগুলো কারণে এই হিন্দু উপদলটির সঙ্গে তাদের সমঝোতা প্রতিষ্ঠা সহজ হয়। ইংরেজরা বাংলায় প্রায় একচেটিয়াভাবে হিন্দু এজেন্ট এবং ঠিকাদারদের সাহায্য নিয়ে তাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালিয়ে আসছিল।[৯৭২] শতাব্দীব্যাপী এইরূপ সহযোগিতা শুধু এই বণিক শ্রেণীর উত্থানকেই সাহায্য করেনি, বরং তাদের উভয় শ্রেণীর মধ্যে কতগুলো অভিন্ন স্বার্থের ক্ষেত্রও প্রস্তুত করে। তারা ছিল একে অপরের স্বাভাবিক মিত্র এবং তাদের যে কারও পক্ষে কোন তৃতীয় পক্ষ, যথা নওয়াবের বিরুদ্ধে তাদের উভয়েই মিত্র হিসেবে পরস্পর হাত মিলানোর সম্ভাবনা ছিল। তদুপরি শেঠ ও বাণিয়ার দল পুরোপুরি উপলব্দি করে যে, বাংলায় ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে এবং এর ফলশ্রুতিতে কোম্পানীর বাণিজ্যিক কারবার বিস্তৃত হলে, তা তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থের জন্য অনুকূলই হবে। তারা এই বিষয়টিও উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, একজন মুসলমান নওয়াবের চেয়ে ইংরেজদের বাণিজ্যিক স্বার্থ এবং স্থানীয় সমর্থনের প্রয়োজনে কোম্পানী বাণিয়াদের উপর বেশি নির্ভরশীল থাকবে। এইভাবে তাদের রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক স্বার্থে বাণিয়া এবং শেঠরা ইংরেজদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের জন্য প্রস্তুত ছিল।

এই হিন্দু উপদলের সাথে মৈত্রী স্থাপনের এইরূপ সুবিধা এবং তাদের সাহায্যে বাংলার রাজনৈতিক মসনদ দখলের সম্ভাবনাকে সামনে রেখেই ১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা কলিকাতার দূর্গ সুদৃঢ় করার প্রকল্পের প্রণেতা চার্লস এফ নোবল এবং কর্ণেল স্কটের সেক্রেটারী আমাদেরকে নিম্নোক্ত বিষয় জানিয়েছেন :

---

[৯৭২] ১৭৩৬-৪০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজরা ৫২ জন স্থানীয় বণিকের মাধ্যমে কলিকাতায় তাদের বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে, তাদের সকলেই ছিলেন হিন্দু। কোম্পানী কাশিমবাজারে ২৫ জন ব্যবসায়ীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল . তারাও সকলে হিন্দু ছিলেন। শুধুমাত্র ঢাকায় এইরূপ ১২ জন বণিকের মধ্যে মাত্র ২ জন ছিলেন মুসলমান- বেঙ্গল পাব, কনসাল্ট, ৬ জুলাইয়ের ১৭৩৬ এবং ১৫ ডিসেম্বর, ১৭৪০ : কাশিমবাজার ফ্যাক্টরী রেকর্ড, ৪র্থ খন্ড, ৩১ জানুয়ারী, ১৭৭৯, এবং ঢাকা ফ্যাক্টরী রেকর্ডস, ২য় খন্ড, ১২ এপ্রিল, ১৭৩৯, এই সবগুলো এ, আর মল্লিকের বৃটিশ পলিসি এন্ড দি মুসলিমস্ ইন বেঙ্গল গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হয়েছে। ঢাকা, ১৯৬১পৃ.৬২

কর্ণেল স্কট বুঝেছেন যে. বৃদ্ধ নওয়াবের মৃত্যুর পরে মসনদ নিয়ে ভদ্রলোক. তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং দৌহিত্রদের মধ্যে বিবাদ শুরু হবে. তিনি তাদের উচ্চাভিলাষ সম্পর্কে ইতিমধ্যে টের পেয়েছেন। কর্ণেল স্কট দেখতে পেয়েছেন যে. বাংলার জেন্টু (হিন্দু) রাজা এবং অধিবাসিগণ মুর (মুসলমান) সরকারের প্রতি অত্যধিক অসন্তুষ্ট এবং তারা গোপনে গোপনে পরিবর্তন চায় এবং স্বৈরাচারী শাসকদের বশ্যতা ছুড়ে ফেলে দেয়ার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। তিনি এই মত পোষণ করেন যে. যদি কোন ইউরোপীয় শক্তি সফলতার সঙ্গে শুরু (বিপ্লব) করতে পারে এবং তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করে এবং তাদেরকে উৎসাহ দেয়. তাহলে তারা (হিন্দুরা) তাদের সঙ্গে যোগ দিতে রাজী হবে। তবে প্রথম এই ভেবে একটু সতর্ক হতে পারে যে. প্রথম তারা কিরূপ আচরণ করে এবং কতটুকু সফলভাবে তাদের জন্য অনুকূল একটি বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হয়।

আমি উমি চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছি; তিনি বাংলায় আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি, যদি তার সেরূপ মন থাকে..। নিমো (নিমু) গোসাই নামে হিন্দুদের একজন বড় পুরোহিত আছেন, হিন্দু রাজন্যবর্গ এবং একটি বিশেষ শ্রেণী ও বর্ণের লোকদের উপর তার রয়েছে বিরাট প্রভাব. এই ফকীর বা ধর্মীয় ভিক্ষুক সম্প্রদায়ের লোকেরা স্বশস্ত্র অবস্থায় দলবদ্ধ হয়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায়; যদি তাদেরকে আমাদের স্বার্থ উদ্ধারের কাজে নিয়োগ করা যায়, তাহলে তারা সম্ভবত আমাদের কাজে আসবে এবং নিমু গোসাইয়ের মাধ্যমে তা করা যাবে বলে বিশ্বাস করার জন্য আমার কাছে বিশেষ যুক্তি আছে।

এই পুরোহিত কর্ণেল স্কটকে অনেক ভাল ভাল তথ্য এবং দেশের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অনেক পরামর্শও দিয়েছে। সে তাকে আরো বলেছে যে, প্রয়োজনের মুহূর্তে মাত্র ৪ দিনের মধ্যে ইংরেজদেরকে সাহায্য করার জন্য এক হাজার লোক এনে উপস্থিত করাতে পারবে। কর্ণের্ল তার জীবিতকালে তাকে কিছু উপকার করেছেন এবং আমি বলতে পারি যে, আজও তার স্মরণ শক্তির প্রতি তার শ্রদ্ধা আছে। উপরের বিবরণ থেকে তিনটি জিনিষ স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

প্রথম- কলিকাতার দুর্গ দৃঢ়করণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল আলীবর্দী খানের বৃদ্ধাবস্থায় এবং মসনদের উত্তরাধিকারের প্রশ্নে বিভেদ আসন্ন মনে হওয়ায় ইংরেজদের সামরিক অবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য।

দ্বিতীয়ত- যে সকল হিন্দু রাজা ও অধিবাসিদের সম্পর্কে এই ধারণা করা হয়েছিল যে, তারা সরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তাদের সাহায্য নিয়ে ইংরেজরা বাংলার ক্ষমতা দখল করতে পারবে, স্পষ্টতই তারা হচ্ছে- জগৎ শেঠ এবং বর্ধমানের রাজার নেতৃত্বে পরিচালিত দল।

তৃতীয়ত- কর্ণেল স্কট ইতোমধ্যে সম্ভবত তাদের কয়েকজনের বিশেষ করে নিমু গোসাই নামক একজন হিন্দু পুরোহিত এবং উমি চাঁদের সংস্পর্শে এসে থাকবেন। কর্ণেল স্কট নিমু গোসাইর জন্য কিছু কাজ করে দিয়েছিলেন, যে কারণে সেও প্রয়োজনের সময় ১০০০ সশস্ত্র লোক নিয়ে ইংরেজদেরকে সাহায্য করতে তার ইচ্ছা সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

কলিকাতার দুর্গ সুদৃঢ়করণের যৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্য পরবর্তীকালে কথিত ফরাসী হুমকীর বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে। আসলে ১৭৫৪ সালে যখন ঐ সুদৃঢ়করণের কাজ শুরু করা হয়, তখন তা আদৌ কোন বিবেচ্য বিষয় ছিল না। এমন কি বিলাতের কোর্ট অব ডিরেক্টরগণকে জানানো হয়েছিল যে, "দেশীয় সৈন্যদের আক্রমণ থেকে" উপনিবেশের নিরাপত্তা বিধানের জন্য কলিকাতার দুর্গ সম্প্রসারণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।[৯৫৩] কোর্টের পক্ষ থেকে নওয়াবের সম্মতি বা অন্ততপক্ষে পরোক্ষ সমর্থন নিয়ে সম্প্রসারণের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয় এবং সম্মতি আদায় করার জন্য ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকার অনুমোদনও দেয়া হয়।[৯৫৪]

বাংলার ইংরেজ কুঠিয়ালগণ অবশ্য দুর্গের সম্প্রসারণ কাজ চালিয়ে যেতে থাকে এবং এ সম্পর্কে নওয়াবকে জানতেও দেয়নি। তারা নিজেরা নিশ্চিত ছিল যে, নওয়াব আলীবর্দী খান "আমাদের দ্বারা কলিকাতা সুরক্ষিত করার বিষয়টি খেয়ালই করবেন না।"[৯৫৫] কাসিম বাজার কুঠির প্রধান এবং নওয়াবের দরবারে ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলের প্রতিনিধি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, "কলিকাতাকে সুরক্ষিত করার পূর্বে সেজন্য নওয়াবের নিকট আবেদন করা হবে" আমাদের জন্য একেবারেই অনুচিত। কারণ, নওয়াব যদি আমাদেরকে এ কাজ করতে অনুমতি দিতে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেন, তাহলে দুর্গ সম্প্রসারণ করার সকল চিন্তা

---

৯৫৩ ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলের প্রতি কোর্ট অব ডিরেক্টরস, ২৪ নভেম্বর, ১৭৫৪ উইলসন। দি ইণ্ডিয়ান রেকর্ডস: ওল্ড ফোর্ট উইলিয়াম ইন বেঙ্গল, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৫

৯৫৪ ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলের প্রতি কোর্ট অব ডিরেক্টরস, ২৪ নভেম্বর, ১৭৫৪ উইলসন। দি ইণ্ডিয়ান রেকর্ডস: ওল্ড ফোর্ট উইলিয়াম ইন বেঙ্গল, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৮-২০

৯৫৫ ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলের প্রতি কোর্ট অব ডিরেক্টরস, ১৫ই আগস্ট, ১৭৫৫ উইলসন পূর্বোক্ত পৃঃ ২৮

আমাদেরকে ত্যাগ করতে হবে অথবা তা করতে হবে তাকে অমান্য করে।"[৯৫৬] নওয়াবের অনুমতি নেয়া হয়েছে কিনা তা অবশ্য কোর্ট অব ডিরেক্টরসকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়নি বরং তাদের নির্দেশের প্রতি যথাযথ সম্মান দেখানো হবে বলে জওয়াব দিয়ে বিষয়টি তাদের নিকট থেকে এড়িয়ে যাওয়া হয়।[৯৫৭] কোর্টের নিকট প্রেরিত একই পত্রে ২৮ শে সেপ্টেম্বর, ১৭৫৫, খ্রিস্টাব্দে বাংলার কুঠিয়ালগণ পুনরুল্লেখ করেন যে, "এক দেশী শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার জন্য দুর্গের সম্প্রসারণ কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।"[৯৫৮] উল্লেখযোগ্য যে, ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিল "এক দেশী শত্রুর" আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ সম্প্রসারণ করার যে যুক্তি প্রদর্শন করেছে, তা হচ্ছে তাদের আশংকা অনুযায়ী মসনদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী কোন একজন বা অন্য আরেকজন।"[৯৫৯] এ থেকে তাদের রাজনৈতিক অভিসন্ধি প্রকাশ হয়ে পড়ে; কারণ এর পূর্বে কখনো মসনদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের কেউ কখনো কোন বিদেশীদের কুঠিতে আক্রমণ চালায়নি। অতএব, কুঠিয়ালদের দেখানো অজুহাতের ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, আসন্ন বিরোধে তারা কোন একটি পক্ষ অবলম্বন করার জন্য ইচ্ছা করছিল। সে যাই হোক, কয়েক মাসের মধ্যে দুর্গের কাজ অনেকখানি এগিয়ে যায় এবং ২১ ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৬ ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিল তাদের প্রভুদেরকে জানাতে সক্ষম হয় যে, "পেরিনস কর্ণারের" দুর্গ প্রকারের কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়েছে।[৯৬০]

তাদের কথিত "দেশীয় শত্রুকে" প্রতিরোধ করার জন্য এই গোপন প্রস্তুতিসহ কলিকাতার চতুস্পার্শ্বে তাদের জমিদারী এলাকায় তারা বাস্তব অর্থেই তাদের সার্বভৌম অধিকার প্রয়োগ করে।[৯৬১] এর উদাহরণ বা ফলস্বরূপ তারা

---

৯৫৬ ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলের প্রতি কোর্ট অব ডিরেক্টরস, ১৫ই আগস্ট, ১৭৫৫ উইলসন পূর্বোক্ত পৃঃ ২৮

৯৫৭ ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলের প্রতি কোর্ট অব ডিরেক্টরস, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৭৫৫ উইলসন পূর্বোক্ত পৃঃ ৩১

৯৫৮ ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলের প্রতি কোর্ট অব ডিরেক্টরস, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৭৫৫ উইলসন পূর্বোক্ত পৃঃ ৩১

৯৫৯ সিলেক্ট কমিটির নিকট চার্লস এফ নোবলের পত্র, ফোর্ট সেন্ট জর্জ, ২ শে সেপ্টেম্বর, ১৭৫৬, হিল ৩য় খন্ড ৩২৬

৯৬০ ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিল টু কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ ২১ ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৬ উইলসন পূর্বোক্ত পৃঃ ৪৪

৯৬১ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাৎসরিক ১১৯৫.০০ টকা খাজনা দেয়ার শর্তে কলিকাতা সুতানটি ও গোবিন্দপুর নামক তিনটি গ্রামের জমিদারী অধিকার লাভ করে। যদিও নওয়াব মুর্শিদ কুলী খান তাদের জমিদারী এলাকা আর সম্প্রসারণ করার অনুমতি দেননি, কিন্তু কোম্পানী চুপিসারে তাদের হিন্দু কর্মচারীদের নামে বহু সংখ্যক গ্রাম ক্রয় করে । এই সম্পর্কে নওয়াব অনবহিত ছিলেন না। তাই ক্রয়কৃত গ্রামসমূহ হতে কোম্পানী যে পরিমাণ কর আদায় করত, সে অনুসারে তাদের নিকট থেকেও বর্ধিত কর দাবি করেন। ইংরেজরা

তাদের এলাকায় নওয়াবের আইনের আওতা থেকে পলাতক বা তার সুবিদিত শত্রুকে আশ্রয় দিতে থাকে এবং তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এদের সকলেই ছিল হিন্দু। এইভাবে ১৭৫১ সালে কাউন্সিল কলিকাতার জনৈক রামকৃষ্ণ শেঠকে আশ্রয় দেয়, তার বিরুদ্ধে চোরাচালানের অভিযোগ ছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিল তাকে হস্তান্তরের জন্য নওয়াবের আদেশ অমান্য করে। অনুরূপভাবে ১৭৫৫ এবং ১৭৫৬ সালে তারা লক্ষ্মী, রাধানাথ, গোঁসাই সেন এবং সচের সম্পত্তির উপর নওয়াবের আইনগত দাবীকে বাধাগ্রস্থ করে; তাদের কেউ মারা যাওয়ার সময় উইল করে যাননি এবং তাদের কোন উত্তরাধিকারী ছিল না।[৯৬২] একই সময়ে কলিকাতা কাউন্সিল এরূপ অবাধ্য মনোভাবসহ তাদের প্রদত্ত বাণিজ্যিক সুবিধার ব্যাপক অপব্যবহার শুরু করে। বিশেষ করে তারা কোম্পানীর জন্য খাস করে মঞ্জুরীকৃত দস্তক বা বাণিজ্যিক অনুমতি পত্র নিয়ে ব্যাপকভাবে অবৈধ বাণিজ্য পরিচালনা শুরু করে। যারা ব্যক্তিগত ভাবে বাণিজ্য করত তাদের নিকট তারা এই দস্তক বিক্রি করে নওয়াবকে বিরাট অংকের রাজস্ব থেকে বঞ্চিত করত।

নওয়াব আলীবর্দী খান ইংরেজদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন না। তিনি তাদের কলিকাতার দুর্গের সম্প্রসারণ কাজ সম্পর্কেও জানতে পেরেছিলেন। তাঁর অত্যাধিক অসুস্থতা এবং একই সময়ে একে একে ইকরামুদ্দৌলাহ, নওয়াজিশ মোহাম্মদ খান এবং সাঈদ আহমদের মৃত্যুতে দুঃখক্লিষ্ট থাকায় তিনি তাদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে পারেননি। তাঁর সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী সিরাজুদ্দৌলাহ অবশ্য নওয়াবের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং ইংরেজদের ফন্দি নস্যাৎ করে দিতে কৃত সংকল্প ছিলেন। তাঁর এই মনোভাব স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে ইংরেজদের নিকট অপ্রিয় করে তুলেছিল, তারা এখন তাঁর সিংহাসন আরোহণকে প্রতিহত করার জন্য এবং তাদের নিজস্ব মনোনীত কাউকে মসনদে আসীন করার জন্য চূড়ান্তভাবে সংকল্পবদ্ধ হয়। এইভাবে তারা আলীবর্দী খানের মৃত্যুর পূর্বেই নওয়াবীর জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী দাবীদারদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হতে শুরু করে, বিশেষ করে ঘষেটি বেগমের সাথে, তার প্রতি সমর্থন ছিল ঢাকার

তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে১৭২৬, ১৭৩৬ এবং ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে ৮ ২০,০০০.০০, ৮ ৫৫,০০০.০০ এবং ৮ ৮৫,০০০.০০ দিয়ে নওয়াবের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে। কোম্পানী গ্রামগুলো থেকে ১৭১৭ সালে প্রকৃতপক্ষে আদায় করে ৮ ১১,০৭১.০০/- ১৭৫৪ সালি তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়য় ৮ ১০৭,১৩১.০০ টাকায়। (ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, এ স্ট্যাটেস্টিক্যাল একাউন্ট অব বেঙ্গল, ১ম খন্ড, পৃঃ ২০ আর গুপ্ত, পূর্বোক্ত পৃঃ ৯-১০)

[৯৬২] গুপ্ত, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৩৮-৩৯

রাজস্ব প্রশাসক প্রভাবশালী রাজা রাজ বল্লভের। ইংরেজদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কাশিমবাজারের ফরাসী কুঠির প্রধান এম. জীন ল নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়েছেন[৯৬৩]:

আলীবর্দী খানের শেষবারের অসুস্থতার সময় সুবাদারীর দাবীদার উল্লেখযোগ্য দুটি দল ছিল এবং তারা বিভক্ত হলেও মনে হত যে, সিরাজুদ্দৌলাহকে উৎখাতের জন্য তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। একদল ছিল নওাজিশ মোহাম্মদ খানের বিধবা স্ত্রীর, তার পরিকল্পনা ছিল সুবাদার হিসেবে তার অভিভাবকত্বের অধীন সিরাজুদ্দৌলাহর ভ্রাতা, বাদশা কুলীর অবৈধ সন্তানের জন্য স্বীকৃতি লাভ। অপর দলটির নেতৃত্বে ছিল উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পূর্ণীয়ার নওয়াব শওকত জং। এসব দলাদলির অপরিহার্য পরিণতি হচ্ছে দারুন বিশৃঙ্খলা। এসব সমস্যা ও উত্তেজনাকর অবস্থায় সিরাজুদ্দৌলাহর ইংরেজদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মত যথেষ্ট কারণ ছিল। সুবাদার হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার মত প্রভাব সিরাজুদ্দৌলাহ অর্জন করতে পারবে না- এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে ইংরেজরা ঘষেটি বেগমের সঙ্গে পত্র যোগাযোগ করে, যার কথা একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তার ধন-ভাণ্ডার এবং তার প্রধান দীওয়ান রাজ বল্লভের ধন ভাণ্ডার নিরাপদ করার জন্য কলিকাতায় স্থানান্তর করা হয়। এমনও বলা হয়েছে যে, পূর্ণীয়ার নওয়াবের সঙ্গেও তাদের সমঝোতা হয়েছিল। জীন ল' আরো জানিয়েছেন যে, সিরাজুদ্দৌলাহ যখন ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারেন, তখন তিনি ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ প্রতিনিধিদের তাঁর দরবারে ডেকে পাঠান এবং তিন দিন জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাদেরকে নির্দেশ দেন যে, "তারা যেন তাদের প্রভুদেরকে বেগম বা তার অনুসারীদের সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ না রাখার জন্য সতর্ক করে দেন।"[৯৬৪]

ইংরেজরা অবশ্য তাদের চক্রান্ত থেকে বিরত হয়নি এবং মসনদের উত্তরাধিকারীদের নিয়ে বিবাদে হস্তক্ষেপ করার লক্ষ্যে তাদের সিদ্ধান্ত নিয়ে অগ্রসর হওয়ার সঙ্কল্প থেকে রাজ বল্লভের পুত্র কৃষ্ণ বল্লভ বা কৃষ্ণ দাসের ঘটনা সৃষ্টি হয়। ঢাকার রাজস্ব প্রশাসক রাজ বল্লভকে অর্থ আত্মসাতের দায়ে সন্দেহ করা হয় এবং একজন ইংরেজ কুঠিয়াল যেমন লিখেছেন যে, পিতা-পুত্র উভয়কে সন্দেহ করার জন্য "অনেক বড় বড় কারণ ছিল" এবং তার মধ্যে অত্যাচার ও অন্যান্য অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে প্রচুর অর্থ সঞ্চয়সহ আরো অনেক প্রতারণার

[৯৬৩] এম. জীন. ল' এর স্মৃতিকথা থেকে উদ্ধৃত, হিল, ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৬৩-১৬৪

[৯৬৪] এম. জীন ল' এর স্মৃতিকতথা থেকে উদ্ধৃত হিল, ৩য় খন্ড , পৃঃ ১৬৩-১৬৪

অপরাধে তারা অপরাধী ছিল।"[৯৬৫] অসুস্থ নওয়াব আলীবর্দী খানের পক্ষ থেকে সিরাজুদ্দৌলাহ রাজ বল্লভের নিকট থেকে হিসাব চান এবং আরো জানতে চান- "গত কয়েক বৎসর যাবত সংগৃহীত নওয়াবের রাজস্ব সম্পর্কে।"[৯৬৬]অবিলম্বে রাজ বল্লভ কলিকাতায় ইংরেজদের নিকট ৫৩,০০,০০০.০০(তেপ্পান্ন লক্ষ) টাকাসহ তার পরিবারের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং আশ্রয় লাভ করেন। নির্দ্বিধায় পলাতকদের জন্য আশ্রয় মঞ্জুর করা এবং এ সময় সিরাজুদ্দৌলাহর সুবিদিত শত্রুকে আশ্রয় দান ছিল ইংরেজদের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট শত্রুতামূলক আচরণ এবং বেগমের সঙ্গে তাদের যোগসাজশের প্রমাণ। তাদের এ কাজের অর্থ যে কি, তা পুরোপরি অবহিত থাকা সত্ত্বেও তারা তাকে আশ্রয় দেয় এবং তাদের পূর্ণ আস্থা ছিল এই যে, শেষ পর্যন্ত বেগমেরই জয় হবে এবং তার উপর রয়েছে রাজা রাজ বল্লভের প্রচুর প্রভাব। হিসাবের জন্য সিরাজুদ্দৌলাহর পক্ষ থেকে চাপের মুখে পড়ে রাজবল্লভ এই অজুহাত দেখিয়ে তা এড়িয়ে যায় যে, "তার যা কিছু ছিল, তা নিয়ে তার পুত্র পালিয়ে গিয়েছে এবং ইংরেজদের আশ্রয়ে রয়েছে, যে কারণে তার (সিরাজের) চাহিদা পূরণ করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছেনা।"[৯৬৭]

১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ ই এপ্রিল যখন আলীবর্দী খান মারা যান, তখন এই ছিল অবস্থা এবং আলীবর্দী খানের মৃত্যুর পর এই চরম প্রতিকূল অবস্থায়ই সিরাজুদ্দৌলাহ তাঁর উত্তরাধিকারী হয়ে মসনদে আসীন হন।

---

৯৬৫ উইলিয়াম টুকের কলিকাতা অধিকারের বিবরণ, ১০ই এপ্রিল থেকে ১০ই নভেম্বর, ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ, উইলসন, ১ম খন্ড পৃঃ ২৭৮-২৭৯

৯৬৬ উইলিয়াম টুকের কলিকাতা অধিকারের বিবরণ, ১০ই এপ্রিল থেকে ১০ই নভেম্বর, ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ, উইলসন, ১ম খন্ড পৃঃ ২৭৯

৯৬৭ কোর্ট অব ডিরেক্টরসের নিকট লিখিত হলওয়েলের পত্র, ৩০ নভেম্বর, ১৭৫৬ বি.এম.পি. ২য় খন্ড কোর্টের নিকট হলওয়েলের লেখা আরো পত্র ১০ আগস্ট, ১৭৫৭ হিল, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩৪৮-৩৪৯

একাদশ অধ্যায়[৯৬৮]

সিরাজুদ্দৌলাহ এবং বাংলায় মুসলিম শাসনের অবসান

১. ইংরেজদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব

আলীবর্দী খানের মৃত্যুর পর দৃশ্যত: সিরাজুদ্দৌলাহ কোন বিরোধিতা ব্যতীতই বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঘষেটি বেগম তার অর্থ সম্পদ উদার হস্তে বিতরণ করে কিছু সংখ্যক সেনাপতি এবং তাদের অধিনস্থ সৈন্যদেরকে তার পক্ষে টেনে নিয়েছিলেন। সিরাজুদ্দৌলাহর মসনদে আরোহণের প্রাককালে তাকে (ঘষেটি বেগম) তার মুর্শিদাবাদের নিকটস্থ মতিঝিল প্রাসাদে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছিল এবং তিনি সেখান থেকে তাকে (সিরাজুদ্দৌলাহ) হঠাৎ আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছিলেন। সিরাজুদ্দৌলাহ অবশ্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি একটি শক্তিশালী বাহিনী মতিঝিল প্রাসাদে প্রেরণ করেন এবং তেমন বড় কোন বিরোধিতা ছাড়াই তাকেসহ তার ধনসম্পদ হস্তগত করেন। যে সকল সেনাপতি ও সৈন্য "তাঁর নিকট হতে এত এত স্বর্ণ ও এত এত উপঢৌকন পেয়েছিলেন" তার জন্য "যুদ্ধ করার আদৌ কোন গরজ বোধ করেননি" এবং তাকে ত্যাগ করে চলে যান।[৯৬৯] এমনকি তার পছন্দের মীর নজর আলীও প্রয়োজনের মূহুর্তে তার পাশে দাঁড়াননি। বরং দোস্ত মোহাম্মদ খান ও রহিম খান নামক দু'জন "চরিত্রবান সেনাধ্যক্ষকে" বিরাট অংকের উপঢৌকন দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পথ করে দেন এবং সিরাজুদ্দৌলাহর নিকট তার জন্য মধ্যস্থতা করতে তাদেরকে রাজী করান।[৯৭০] ঘষেটি বেগমকে মুর্শিদাবাদ প্রাসাদে আটক রাখা হয় এবং তার ধন-সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেয়া হয়। পরে একইভাবে দ্রুততার সঙ্গে সিরাজুদ্দৌলাহ পূর্ণীয়ার নবাব শওকত জংয়ের বিরুদ্ধে অগ্রসর

---

[৯৬৮] মূল বইয়ে ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়

[৯৬৯] সিয়ার ২য় খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১৮৫-৮৬

[৯৭০] সিয়ার ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৮৬। মীর নজর আলী খান "বার থেকে পনের লক্ষ টাকার রত্ন নিয়ে পালিয়ে যান এবং নগদ টাকা কি পরিমাণ নিয়েছিলেন, তা আল্লাহই জানেন।" তিনি ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে নিঃস্ব এবং দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থায় বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন বলে সিয়রের অনুবাদক ব্যক্তিগতভাবে অবহিত হয়ে উল্লেখ করেছেন। সিয়ার ২য় খন্ড টীকা-৯৬

হন। তিনিও গভীরভাবে বিদ্রোহের কথা ভাবছিলেন। আকস্মিকভাবে সিরাজুদ্দৌলাহ ও তাঁর সৈন্য বাহিনী পূর্ণীয়ার নিকট আগমণ করায় শওকত জং, তার অনুগৃহীত সমর্থকগণ এবং মন্ত্রীরা আতকিংত হয়ে পড়েন এবং আত্মসমর্পণ করেন।

এভাবে তাঁর নিকটস্থ প্রতিদ্বন্দ্বীদের মোকাবেলা করে সিরাজুদ্দৌলাহ ইংরেজদের দিকে মনোনিবেশ করেন। তাঁর মসনদে আরোহণের সময় ইংরেজরা প্রথানুযায়ী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে যায়নি এবং তাঁকে কোন উপঢৌকনও দেয়নি। সে সময়কার একজন ইংরেজ কুঠিয়াল, উইলিয়াম টুক লিখেছেন:[৯৭১] আমি ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছি যে, "সিরাজুদ্দৌলাহ কিভাবে নওয়াব হলেন। প্রাচ্য দেশীয় প্রাচীন প্রথা হচ্ছে কেহ দেশের রাজা হলে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবেন এবং তাঁকে যথাযথ উপঢৌকন দিবেন। আমরা এটা অবহেলা করেছি এবং এ জন্য তাঁকে কম বিরক্ত করিনি.... ।"

কৃষ্ণ দাসকে আশ্রয় দেয়া ছিল ইংরেজদের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক অবাধ্যতা এবং এটা ছিল সিরাজুদ্দৌলাহর শত্রুদের সঙ্গে তাদের চক্রান্তের আলামত। তিনি এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। তবু তিনি প্রথমে তাদের প্রতি তেমন কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার বিষয় চিন্তা করেননি। যেমন ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করেছিলেন ঘষেটি বেগম এবং শওকত জংয়ের বিরুদ্ধে। এর পরিবর্তে তিনি আলাপ-আলোচনার পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তিনি কৃষ্ণ দাসকে সমর্থন এবং অননুমোদিতভাবে নির্মিত দুর্গ ভেঙ্গে ফেলার জন্য বারবার ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলের প্রতি আহবান জানাচ্ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলের গভর্ণর রজার ড্রেক তাঁর এসব আহবানের পরিপ্রেক্ষিতে ধৃষ্টতাপূর্ণ জওয়াব দিয়েছেন। টুকের ভাষায় তাদের অজুহাত ছিল নিম্নরূপঃ[৯৭২]

"তারা কৃষ্ণদাসকে নিরাপত্তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং এর পরিণতি যাই হোক, তারা তাকে নিরাপত্তা দিবেনই। অজুহাত হল এই যে, ইংরেজদের পতাকার নিচে আশ্রয় নেয়া কাউকে তার শত্রুর নিকট হস্তান্তর করা হচ্ছে জাতীয় মর্যাদার প্রশ্ন..। নবাব জানতেন যে, তিনি (কৃষ্ণদাস) ছিলেন একজন অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি এবং তিনি চেয়েছিলেন তাকে লুন্ঠন করতে। তাছাড়া এটা এমন একটা দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াবে যা হবে কোম্পানীর জন্য ক্ষতিকর এবং পরে নওয়াব এই নিয়ম অনুসরণ করে যখন যাকে খুশী তাকে ডেকে পাঠাবেন। এইভাবে ইংরেজরা তিনটি প্রধান অজুহাত তুলে ধরেছে।

---

৯৭১ হিল ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৭৮

৯৭২ হিল ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৭৮

প্রথমতঃ কৃষ্ণদাস ইংরেজ পতাকা তলে আশ্রয় নিয়েছে; যদি তাকে তার শত্রুদের নিকট হস্তান্তর করা হয়, তাহলে তা অন্যান্য জাতির নিকট ইংরেজদের মর্যাদা হ্রাস করবে।

দ্বিতীয়তঃ সিরাজুদ্দৌলাহ কৃষ্ণদাসকে লুণ্ঠন করতে চেয়েছিলেন এবং তিনি (কৃষ্ণদাস) ছিলেন "অত্যন্ত ধনী"।

তৃতীয়তঃ তাকে সমর্পণ করাটা একটা দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াবে, পরে নওয়াব যখন যাকে ইচ্ছা তাকেই সমর্পণ করার জন্য দাবী করতে পারবেন।

স্পষ্টতই এসব অজুহাতের ধরণই হচ্ছে অবজ্ঞা মিশ্রিত বা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ইংরেজ কুঠিয়ালরা নওয়াবের রাজ্যের মধ্যেই বাস করতেন এবং তারা কোন স্বীকৃত সরকারের অবস্থানে ছিলেন না। অতএব, তারা স্থানীয় লোকজনকে তাদের পতাকা তলে আশ্রয় দেয়ার অধিকারী ছিলেন না, এমন কি তারা রাজনৈতিক অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও। কৃষ্ণদাসের ব্যাপারটি ছিল এই যে, তিনি বিচার থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। নওয়াব তার অর্থ কড়ি লুণ্ঠন করতে চেয়েছিলেন বলে যে বক্তব্য দেয়া হয়েছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা; কারণ, এমনকি উইলিয়াম টুকের সাক্ষী অনুযায়ীও রাজ বল্লভ "অত্যাচার ও অন্যান্য অন্যায় পন্থা অবলম্বন করে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন" এবং অবৈধ পন্থায় অর্জিত অর্থ এবং পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলো হতে সংগৃহীত রাজস্বসহ তিনি তার পুত্র কৃষ্ণদাসকে আশ্রয়ের জন্য কলিকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তৃতীয় অজুহাতটিও সমভাবে ভ্রান্ত। প্রকৃত পক্ষে, এই ব্যাপারে ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলের যে দাবী বা অজুহাত, তার শুধু একটি ব্যাখ্যাই হতে পারে যে, বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতার নির্ধারক হওয়াই ছিল তাদের নীতি। উইলিয়াম টুক আরো উল্লেখ করেছেন যে, কৃষ্ণদাসের ব্যাপারটি নিয়ে পত্র বিনিময়কালীন পুরো সময়েই ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলের গোপন কমিটি "নওয়াবের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য ব্যবস্থা করতে চূড়ান্তভাবে ব্যস্ত থাকতো।" এবং তারা প্রায় নিশ্চিত ছিল যে, "সিরাজুদ্দৌলাহ পূর্ণীয়ার নওয়াবের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হবেন।" যাহোক, টুক মন্তব্য করেছেন, "তাদের সকল নিশ্চিত আশা ব্যর্থ হয়ে গেল, কারণ শীঘ্রই সিরাজুদ্দৌলাহ শওকত জংকে পরাজিত করে এবং অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে মে মাসের মাঝামাঝি মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন।"[৯৭৩]

---

৯৭৩ হিল ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৭৮

ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলের মনোভাব ছিল একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সরকারের মত, বিদেশে ব্যবসায়ে নিয়োজিত বণিকদের কোন কোম্পানীর মত নয়। ইংরেজদেরকে একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানে রাজী করানোর জন্য সিরাজুদ্দৌলাহ তাদের সঙ্গে যার সুসম্পর্ক আছে, হুগলীর এমন একজন সম্পন্ন প্রভাবশালী বণিক খাজা ওয়াজিদকে তাদের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি চার বার কালিকাতা যান এবং প্রতিবারেই অসম্মানের সাথে তাকে বিদায় করা হয়েছে এবং সর্বশেষে পুনরায় সেখানে গেলে তাকে আগের মতই ব্যর্থ ও অপমানিত হয়ে ফিরে যেতে হবে বলে হুমকি দেয়া হয়।"[৯৭৪] এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পরবর্তী সময়ে নওয়াবের আলোচনার প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে তারা প্রথমবারের মত কলিকাতায় তাদের দূর্গ নির্মাণের কারণ হিসেবে ফরাসীদের সঙ্গে তাদের সম্ভাব্য যুদ্ধের অজুহাত উল্লেখ করে।[৯৭৫]

যাহোক, শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের জন্য যখন সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, তখন সিরাজুদ্দৌলাহ শক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা জুন খাজা ওয়াজিদের নিকট লিখা এক পত্রে নওয়াব তাঁর এই সিদ্ধান্তের কারণ বর্ণনা করেন।[৯৭৬]

"ইংরেজদেরকে আমার দেশ থেকে বের করে দেয়ার জন্য আমার তিনটি প্রধান কারণ আছে।

একটি হচ্ছে, তারা দেশের আইনের পরিপন্থী পন্থায় রাজ্যের মধ্যে একটি শক্তিশালী দুর্গ গড়ে তুলেছে এবং একটি প্রকাণ্ড পরীখা খনন করেছে।

দ্বিতীয়ঃ তারা দস্তক সুবিধার অপব্যবহার করে এমন সব লোককে তা প্রদান করেছে, যারা কোনভাবেই তা পেতে পারেন না। তাদের এই আচরণের জন্য শুল্ক বাবদ যে রাজস্ব আয় হত, তা থেকে সরকার বঞ্চিত হয়েছে।

---

৯৭৪ উইলিয়াম ওয়াটস্ এবং ম্যাথু কলেট টু ফোর্ট সেন্ট জর্জ কাউন্সিল, ৭ এবং ১৬ জুলাই, ১৭৫৬; হিল, ১ম খন্ড; পৃঃ ৫৮ এবং ১০৮। সিরাজুদ্দৌলাহ কর্তৃক কলিকাতা অধিকারের পরে ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলের নিকট লিখেছেন, "আমি এখনো মনে করি কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দেয়া এবং নওয়াবের বার্তাবাহককে অপমানিত করাই ছিল আসলে আমাদের গত দুর্ভাগ্যের কারণ।" ঐ ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫৭

৯৭৫ হিল ২য় খন্ড, পৃঃ ১৪৭। ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হওয়া এবং এর ফলশ্রুতিতে ভারতে ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা। ধারণা করা হয় যে, কোর্ট অব ডিরেক্টরস নওয়াবের অনুমতি ব্যতীত কলিকাতার দূর্গ সম্প্রসারণের জন্য অনিচ্ছুক থাকায় তাদেরকে শান্ত করার জন্য উত্তরকালে এ ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হয়

৯৭৬ হিল ১ম খন্ড, পৃঃ ৪-৫

তৃতীয়: তারা নওয়াবের এমন সব প্রজাকে আশ্রয় দিয়েছে, যাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে হিসাব চাওয়া হয়েছে, তাদেরকে ফেরত চাওয়া হলে তারা তাদেরকে ফেরত না দিয়ে আশ্রয় দিয়েছে, যেন তারা বিচারের আওতা থেকে মুক্ত থাকতে পারে। এই সকল কারণে তাদেরকে এদেশ থেকে বিতাড়ন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

এর দুই দিন পরে ৩রা জুন, সিরাজুদ্দৌলাহ কাশিম বাজার কুঠি আক্রমণ করে দখল করে নেন। হিল যেভাবে আমাদের বিশ্বাস করাতে চেয়েছেন[৯৭৭] সেভাবে কাশিম বাজার কুঠি দখল করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিলনা, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সমঝোতায় আসার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলের উপর চাপ সৃষ্টি করা। এই বিষয়টি কাশিমবাজার কুঠির দায়িত্ব প্রাপ্ত উইলিয়াম ওয়াটস্ এবং ম্যাথু কলেটের সাক্ষ্য থেকে পরিস্কার হয়ে যায়। সিরাজুদ্দৌলাহর পদক্ষেপ সম্পর্কে তারা তাদের কাউন্সিলকে জানিয়েছিলেন যে, সৈন্যদের দ্বারা লুণ্ঠিত হওয়া রোধ করতে তিনি কুঠি এবং গুদাম ঘরে তালা দিয়ে রেখেছেন। তারা আরও উল্লেখ করেছেন যে, "অস্ত্রের ভাণ্ডার ব্যতীত তিনি কাশিম বাজারস্থ কোম্পানীর মালিকানাধীন কোন কিছুই স্পর্শ করেননি।"[৯৭৮] নওয়াব শুধু ওয়াটসকে মূলতঃ এই শর্তে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেন যে, "ইংরেজরা উপরোক্ত তিন ধরণের বিধিবহির্ভূত কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকবে।"[৯৭৯] নওয়াব কাশিমবাজারের সকল ইংরেজকে মুক্তি দেন, তবে শুধু ওয়াটস্ এবং কলেটকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে কলিকাতার দিকে অগ্রসর হন। কলিকাতার দিকে অগ্রসর হওয়ার পরেও তিনি একটি শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে মিমাংসায় পৌঁছার জন্য কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলের নিকট কয়েকটি পত্র লিখেন।"[৯৮০]

ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলের অবশ্য সিরাজের আহবানে সাড়া দেয়ার মন মানষিকতা ছিল না। তারা তাদের দুর্গের সম্প্রসারণ করেছে, ঘষেটি বেগমের ধন-সম্পদ এবং ঢাকা থেকে আদায়কৃত রাজস্বসহ কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দিয়েছে এবং তারা এসবই করেছে নওয়াবী নিয়ে উত্তরাধিকারীদের বিরোধে হস্তক্ষেপ করার সুচিন্তিত পদক্ষেপ হিসেবে এবং তারা চেয়েছে এভাবে বাংলার উপর তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। দক্ষিণ ভারত থেকে সামরিক সাহায্য

---

৯৭৭ হিল ১ম খন্ড, পৃঃ ১,৩ এফ, এফ

৯৭৮ ওয়াটস এবং কলেট কর্তৃক .. কাউন্সিলের নিকট প্রেরিত পত্র, ৮ই জুলাই ১৭৫৬ ঐ, পৃঃ ৬১

৯৭৯ হিল ১ম খন্ড, পৃঃ ১০

৯৮০ ঐ, পৃঃ ১০৪, ১৪২ এবং ২৫৪

পাওয়ার সম্ভাবনায় তাদের সাহস আরও বেড়ে গিয়েছিল, কারণ প্রথম ও দ্বিতীয় কর্ণাটক যুদ্ধের জন্য সেখানে যে সৈন্য সমাবেশ করা হয়েছিল, এখন কোন যুদ্ধ না থাকায় তাদের আর সেখানে কোন প্রয়োজন ছিল না, তাই বাংলার প্রয়োজনে তাদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকা যাবে। কাশিমবাজার দখলের সংবাদ কলিকাতা পৌঁছার তিন দিন পূর্বে, ৪ঠা জুন, (১৭৫৬) ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিল জরুরী সামরিক সাহায্য প্রেরণের জন্য ফোর্ট জর্জের নিকট অনুরোধ বার্তা প্রেরণ করে[৯৮১] এবং নওয়াবের কলিকাতা পৌঁছার ঠিক এক সপ্তাহ পূর্বে ১০ই জুন, ড্রেক বৈরী আচরণ শুরু করে দিয়েছিলেন এবং হুগলী নদীর ভাটিতে সবচেয়ে সংকীর্ণ স্থানে অবস্থিত থানা দুর্গ দখল করার জন্য একটি এবং হুগলী ও কলিকাতার মধ্যবর্তী সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান, সুখ সাগর দখল করার জন্য আরেকটি অর্থাৎ দুদিকে দুটি সৈন্যদল প্রেরণ করেছিলেন। অবশ্য নওয়াবের সৈন্যদের একটি অগ্রবর্তী দল উভয় স্থানে ইংরেজদের আক্রমণ প্রতিহত করে। সিরাজুদ্দৌলাহ ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) সৈন্য নিয়ে ১৬ই জুন ফোর্ট উইলিয়ামের দোর-গোড়ায় উপস্থিত হন। এমন কি এই সময়ও ড্রেক চিন্তা করছিলেন যে, ইংরেজরা যদি দৃঢ়ভাবে যুদ্ধ করে, তাহলে নওয়াব পশ্চাদপসারণ করবেন। দুই দিন যুদ্ধ করার পরে ড্রেক অবশ্য দেখতে পান যে, নওয়াবের সৈন্যদের প্রতিরোধ করা অসম্ভব, তাই তিনি ১৯ শে জুন, দুর্গের অধিকাংশ ইংরেজকে নিয়ে নদীর কয়েক মাইল ভাটিতে ফল্টায় পালিয়ে যান। মাত্র অল্প কয়েকজন ইংরেজসহ হলওয়েলকে দুর্গে রেখে যান (অনুমেয় যে, যুদ্ধের প্রদর্শনী করে ড্রেকের পালানোর জন্য আড়াল করে দেয়া) এবং পরের দিন তাকেও এই পথ অনুসরণ করার জন্য নির্দেশ দিয়ে যান। এটা করার পূর্বেই ২০শে জুন দুপুরের দিকে নওয়াবের সৈন্যরা দূর্গ দখল করে নেয়, তখন হলওয়েল ও তার সহযোগীদের আত্মসমর্পণ করতে হয়।[৯৮২] শুধু রাতের বেলা কিছু সংখ্যক ইংরেজ অতিরিক্ত মদ্য পান করে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করায় তাদেরকে ১৮ফুট/১৪ফুট একটি কক্ষে আটক রাখা হয়। সে কক্ষটি উচ্ছৃঙ্খল লোকদেরকে নিবৃত করার জন্য তারাই তৈরী করেছিল। আটককৃত লোকদের সংখ্যা চল্লিশের কম ছিলনা, কিন্তু ষাটেরও অধিক ছিলনা। তার পূর্ববর্তী চার দিনের কঠোর যুদ্ধে অবসাদ ও নিঃশেষ হয়ে রাতের বেলা তাদের মধ্য হতে প্রায় ২০ জন মারা যায়। এই ঘটনাটি পরবর্তীকালে হলওয়েল কর্তৃক অতিরঞ্জিতভাবে প্রচারিত হয়ে "ব্লাক-হোল-ট্রাজেডি" বলে কুখ্যাতি অর্জন করে। হলওয়েল

---

৯৮১ আলেকজান্ডার গ্রান্ট "এ্যান একাউন্ট অব দ্যা ক্যাপচার অব ক্যালকাটা", হিল, ১ম খন্ড, পৃঃ ৭৬

৯৮২ হাউস অব কমন্সের কমিটির সামনে টুকের সাক্ষাৎ, ঐ, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩০১

আটককৃত ও মৃতদের সংখ্যা যথাক্রমে ১৪৬ জন ও ২৬ জন উল্লেখ করেছিলেন এবং গাদাগাদি করে রাখার জন্য এতসংখ্যক ইংরেজ মারা যায় বলেও উল্লেখ করেছিলেন।[৯৮৩] এখন পণ্ডিত ব্যক্তিগণ মোটামুটি একমত পোষণ করেন যে, হলওয়েলের বিবরণ সাধারণভাবে অতিমাত্রায় বিকৃত এবং খুব বেশি অতিরঞ্জিত।[৯৮৪] পরের দিন অবশ্য সিরাজুদ্দৌলাহ দুর্গের মধ্যে যত ইংরেজকে পাওয়া গিয়েছে, তাদের সকলকে মুক্তি দেন। তবে হলওয়েল এবং অন্য তিনজন ব্যতীত, তাদেরকে তিনি তার সঙ্গে রাজধানী মুর্শিদাবাদ নিয়ে যেতে আদেশ দেন। ২৪জুন সিরাজুদ্দৌলাহ মাণিক চাঁদকে কলিকাতার প্রশাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত রেখে রাজধানীর উদ্দেশ্যে কলিকাতা ত্যাগ করেন। ২৬ শে জুন সকল ইংরেজ ফলটার দিকে যাত্রা করে।

রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করে ৩০শে জুন সিরাজুদ্দৌলাহ ফোর্ট সেন্ট জর্জের গভর্ণর জর্জ পিগটের নিকট একটি পত্র লিখেন। এই পত্র থেকে জানা যায় যে, নওয়াব যুক্তিসঙ্গত এবং আইনানুগ শর্তে ইংরেজদেরকে বাংলায় বসবাস এবং ব্যবসা বাণিজ্য করার অনুমতি দিতে ইচ্ছুক। প্রকৃতপক্ষে, হলওয়েলসহ অন্য তিন জন ইংরেজকে তাঁর সঙ্গে মুর্শিদাবাদ নিয়ে যাওয়া থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তিনি কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। নওয়াব লিখেছেনঃ[৯৮৫]

"সুবাহ বাংলা থেকে আপনাদের কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়ার জন্য আমার কোন ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু আপনাদের গোমস্তা রজর ড্রেক একজন অত্যন্ত দুষ্ট এবং উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোক এবং সে তার কুঠিতে এমন সব লোকদেরকে আশ্রয় দেয়া শুরু করেছে, যাদের নিকট বাদশাহের হিসাব পাওনা রয়েছে। আমার হুশিয়ারী সত্ত্বেও সে এসব নির্লজ্জ কাজ থেকে বিরত হয়নি।

---

৯৮৩ ঐ পৃঃ ১৩১ এফ এফ

৯৮৪ দেখুন. গুপ্ত পূর্বোক্ত. পৃঃ ৭০-৮০। আরো দেখুন অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া. তৃতীয় সংস্করণে টি, জি,পি, স্পিয়ারের, "নোট অন দ্যা ব্লাক হোল" পৃ: ৪৭৯। স্পিয়ার লিখেছেন: কলিকাতার রক্ষক, আপাত দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য এবং খুব বেশী অনির্ভরযোগ্যও নয়। এই ব্যক্তি ভি, জেড. হলওয়েলের বর্ণনা শক্তির নিকট থেকেই আমরা প্রচলিত ব্লাক হোল আখ্যানটি পেয়েছি, পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত এই ঘটনাটির প্রতি কেহ তেমন দৃষ্টি দেয়নি। কিন্তু তার পরই সাম্রাজ্যবাদীদের জীবন কাহিনী ভিত্তিক উপাখ্যান রচনাকারীদের কাছে এটা একটা ভাল বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।----অনেক বৎসর যাবৎ এখন এই প্রসঙ্গে মতৈক্যে পৌঁছানো গিয়াছে যে, এটা সিরাজুদ্দৌলাহর পরিকল্পিত কর্মকান্ড ছিলনা, এমনকি তাঁর অনুচরদেরও নয়। এটা ছিল অজ্ঞতা এবং অসর্তকতার ফল, প্রতিশোধ নেয়া বা নির্দয়তা নয়।"

৯৮৫ হিল. ১ম খন্ড, পৃঃ ১৯৬

কেন এসব লোক কোম্পানীর বাণিজ্যিক কারবার করতে এসে এই ধরণের কাজে লিপ্ত হবে? যাহোক, এই নির্লজ্জ লোকটি তার কাজের ফল পেয়েছে এবং এই সুবাহ থেকে বহিস্কৃত হয়েছে। মিঃ ওয়াটসের মত একজন অসহায় এবং গোবেচারা লোককে আমি আপনার নিকট যাওয়ার অনুমতি দিয়েছি। যেহেতু আমি আপনাকে কোম্পানীর একজন গুরুত্বপূর্ণ লোক বলে সম্মান করি, তাই আমি এই পরিস্থিতিতে তার নির্লজ্জ ও নীতি বিগর্হিত কাজ-কারবার সম্পর্কে লিখছি।"

অতএব, সিরাজুদ্দৌলাহর মনোভাব পূর্বাপর একই রকম ছিল। বাংলায় কোম্পানীর বাণিজ্যের প্রতি তাঁর কোন আপত্তি ছিল না; তিনি শুধু চেয়েছিলেন যে, তারা কোন রাজনৈতিক চক্রান্তে লিপ্ত না হোক বা তাদের বাণিজ্যিক সুবিধারও কোন অপব্যবহার না করুক। নওয়াবের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে কাউন্সিল কর্তৃক ফোর্ট উইলিয়াম সম্প্রসারণ, বিচারের হাত থেকে পলাতকদের আশ্রয় দান এবং বাণিজ্যিক সুবিধার অপব্যবহারের কারণেই নওয়াবের কাশিমবাজার কুঠি এবং ফোর্ট উইলিয়াম দখল করা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি বিশেষ করে রজার ড্রেকের ঔদ্ধত্যের কারণে বিরক্ত হয়েছিলেন। অন্য একজন অধিক বিজ্ঞ এবং অমায়িক নেতার নেতৃত্বে ইংরেজদের বাংলায় ফিরে আসা এবং ন্যায়সঙ্গত শর্তে বাণিজ্য করতে অনুমতি দেওয়ার জন্য সিরাজুদ্দৌলাহর ইচ্ছা উপরোক্ত পত্রেই নিহিত আছে।

ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর এইরূপ আপোষরফার মনোভাব দেখে মনে হয়, তিনি ইংরেজ কুঠিয়ালদেরকে শুধু বাণিজ্যিক প্রতিনিধি বলেই মনে করতেন। তাছাড়া কর্ণাটক যুদ্ধ এবং দাক্ষিণাত্যে বিপুল সংখ্যক ইংরেজ সৈন্যের উপস্থিতির কারণে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক উচ্চাকাংখা যে একটি নতুন মাত্রা লাভ করেছিল, সে বিষয়টিকে তিনি খাটো করে দেখেছিলেন বলেই মনে হয়।

২. ফলটায় ইংরেজদেন অবস্থান

রজার ড্রেক এবং তার সহকর্মীরা ফলটায় থেকেই শক্তিবলে নিজেদেরকে পুনপ্রতিষ্ঠিত করার বিষয় চিন্তা করছিলেন। তারা মাদ্রাজ থেকে সৈন্য এসে পৌঁছার জন্য অপেক্ষা করছিলেন মাত্র। ইতিপূর্বেই তারা এজন্য অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন। সময় নেয়ার জন্য তারা ৬ই জুলাই নওয়াবের প্রধান প্রধান এবং উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তির জন্য ইচ্ছা ব্যক্ত করে আলাপ-আলোচনা শুরু করেছিলেন।[৯৮৬] তারা যে আসলে শান্তিপূর্ণ সমাধান চাননি, তা

---

৯৮৬ খাজা ওয়ালিদের নিকট ফলটা কাউন্সিলের পত্র. ওয়াটস্ এবং কলেট ৬ই জুলাই. ১৭৫৬. হিল প্রথম খন্ড পৃঃ ৫৭-৫৯

তার এক সপ্তাহ পূর্বে মাদ্রাজ কাউন্সিলের নিকট লিখিত তাদের পত্র থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়। এই পত্রে তারা জানায় যে, তারা সময় নেয়ার জন্যই শুধু শান্তিপূর্ণভাবে আপোষরফার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন এবং পুনরায় মাদ্রাজ কর্তৃপক্ষের নিকট আরো সৈন্য প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানান।[৯৮৭]

ফলটা থেকে যখন ইংরেজরা শক্তি পরীক্ষার কথা চিন্তা করছিলেন এবং মাদ্রাজ থেকে নতুন করে আরো সৈন্যের আগমণের অপেক্ষায় ছিলেন, তখন স্থানীয় বণিক এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ইংরেজদেরকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করা ও উৎসাহ দিয়ে আসছিলেন। যেমন খাজা ওয়াজিদের প্রধান সহকারী জনৈক শ্রীবাবু ওরফে শিব বাবু নানাভাবে, বিশেষ করে এই কথা বলে ড্রেকের আশংকাকে বাড়িয়ে তোলে যে, কলিকাতায় এমন শোচনীয় পরাজয়ের পর সম্মানের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রায় অসম্ভব এবং নওয়াব আর ইংরেজদেরকে আগের মত সুযোগ-সুবিধা দিবেন না। শিব বাবু এক প্রস্তাবে বলে যে, "কলিকাতায় পুনপ্রতিষ্ঠার সম্মানজনক পন্থা হচ্ছে এই যে, তোমরা মাদ্রাজ চলে যাবে এবং সেখানে গিয়ে গভর্ণর এবং কাউন্সিলের সঙ্গে মতৈক্যের ভিত্তিতে শক্তিবলে প্রত্যাবর্তন করবে।"[৯৮৮] গোবিন্দরাম মিত্র নামে আরেক ব্যক্তি, যে নওয়াবের কলিকাতা অভিযানের সময় গাছ কেটে রাস্তায় ফেলে রেখেছিল এবং রাস্তা কেটে দিয়ে"[৯৮৯] নওয়াবের জন্য বাধা সৃষ্টির মাধ্যমে ইংরেজদেরকে সাহায্য করার জন্য চেষ্টা করেছিল, সে এখন ইংরেজদের জন্য গোয়েন্দাগিরি শুরু করে।[৯৯০] গোবিন্দ রাম মিত্র এবং তার মত অন্যান্যদের সহায়তা নিয়ে চন্দরনগরে অবস্থানকারী ওয়াট্স এবং কলেট, কাশিমবাজারে অবস্থানকারী ওয়ারেন হেস্টিংস নওয়াবের দরবারের যারা অসন্তুষ্ট ছিল, তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে এবং তার সেনাবাহিনী ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে। মানিকচাঁদ তার পক্ষ থেকে ফলটায় অবস্থানকারী ইংরেজদের জন্য রসদ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা করে তাদের জন্য সুবিধা করে দেয় এবং ফলটা থেকে ইংরেজরা একটি শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় ইচ্ছুক বলে নওয়াবের নিকট বিভ্রান্তিমূলক খবর পাঠিয়েও তাদেরকে সহায়তা করে।

ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিল থেকে আরো সৈন্য পাঠানোর অনুরোধ এবং কাশিমবাজারের আত্মসমর্পণের খবর মধ্য জুলাইতে মাদ্রাজ পৌঁছে। সঙ্গে সঙ্গে

---

৯৮৭ ফলটা কাউন্সিল থেকে ফোর্ট সেন্ট জর্জ কাউন্সিলের নিকট লিখিত পত্র, ১৩ই জুলাই, ১৭৫৬, ঐ, পৃঃ ৭১-৭২

৯৮৮ কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট ওয়াট্স এবং কলেট ১৭ই জুলাই, ১৭৫৬, ঐ পৃঃ ৭১-৭২

৯৮৯ ড্রেকস ন্যারেটিভ, ঐ পৃঃ ১১৯-১৪১

৯৯০ অরম, এমএস এস, ইন্ডিয়া, ৫ম খন্ড, ১১৬৯, গোপাল রাম কর্তৃক উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত পৃঃ ১১৩

ফোর্ট সেন্ট জর্জ কাউন্সিল মেজর কিলপ্যাট্রিকের অধিনে ২০০ সৈন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৯৯১] কিলপ্যাট্রিক ২০শে জুলাই দেলাওয়ার জাহাজ যোগে মাদ্রাজ থেকে রওয়ানা দেন এবং ৩১ শে জুলাই ফলটায় পৌঁছে জানতে পারেন যে, ফোর্ট উইলিয়াম থেকেও ইংরেজদেরকে বহিস্কার করে দেয়া হয়েছে। যেহেতু বর্ষা মৌসুম শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং কলিকাতা পুণর্দখলের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক সৈন্যও ছিলনা, তাই মেজর কিলপ্যাট্রিক তাড়াহুড়া করে যুদ্ধে না গিয়ে ৫ই আগস্ট মাদ্রাজ কাউন্সিলের নিকট "বিপুল পরিমাণ সামরিক সরঞ্জাম" এবং আরো নৌসেনা চেয়ে পাঠান।[৯৯২] আর সসৈন্যে তার আগমনে যেন নওয়াবের মনে কোন ভুল বোঝা-বুঝির সৃষ্টি না হয় এবং আরো সময় নেয়ার জন্য মেজর কিলপ্যাট্রিক ড্রেকের অনুসৃত কৌশলই অনুমোদন করেন এবং তা অব্যাহত রাখেন। এভাবে একদিকে আরো অতিরিক্ত সৈন্যের জন্য মাদ্রাজে পত্র লিখা এবং অন্যদিকে ১৫ই আগস্ট, ১৭৫৬, কিলপ্যাট্রিক ইংরেজদের সদিচ্ছা সম্পর্কে সিরাজুদ্দৌলাহকে আশ্বস্ত করে তাঁর অনুগ্রহ কামনা করেন।[৯৯৩] কিলপ্যাট্রিক ইংরেজদের পক্ষে মধ্যস্থতা করার জন্য মাণিকচাঁদ, জগত শেঠ এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিকট পত্র লিখেন।[৯৯৪] যদিও নওয়াবের নিকট প্রেরিত পত্র হস্তান্তর করা হয়নি, কিন্তু মাণিক চাঁদের নিকট লিখিত পত্রে "অনেক প্রশংসা এবং তার সহায়তার ব্যাপারে সর্বাধিক মাত্রায় আশা করা হয়।" ফলটা সিলেক্ট কমিটি আরো উল্লেখ করে যে, তিনি যেন "কলিকাতায় একটি বাজার চালু এবং আমাদের জন্য সর্বপ্রকার রসদপত্র সরবরাহ করার দস্তকসহ একটি নৌকা প্রেরণ করেন।"[৯৯৫] মাণিক চাঁদ নওয়াবকে এই কথাও বলেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে ইংরেজদের কোন বৈরী উদ্দেশ্য নেই।[৯৯৬]

ইংরেজদের শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে এসব বিবৃতি, বিশেষ করে মানিক চাঁদের আশ্বাসে নিঃসন্দেহে সিরাজুদ্দৌলাহর উপর একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়; কারণ, বর্ণিত আছে যে, নওয়াব মাণিকচাঁদকে বলেছিলেন যে, যদি ইংরেজদের তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোন ইচ্ছ না থাকে, তাহলে তিনি তাদেরকে পুনঃ বসতি স্থাপন এবং বাণিজ্যিক সুবিধা মঞ্জুর করতে প্রস্তুত আছেন।[৯৯৭] এভাবে আরো কিছু পরিস্থিতির কারণে সময় নেয়ার জন্য ড্রেক এবং কিলপ্যাট্রিকের কৌশল ফলপ্রসু

---

[৯৯১] হিল ২য় খন্ড, পৃঃ ৯৯

[৯৯২] ঐ ২য় খন্ড, পৃঃ১৯৩

[৯৯৩] ফলটা সিলেক্ট কমিটি কন্সালটেশনস্ ২২ শে আগস্ট, ১৭৫৬, গুপ্ত কর্তৃক, পূর্বোক্ত, ৮৯

[৯৯৪] ঐ, পৃঃ ৯০

[৯৯৫] ফলটা সিলেক্ট কমিটি কনসাল্টেশন সেপ্টেম্বর ১৭৫৬ ঐ

[৯৯৬] ফলটা সিলেক্ট কমিটি কনসাল্টেশন ৬ নভেম্বর, ১৭৫৬ ঐ

[৯৯৭] ফলটা সিলেক্ট কমিটি কনসাল্টেশনস্ -ঐ-

হয়। আবার বাংলার নওয়াবের উল্লেখ করার মত কোন নৌ-শক্তি ছিল না। অতএব, যদিও তিনি ভিনদেশীদেরকে তাদের কুঠি এবং স্থলভাগের বসতি থেকে বহিস্কার করতে সক্ষম ছিলেন, কিন্তু উপকূলভাগ থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করা বা গভীর সমুদ্রে তাদেরকে অনুসরণ করা ছিল তাঁর ক্ষমতার বাইরে। দ্বিতীয়ত, সিরাজুদ্দৌলাহ ঠিক সে সময় পাটনার শওকত জংকে নিয়েও খুব ব্যস্ত ছিলেন। মীর জাফর এবং অন্যান্য কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা কর্তৃক উস্কানী পেয়ে[৯৯৮] এবং মোগল সম্রাটের নিকট থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদারীর ফরমান লাভ করে শওকত জং সিরাজুদ্দৌলাহর কর্তৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন। ইংরেজরা স্বভাবতই শওকত জংয়ের সাফল্য কামনা করত।[৯৯৯] তারা অবশ্য অত্যন্ত হতাশ হয়, যখন সিরাজুদ্দৌলাহ ১৭৫৬ সালের ৬ই অক্টোবর এক যুদ্ধে শওকত জংকে পরাজিত করেন এবং শওকত জং নিহত হন।

ইতিমধ্যে কলিকাতার পতন এবং আরো অতিরিক্ত সৈন্যের জন্য ড্রেক এবং কিলপ্যাট্রিকের পত্র আগস্টের মাঝামাঝি মাদ্রাজে এসে পৌঁছে। আর গত মে মাসেই ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (১৭৫৬-১৭৬৩) শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড পরস্পরের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়; কিন্তু এই সংবাদ তখনও ভারতে এসে পৌঁছেনি। তবে ফোর্ট সেন্ট জর্জ কাউন্সিল অবশ্য এরূপ একটি যুদ্ধ বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে আশংকা করেছিল, আর তাই বাংলায় আরো বেশি সৈন্য পাঠাতে ইতস্ততঃ করছিল।[১০০০] অতএব, তারা ইংল্যাণ্ড থেকে কোন জাহাজ ভারতে এসে পৌঁছার জন্য অপেক্ষা করছিল। সেপ্টেম্বরে কোম্পানীর দুটি জাহাজ যথাক্রমে চেষ্টারফিল্ড এবং ওয়ালপোল মাদ্রাজে এসে পৌঁছে; কিন্তু তখনও তারা ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার কোন সংবাদ নিয়ে আসতে পারেনি।[১০০১] ধারণা করা যেতে পারে যে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই তারা ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করেছিল। সে অনুযায়ী ফোর্ট সেন্ট জর্জ কাউন্সিল ১৩ই অক্টোবর রবার্ট ক্লাইভ এবং এডমিরাল ওয়াটসনের অধীনে বাংলায় এক অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ক্লাইভ এবং বেঙ্গল কাউন্সিলকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তা হচ্ছে নিম্নরূপ:

শুধু কলিকাতা পুনর্দখলই এই অভিযানের পিছনে আমাদের উদ্দেশ্য নয়; শুধু কুঠিসমূহ এবং বসতিগুলো পুনরুদ্ধারই নয়, বরং মোগল সম্রাট কর্তৃক

---

৯৯৮ সিয়ার, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৯৩, ১৯৭, ১৯৮, ২০৫

৯৯৯ ফলটা কাউন্সিল থেকে ফোর্ট সেন্ট জর্জ কাউন্সিলের নিকট লিখিত পত্র, ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৭৫৬। হিল পৃঃ ২১৬

১০০০ ফোর্ট সেন্ট জর্জ থেকে ইংল্যান্ডে প্রেরিত সাধারণ চিঠি, ১৩ অক্টোবর, ১৭৫৬, বি. এম.পি. ২য় খন্ড

১০০১ ফোর্ট সেন্ট জর্জ থেকে ইংল্যান্ডে প্রেরিত সাধারণ পত্র, ১৩ অক্টোবর, ১৭৫৬, বি. এম.পি. ২য় খন্ড।

মঞ্জুরকৃত সকল সুবিধা পুরোপুরি আদায় করতে হবে এবং সম্প্রতি যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে, তার জন্য যথেষ্ঠ ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে, অন্যথায় আমাদের অভিমত হচ্ছে এই যে, এই প্রচেষ্টা না নেয়াই শ্রেয় হবে।

সৈন্য পৌঁছার এই খবর শুনে নওয়াব যদি কোম্পানীকে উপরে উল্লেখিত সকল সুবিধাদি দেয়ার প্রস্তাব দেয় অথবা যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার ঝুঁকি নেয়, তাহলে আমাদের মনে হচ্ছে ক্ষতিপূরণ আদায় করার ভাবাবেগ থেকে যুদ্ধের পরিণতিতে যে খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে, কোম্পানীর অর্থ কড়ির যে ক্ষয়-ক্ষতি হবে, সে ক্ষতি পূরণের চিন্তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে; যদিও ক্ষতিপূরণ আদায়ের চিন্তা কখনো একটা ন্যায় সঙ্গত চিন্তা ছিল না; কিন্তু আমরা মনে করি যে তরবারী ও কলম পাশাপাশিই চালাতে হবে এবং বর্তমানের অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যবল পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ শুরু করতে হবে। এই যুদ্ধ হতে হবে সর্ব প্রকারের যেন তার (নওয়াবের) রাজ্যের বা বিষয় সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয় বা আমাদের পক্ষ হতে সমুচিত জওয়াব দেয়ার জন্য প্রত্যাঘাত করার ক্ষমতা আমাদের করায়াত্বে চলে আসে।

সামরিক পদক্ষেপের যে কি বিরাট সুবিধা হবে, বিশেষ করে যারা নওয়াবের পরিষদে থেকেও সরকারের এই হিংস্রতার জন্য অসন্তুষ্ট আছেন বা যারা মসনদের প্রতি দাবিদার, তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ফলে তাদের উপর এর যে কি প্রভাব পড়বে, তা ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না ..। কিন্তু, আমার মতে এই অভিযান পরিচালনার জন্য কর্ণেল ক্লাইভের সামর্থের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল এবং এটাও একান্ত প্রয়োজন যে, এই অভিযান পুরোপুরি কার্যকরী করার পথে কোন মতভেদ বা অন্য কোন ক্রটি বিচ্যুতি যেন কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে, সেজন্য আমাদের নির্দেশ হল কোম্পানীর স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কর্ণেল ক্লাইভ যা ভালো বিবেচনা করবেন, সে অনুযায়ী সামরিক অভিযান নিয়ে স্থল পথেও অগ্রসর হতে পারবেন।

ফ্রান্সের সঙ্গে যদি কোন যুদ্ধ শুরু হওয়ার খবর পাওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে তাকে এখানে পুনরায় ডাকা হতে পারে, তখন কলিকাতার সুরক্ষার জন্য যে পরিমাণ সৈন্য রাখা দরকার হবে, তা রেখে অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে তাকে অবিলম্বে ফিরে আসতে হবে। কারণ আমরা মনে করি, সে অবস্থায় সৈন্য প্রত্যাহার করা হলে যে ঝুঁকি বহন করতে হবে, তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে আমাদের নিয়ন্ত্রনাধীন এলাকাসমূহে কোম্পানীর বিষয় সম্পদ রক্ষা করা। অতএব, ফ্রান্সের সঙ্গে নতুন করে যুদ্ধ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা কোন উদ্দীপক বিষয়

ছিল না, বরং তা ছিল নিবৃত্তি মূলক। ফোর্ট সেন্ট জর্জ কাউন্সিলের ধারণা ছিল যে, ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হলে দাক্ষিণাত্যই হবে প্রধান যুদ্ধ ক্ষেত্র। বাংলায় অভিযান প্রেরণের পিছনে তাদের স্পষ্ট কৌশল ছিল এই যে, ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই বাংলায় তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করে বুদ্ধিবলে তাদের (ফরাসীদের) প্রথমেই পরাস্ত করা। তারপর সত্যিকার যুদ্ধ শুরু হলে দাক্ষিণাত্যে যত বেশি সম্ভব সৈন্য সামন্ত পাওয়া যায়, তার সবই ফরাসীদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা। অতএব, ক্লাইভকে বাংলায় পৌঁছা মাত্র অবিলম্বে প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। যুদ্ধের অনেক খারাপ পরিণতি সে শুধু তখনই এড়াতে পারবে, যদি নওয়াব "সৈন্যসহ তার আগমণের সংবাদ"[১০০২] পেয়ে কোন যুদ্ধের ঝুঁকি না নেন এবং ইংরেজদেরকে তাদের সকল ক্ষতি পূরণ করে দেন। "পূর্ণমাত্রায় তাদের সকল সুযোগ-সুবিধা পুণ:প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব দেন।" এমনকি এই আলোচনা চলাকালীন সময় ক্লাইভকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, "তরবারী এবং কলম" যেন একই সংগে চলে।

নওয়াবের শত্রু এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্যও ক্লাইভকে নির্দেশ দেয়া হয়। শেষোক্ত পদক্ষেপটির জন্য সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে ঢাকা, পূর্ণীয়া এবং কর্ণাটকের নায়েব সুবাদারদের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়। একই সময়ে মাদ্রাজ কাউন্সিল বাংলায় ইংরেজদের প্রতি তাদের ভাষায় "হিংস্র ও নিষ্ঠুর আচরণ" করার জন্য সিরাজুদ্দৌলাহর নিকট লিখিত এক পত্রে তাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং হুমকির ভাষায় নওয়াবের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ দাবী করে। পিগট লিখেছেন:[১০০৩]

"আমি প্রচুর সৈন্য এবং স্থলবাহিনীসহ ক্লাইভ নামে একজন বড় সর্দার পাঠিয়েছি, যে আমার পরে শাসন করবে। আমাদের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার জন্য পূর্ণ সন্তুষ্টিসহ ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে। আপনি শুনেছেন যে, আমরা এই অঞ্চলে যুদ্ধ করেছি এবং সর্বদাই বিজয়ী হয়েছি।"

এই পত্রের ভাষা এবং এতে ক্লাইভ এবং ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলের জন্য যে সকল শর্ত নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, তা একটি শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথ রুদ্ধ

১০০২ ৬ টি জাহাজ-দ্যা কেন্ট, দ্যা চেম্বারল্যান্ড, দ্যা টাইগার, দ্যা সৈলিসবারী, দ্যা ওয়ালপোল এবং দ্যা মালবারাহ এবং তিনটি কোচ দ্যা ন্যাপউইং , দ্যা ক্লেব এবং দ্যা বোনেটা ইত্যাদি নিয়ে অভিযান পরিচালিত হয়। এই সব জাহাজে ছিল ৫২৮ জন পদাতিক সৈন্য, ১০৯ জন গোলন্দাজ সৈন্য, ৯৪০ জন সিপাহি এবং ১৬০ জন লস্কর: তা ছাড়াও ছিল সামরিক সরঞ্জাম এবং রসদপত্র এবং ৪,০০,০০০ টাকা (হিল, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৩৩

১০০৩ হিল, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৪৩

করে দিয়েছে। সিরাজুদ্দৌলাহর বিরুদ্ধে "হিংস্রতার এবং নিষ্ঠুরতার" যে, অভিযোগ তা স্পষ্টতই ভিত্তিহীন।

ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিল ইচ্ছাকৃতভাবে এবং ষড়যন্ত্র করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে নবাবকে ক্ষেপিয়ে তোলে। এমনকি তাদের নিজেদের মধ্যেও ফোর্ট সেন্ট জর্জ পুরাপুরি নিশ্চিত হতে পারেনি যে, সিরাজুদ্দৌলাহর আদৌ কোন ত্রুটি হয়েছিল কি না। এরূপ দেখা যায় যে, বাংলায় অভিযান প্রেরণের ব্যাপারে বিলাতের কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট মাদ্রাজ কাউন্সিল লিখেছিল, ''নবাব প্রথম থেকেই ইংরেজদেরকে সম্পূর্ণভাবে বহিষ্কার করার কোন সংকল্প করেছিলেন কি না এবং যদি তাই হয়ে থাকে তা হলে এমন কি কারণ ঘটতে পারে, যে জন্যে তিনি এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকবেন অথবা এটা কি কোন বড় অংকের অর্থ কড়ির ব্যাপার ছিল এবং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সে বিষয়টির কোন সুরাহা করা সম্ভব হয়নি, সে সম্পর্কে আরো বেশি অবগত হয়ে বলতে পারব"।[১০০৪] এটা পরিষ্কার যে নবাবের বিরুদ্ধে মাদ্রাস কাউন্সিল যে "সহিংসতা এবং নিষ্ঠুরতার" অভিযোগ তুলেছিল, তা ছিল অপর্যাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে বরং তা ছিল তাদের আগ্রাসী অভিযান পরিচালনা করার জন্যে একটি অজুহাত মাত্র।

১৭৫৬ সালের ১৫ ডিসেম্বর ক্লাইভ ফলটায় এসে পৌঁছেন এবং কোম্পানীর প্রতি মাণিক চাঁদ যে "বিরাট বন্ধুত্ব ও. অন্তরঙ্গতা" প্রদর্শন করেছেন, সে জন্যে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ঐ দিনই একটি পত্র লিখেন। ক্লাইভ মাণিক চাঁদকে এই কথাও বলেন, যেহেতু তিনি (মাণিক চাঁদ) "এই পর্যন্ত কোম্পানীর পক্ষে কাজ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে এসেছেন" তাই কোম্পানীর যখন "সর্বোচ্চ প্রয়োজন পড়বে" তখন যেন তিনি "তাদের প্রতি অনুরূপ মনোভাব অব্যাহত রাখেন"।[১০০৫] এই পত্রের প্রেক্ষিতে মাণিক চাঁদ তার সঙ্গে সম্পূর্ণ ঐক্যমত প্রকাশ করে জবাব লিখেন, তদুপরি ক্লাইভের সম্পূর্ণ নিরাপদে এই অঞ্চলে এসে পৌঁছার সংবাদ জানতে পেরে তিনি আনন্দিত হন এবং তাকে জানান... ।[১০০৬]

যে সব কারণে কোম্পানীর বসতিসমূহের উপর দুর্ভাগ্য নেমে এসেছিল তা আপনি আপনাদের সাবেক মুতসুদ্দিদের (agents) নিকট থেকে জানতে

[১০০৪] ইংল্যান্ডের কোর্ট অব ডিরেক্টরদের নিকট সেন্ট জর্জ কোর্টের কাউন্সিলের লেখা সাধারণ পত্র, ১৩ অক্টোবর ১৭৫৬; বি এম পি ২য় খন্ড।

[১০০৫] রাজা মাণিক চাঁদের নিকট ক্লাইভের পত্র, ১৫ ডিসেম্বর ১৭৫৬; বি এম পি ২য় খন্ড।

[১০০৬] ক্লাইভের নিকট মাণিক চাঁদের পত্র, ১৯ ডিসেম্বর ১৭৫৬: বি এম পি ২য় খন্ড।

পারবেন। সে সময় তাদের প্রতি আমার আচরণ এবং শান্তি ও স্বস্থির প্রতি আমি যে মনোভাব পোষণ করি তা ইতোমধ্যেই আপনি অবশ্যই জেনে থাকবেন। আপনার পত্র পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে আমার মনোভাবকে চাঙ্গা করে দিয়েছে এবং কোম্পানীর পক্ষে কাজ করার জন্যে আমার যে ইচ্ছে তা আমি আমার সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে অব্যাহত রাখবো। আমার একান্ত বিশ্বস্ত রাধাকিসেন মল্লিককে আপনার নিকট পাঠালাম; সে আপনাকে আরো বিশেষ কিছু বিষয় জানাবে, যেগুলোর প্রতি একান্ত মনোযোগ দেয়া এবং সুবিবেচনায় নেয়ার জন্যে আমি আপনার নিকট অনুরোধ করছি।

রাধাকিসেন মল্লিকের মাধ্যমে ক্লাইভকে "আরো কিছু বিষয় জানানো হয়েছিল, এই বিষয়গুলোর কোন রেকর্ড নেই। স্পষ্টতই আরো যে যে বিষয় জানানো হয়েছিল সেগুলোর প্রকৃতি এমন ছিল যে, তা কোন বৈরি ব্যক্তির হাতে পড়ে যায় কি না, তাই লিখিতভাবে জানানোটাই যথার্থ মনে হয়নি। আর তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হলো যে, কোলকাতায় নবাব সিরাজুদ্দৌলাহর গভর্ণর মাণিক চাঁদ, যার উপর নবাবকে ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা এবং আলাপ আলোচনার জন্যে বেশি নির্ভর করতে হতো, সেই মাণিক চাঁদ পূর্ব থেকেই ইংরেজদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। তিনি ইংরেজ সৈন্য সামন্তসহ ক্লাইভের নিরাপদে এসে পৌঁছার সংবাদ জানতে পেয়ে আনন্দিত হয়েছিলেন এবং এখন থেকে সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে কোম্পানীর পক্ষে কাজ করার জন্যে আরো দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন। তার চেয়ে ভাল কোন মিত্রের কথা ক্লাইভ চিন্তাও করতে পারেনি। ক্লাইভ রাধাকিসেনের মাধ্যমে সংবাদটি পাওয়ার স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং নবাব সিরাজুদ্দৌলাহকে লেখা গভর্ণর পিগটের একটি পত্র একই ব্যক্তির মাধ্যমে মাণিক চাঁদের নিকট পাঠান। তিনি দাক্ষিণাত্যের নবাব সালাবত জঙ্গ কর্তৃক নবাব সিরাজুদ্দৌলাহকে লেখা আরেকটি পত্র তার (মাণিক চাঁদের) অগ্রায়নপত্রসহ পাঠান। এই পত্রে গভর্ণর (পিগট) লিখেছিলেন-

এই পত্র পড়ার পর যদি এ দেশে কোন গোলযোগ দেখা দেয়, তবে এর জন্যে নবাবই (নবাব সিরাজুদ্দৌলাহ) দায়ী থাকবেন এবং তখন তা অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে খারাপ আকার ধারণ করবে।[১০০৭]

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পিগটের পত্রে স্পষ্টভাবেই যুদ্ধের হুমকি ছিল। মাণিক চাঁদ এ পর্যন্ত নবাবকে জানিয়ে আসছিলেন যে, ইংরেজদের

১০০৭ রাজা মাণিক চাঁদের নিকট ক্লাইভের পত্র, ২১ ডিসেম্বর ১৭৫৬; বি এম পি ২য় খন্ড।

যুদ্ধাংদেহী কোন মনোভাব নেই। এখন এরূপ শক্তভাবে লেখা পত্রটি নবাবের নিকট অগ্রায়ন করার ব্যাপারে তিনি বিব্রত বোধ করছিলেন। এরূপ বেকায়দা অবস্থায় মাণিক চাঁদ ২৩ ডিসেম্বর ১৭৫৬ তারিখে ক্লাইভকে লেখা একটি পত্রে নবাবকে লেখা পিগটের পত্রটিকে একটু সংশোধন করে তার নিকট পাঠাতে বলেন।[১০০৮] ক্লাইভ এরূপ কিছু পরিবর্তন করতে কঠোরভাবে অস্বীকার করেন এবং আরো লিখেন-

"নবাব আমাদের যা ক্ষতি সাধন করেছেন, আমরা তার ক্ষতিপূরণের দাবী জানানোর জন্যেই এসেছি; তার অনুগ্রহ ভিক্ষা করার জন্যে আসিনি। আমরা এমন একটি বাহিনী নিয়ে এসেছি যে, আমাদের দাবী প্রতিষ্ঠা করার জন্যে তা যথেষ্ঠ"।

৩. ইংরেজদের আক্রমণ এবং সিরাজুদ্দৌলাহর পতন

ক্লাইভ তার পত্র নওয়াবের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে কিনা, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন না। যেদিন তিনি উপরোক্ত পত্র লিখেছিলেন (২৫ শে ডিসেম্বর), সেদিনই তিনি যুদ্ধ শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি।[১০০৯] তার আক্রমণাভিযানের ক্রমপঞ্জি হচ্ছে - ২৯ ডিসেম্বর ইংরেজদের নৌ-বহর নদী পথে অগ্রসর হয় এবং তার পর দিন তারা বাজবাজ দখল করে নেয়। ৩১শে ডিসেম্বর থানা দুর্গও অধিকার করে এবং ১লা জানুয়ারী, ১৭৫৭ কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম পুনর্দখল করে। মাণিক চাঁদ, যিনি গোপনে গোপনে ইংরেজদের বন্ধুত্বের কথা বলতেন, তিনি তাদের বৈরী মনোভাব সম্পর্কে ভালভাবেই অবহিত ছিলেন, কিন্তু তিনি এই সব্ ঘটনার কোন কিছুই নওয়াবকে অবহিত করেননি বা ইংরেজদের দ্বারা পুনর্দখল করা স্থানগুলোর সুরক্ষার জন্যও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি, যদিও তার অধিনে যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্য ছিল। ফোর্ট উইলিয়াম পুনর্দখল করার পরে ক্লাইভ হুগলী আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এবং মাণিক চাঁদ তখন হুগলীতে পশ্চাদপসরণ করেছিলেন। ৮ই জানুয়ারী মাণিক চাঁদকে লিখিত এক পত্রে ক্লাইভ তাকে তার বন্ধুত্ব অব্যাহত রাখার আহবান জানান, যেরূপ বন্ধুত্ব এ পর্যন্ত প্রদর্শন করে আসছিলেন।[১০১০]একই দিন ক্লাইভ জগত শেঠ এবং খাজা ওয়াজিদকে পত্র লিখে তাদেরকে আহবান জানান যে, তারা যেন ইংরেজদের যে ক্ষতি হয়েছে, তা

[১০০৮] ক্লাইভের নিকট মাণিক চাঁদের পত্র, ২৩ ডিসেম্বর ১৭৫৬; বি এম পি ২য় খন্ড।

[১০০৯] ক্যালপ্যাট্রিকের নিকট লিখিত ক্লাইভের পত্র, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৭৫৬ -ঐ-

[১০১০] মাণিক চাঁদের নিকট ক্লাইভের পত্র, ৮ই জানুয়ারী, ১৭৫৭ -ঐ-

পূরণ করে দেয়ার জন্য নওয়াবকে রাজী করান এবং এই অনুরোধের সঙ্গে ছিল এইরূপ হুমকি:"আপনারা অবশ্যই শুনে থাকবেন যে, করোমণ্ডল উপকূলে আমরা আমাদের সাহসের কোন কমতি দেখাইনি এবং এই উপলক্ষে আরো বেশি নিবেদিত হওয়ার জন্য আমাদের আরো অনেক বেশি শক্তিশালী হওয়ার কারণ আছে ...।"[১০১১] ক্লাইভ অবশ্য এইসব ভদ্রলোকদেরকে জওয়াব দেয়ার কোন সুযোগ দেননি; এবং মাত্র ২ দিন পরে ১০ই জানুয়ারী, ১৭৫৭ হুগলি আক্রমণ ও দখল করে নেন। পুরো শহরই লুণ্ঠন করা হয় এবং "আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। ড্রেক এবং বেকারের ভাষায় এর উদ্দেশ্য ছিল "প্রদেশের সৈন্যদের মনে ভীতি সৃষ্টি করা এবং অসন্তুষ্টদেরকে পক্ষ ত্যাগ করে আমাদের পক্ষে যোগ দেয়ার জন্য উৎসাহিত করা"। মাণিক চাঁদ আগের মতই কোন প্রতিরোধ করেননি। বিদ্যমান নথিপত্র এবং ইংরেজদের সঙ্গে তার লিখিত পত্র মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি ইংরেজদের সঙ্গে যোগসাজশ করে এত দ্রুত এবং সহজে বাজবাজ, থানা, কলিকাতা এবং হুগলী পুণর্দখলে তাদেরকে সাহায্য করেছিলেন এবং উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। শুধু মাত্র হুগলী লুণ্ঠন করার পরে তিনি নওয়াবের নিকট লিখেন যে, তিনি গত জুনে যে ইংরেজদের পরাজিত করেছিলেন, বর্তমানে তাকে তাদের থেকে আলাদা ইংরেজ জাতির সঙ্গে মোকাবেলা করতে হচ্ছে। কলিকাতা পুনর্দখল এবং হুগলী ধ্বংসের খবর মুর্শিদাবাদে পৌঁছা মাত্রই সিরাজুদ্দৌলাহ এক বিরাট বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন এবং ২০শে জানুয়ারী, ১৭৫৭, হুগলীর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেন। তাঁর আগমনে ইংরেজরা সে স্থান থেকে পশ্চাদপসারণ করে এবং ফোর্ট উইলিয়ামে আশ্রয় গ্রহণ করে । কলিকাতার দিকে রওয়ানা দেয়ার আগে নওয়াব জর্জ পিগটকে লেখা তার পত্রের সহিত সঙ্গতি রেখে ২০শে জানুয়ারী এডমিরাল ওয়াটসনকে একটি পত্র লিখেন এবং তাতে তিনি বাংলায় ইংরেজদেরকে পুণরায় বসবাস করার অনুমতি দিতে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তবে শর্ত হল রজার ড্রেকের পরিবর্তে অন্য কাউকে তাদের প্রধান নিযুক্ত করতে হবে।[১০১২] ২৪ এবং ৩০ শে জানুয়ারী সিরাজুদ্দৌলাহ তাঁর একই ইচ্ছার কথা পুনরুল্লেখ করেন এবং আলাপ আলোচনার জন্য "একজন বিশ্বস্ত লোককে" পাঠানোর জন্য আহবান জানান।[১০১৩] এসব পত্র পেয়ে ক্লাইভও শান্ত হন এবং সিরাজুদ্দৌলাহকে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে দূরে রাখার জন্য ক্লাইভ নওয়াবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার জন্য তার মনোভাব প্রকাশ

[১০১১] জগৎশেঠ ও খাজা ওয়াজিদকে লেখা ক্লাইভের পত্র, ৮ই জানুয়ারী, ১৭৫৭ -ঐ-

[১০১২] হিল, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৩০-১৩১

[১০১৩] হিল, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৩৩, ১৮৪,

করেন।[১০১৪] নওয়াব ৩রা ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় প্রবেশ করেন। পরের দিন ক্লাইভ এবং ওয়াট্‌সন নওয়াবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য স্ক্রাফটন এবং ওয়ালস্‌ নামক দুজনকে তার শিবিরে প্রেরণ করেন। এই দু'ব্যক্তি অযৌক্তিকভাবে আশংকা করে যে, সিরাজুদ্দৌলাহ তাদেরকে আটক করবে এবং পরের দিন ভোরে অকস্মাৎ ফোর্ট উইলিয়াম আক্রমণ করবে। অতএব, তারা রাতের বেলা নওয়াবের শিবির থেকে পালিয়ে এসে তাদের ভুল ধারণা ক্লাইভের নিকট ব্যক্ত করে। তাদের আশংকা ছিল ভিত্তিহীন, কারণ এমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে, ইংরেজ দূতদ্বয়কে আটক করার জন্য নওয়াবের মতলব ছিল। এই ধারণাটি তাঁর বার বার আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করার প্রস্তাবেরও বিপরীত। তদুপরি, তিনি যদি ইংরেজদেরকে হঠাৎ আক্রমণ করার ইচ্ছা পোষণ করতেন, সেক্ষেত্রে দূতদেরকে আটক করে রাখলে তার হঠাৎ আক্রমণের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেত। তাতে তারা সতর্ক হয়ে যেত। কারণ স্ক্রাফটন এবং ওয়ালসের যদি পরের দিন ভোরের পূর্বেই দুর্গে ফিরে আসার সময় নির্ধারিত থাকত এবং সেক্ষেত্রে যদি তারা না ফিরতো, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হত। অপরপক্ষে, যদি তাদেরকে নওয়াবের শিবিরেই রাত যাপনের সময় সূচী নির্ধারিত থাকত, সেক্ষেত্রে তো আটক করে রাখার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

সিরাজুদ্দৌলাহর যে এ ধরণের কোনই ইচ্ছা ছিল না, তা পরের দিনের ঘটনা থেকে পরিস্কার হয়ে যায়। যখন স্ক্রাফটন ও ওয়ালসের তথ্যের ভিত্তিতে পরের দিন ৫ই ফেব্রুয়ারী ভোরে ক্লাইভ আকস্যাৎ নওয়াবের শিবির আক্রমণ করেন, তখন তিনি বিস্মিত হন।[১০১৫] এমন কি এই ধরণের উস্কানীর পরেও সিরাজুদ্দৌলাহ আলাপ-আলোচনা ভেঙ্গে দেননি। অবশেষে ৯ই ফ্রেব্রুয়ারী উভয় পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। আলী নগরের সন্ধি নামে অভিহিত এই চুক্তির মাধ্যমে নওয়াব ইংরেজদেরকে ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দের ফরমান দ্বারা যে সকল গ্রামের মালিকানা দেয়ার কথা ছিল, তা দিতে সম্মত হন। সকল প্রকার শুল্ক থেকে তাদের পণ্যকে অব্যাহতি এবং কলিকাতাকে সুরক্ষিত করা এবং সেখানে একটি টাকশাল স্থাপনেরও অনুমতি দেন।[১০১৬]

এইভাবে আলীনগরের সন্ধিদ্বারা ইংরেজদের দাবী অনুযায়ী সকল সুবিধা নিশ্চিত করা হয়। সিরাজুদ্দৌলাহর জন্য এইরূপ একটি অবমাননাকর চুক্তি

১০১৪ হিল, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৮৩-২০৮

১০১৫ হিল ৩য় খন্ড, পৃঃ ৩৮,৩৯, ৩১০

১০১৬ হিল ২য় খন্ড, পৃঃ ২১৫-১৭

সম্পাদনের পেছনের কারণ ছিল আহমদ শাহ আবদালী কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণের গুজব এবং এছাড়া সম্ভবত, মাণিক চাঁদের মত তাঁর নিজস্ব কর্মকর্তার বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণও দায়ী। নওয়াব অবশ্যই উপলব্ধি করে থাকবেন যে, মাণিক চাঁদ ও তার মত অন্যান্যদের গোপনে ইংরেজদের সাহায্য করার ফলে তাঁর পক্ষে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী শর্ত ইংরেজদের উপর চাপিয়ে দেয়া সম্ভব হবে না। অপরদিকে, ইউরোপে ফরাসীদের সঙ্গে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হওয়ার খবর পৌঁছার পর ক্লাইভও সে সময় নওয়াবের সাথে বৈরিতা বন্ধ করা যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। তিনি আশংকা করছিলেন যে, তাকে হয়ত মাদ্রাজে ডেকে পাঠানো হবে এবং তিনি যদি নওয়াবের সঙ্গে কোন সন্ধি না করেন, তাহলে হয়ত তিনি ফরাসীদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করবেন। সেক্ষেত্রে বাংলায় ইংরেজদের অবস্থান অত্যন্ত করুন হয়ে দাঁড়াবে।

ক্লাইভের দিক থেকে ৯ ই ফেব্রুয়ারীর সন্ধি ছিল একটি সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। তিনি খুব ভাল ভাবে জানতেন যে, বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার জন্য সিরাজুদ্দৌলাহকে মসনদ থেকে অপসারণ এবং ফরাসীদেরকে বাংলা থেকে বিতাড়িত করা প্রয়োজন। প্রথম লক্ষ্য পূরণ করার জন্য তিনি বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার সংবাদ পৌঁছায় তাকে তার এই পরিকল্পনা সংশোধন করতে হয় এবং তাকে অবিলম্বে দ্বিতীয় লক্ষ্য অর্জন অর্থাৎ ফরাসীদেরকে বহিস্কারের জন্য সেদিকে তার মনোযোগ দিতে হয়। বস্তুতঃ ৯ই ফেব্রুয়ারীর সন্ধি করার পর পরই ক্লাইভ ফরাসীদের চন্দননগর উপনিবেশ আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে তিনি চন্দন নগর আক্রমণের প্রস্তাব সম্পর্কে নওয়াবের সমর্থন অন্ততপক্ষে তাঁর পরোক্ষ সম্মতি আদায় করার জন্য উমিচাঁদ এবং ওয়াটসকে সিরাজুদ্দৌলাহর দরবারে প্রেরণ করেন।[১০১৭] ক্লাইভের পক্ষ থেকে এটা ছিল একটা চাতুরীপূর্ণ পদক্ষেপ, যা নওয়াবকে বিপাকে ফেলে দেয়। যদি তিনি ইংরেজদের এই প্রস্তাবে সাড়া দেন, তাহলে তিনি নিজেই নিজ রাজ্যের মধ্যে নিরপেক্ষতা লঙ্ঘন করবেন এবং ফরাসীদের বিপক্ষে ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করার জন্য অভিযুক্ত হবেন। অপরদিকে যদি তিনি সাড়া না দেন, তাহলে তিনি ইংরেজদের প্রতি অবন্ধুসুলভ আচরণ, এমনকি ফরাসীদের সঙ্গে গোপনে মৈত্রী স্থাপন করার জন্যও অভিযুক্ত হতে পারেন। এখনই দেখা যাবে যে, ক্লাইভ অবিলম্বে শেষের দুটো অভিযোগই নওয়াবের বিরুদ্ধে উত্থাপন করেন।

১০১৭ নওয়াবের নিকট ক্লাইভের লিখিত পত্র থেকে উদ্ধৃত, ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৭, হিল ২য় খন্ড, পৃঃ ২৩৬

সিরজুদ্দৌলাহ ন্যায়সঙ্গতভাবেই ক্লাইভের প্রস্তাবে সম্মত হতে অস্বীকার করেন এবং পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ তিনি তাঁর রাজ্যের মধ্যে নিরপেক্ষতা বলবৎ করতে সাধ্যমত চেষ্টা করেন।[১০১৮] যখন তাঁর সকল শান্তিপূর্ণ পদক্ষেপ ব্যর্থ হয়, তখন তিনি নিরপেক্ষতা বলবৎ করতে শেষ চেষ্টা স্বরূপ তাঁর নিজ বাহিনী মোতায়েন করতে সিদ্ধান্ত করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর সেনাপতি নন্দ কুমারকে নির্দেশ দেন যে, "যদি ইংরেজরা চন্দর নগর আক্রমণ করে তাহলে, তিনি যেন তার সকল শক্তি দিয়ে ফরাসীদেরকে সাহায্য করেন। আর যদি ফরাসীরা ইংরেজদেরকে আক্রমণ করে তাহলে তিনি একইভাবে ইংরেজদেরকে সাহায্য করবেন যেন, তাঁর রাজ্যের মধ্যে কোন বিবাদ বিসম্বাদ না ঘটে।"[১০১৯] ইংরেজরা অবশ্য দশ বা বার হাজার টাকা দিয়ে নন্দ কুমারকে কিনে নেয়।[১০২০] ফলে নওয়াবের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। তারা তাঁর সেক্রেটারী এবং গোয়েন্দা প্রধানকেও ঘুষ দেয় এবং এইভাবে তাঁর গোপন যোগাযোগ ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতেও সক্ষম হয়।[১০২১] বাস্তবিকপক্ষে মাণিক চাঁদ এবং জগত শেঠের সহায়তায় ক্লাইভ ঘুষ এবং চক্রান্তের জাল এমন ব্যাপকভাবে বিস্তার করতে সক্ষম হয় যে, সিরাজুদ্দৌলাহর পক্ষে কোন কঠোর নীতি অনুসরণ করা একবোরেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। জগত শেঠের চক্র সম্ভাব্য সকল উপায়ে তাদের প্রভাবকে প্রয়োগ করে এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোন কঠোর নীতি গ্রহণ ও অনুসরণ করা থেকে নওয়াবকে বিরত রাখার জন্য তাদের শক্তি অনুযায়ী সব কিছুই করে। যখনই তিনি কিছু করার বিষয়ে চিন্তা করেন, তখনই এই পদস্থ ব্যক্তিগণ যুক্তি দেখাতেন যে, ইংরেজদের বিরক্ত না করাটাই সুবুদ্ধির কাজ।"[১০২২] ঠিক এই সময় এই সংকট মূহুর্তে আহমদ শাহ আবদালীর বিহারের দিকে এগিয়ে আসার খবরে সিরাজুদ্দৌলাহ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। শেঠ এবং বানিয়া চক্র ইংরেজদের দিক হতে নওয়াবের দৃষ্টিকে আবদালী ভীতির দিকে ঘুরিয়ে দেন। তারা এই কাজে এত বেশি সফল হয় যে, সিরাজুদ্দৌলাহ তাঁর বাহিনীর শুধু উত্তম অংশকে বিহার সীমান্তে মোতায়েন করে রেখেছিলেন এবং এরূপ পদক্ষেপ তাঁকে ইংরেজদের নিকট দূর্বল করে তুলেছিল। এমনকি তিনি আবদালীর আক্রমণের হুমকি প্রতিহত

[১০১৮] হিল ২য় খন্ড, পৃঃ ২২২-২৩১, ২৩৬,২৪০,২৪৫-২৪৬,২৬৪,২৬৮-২৬৯

[১০১৯] ক্লাইভের নিকট ওয়াটসের লেখা পত্র ১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৭, হিল ২য় খন্ড, পৃঃ ২২৮; সিক্রেট কমিটির নিকট ক্লাইভের লেখা পত্র, ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৭, হিল পৃঃ ২৪০

[১০২০] ক্লাইকে লেখা ওয়াটসের পত্র, ১৮ ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৭ হিল পূর্বোক্ত।

[১০২১] ল' এর স্মৃতি কথা, হিল, ৩য় খন্ড টীকা-১৯১

[১০২২] ল' এর স্মৃতি কথা, হিল, ৩য় খন্ড টীকা-১৯৭-৯৯

করার জন্য তাদের সাহায্যও কামনা করেন।[১০২৩] সিরাজুদ্দৌলাহর সংকটজনক অবস্থা ক্রমাগতভাবে ক্লাইভের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়ক হয়ে উঠে।

এই অবস্থায় ৫ই মার্চ চ্যাম্বারল্যাণ্ড জাহাজ যোগে নতুন করে আরো এক দল সৈন্য এসে পৌঁছে।[১০২৪] এই নতুন সৈন্যদল আসায় ক্লাইভের সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হয়। ৮ই মার্চ তিনি চন্দরনগরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন এবং ১৪ই মার্চ তা অবরোধ করেন। ফরাসীদের উপর যে কোন রকম আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য সিরজুদ্দৌলাহ রায় দূর্লভ রাম এবং মীর মদনের অধিনে এক সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা পৌঁছার পূর্বেই ক্লাইভ ফরাসীদেরকে বাধ্য করেন আত্মসমর্পণ চুক্তি স্বাক্ষর করতে এবং চন্দর নগর তাদের নিকট সমর্পণ করে সে স্থান ত্যাগ করতে এবং বাংলায় তাদের সকল কুঠি এডমিরাল ওয়াটসন এবং নওয়াবের নিকট হস্তান্তর করে দিতে।[১০২৫]

চন্দরনগর দখল করেই ক্লাইভ সিরাজুদ্দৌলাহর নিকট ফরাসীদেরকে বাংলা থেকে "সমূলে বহিস্কার" করার জন্য কর্তৃত্বপূর্ণভাবে "কঠোর জোটবদ্ধ" আচরণ দাবী করেন।[১০২৬] নওয়াব সর্বদা "আহমদ শাহ্ আবদালীর ভীতিতে" থাকায় তাঁর দরবার থেকে ফরাসীদের প্রতিনিধি জীন ল'কে বিদায় করে ইংরেজদেরকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করেন। এতে ক্লাইভ সন্তুষ্ট হননি, তিনি এখন ২০ শে এপ্রিল জীন ল'কে অনুসরণ এবং তাকেসহ ফরাসীদের আরো যে সকল লোক পাটনায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদেরকে ধরার জন্য কোম্পানীর ২০০০ (দুই হাজার) সৈন্য স্থল পথে পাটনায় যাওয়ার জন্য সিরজুদ্দৌলাহর অনুমতি চান।[১০২৭] এটা দিতে সিরাজুদ্দৌলাহ অস্বীকার করেন। তাই ক্লাইভ ফরাসীদের সঙ্গে তাঁর যোগাসাজশের অভিযোগ উথাপন করেন। প্রকৃতপক্ষে, ক্লাইভ এই সময় বাংলার মসনদ থেকে সিরাজুদ্দৌলাহকে অপসারণ করে তাদের মনোনীত একজনকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করার জন্য সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। এর মাত্র তিন দিন পরে ২৩ শে এপ্রিল, ১৭৫৭, ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলের সিলেক্ট কমিটি সিরজুদ্দৌলাহকে অপসারণ করার জন্য অফিসিয়াল রীতিমাফিক এক প্রস্তাব গ্রহণ করে।[১০২৮]

১০২৩ ওয়াটসকে লেখা সিরাজুদ্দৌলাহর পত্র হিল ২য় খন্ড, পৃঃ ২৪১

১০২৪ অর্ম, মিলিটারী ট্রান্স্যাকশন, ২য় খন্ড ১৪২-১৪৩; ল'এর স্মৃতি কথা, পূর্বোক্ত, ২৭১

১০২৫ হিল, ২য় খন্ড, ২৯২-২৯৩

১০২৬ পিগট এবং সিরাজুদ্দৌলাহর নিকট ক্লাইভের পত্র, ২৯ শে মার্চ, ১৭৫৭, হিল ২য় খন্ড, ৩০৩-৩০৪

১০২৭ সিরজুদ্দৌলাহকে লেখা ওয়াটসনের পত্র, ১৯ শে এপ্রিল, ১৭৫৭, এবং সিরজুদ্দৌলাহকে লেখা ক্লাইভের পত্র, ২০ শে এপ্রিল, ১৭৫৭ হিল, পৃঃ ৩৪৫, ৩৪৮-৩৪৯

১০২৮ হিল, ২য় খন্ড, ৩৬৮

তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অজুহাত হিসেবে তারা নওয়াবের বিরুদ্ধে ৯ই ফেব্রুয়ারী চুক্তির শর্তাবলী পালনে তাঁর ব্যর্থতার অভিযোগ তুলতে শুরু করেন। যদিও মাত্র এক মাস পূর্বে ২৯ শে মার্চ ক্লাইভ নিজেই মাদ্রাজে তার উর্দ্বতন কর্মকর্তাদের নিকট লিখেছিলেন যে, নওয়াব "ইতিমধ্যেই চুক্তির প্রায় সকল শর্তই বাস্তবায়ন করেছেন; ওয়াটসকে তিন লক্ষ টাকা প্রদান করেছেন; কাশিমবাজার এবং অন্যান্য সকল কুঠি ও অর্থসহ যে সকল পণ্য আটক করেছিলেন, তা সবই প্রত্যার্পণ করেছেন।[১০২৯] নওয়াব পূর্বেই কলিকাতার নিকটস্থ ৩৮টি গ্রাম ইংরেজদেরকে ফেরত প্রদান করার জন্য আদেশ প্রদান করেছিলেন এবং ফোর্ট উইলিয়ামে তাদের মুদ্রা তৈরী করার অনুমতি দিয়েছিলেন।[১০৩০]

নওয়াবের বিরুদ্ধে এসব ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপনের পাশাপাশি তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ক্লাইভ জগতশেঠ, রায় দূর্লভ এবং উমিচাঁদের সঙ্গে এক চক্রান্তে লিপ্ত হন। শেঠ ভাইদের পরামর্শে নওয়াবের বখশী (সেনাবাহিনীর বেতন প্রদানের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা) মীর জাফরকে নওয়াবী পদের জন্য বাছাই করা হয় এবং মীর জাফরও তার ২জন সমর্থক যথা, মির্যা আমীর বেগ এবং খাদিম হোসেন খান তাদের অধিনস্থ সৈন্য নিয়ে প্রস্তাবিত অভ্যুত্থানকে সাহায্য বা মদদ দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন। ১ লা মে থেকে ৩রা জুন, ১৭৫৭ সময়ের মধ্যে মীর জাফর ও ইংরেজদের মধ্যে সম্পাদিত চূক্তির শর্তাবলী নির্ধারণ এবং চূড়ান্ত করা হয়। শেষের দিকে উমিচাঁদের মনোভাবে কিছুটা জটিলতা সৃষ্টি হয়। তিনি এই চক্রান্তের কথা নওয়াবের নিকট প্রকাশ করে দেয়ার হুমকি দিয়ে সিরাজুদ্দৌলাহর কোষাগারে সঞ্চিত অর্থের ৫% নিজের জন্য দাবী করে বসেন। বিশ্বাসঘাতককে একই মুদ্রায় পরিশোধ করতে ক্লাইভের বিবেকে বাধেনি। তিনি দুপক্ষের মধ্যে স্বাক্ষরের জন্য একটি জাল চূক্তি প্রস্তুত করান এবং উমিচাঁদকে ২০,০০০.০০ (বিশ হাজার) টাকা প্রদান করার শর্ত লিপিবদ্ধ করে তাতে নিজেই ওয়াটসনের স্বাক্ষর জাল করেন। আসল চূক্তিতে মীর জাফর কোম্পানীকে ৯ই ফেব্রুয়ারী সম্পাদিত চূক্তি মোতাবেক সকল সুবিধা প্রদান করতে অঙ্গীকার করেন; তদুপরি অন্যান্যের মধ্যে তিনি ক্ষতিপূরণ বাবদ কোম্পানীকে ১ কোটি টাকা, ইউরোপীয়দের ৫০ লক্ষ টাকা, হিন্দু ভদ্রলোকদের ২০ লক্ষ টাকা এবং আগের বৎসর সিরাজুদ্দৌলাহর কলিকাতা দখলের কারণে ক্ষতিপূরণের জন্য আর্মেনিয়ানদের ৭ লক্ষ টাকা প্রদান করার অঙ্গীকার করেন। মীর জাফর

[১০২৯] ড পগটের নিকট ক্লাইভ, ২৯ শে মার্চ, ১৭৫৭ হিল পৃঃ ৩০৩

[১০৩০] ফোট উইলিয়াম সিলেক্ট কমিটিকে ওয়াট্‌স ১০ই মার্চ ১৭৫৭ হিল পৃঃ ২৭৮

কলিকাতা এবং এর দক্ষিণের সমগ্র এলাকা "স্থায়ীভাবে ইংরেজদের শাসনাধীনে ন্যস্ত" করতে রাজী হন। তাছাড়াও তিনি "দেশী বা ইউরোপীয় সকল শত্রুর বিরুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে একটি আক্রমণাত্মক এবং আত্মরক্ষামূলক মৈত্রী স্থাপন করতেও অঙ্গীকার করেন" এবং নওয়াব যখন কোম্পানীর অন্যান্যদের কোন কাজে নিয়োজিত করবেন, তখন তাদের ব্যয় বহন করবেন।[১০৩১]

ইতিমধ্যে আহমদ শাহ আবদালীর ভারত ত্যাগের খবরে সিরাজুদ্দৌলাহ অনেকটা স্বস্তি লাভ করেন এবং ইংরেজরা যদি ফরাসীদের খোঁজে উত্তর দিকে যাত্রা করে তাহলে তাদের প্রতিরোধ করার জন্য মীর জাফরকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে পলাশীর দিকে অগ্রসর হওয়র জন্য নির্দেশ দেন। যেহেতু তখন মীর জাফর ও শেঠদের সঙ্গে আলোচনা চলছিল মাত্র, চূড়ান্ত হয়নি। তাই ক্লাইভ চন্দরনগর থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে সিরাজুদ্দৌলাহর সন্দেহের উদ্রেক করা থেকে বিরত থাকাকে সমীচিন মনে করলেন।[১০৩২] অন্যদিকে, মীর জাফর এই অভ্যুত্থান ঘটানো ত্বরান্বিত করার জন্য ক্লাইভ এবং তার সহকর্মীদেরকে আরো অতিরিক্ত ৫২ লক্ষ টাকা প্রদান করতে প্রতিশ্রুতি দেন। চুক্তি চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত করে এবং মীর জাফরের স্বাক্ষর ও সীল দিয়ে ১০ই জুন, ১৭৫৭ তারিখে ক্লাইভের নিকট হস্তান্তর করা হয়। এর তিন দিন পরে (১৩ই জুন) ক্লাইভ সিরাজুদ্দৌলাহর বিরুদ্ধে সন্ধির শর্তাবলী পালনে ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে তাঁর নিকট এক চরম পত্র প্রেরণ করেন এবং তিনি (সিরাজ) সন্ধির বাধ্য বাধকতা মেনে চলছেন কিনা, সে সম্পর্কে মীর জাফর, জগত শেঠ, রায় দুর্লভ, মীর মদন এবং মোহন লালের মতামত যাচাই করার জন্য দাবী তোলেন।[১০৩৩] একই সময়ে ক্লাইভ তার বাহিনীকে মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। সিরাজুদ্দৌলাহ ক্লাইভকে মোকাবেল করার জন্য পলাশীর অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে ২৩ জুন, ১৭৫৭ তারিখে যুদ্ধে ক্লাইভ বিজয়ী হন। তবে বীরত্বপূর্ণভাবে যুদ্ধ করে নয়, মীর জাফর, রায় দুর্লভ রাম এবং তাদের দলভুক্তদের বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে; শেষোক্তরা তাদের অধিনস্থ সৈন্যদেরকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতেও দেননি। সিরাজুদ্দোলাহ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন। সম্ভবত: বিহার সীমান্তে মোতায়েনরত তাঁর সৈন্যদেও সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য উত্তর দিকে যাত্রা করেণ। পথিমধ্যে হতভাগ্য নবাব মীর জাফরের জনৈক সমর্থকের হাতে ধৃত হন এবং তাকে বন্দী হিসাবে

১০৩১ হিল ২য় খন্ড ৩৮৩-৩৮৫

১০৩২ সিরাজুদ্দৌলার নিকট ক্লাইভ ২ রা মে ১৭৫৭ ঐ পৃ ৩৭২

১০৩৩ সিরাজুদ্দৌলার প্রতি ক্লাইভ ১৩ই জুন ১৭৫৭ ঐ পৃ ৪০৫-৪০৭

মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসা হয়। সেখানে ২৯ শে জুন, ১৭৫৭ ক্লাইভ মীর জাফরকে বাংলার নওয়াবের মসনদে আসীন করান এবং ৩ দিন পরে ২রা জুলাই, খুব সম্ভব ক্লাইভ ও মীর জাফরের উস্কানীতে মীর জাফরের পুত্র মিরন কর্তৃক সিরাজুদ্দৌলাহ নিহত হন। তখন মীর জাফর ও ক্লাইভ উভয়েই মুর্শিদাবাদে উপস্থিত ছিলেন এবং ক্ষমতাচ্যুত নওয়াবের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্বসহ রাজধানীর পুরো নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতেই ছিল।

৪. সিরাজুদ্দৌলাহর পরাজয় এবং নিহত হওয়া

সিরাজুদ্দৌলাহর পরাজয় এবং নিহত হওয়া এবং ক্লাইভের তত্ত্বাবধানে ক্রীড়নক নওয়াব হিসেবে মীর জাফর বাংলার মসনদে আরোহণের সঙ্গে বাংলায় ইংরেজদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা সম্ভব হয়েছিল কতগুলো ধারাবাহিক ঘটনা পরম্পরার চূড়ান্ত ফল হিসেবে। আস্তে আস্তে মোগল সাম্রাজ্যের ভেঙ্গে পড়া, পূর্ববর্তী শতাব্দীর ভৌগলিক আবিস্কারের পরিণতি হিসেবে ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক ও উপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বাংলায় একটি হিন্দু সম্পদশালী ও প্রভাবশালী বণিক শ্রেণীর উদ্ভব, যারা ১৭২৭ সালে মুর্শিদ কুলী খানের মৃত্যুর পর থেকে বাস্তবিকভাবেই বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ব করেছিল, ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গোমস্তাদের দক্ষিণ এশিয়ার এই উপমহাদেশের উপর বাণিজ্যিক এবং উপনিবেশিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার সংকল্প এবং প্রয়াস। সিরাজুদ্দৌলাহ এই পরিস্থিতিরই শিকার হয়েছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে সাধারণত তাঁর বিরুদ্ধে অনেক কুৎসা প্রচার করা হয়েছে এবং তাঁর পতনের জন্য তাঁকেই দায়ী করা হয়েছে। এটা সহজেই বোধগম্য; কারণ তাঁর পতনের পরে প্রায় ২০০ বৎসর তাঁর বিরোধীরাই ক্ষমতাসীন ছিলেন এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁর সম্পর্কে মতামতকে প্রভাবান্বিত করেছেন। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, তাঁর পক্ষ হতে আমাদের নিকট কোন দলিল নেই। দলিল পত্র যা পাওয়া গিয়েছে তা সবই তাঁর বিরোধী পক্ষ হতে। এই "উৎসের" উপর অনিবার্য নির্ভরতার ফল দাঁড়িয়েছে পতিত নওয়াব সম্পর্কে প্রায় সমভাবে একটি বিরূপ চিত্র অংকন করা।

সিরাজুদ্দৌলাহর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহের মূল উৎস হচ্ছে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য অফিসিয়াল পদ্ধতিতে প্রস্তাব গ্রহণের ঠিক এক সপ্তাহ পরে অর্থাৎ ১লা মে, ১৭৫৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ামের সিলেক্ট কমিটির একটি সভার সিদ্ধান্তসমূহ। ১লা মে'র এই সভায় তারা সিরাজুদ্দৌলাহকে

ক্ষমতাচ্যূত করার জন্য তাদের চক্রান্তের সমর্থনে নিম্নোক্ত যুক্তিসমূহ দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন–

ক) তিনি ছিলেন অসৎ এবং ইংরেজদের প্রতি অত্যাচারী;

খ) তিনি ফরাসীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছেন, যার অর্থ হচ্ছে তিনি প্রথম সুযোগেই ইংরেজদের সঙ্গে সম্পাদিত সন্ধি ভঙ্গ করবেন; এবং

গ) তিনি বাংলার জনগণের নিকট অপ্রিয় হয়ে পড়েছেন, সেজন্য যে কোন উপায়েই হোক, একটি বিপ্লব ঘটে যাবে।[১০৩৪]

স্পষ্টত এই যুক্তিগুলোর ধরণই হচ্ছে এই রকম যে, ইংরেজ কুঠিয়ালগণ নিজদেরকে অভিযোগ থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছেন। সিরাজুদ্দৌলাহ ইংরেজ বণিকদেরকে উৎপীড়ন করেননি, এমনকি কাশিমবাজার কুঠি দখল করার পরও তিনি তাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করেননি। ক্লাইভ এবং ওয়াটসের স্বীকৃতি অনুযায়ীই সিরাজুদ্দৌলাহ বাংলায় ইংরেজদের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, তা সব পূরণ করে দিয়েছিলেন এবং ১৭৫৭ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারীর চুক্তির শর্তসমূহ বিশ্বস্ততার সঙ্গে বাস্তবায়ন করেছেন। তদুপরি তিনি ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সাথে তার বিনিময়কৃত সকল পত্রে বারবার উল্লেখ করেছেন যে, বাংলা থেকে তাদের বহিস্কার করার কোন ইচ্ছা তাঁর নেই এবং তিনি তাদের পূর্বের সকল সুযোগ-সুবিধা পুণর্বহাল করতে প্রস্তুত, যদি তারা তাদের বাণিজ্যিক সুবিধার অপব্যবহার না করতে রাজী হয় এবং নওয়াবের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন না করে। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ বণিকরাই তাদের বাণিজ্যিক সুবিধার ব্যাপকভাবে অপব্যবহার করেছে এবং স্পষ্টভাবে ও পরিকল্পিতভাবে তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নওয়াবের সুনির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে তারা চুপিসারে কলিকাতাকে সুরক্ষিত করতে শুরু করে এবং আইনের হাত থেকে পলাতকদের আশ্রয় দিয়ে তারা নওয়াবের অবাধ্য হয়েছেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তথাকথিত "ফরাসী বিপদ" থেকে নিরাপত্তার জন্য তাদের দুর্গ নির্মাণের কোন প্রয়োজন ছিল না, এর পিছনে তাদের লক্ষ্য ছিল বাংলায় একটি "বিপ্লব" ঘটানো, যে উদ্দেশ্যে ইংরেজরা সিরাজুদ্দৌলাহর মসনদে আরোহণ করার পূর্ব থেকেই পরিকল্পনা করে আসছিল এবং নওয়াবের প্রতি বৈরী প্রজাদের কোন একটি দলের সঙ্গে হাত মিলানোর বিষয়ে চিন্তা করছিল।

[১০৩৪] হিল, ২য় খন্ড, ৩৭০-৩৭১

অনুরূপভাবে সিরাজুদ্দৌলাহর বিরুদ্ধে ফরাসীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগও বিভ্রান্তিমূলক। আসলে তিনি যা করেছিলেন, তা হল তিনি ক্লাইভের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে ফরাসীদের বিরুদ্ধাচারণ করেননি এবং ইংরেজদের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেননি। একজন স্বাধীন শাসকের ধারণার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তিনি তাঁর রাজ্যের মধ্যে নিরপেক্ষতা বলবৎ রাখার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ক্লাইভ নওয়াবের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে এবং তাঁর আবদালী ভীতি এবং ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে আগ্রাসীভাবে ফরাসীদের চন্দরনগর উপনিবেশ আক্রমণ করে এবং দখল করে নেয়। এই পরিস্থিতিতে সিরাজুদ্দৌলাহকে তাঁর রাজ্যের আঞ্চলিক অখন্ডতা লজ্ঞনকে হজম করতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি তাঁর রাজ্যের মধ্যে ইংরেজদের দ্বারা ফরাসীদেরকে তাড়িয়ে বেড়ানোর অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। এটা মনে হচ্ছে যে, ক্লাইভের এই আগ্রাসনমূলক আচরণের প্রেক্ষিতে নওয়াব দক্ষিণ ভারতের ফরাসী জেনারেল বুসীর নিকট বাংলায় ফরাসীদের উদ্ধারের লক্ষ্যে এগিয়ে আসার জন্য লিখেছিলেন। এই পত্রটি ইংরেজদের হস্তগত হয় এবং পরে তারা এটাকে ফরাসীদের সঙ্গে সিরাজুদ্দৌলাহর চক্রান্তের প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করে। এই পত্রটি যদি আসল বলেও ধরা হয়, তথাপি এটা পরিস্কার যে, নওয়াবের এ কাজগুলো ছিল তাঁর রাজ্যের মধ্যে ক্লাইভ কর্তৃক নিরপেক্ষতা লজ্ঞনের পরবর্তী পদক্ষেপ। ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করে বস্তুত ইংরেজরা নওয়াবের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছিল এবং তিনি তাঁর রাজ্যের মধ্যে ফরাসীদের রক্ষার জন্য যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, তা নৈতিক ও আইনগত উভয় দিক দিয়েই ছিল বৈধ ও যুক্তিসঙ্গত।

এইরূপ যুক্তিরও কোন অবকাশ নেই যে, ইংরেজরা যদি ফরাসীদেরকে আগেই প্রতিহত না করত, তাহলে তারাও ইংরেজদেরকে আক্রমণ করত। তখন নওয়াব তাদেরকে বাধা দিয়ে রুখতে পারতেন না। ফরাসীরা বাংলায় ছিল দূর্বল এবং এমন কোন দলিল-পত্র পাওয়া যায়নি, যা থেকে বুঝা যায় যে, তারা বাংলায় ইংরেজদেরকে আক্রমণ করার কোন রকম চিন্তা-ভাবনা করেছিল বা কোন প্রচেষ্টা নিয়েছিল। যদি এই বিষয়গুলো লক্ষ্য করা যায় যে, ইংরেজরা ইতিমধ্যেই নিরপেক্ষতা এবং নওয়াবের সঙ্গে তাদের প্রতিষ্ঠিত সমঝোতার শর্ত লজ্ঞন করেছে এবং তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে এবং এই. পদক্ষেপকে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ করে তাদের বিবেককে আশ্বস্ত করার জন্য বলেছে যে, সিরাজুদ্দৌলাহ "প্রথম সুযোগেই তাদের সঙ্গে সম্পাদিত সন্ধিকে ভঙ্গ করবে," এক্ষেত্রে সিরাজুদ্দৌলাহর বিরুদ্ধে তাদের উত্থাপিত অভিযোগসমূহের স্ববিরোধিতা

সহজেই চোখে পড়ে। এটা পরিস্কার যে, তিনি এ পর্যন্ত ইংরেজদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করেননি, অথচ তারা ইতিমধ্যেই তা করেছে।

অনুরূপভাবে বাঙালি জনগণের নিকট সিরাজুদ্দৌলাহ অপ্রিয় হয়ে যাওয়া বলতে বুঝানো হচ্ছে জগত শেঠ-উমিচাঁদ চক্রের নিকট অপ্রিয় হওয়া। তারা মুর্শিদ কূলী খানের সময় থেকেই রাষ্ট্রের সকল গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো দখল করে রেখেছিলেন। লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, সিরাজুদ্দৌলাহকে কলিকাতার প্রশাসন এবং ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার বিষয়ে নির্ভর করতে হতো মাণিক চাঁদের উপর। আহমদ শাহ আবদালীর আক্রমণের হুমকি থেকে বিহারের সীমান্ত রক্ষার জন্য নির্ভর করতে হত রাজা রামনারায়নের উপর, তাঁকে তাঁর রাজ্যের মধ্যে সামরিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখা এবং ফরাসীদেরকে আক্রমণ করা থেকে ইংরেজদেরকে বিরত রাখার জন্য নির্ভর করতে হয় নন্দ কুমার, রায় দূর্লভ রাম এবং মীর মর্দানের উপর এবং পূর্বাঞ্চলীয় জেলাসমূহের রাজস্ব প্রশাসনের জন্য নির্ভর করতে হতো রাজা রাজ বল্লভের উপর।

এটা পরিস্কার যে, এই সকল লোকের সহযোগিতা ব্যতীত সিরাজুদ্দৌলাহর পক্ষে সফল হওয়া ছিল কঠিন, এমন কি অসম্ভব। এমন কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই যে, যা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি তাদেরকে অসন্তুষ্ট করার জন্য কোন কিছু করেছেন। বরং আগেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে যে, তারা রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক কারণে ইংরেজদের সঙ্গে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজদের সঙ্গে তাদের এই মৈত্রীই ছিল সিরাজুদ্দৌলাহর পতনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ। তাঁর শাসনের শুরুতে তিনি যেভাবে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঘষেটি বেগম ও শওকত জংদের সামাল দিয়েছিলেন, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর সাহস ও দৃঢ়তার কোন অভাব ছিল না, যদিও কেউ কেউ এরূপ বলেছেন। পরবর্তীকালে ইংরেজদেরকে মোকাবেলা করার সময় তাঁর যে দোদুল্যমানতা এবং বাহ্যিক দূর্বলতা দেখা গেছে, তা ব্যাখ্যা করা যাবে শুধু তাঁর বিশ্বস্ত ও প্রভাবশালী কর্মকর্তাগণের (মাণিক চাঁদ, জগৎ শেঠ, রায় দূর্লভ রাম প্রমুখ) অনান্তরিকতা ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক ধারাবাহিক কর্মকাণ্ডের পটভূমি বিবেচনায় আনলে। এইভাবে ইংরেজদের কলিকাতা পুনর্দখল প্রতিহত করতে সিরাজুদ্দৌলাহর ব্যর্থতা মিলে প্রধাণতঃ তাদের সঙ্গে মাণিক চাঁদের পূর্বাপর যোগসাজশ, যিনি ইংরেজদের প্রকৃত ইচ্ছা এবং সামরিক প্রস্তুতির খবর নওয়াবের নিকট পৌঁছাননি, উপরন্তু তা গোপন করেছেন। বাজবাজ থানা এবং কলিকাতা পুনর্দখলে ইংরেজদের উৎসাহ দিয়েছেন এবং সাহায্য করেছেন। অনুরূপভাবে, ক্লাইভ কর্তৃক চন্দরনগর আক্রমণের পূর্বে নওয়াব তাদেরকে প্রতিরোধ করতে দৃঢ়

সংকল্পবদ্ধ ছিলেন; কিন্তু যে নন্দ কুমারকে এই দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়েছিল, তিনি দায়িত্ব পালন না করে ইংরেজদের নিকট থেকে মোটা অংকের ঘুষ গ্রহণ এবং তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। অনুরূপভাবে নওয়াবের দরবারে অবস্থান করে জগত শেঠ, উমিচাঁদ এবং রায় দুর্লভ রাম সাধ্যমত চেষ্টার মাধ্যমে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি অবলম্বন করা থেকে নওয়াবকে বিরত রাখেন। এসব লোকের সহায়তায় ক্লাইভ সহজেই প্রশাসনকে অচল করে দিতে এবং নওয়াবের একান্ত গোপনীয় সংবাদ সংগ্রহ এবং চিঠি পত্র হস্তগত করতে সক্ষম হয়।

আসলে সিরাজুদ্দৌলাহর মসনদে আরোহণের ছয় মাসের মধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সূচনা হয়। সিরাজুদ্দৌলাহও নিশ্চয়ই তাঁর বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রের বিষয় জানতে পেরেছিলেন, কিন্তু প্রতারণা এবং বিশ্বাসঘাতকতার জাল এত বেশি বিস্তৃত ছিল যে, তিনি কারও বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারেননি, কারণ তিনি কারও উপরই আস্থা স্থাপন করতে পারছিলেন না। সে সময়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা এবং অসহায়ত্ব চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে, যখন তিনি দেশের শাসন ব্যবস্থা বিদেশীদের হাতে চলে যাওয়া থেকে দেশকে রক্ষার জন্য মীর জাফরসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিকট তাঁর আকুল আবেদন জানান, সে আবেদনের বিপরীতে তারা তাঁকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন শুধু প্রয়োজনের সময় বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য। জগত শেঠ ও তার দলের অন্যান্যদের চেয়ে মীর জাফরের ভূমিকা কম ঘৃণ্য ছিল না। শুধু পার্থক্য হচ্ছে এই যে, মুর্শিদ কুলী খানের সময় থেকে এক সময়ের ক্ষমতাশালী মুসলমান অভিজাত শ্রেণীকে ক্রমান্বয়ে পশ্চাতে ঠেলে দেয়া হয়েছিল, মীর জাফর হচ্ছেন সে অধঃপতিত শ্রেণীর প্রতিনিধি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভারসাম্য রক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর অনুপস্থিতিতে বাস্তবিকপক্ষে উদীয়মান হিন্দু বণিক শ্রেণী খালী মাঠ পেয়ে যায়। আলীবর্দী খান এবং তাঁর পূর্বসূরী শুজাউদ্দীন উভয়ে যেহেতু তাদের সমর্থন নিয়েই বাংলার মসনদ লাভ করেছিলেন, সে প্রেক্ষিতে তাদের সঙ্গে মীর জাফরের মৈত্রী সম্ভবত অস্বাভাবিক কিছু মনে হবে না। তবে এই পরিস্থিতির বিশেষ বৈশিষ্ট ছিল। মসনদের জন্য সংগ্রামে ইংরেজদের হস্তক্ষেপ। এই হস্তক্ষেপ যেমন ছিল তাদের সাম্রাজ্যবাদী এবং বাণিজ্যিক উচ্চাকাঙ্খার ফল, তেমনি ছিল জগত শেঠ-মাণিক চাঁদের দলের উৎসাহ এবং সহযোগিতা প্রদানের ফল। পরবর্তী ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, মীর জাফরের প্রতি তাদের সমর্থনের চেয়ে ইংরেজদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতাই ছিল আসল কারণ।

এইরূপ মনে করার কোন হেতু নেই যে, যদি মীর জাফর এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যোগ না দিতেন বা সিরাজুদ্দৌলাহ তাকে বরখাস্ত বা বন্দী করতেন, তাহলে পরিস্থিতি সিরাজুদ্দৌলাহর জন্য ভাল হয়ে যেত। দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ, উদ্যমী এবং রোমাঞ্চ প্রিয় ইংরেজরা বণিক শ্রেণীর সঙ্গে জোট বেধে সিরাজের পতন না ঘটিয়ে এবং তাদের মনোনীত কোন ক্রীড়নককে মসনদে না বসিয়ে তাদের চক্রান্ত বন্ধ করতেন না। ইংরেজ কোম্পানী বা জগত শেঠ-মাণিক চাঁদের দলের কেউ যে একজন "অত্যাচারী" এবং "নীতিহীন" শাসকের স্থলে একজন ন্যায় পরায়ণ শাসককে অভিষিক্ত করতে চাননি, তা পলাশী যুদ্ধের পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যেই অত্যন্ত পরিস্কার হয়ে যায়। তাদেরই মনোনীত মীর জাফর তাদের দাবী পূরণে অসমর্থ এবং তাদের পীড়াপীড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে শীঘ্রই মসনদ ত্যাগ করেন। তাদের পরবর্তী পছন্দনীয় মীর কাশিমও তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে সমভাবে ব্যর্থ হন এবং যদিও তিনি দেশের প্রশাসন এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করার জন্য সর্ব প্রকারে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন। ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং দক্ষতা আনয়নের জন্য তার প্রচেষ্টার কারণে তিনি ক্ষমতাচ্যুত, পরাজিত এবং ইতিহাস থেকে বিলীন হয়ে যান। সমসাময়িক এমন কোন দালিলিক প্রমাণ নেই, যা থেকে দেখা যাবে যে, সিরাজের পতনের জন্য যারা সবচেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল, সেই জগত শেঠ, নন্দ কুমার- মাণিক চাঁদ চক্র দেশকে বিদেশীদের পুরো নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়া ঠেকানোর জন্য কোন কিছু করেছে। বিপরীতক্রমে, তাদের সমর্থন এবং সহযোগিতাই ইংরেজদেরকে বাংলায় সহজে সফল হতে সাহায্য করে। সিয়ার যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, "বাঙ্গালীদের বিভেদের কারণে দাক্ষিণাত্যে ইউরোপীয়ানদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য যেমন প্রচণ্ড যুদ্ধ করতে হয়েছে, বাংলায় তার প্রয়োজন এড়ানো গিয়েছে।"[১০৩৫]

এটা সিরাজুদ্দৌলাহর কোন ক্রুটি নয় যে, নওয়াব আলীবর্দী খান তাকে সিংহাসনের জন্য মনোনীত করে গিয়েছেন এবং তিনি তাঁর নিকটাত্মীয়দের নিকট থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং শত্রুতার সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁর চৌদ্দ মাসব্যাপী শাসনকালে তিনি তাদেরকে মোকাবেলা করেই অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং মনে হচ্ছে যে, তিনি হয়ত সফল হতেন, যদি না "বাঙ্গালীরা" বিশ্বাসঘাতকতা করতো এবং তাঁর শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য বিদেশীদেরকে ডেকে আনাকেই অগ্রাধিকার দিত। এই অবস্থায়ও সিরাজুদ্দৌলাহ ইংরেজ ও ফরাসী উভয়ের প্রতি, তাঁর নিজের প্রতি এবং তাঁর দেশের প্রতিও ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি

[১০৩৫] দি অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬১, পৃঃ ৪৬৯

তাঁর ব্যক্তিগত ত্রুটি বা অদক্ষতার জন্য ব্যর্থ হননি, ব্যর্থ হয়েছেন তাঁর লোকজনের চারিত্রিক দূর্বলতার জন্য এবং সে সময়ের পরিস্থিতি তাঁর প্রতিকূলে থাকার কারণে। তিনি এ কারণে ব্যর্থ হয়েছেন যে, তাঁর নিজস্ব লোকেরা তাঁর সঙ্গে বেঈমানি করেছে। প্রভাবশালী "বাঙ্গালীরা" দেশের স্বার্থের চেয়ে তাদের নিজেদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছে; এক সময়ের বিশাল মোঘল সাম্রাজ্যের কাঠামোতে যে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়েছিল এবং ধস নেমেছিল, বাংলা ছিল তার একটি অংশ মাত্র এবং এই বাংলা বা অন্য কোন প্রদেশও তখন যথেষ্ট শক্তি অর্জন করতে পারেনি, বিশেষ করে নৌ-শক্তি, যা দিয়ে ইউরোপীয় জাতিসমূহের ক্রমবর্ধমান আক্রমণকে প্রতিহত করা যেত এবং সর্বশেষ আরও একটি কারণ হচ্ছে এই যে, ইউরোপীয়ানরা গত শতাব্দীর ভৌগলিক আবিস্কারের ফলশ্রুতিতে ঠিক সময়ে বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণ এবং উপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিল।

সিরাজুদ্দৌলাহর পতন ছিল পাশ্চাত্যের নিকট প্রাচ্যের পতনের আগাম ঘোষণা এবং ইউরোপের নিকট এশিয়ার পতনের প্রতীক। তাঁর সংগ্রাম এবং পতন ছিল প্রাচ্যে পাশ্চাত্যের অবাঞ্চিত প্রবেশ এবং শাসনের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক এবং ব্যর্থ প্রতিরোধের নামান্তর মাত্র। তিনি সফল হননি; কিন্তু তিনি দেশকে ব্যর্থ করে দেননি। দেশই তাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। যেমন একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন; "তাঁর যে দোষই থাকুক না কেন, সিরাজুদ্দৌলাহ তাঁর প্রভুর সঙ্গে বেঈমানী করেননি বা তিনি তাঁর দেশকেও বিক্রি করেননি..। সে বিয়োগান্ত নাটকের প্রধান প্রধান নায়কদের মধ্যে তিনিই একমাত্র নায়ক, যিনি কোনরূপ প্রতারণা করার চেষ্টা করেননি।"[১০৩৬]

এটা ইংরেজদের কৃতিত্ব যে, তারা সফল হয়েছে, নওয়াবের বিরুদ্ধে তাদের দোষারোপ এবং অভিযোগসমূহ ছিল মোটামুটি তাঁর বিরুদ্ধে তাদের কুটনৈতিক ও রাজনৈতিক আক্রমণাত্মক ভূমিকারই অংশ বিশেষ। অতএব, তাকে বিচার করার জন্য এগুলোকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। এ ব্যাপারে অবশ্য একটি প্রাচীন প্রবচনকেও মনে রাখতে হবে যে, প্রেম এবং যুদ্ধে কোন কিছুই অন্যায় নয়, তাই কোন কোন ইংরেজ এজেন্ট যে প্রতারণা এবং শঠতা অবলম্বন করেছিল, তা উপেক্ষণীয়। ইংরেজদের সাফল্য শুধু একজন স্থানীয় শাসকের বিরুদ্ধে ছিলনা, তাদের সাফল্য ছিল তাদের আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসীদের বিরুদ্ধেও।

[১০৩৬] কর্ণেল জি.বি. ম্যালেসন, দ্যা ডিসাইসিভ ব্যাটলস অব ইন্ডিয়া .. ১৭৪৬ থেকে ১৮৪৯, লন্ডন, ১৮৮৫ পৃঃ ৭১

সিরাজুদ্দৌলাহ্‌র পতন বাংলায় ইংরেজ শাসনের সূচনা করে, যা প্রায় ২০০ (দু'শত) বৎসর স্থায়ী হয়েছিল। বাংলায় তাদের অবস্থান থেকে শক্তি সঞ্চয় করে তারা ক্রমান্বয়ে উপমহাদেশের অন্যান্য অংশেও তাদের শাসন সম্প্রসারিত করে এবং ইউরোপীয় অন্যান্য শক্তির আগ্রাসী পরিকল্পনা থেকে তাদের "ভারতীয় সাম্রাজ্যের" নিরাপত্তা বিধান কালক্রমে ঐ সব শক্তির সঙ্গে বৃটেনের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়ে পরিণত হয়। উনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধব্যাপী মধ্যপ্রাচ্য, মিশর, আরব, তুরস্ক, ইরান এবং আফগানিস্তানের ব্যাপারে বৃটিশ নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি ছিল একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এই প্রেক্ষিতে সিরাজুদ্দৌলাহ্‌র পতন এবং বাংলায় মুসলিম শাসনের অবসান আন্তর্জাতিক ইতিহাস এবং বিশ্ব ব্যবস্থায় একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।

-০-

মুঘল আমলে বাংলার কয়েকজন শাসক

সম্রাট শাহজাহান

শায়েস্তাখান

মুর্শিদকুলি খান

নবাব আলীবর্দী খান

নবাব সিরাজুদ্দৌলাহ

PLATE XLVI

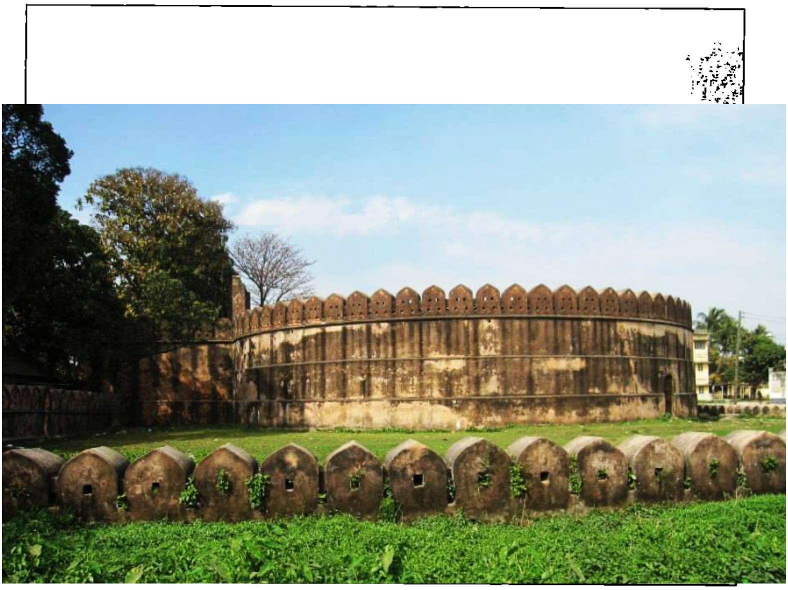

The Idrakpur Fort, Munshiganj built during Mir Jumla's time. Reproduced from M.A.A.I.P., Pl. 63c.

History of the muslims of Bengal
a book by
Dr. Muhammad Mohor Ali
Price: 400tk BDT $10.00 US
9 8 4 - 3 1 1 - 4 2 6 - 0

MEDHA BIKASH PROKASHON